









# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ পরিচালিত সচিত্র মাসিকপত্র

সম্পাদক—শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য

দ্বিতীয় ষাণ্মাসিক সূচীপত্র  
1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ : জুলাই—ডিসেম্বর

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ  
পি-23, রাজা রাজকৃষ্ণ ষ্ট্রীট, কলিকাতা-6  
'পরিষদ ভবন'  
ফোন : 55-0660

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

## বর্ণানুক্রমিক বাণ্যাসিক বিষয়সূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—১৯৭০

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার বিজ্ঞান চর্চা	বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	540	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
অবলোহিত রশ্মি	শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত	715	ডিসেম্বর
আগ্নেয়গিরি	সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়	389	জুলাই
আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যসম্ভান		477	অগাষ্ট
উদ্ভিদ ও ফস্করাস	শচীনন্দন বাগচী	415	জুলাই
উদ্ভিদ-হরমোন	শ্রীসরোজাক নন্দ	385	জুলাই
উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রসায়নের ভূমিকা	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	645	নভেম্বর
উদ্ভিদের দান	শ্রীচুণীলাল রায়	439	জুলাই
উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের বৈজ্ঞানিক			
পরিস্থিতি	সতীশরঞ্জন খাস্তগীর	514	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
উচ্চ-গচ্ছর	সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ	501	অগাষ্ট
এ. এম. ও পি. এম.	বিনায়ক সেনগুপ্ত	503	অগাষ্ট
খাদ্য সমস্তার ভয়াবহ রূপ	অনীতকুমার মুখোপাধ্যায়	434	"
ক্রোমোসোম ও মাহুকের রোগ	শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী	590	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
করাতের শুঁড়া থেকে কোক	শ্রীঅজয় গুপ্ত	434	জুলাই
কলকাতার ভূগর্ভ রেল : একটি সমীক্ষা	সাধনচন্দ্র দত্ত	569	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
কবির কয়েকটি দিক	সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত	469	অগাষ্ট
কৃত্তিকা বার নাম	অরুণরতন ভট্টাচার্য	611	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
কৃষি-সমস্তার সমাধানে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ			
হরমোনের ভূমিকা	মনোজকুমার সাধু	705	ডিসেম্বর
কুষ্ঠরোগ নিরাময়ে নতুন ওষুধ		666	নভেম্বর
ক্যালার রোগের নতুন ওষুধ		662	"
খাদ্য-সমস্তা ও রসায়ন	শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়	460	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
গোখাতের চাইনি বা সাইলেজ	শ্রীমৃণালকান্তি ভৌমিক	408	জুলাই
গতিশীল মহাদেশ	১. শ্রীমুখিত সেন	741	ডিসেম্বর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
ঘর গরম করতে রঙের অভিনব ভূমিকা		665	নভেম্বর
চাঁদের পাখর	শ্রীঅলোককুমার সেন	487	অগাষ্ট
চা	মণীন্দ্রনাথ দাস	667	নভেম্বর
চুলকুনি এসেছে	সুধাংকুবল্লভ মণ্ডল	403	জুলাই
চিকিৎসা-বিজ্ঞানের মহাকাশ গবেষণার		419	"
ফল		615	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
চিকিৎসার ইলেকট্রনিক্স	জয়ন্ত বসু		
জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর			
বর্ণালীমিতি	কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	671	নভেম্বর
টিন	চকলকুমার রায়	683	"
ট্রেনার পদ্ধতি	মিহিরকুমার কুণ্ডু	709	ডিসেম্বর
ট্যাকিওন্স	অজয় গুপ্ত	739	"
ডিটারজেন্ট ও তার আধুনিক প্রয়োগ	সমীরকুমার রায়	393	জুলাই
থ থোসিস	শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর	582	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
দূরবীনের জন্মকথা	বিনায়ক সেনগুপ্ত	440	জুলাই
ধূমকেতুর কথা	রতনমোহন থা	484	অগাষ্ট
ধাঁধা	সমীরকুমার ঘোষ	627	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
ধাতু-নিষ্কাশনী কোক করলা	হরেন্দ্রনাথ রায়	423	জুলাই
নিজ্জার দ্রাঘু-রাসায়নিক তত্ত্ব	সুভাষচন্দ্র বসাক ও		
	জগৎজীবন ঘোষ	492	অগাষ্ট
নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার	অরুণ রায়	455	অগাষ্ট
নাইলনের জাল	হিম্মাল রায়	620	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
পলিওয়াটার	শ্রীসুশীলকুমার নাথ	687	নভেম্বর
পদার্থের চতুর্থ অবস্থা	পার্বসারথি চক্রবর্তী	467	অগাষ্ট
পরমাণু-শক্তির কল্যাণময় ভবিষ্যৎ		474	"
পরমাণু তাজবার বৃহত্তম স্রষ্টা		663	নভেম্বর
পাই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস	হিম্মাল রায়	443	জুলাই
পুস্তক পরিচয়	শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়	498	অগাষ্ট
	রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	430	জুলাই
	ব্রহ্মানন্দ দাশগুপ্ত	609	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
পেঁয়াজ	প্রণবকুমার তপস্বী	654	নভেম্বর
প্লাজমা ও বিপরীত জগৎ	সুধেন্দুবিকাশ কর	522	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
প্রজাতির উদ্ভব	সুহৃদা মৌলিক	399	জুলাই

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
পৃথিবীর বয়স	জ্যোতির্ময় হুই	681	নভেম্বর
ঐক্যতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে			
বিজ্ঞানের অবদান	মিনতি চক্রবর্তী	638	"
পৃথিবীর গভীরে	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	401	জুলাই
পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব	গিরিজাচরণ ঘোষ	431	জুলাই
প্রশ্ন ও উত্তর	শ্রীমন্তনন্দ দে	446	জুলাই
"	"	508	অগাষ্ট
"	"	631	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
"	"	688	নভেম্বর
"	"	745	ডিসেম্বর
বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ		(94	নভেম্বর
বাংলা দেশে মাছের চাষ	শ্রীধরগঙ্গনাথ দাস	526	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—			
অতীত ও বর্তমান	শ্রীমদ্বিদ্যরঞ্জন মিত্র	4০2	অগাষ্ট
বিজ্ঞান-সংবাদ		428	জুলাই
"		675	নভেম্বর
"		727	ডিসেম্বর
বিবিধ		447	জুলাই
"		509	অগাষ্ট
"		691	নভেম্বর
"		746	ডিসেম্বর
বিজ্ঞানের ভাষা	লীলা মজুমদার	544	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
বিজ্ঞানাগরের গ্রন্থাগার	রাসবিহারী রায়	547	"
বিজ্ঞান-চিন্তা পদ্ধতির সার্বজনীনতা	শ্রীমহাদেব দত্ত	577	"
ভারতের জাতীয় পাখী—ময়ূর	শ্রীবিষ্ণুনাথ মিত্র	737	ডিসেম্বর
ভারতের মহাকাশ গবেষণা	শঙ্কর চক্রবর্তী	649	নভেম্বর
ভারতীয় প্রাইমেট	শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু	480	অগাষ্ট
ভারতের কৃষি সমস্যা	শ্রীহরীশকুমার সুধোপাধ্যায়	570	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
ভারতের কল ও শিল্প হিসাবে তাদের			
ব্যবহার	বলাইচাঁদ কুণ্ডু	554	"
ভূমিকম্প কেন ?	দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	534	"
মজার বস্তু	মহায়া বিশ্বাস	628	"
মহাবিশ্ব	আব্দুল হক খন্দকার	655	নভেম্বর
মহাজাগতির রশ্মি আলোক	হীরেন্দ্রকুমার পাল	697	ডিসেম্বর

বিষয়	লেখক	পৃষ্ঠা	মাস
মাহুঘের বিবর্তন পথের নূতন নিশানা		375	অগাঠ
মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ	গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	633	নভেম্বর
রেডিও-কটো	শ্রীবিখনাথ বড়াল	733	ডিসেম্বর
রিয়াট্টর	মনোজ্ঞন বিশ্বাস	411	জুলাই
রেডার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ	ভামিন্দ্র দে	195	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
লিউকেমিয়া	সমর চক্রবর্তী	458	অগাঠ
শনিগ্রহ	সোমদত্তা সিংহ	586	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
শব্দের ব্যবহার	শ্রীবিখনাথ বড়াল	435	জুলাই
শব্দ সঞ্চয়	সমীরকুমার ঘোষ	506	অগাঠ
শোক সংবাদ—			
বিজ্ঞানজাল গজোপাধ্যায়		690	নভেম্বর
প্রোফে: এ. ভি. রামন		729	ডিসেম্বর
ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়		31	"
সংখ্যা নিয়ে খেলা	অমর নাথ রায়	695	নভেম্বর
সংশ্লেষণের মাধ্যমে জিনের ভাষা			
বিজ্ঞান—ধোঁরানার যুগান্তকারী আবিষ্কার দেবব্রত নাগ ও	জগৎজীবন ঘোষ	600	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ		420	জুলাই
সিমেন্ট বালির নোকা		479	অগাঠ
সুপার টাঙ্কার	দীপ্তিময় দে	499	ডিসেম্বর
গৌরজগতে প্রাণের সন্ধান	দিলীপ বসু	622	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
হিমবাহ	সন্তোষকুমার দে	719	ডিসেম্বর
হিমাক্ষের নীচে জীবন	দেবব্রত নাগ এবং জগৎজীবন ঘোষ	722	ডিসেম্বর
হামক্ৰি ডেভির শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার	উমা চট্টোপাধ্যায়	679	নভেম্বর

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

মাধ্যমিক লেখকসূচী

জুলাই হইতে ডিসেম্বর—1970

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী	ক্রোমোসোম ও মাহুঘের রোগ	590	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
শ্রীঅজয় গুপ্ত	ট্যাকিওন্স	739	ডিসেম্বর
"	করাতের শুঁড়া থেকে কোক	434	জুলাই
অরুণকুমার রায়চৌধুরী	একজন নিয়ন্ত্রণ	551	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	বাগ
অরুণ রায়	নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার	465	অগাঠ
অরুণরতন ভট্টাচার্য	কৃত্তিকা বার নাম	611	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
শ্রীআলোককুমার সেন	চাঁদের পাথর	487	অগাঠ
অমরনাথ রায়	সংখ্যা নিয়ে খেলা	685	নভেম্বর
আব্দুল হক খন্দকার	বহাধিষ	656	নভেম্বর
উমা চট্টোপাধ্যায়	হাস্কি ডেভির প্রোট আবিষ্কার	679	নভেম্বর
কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়	জৈব বৌগের ভর-বর্ণালীমিতি	671	নভেম্বর
শ্রীবেগেননাথ দাস	বাংলা দেশে বাহুর চাষ	526	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়	মাধ্যাকর্ষণ-ভরজ	633	নভেম্বর
গিরিজাচরণ ঘোষ	পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব	431	জুলাই
চকলকুমার রায়	টিন	683	নভেম্বর
চুণীলাল রায়	উদ্ভিদের দান	439	জুলাই
জয়ন্ত বসু	চিকিৎসার ইলেক্ট্রনিক্স	615	সেপ্টেম্বর-অক্টো:
জ্যোতির্ষ হই	পৃথিবীর বয়স	681	নভেম্বর
শ্রীজিদিবরঞ্জন মিত্র	বাংলা-ভাষার বিজ্ঞান-চর্চা, অতীত ও বর্তমান	462	অগাঠ
দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়	পৃথিবীর গভীরে	401	জুলাই
"	ভূমিকম্প কেন ?	534	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
দীপ্তিময় দে	সুগার ট্যাঙ্কার	499	অগাঠ
দিলীপ বসু	সৌরজগতে প্রাণের সন্ধান	622	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
দেবব্রত নাগ ও অগ্নীজীবন ঘোষ	সংলগ্নবর্ণের মাধ্যমে জিনের ভাষা বিশ্লেষণ— ধোরানার যুগান্তকারী আবিষ্কার	600	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
"	হিমাতের নীচে জীবন	722	ডিসেম্বর
পার্শ্বসারথি চক্রবর্তী	পদার্থের চতুর্থ অবস্থা	467	অগাঠ
প্রণবকুমার তপস্বী	পেরাজ	654	নভেম্বর
শ্রীপ্রিয়দারঞ্জন রায়	খাদ্যসম্পদ ও রসায়ন	560	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
"	পুস্তক পরিচয়	498	অগাঠ
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র কর	পুথোসিস	582	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত	অবলোহিত রশ্মি	715	ডিসেম্বর
ব্রজানন্দ দাশগুপ্ত	পুস্তক পরিচয়	609	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
বলবিহারী কুণ্ড	ভারতের কল ও খাদ্য হিসাবে তাদের ব্যবহার	554	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য	অক্ষরকুমার দত্ত ও বাংলার বিজ্ঞান-চর্চা	540	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
শ্রীবিষ্ণুনাথ মিত্র	ভারতের জাতীয় পাখী—ময়ূর	737	ডিসেম্বর

লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
বিশ্বনাথ বড়াল	শব্দের ব্যবহার	435	জুলাই
"	রেডিও-কটো	733	ডিসেম্বর
বিনায়ক সেনগুপ্ত	দূরবীনের কথা	400	জুলাই
"	এ. এম ও পি. এম	503	অগাষ্ট
মণীন্দ্রনাথ দাস	চা	667	নভেম্বর
মনোজকুমার সানু	কৃষি-সমস্ত্রার সমাধানে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ-হর্যোনের ভূমিকা	705	ডিসেম্বর
শ্রীমদ্রজন বিশ্বাস	রিয়্যাক্টর	411	জুলাই
মহাদেব দত্ত	বিজ্ঞান-চিন্তা-পদ্ধতির সাংজনীনতা	517	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
মুহুলা মৌলিক	প্রজাপতির উদ্ভিদ	399	জুলাই
	হর্ষশিলিঃ	741	ডিসেম্বর
মহা বিদ্যাস	মজার যন্ত্র	628	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
মিহিরকুমার কুতু	ট্রেসার পদ্ধতি	709	ডিসেম্বর
মিনতি চক্রবর্তী	প্রাকৃতিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের অবদান	639	নভেম্বর
মৃণালকান্তি ভৌমিক	গো-খাত্তের চাটুনি বা সাইলেজ	408	জুলাই
রতনমোহন খা	ধুমকেতুর কথা	481	অগাষ্ট
রবীন বন্দ্যোপাধ্যায়	উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রসায়নের ভূমিকা	645	নভেম্বর
"	পুস্তক পরিচয়	430	জুলাই
রাসবিহারী রায়	বিশ্বাসাগরের গ্রাহাগার	547	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
লীলা মজুমদার	বিজ্ঞানের ভাষা	541	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
শব্দর চক্রবর্তী	ভারতের মহাকাশ গবেষণা	649	নভেম্বর
শচীনন্দন বাগচী	উদ্ভিদ ও কসকরাস	415	জুলাই
শ্রীমন্তনন্দ দে	এক ও উত্তর	426	জুলাই
"	"	509	অগাষ্ট
"	"	631	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
"	"	688	নভেম্বর
"	"	745	ডিসেম্বর
"	রেডার ও ব্রুটিপাতের পরিমাপ	795	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
সত্যেন্দ্রকুমার দে	হিমবাহ	719	ডিসেম্বর
সত্যেন্দ্রনাথ খাঙ্গার	উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর বৈজ্ঞানিক পরিমিত	514	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
হর্ষেন্দ্রবিকাশ কর	প্রাকৃতিক ও বিপরীত জগৎ	522	"



লেখক	বিষয়	পৃষ্ঠা	মাস
সাধনচন্দ্র দত্ত	কলকাতার ভূগর্ভ রেল : একটি সমীক্ষা	569	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
অশীলকুমার মুখোপাধ্যায়	ভারতের কবি সম্রাট	570	"
সোমদত্তা সিংহ	শনিগ্রহ	586	"
সমীরকুমার ঘোষ	ধাঁধা	627	"
	শব্দ সংকল	506	অগাষ্ট
অশীলকুমার নাথ	পলিগেরাটার	657	নভেম্বর
অনীতকুমার মুখোপাধ্যায়	ধাতু সমস্তার ভয়াবহ রূপ	449	অগাষ্ট
সমর চক্রবর্তী	লিউকেমিয়া	468	অগাষ্ট
সমীরকুমার রায়	ডিটারজেন্ট ও তার আধুনিক প্রয়োগ	393	জুলাই
সত্যেন্দ্রনাথ গুপ্ত	কবির কয়েকটি দিক	469	অগাষ্ট
অভাসচন্দ্র বসাক ও			
জগৎজীবন ধোব	নিদ্রার আয়ু-রাসায়নিক তত্ত্ব	492	অগাষ্ট
সৌম্যেন্দ্রনাথ গুহ	উচ্চ-গন্ধর	501	"
শ্রীমরোজাক নন্দ	উদ্ভিদ-হরমোন	385	জুলাই
সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়	আগ্নেয়গিরি	389	"
সুধাংশুবরদত্ত মণ্ডল	চুলকুনি এসসে	403	"
শ্রীহরেন্দ্রনাথ রায়	ধাতু-নিষ্কাশনী কোক করা	423	"
শ্রীহরিমোহন কুণ্ডু	ভারতীয় প্রাইমেট	480	অগাষ্ট
হিজোল রায়	নাইলনের জাল	620	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
	পাই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের কথা	443	জুলাই
হীরেন্দ্রকুমার পাল	মহাজাগতিক রশ্মির আলোক	697	ডিসেম্বর

## চিত্রসূচী

অধ্যাপক দি. ভি. রামন	আর্টপেনারের 1ম পৃষ্ঠা	ডিসেম্বর
1886 সালে বেঙ্গোজের কারখানার তৈরি		
প্রথম মোটর গাড়ীর মডেল	আর্টপেনারের 2য় পৃষ্ঠা	অগাষ্ট
ইন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়	731	ডিসেম্বর
কয়েকটি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি	724	ডিসেম্বর
করনার মানচিত্র	535	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
কাংলা মাছ	530	"
কালবোঁস মাছ	532	"
কিউ মানমন্দিরে নির্মিত ভূপৃষ্ঠের উপর উল্লেখ		
বৈজ্ঞানিক বলের দৈনিক পরিবর্তন	515	"

ক্রোমোজোম	590	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
ক্যাকটাস গাছ	2নং আর্ট পেপারের 2য় পৃঃ	"
সিবন	480	অগাষ্ট
গ্রাহলোসাইটিক লিউকেমিয়া	460	"
গ্রাহক-বয়	735	ডিসেম্বর
চুলকুনির উৎপত্তির ধারা	405	জুলাই
জরিপ পদ্ধতি	432	"
জল লবণযুক্ত করবার যন্ত্র	594	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
G. M. T. ঘণ্টার সঙ্গে সমুদ্রের উৎসর্গ:		
বৈজ্ঞানিক বলের পরিবর্তন	517	"
জীবন-জ্ঞান যন্ত্র	আর্ট পেপারের 2য় পৃষ্ঠা	নভেম্বর
টিনে অক্সিজেন দিয়া মাছ বোঝাই করা হইতেছে	529	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা	447	জুলাই
ডক্টর বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়	690	নভেম্বর
ডক্টর অ্যালবার্ট ক্রু	আর্ট পেপারের 2য় পৃষ্ঠা	জুলাই
ডি. এন. এ অণুর গঠন	602	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
দেহে চুলকুনির আক্রমণের লক্ষ্যস্থল	400	জুলাই
নার্শারী ট্যাঙ্কের দৃশ্য	526	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
নিউক্লিওসাইড, নিউক্লিওটাইড ও		
পলিনিউক্লিওটাইডের দৃশ্য	605	"
পৃথিবীর অন্তঃস্থল, ব্যাণ্ডেল, ভূত্বক	402	জুলাই
প্রাণের বলয়	623	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
প্রেরক-বয়	734	ডিসেম্বর
প্রোটোলেটের কাজ	428	অগাষ্ট
প্রেনে চারা পোনার টিন বোঝাই	528	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
কিনাইল অ্যালানিন পরিবাহক আর. এন. এ-র গঠন	603	"
বানর	482	অগাষ্ট
বৃষরাশি	612	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
ভয় নির্ণয়ের পদ্ধতি	672	নভেম্বর
ভারতের পৃথক পৃথক তৈরী একটি রকেট		
উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে	650	নভেম্বর
মাছধরা যন্ত্র	628	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
মাছধরার ক্রোমোজোম ( ডেনডার কংগ্রেসের যত্নসূত্রে )	527	"
মৃগেল মাছ	531	"
রেলগাড়ীতে খোলা ছাড়ির মধ্যে করে মাছ চালান	527	"

রেডার বত্র	595	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
রেডারের পদার্থ ইলেকট্রন প্রবাহের গতিপথ	596	"
রেডারের পদার্থ	597	"
কুই মাছ	530	"
লেবিস	484	অগাষ্ট
লেসার-পেজিল	1নং আর্ট পেপারের 1ম পৃষ্ঠা	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
লেসার রশ্মির কার্যকারিতা	581	"
শল্যচিকিৎসকদের ব্যবহারোপযোগী লেসার রশ্মির আলোর ছুরি	720	ডিসেম্বর
শিলাস্তরের আচ্ছাদিত বিদ্যুতি	537	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর
সামোয়া নামক স্থানে আপস্ফোড'কর্জক নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ:		
বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন	516	"
সপ্তর্ষি মণ্ডল	613	"
সংশ্লিষিত ডি. এন. এ	606	"
হার্ট-লাং মেশিন	533	"
হিউমাসের কস্ফেক্ট মুক্ত করবার ক্ষমতা	417	জুলাই
হুৎস্পন্দন সহায়ক যন্ত্র	619	সেপ্টেম্বর-অক্টোবর

## বিবিধ

অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় সম্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত	693	নভেম্বর
1974 সালে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সস্তাবনা	570	অগাষ্ট
1970 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার	691	নভেম্বর
করোনারী অক্সুশন সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা	748	ডিসেম্বর
কাগজ, আধের ছিব্ড়া ও তুর প্রভৃতি থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য	692	নভেম্বর
কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি	738	ডিসেম্বর
কৃত্রিম রক্ত	749	ডিসেম্বর
চাঁদের মাটি নিয়ে লুনা-16 কিরে এসেছে	691	নভেম্বর
চাঁদের শিলা খনিজ পদার্থের কলিকা দিয়ে গঠিত	"	"
চাঁদের বুকে সকল সোভিয়েট মহাকাশযান লুনোথোদ-1	746	ডিসেম্বর
জোও-8 কিরে এসেছে	692	নভেম্বর
অরিয়ান রজ্জুশব্দের 25 বছর	512	অগাষ্ট
চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নতুন অধ্যায়—এণ্ডোফোপি	749	ডিসেম্বর
খোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233	691	নভেম্বর
ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নতুন কৃতিত্ব	447	জুলাই
নবম বার্ষিক রাজশেখর রায় স্মৃতি বক্তৃতা	"	"
পরমাণু প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের অগ্রগতি	509	অগাষ্ট
পারমাণুবিদ্যুত অঞ্চল	749	ডিসেম্বর
বুধ ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অল্পসন্ধান	632	নভেম্বর
বিশিষ্ট কৃষি বিজ্ঞানীর 1970 সালের শান্তির জন্য নোবেল পুরস্কার লাভ	750	ডিসেম্বর
শিবকো ও ভাগ উল	511	অগাষ্ট
পূর্ব পাকিস্তানে প্রচণ্ড ঘূর্ণিঝড়	750	ডিসেম্বর

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

জুলাই, ১৯৭০

সপ্তম সংখ্যা

## উদ্ভিদ-হরমোন

শ্রীসরোজাক্ষ নন্দ

জীব-বিজ্ঞান ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের কল্যাণে হরমোন কথাটি বর্তমানে সুপ্রচলিত হয়েছে, যদিও এর সত্যকে সঠিক ধারণা অনেকেরই নেই। হরমোন কথাটি গ্রীক hormon শব্দটি থেকে নেওয়া হয়েছে, যার অর্থ—চালিত করা। প্রাণিদেহে যে সকল নালীহীন বা অন্তঃপ্রাবী গ্রন্থি আছে, তারা প্রয়োজনবোধে বিভিন্ন ধরনের জটিল জৈব রাসায়নিক পদার্থ নিঃসরণ করে এবং ঐ সকল পদার্থ রক্ত-প্রবাহের সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে দূরবর্তী কোষ বা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং সেখানে বিশেষ ধরনের কাজ করে। এই জৈব রাসায়নিক পদার্থগুলিকে হরমোন নাম দেওয়া হয়েছে। দেহবহের যে সকল অত্যা-বক্তব্য করার কালে প্রাণীদের বুদ্ধি পাওয়া, বংশ

বুদ্ধি করা প্রভৃতি অঙ্গপ্র-ধরনের কাজ সম্পন্ন হয়, তাদের একক ও পারস্পরিক সংঘর্ষ নিয়ন্ত্রিত ও সুসংহত করে ঐ সব হরমোন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, প্রাণীরা হঠাৎ কোন রকম ভয় পেলে তাদের অ্যাড্রিনাল গ্রন্থি থেকে অ্যাড্রিনালিন হরমোন রক্তের মধ্যে নিঃসৃত হয়, যার ফলে হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া দ্রুততর হয়। পিটুইটারি গ্রন্থি গুলি থেকে বিভিন্ন প্রকারের পিটুইটারি হরমোন নিঃসৃত হয়। তাদের মধ্যে কোনটি দেখের বুদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করে, কোনটি পুরুষের বিশেষ বয়সে গোঁড়-দাড়ি গজাতে সাহায্য করে, কোনটি পুংজনন-কোষের বৃদ্ধি সাধন করে, কোনটি জীভিষকোষকে পরিণত করে। প্যানক্রিয়াস গ্রন্থিতে উৎপন্ন ইনসুলিন হরমোন রক্তের মধ্যে শর্করার পরিমাণ

নিয়ন্ত্রণ করে। সম্মুখবর্তী পিটুইটারী গ্রন্থিকে আবার সর্বপ্রধান গ্রন্থি বলা হয়, কারণ এথেকে নিঃসৃত বিভিন্ন হরমোন অন্তান্ত্র অন্তঃপ্রাবী গ্রন্থির হরমোন নিঃসরণ নিয়ন্ত্রিত করে।

প্রাণিদেহের অস্থ অবস্থার হরমোনের ক্রিয়াকে নানা বাস্তবত্বসম্বিত অর্কেট্টার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। অর্কেট্টার প্রত্যেকটি বাস্তবত্ব তার নিজের নির্দিষ্ট কাজটি যেমন সম্পন্ন করে, তেমনি অন্ত্র প্রত্যেকটির সঙ্গে সজতিও রক্ষা করে। আবার সব যন্ত্রগুলিই এক প্রধান নির্দেশকের নির্দেশ মেনে চলে। এর ফলে পারস্পরিক সহযোগিতায় উপযুক্ত পরিমাণে হরমোন নিঃসৃত করে এবং প্রত্যেকে একজন প্রধান নির্দেশকের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়। এর ফলে যে অপূর্ণ জৈব ক্রিয়া সম্পন্ন হয়, তারই পরিণতি হলো সুস্থাস্থ্য।

প্রাণিদেহের হরমোনের মত উদ্ভিদদেহেও হরমোন আছে কিনা, তা উদ্ভিদতত্ত্ববিদগণ বহুকাল স্থির করতে পারেন নি। প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের গঠন, বৃদ্ধি এবং অন্তান্ত্র কাজ কিসের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, সে সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা পূর্বে নানারূপ অদ্ভুত মত পোষণ করতেন। এক সময়ে তাঁরা ধারণা করেছিলেন যে, এক রহস্যময় প্রাণশক্তি এই সব ক্রিয়া নিয়ন্ত্রিত করে, আবার কেউ কেউ জৈব বিদ্যুৎ-শক্তিকে এগুলির নির্ধারক বলে চিন্তা করতেন। কিন্তু পরবর্তী কালে বিজ্ঞানীদের বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে নির্দিষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, প্রাণী ও উদ্ভিদদেহের আত্যন্তরীণ কার্য-পদ্ধতি নির্ধারিত হয় কতকগুলি জৈব রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা, যাদের নাম দেওয়া হয় হরমোন। চার্লস ডারউইন 1880 খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর 'Power of Movement in Plant' নামক গ্রন্থে একরূপ ধারণা প্রকাশ করেন যে, উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গের মধ্যে কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ উৎপন্ন হয়, যারা তার বৃদ্ধি ও সকালনে সাহায্য করে। ডারউইন এক জাতীয় ঘাসের অঙ্গুরোঙ্গের

পরীক্ষা করেছিলেন। একটি শবুর মত আকৃতি-বিশিষ্ট টিনের চোত্তের মাথার ছিদ্র দিয়ে অঙ্গকারে রক্ষিত অঙ্গুরের কলিগুণ্টাইলের মাথায় সূর্যালোক ফেলা হচ্ছিল (তুট্টা, ধান, গম প্রভৃতি এক-বীজপত্রী বীজের জন্মমূল একটি পাতলা পর্দা দিয়ে ঢাকা থাকে। একেই কলিগুণ্টাইল বলা হয়); কিন্তু দেখা গেল—যে বিন্দুতে আলোক-পাত করা হচ্ছিল, তার কয়েক মিলিমিটার নীচের অংশ আলোকের দিকে সবচেয়ে বেশী বক্রতা লাভ করছে। এথেকে ডারউইন ধারণা করেন যে, কলিগুণ্টাইলের ডগা থেকে নীচের দিকে তন্তুগুলির মধ্যে কোন ধরণের উত্তেজনা সঞ্চারিত হচ্ছে। ডারউইন এই উত্তেজনাকে রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা উৎপন্ন বলে ধারণা করেছিলেন, কিন্তু এর স্বরূপ তিনি আবিষ্কার করতে পারেন নি।

1909 খৃষ্টাব্দে জার্মান বিজ্ঞানী ফিটিং ববছীপে এক ধরণের অর্কিডের উপর পরীক্ষা চালিয়ে লক্ষ্য করেন যে, পরাগনিষেকের পরে ফুলের পাপড়িগুলির রং দ্রুত বিবর্ণ হয়ে আসে এবং গর্ভকোষের বৃদ্ধি হতে থাকে। ফিটিং কতকগুলি দ্রুত পরাগরেণুকে জলে মিশ্রিত করে সেগুলিকে সমস্তপ্রস্তুতি ফুলের গর্ভমুণ্ডের উপর ছড়িয়ে দেন। এতে স্বাভাবিক পরাগনিষেকের মতই ক্রিয়া হতে দেখা গেল। একেজে পরাগরেণুগুলি দ্রুত, স্তম্ভাৎ কোন প্রাণশক্তির কল্পনা করা যায় না। এথেকে ফিটিং-এর ধারণা বহুমূল হয় যে, পরাগনিষেকের মূলে আছে কোন অজানা রাসায়নিক পদার্থ।

ধানগাছের একটা অদ্ভুত বোগ বহুদিন ধরে চাষীরা লক্ষ্য করে আসছেন। কতকগুলি ধানের চাষা অন্তদের অপেক্ষা অতি দ্রুত বাড়তে থাকে এবং হলুদে ও বিবর্ণ হয়ে যায়, যেন তারা দীর্ঘ দিন সূর্যালোক থেকে বঞ্চিত আছে। অবশেষে গাছগুলি শুকিয়ে মরে যায়। জাপানী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানীরা একরূপ রোগাক্রান্ত গাছ থেকে এক ধরণের পরজীবী ছত্রাকের সন্ধান পান, যাকে

ভীরা এই রোগের কারণ বলে ব্যাখ্যা করেন। কিন্তু ১৯২৬ খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ফুরোসাওয়া দেখালেন যে, এই রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ঐ ছত্রাক নয়, কিন্তু ঐ ছত্রাক-নিঃসৃত একটি জৈব রাসায়নিক পদার্থ। তিনি ঐ ছত্রাক রসায়নাগারে পোষণ করেন এবং তা থেকে কাখ প্রস্তুত করে তা নির্বোজিত অবস্থার সাধারণ ধান গাছের উপর প্রয়োগ করে দেখেন যে, গাছগুলি পূর্ণাঙ্গিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে। একেত্রে ছত্রাকগুলি মৃত ও নিষ্ক্রিয়, সুতরাং ঐ রোগের প্রত্যক্ষ কারণ ছত্রাক-নিঃসৃত কোন রাসায়নিক পদার্থ।

জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নিয়ে প্রচুর গবেষণা করেন এবং অবশেষে ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে জাপানী বিজ্ঞানী ইয়ামুতা এবং সুমিকি একটি নির্দিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, যা ধানগাছের পূর্বাঙ্গ রোগটি সৃষ্টি করতে পারে। যে ছত্রাক থেকে এই পদার্থটি নিষ্কাশন করা হলো তার নাম *Gibberella fujikuroi* এবং ঐ রাসায়নিক পদার্থটির নাম দেওয়া হলো *Gibberellin*।

১৯৪৬ খৃষ্টাব্দে হাগেন-স্মিট এবং তাঁর সহ-ধর্মীরা অপরিণত ছুটার বীজ থেকে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করতে সক্ষম হন, তার নাম ইন্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড। এই পদার্থটি প্রয়োগ করে বিনা পরাগনিবেকে অর্কিড বুল ও টোম্যাটোর পরাগনিবেকের কাজ হয়।

উদ্ভিদের বিভিন্ন অঙ্গ জল, আলোক, উত্তাপ ও মাধ্যাকর্ষণের উত্তেজনার সাড়া দেয় ও সঞ্চালিত হয়। এই সঞ্চালন কখনও অল্পকূল এবং কখনও প্রতিকূল হতে পারে। ব্যাপারটিকে সাধারণভাবে 'ট্রপিক মুভমেন্ট' বলা হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে, বীজের অঙ্কুরোদগমের পরে কাণ্ডের অংশটি আলোর অভিমুখে প্রসারিত হয়, আবার বুল অংশটি আলোর বিপরীত দিকে অর্থাৎ মাটির ভিতরে অঙ্কুরে প্রবেশ করে। একেত্রে উদ্ভিদের

কাণ্ডাংশকে বলা হয় আলোকানুবর্তী এবং বুল অংশকে বলা হয় আলোক-প্রতিবর্তী।

'ট্রপিক মুভমেন্ট'র বিভিন্ন পরীক্ষা থেকে নানা-বিধ উদ্ভিদ-হার্মোনের পরিচয় এবং তাদের ক্রিয়া-সম্বন্ধে বর্ণনা জানলাভ করা হয়েছে। ১৮৮০ খৃষ্টাব্দে ডারউইন কলিওপ্টাইলের উপর আলোর ক্রিয়া লক্ষ্য করে যে উত্তেজনা প্রবাহের কথা বলেন, তার স্বরূপ নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বহু-কাল ধরে বিতর্কের সৃষ্টি হয়েছিল। কেউ-কেউ বলেছিলেন যে, আলোক উদ্ভিদের কোষ-গুলিকে 'পোলারাইজ' করেছে এবং তার ফলে এক কোষ থেকে অন্য কোষে উত্তেজনা প্রবাহিত হচ্ছে। কিন্তু এই মতবাদ পরীক্ষার দ্বারা সমর্থিত হয় নি। ১৯১০ খৃষ্টাব্দে বরসেন-জেনসেন পরীক্ষা করে দেখালেন যে, যদি অঙ্কুরের ডগাটিকে কেটে ফেলা হয় এবং এক বিন্দু জিলাটিন লাগিয়ে কলিওপ্টাইলের উপর বসিয়ে দেওয়া যায়, তাহলেও তার উপর আলোর ক্রিয়া স্বাভাবিক-ভাবেই হয়। এই পরীক্ষার প্রমাণিত হলো যে, উত্তেজনার প্রবাহ কোষের 'পোলারাইজেশন'ের জন্তে হতে পারে না, কারণ একেত্রে ছিন্ন অংশ দুটির মধ্যে কোষের যোগাযোগ অবচ্ছিন্ন নয়। সুতরাং ব্যাপারটি নিশ্চয়ই রাসায়নিক পদার্থের প্রবাহের জন্তে হয়েছে।

এর পর বিখ্যাত বিজ্ঞানী ওয়েন্ট কলিওপ্টাইলের বৃদ্ধির পরিমাণ নির্ণয়ের জন্তে একটি পরীক্ষা করেন। প্রথমে তিনি কলিওপ্টাইলের আবরণটি অঙ্কুরের ডগা থেকে বিচ্ছিন্ন করে অ্যাগার-জেলের একটি খণ্ডের উপর বসিয়ে দিলেন। এতে কলিওপ্টাইল থেকে কিছুটা রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে লেগে গেল। এর পর কলিওপ্টাইলটি ফেলে দিয়ে অ্যাগার-জেলের খণ্ডটি অঙ্কুরের মাথার এক দিকে বসিয়ে দিলেন। দু-এক ঘণ্টার মধ্যে দেখা গেল যে, যে দ্বারে অ্যাগার-জেল বসানো হয়েছে, তার

বিপরীত দিকে অঙ্কুরটির মাথা বেঁকে বাড়ে। এই বেঁকে যাওয়ার কারণ হলো, ঐ দিকের কোবের বৃদ্ধি অল্প দিক অপেক্ষা অনেক বেশী হচ্ছে। ওয়েট আরো দেখলেন যে, বত বেনী সংখ্যক কলিগপ্টাইলের ডগা অ্যাগার-জেলের উপর রাখা যায়, অর্থাৎ বত বেনী কলিগপ্টাইলের রস অ্যাগার-জেলের মধ্যে আসে, ততই অঙ্কুরের বক্রতা বৃদ্ধি পায়, অর্থাৎ কোবের বৃদ্ধি হয়।

উপরের পরীক্ষাগুলি এবং এরূপ আরও বহু পরীক্ষা থেকে এখন নিশ্চিতরূপে প্রমাণিত হয়েছে যে, উদ্ভিদের দেহেও প্রাণিদেহের মত নানারূপ হরমোনের সৃষ্টি হয়। এই হরমোনগুলি নানারূপ জটিল গঠনের জৈব রাসায়নিক পদার্থ। এগুলি উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশে উৎপন্ন হয় এবং এক অংশ থেকে অন্য অংশে প্রবাহিত হয় এবং প্রাপক অংশটির বৃদ্ধি বা বিভিন্ন ধরণের পরিবর্তন সাধন করে। এগুলিই হলো উদ্ভিদের মৌলিক হরমোন। কিন্তু বর্তমানে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষাগারে এই সব হরমোনের অল্পরূপ গুণসম্পন্ন বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সংশ্লেষণ করতে সক্ষম হয়েছেন। এদেরও উদ্ভিদ-হরমোন বলা হয়। বর্তমানে এরূপ প্ৰত্যাহিক হরমোনের আবিষ্কার হয়েছে এবং এদের বিভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে। এরূপ তিনটি প্রধান শ্রেণীর নাম হলো—অক্সিন, জিব্বারেলিন এবং কিনিন। এক এক শ্রেণীর মধ্যে বিভিন্ন রাসায়নিক গঠনের পদার্থ আছে, তবে তাদের সকলেরই কার্যপ্রণালী প্রায় একরূপ। অক্সিন শ্রেণীর হরমোনগুলির মধ্যে বেনজোয়িক, ইনডোলিক, সিনারিক এবং গ্ৰাণটিল্যান্টেটিক অ্যাসিডের নামা ধরণের যৌগ বর্তমান। অক্সিন শ্রেণীর হরমোনকে বৃদ্ধি-উদ্বোধক হরমোন বলা হয়। কারণ এদের প্রধান কাজ হলো, উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিতাজন ও বৃদ্ধিসাধন। সাধারণতঃ কাণ্ডের অগ্রভাগ, মূলের অগ্রভাগ, মুকুল ও পাতার অক্সিনের সৃষ্টি হয়। অক্সিনগুলির আর একটি

কাজ হলো পাতা, ফুল ও ফলের পতন নিবারণ করা।

জিব্বারেলিন শ্রেণীর হরমোনগুলির অবিকাংশই জিব্বারেলো ছত্রাক থেকে পাওয়া গেছে। জিব্বারেলিক অ্যাসিড এদের মধ্যে অল্পতম হরমোন। এদের বিশেষ কাজ হলো বামনাকৃতি বা সাধারণাকৃতির উদ্ভিদকে দীর্ঘতর উদ্ভিদে পরিণত করা। এছাড়া কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদগম, ফলের সৃষ্টি এবং অঙ্কুরোদগমেও এরা সাহায্য করে।

কিনিন শ্রেণীর হরমোনগুলির প্রধান কাজ, উদ্ভিদের মুকুলোদগম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগমে সাহায্য করা। এই তিন শ্রেণীর হরমোন ছাড়া আরও নানা প্রকার হরমোনের সম্ভাবনা পাওয়া গেছে, কিন্তু তাদের রাসায়নিক গঠন জানা এখনও সম্ভব হয় নি।

এপর্যন্ত উদ্ভিদ-হরমোনগুলির যে সব ক্রিয়ার কথা বলা হয়েছে, তা উদ্ভিদের বিভিন্ন অংশের কোষ-বিতাজন বা বৃদ্ধি সংক্রান্ত। কিন্তু হরমোন গুলির এর বিপরীত ধরণের একরূপ ক্রিয়াও আছে, যাকে বলা হয় ইনহিবিশন বা বাধন; অর্থাৎ এরা কোন কোন বৃদ্ধির বিরোধিতা করে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, অক্সিন শ্রেণীর হরমোন যেমন কাণ্ডের বৃদ্ধি করে, তেমনি তা মূলের বৃদ্ধি, মুকুলোদগম, জ্রণের বৃদ্ধি, বীজের অঙ্কুরোদগম এবং কয়েক শ্রেণীর উদ্ভিদের পুষ্পোদগম রোধ করে। প্রশ্ন উঠতে পারে যে, সব ক্ষুদ্রে বাধন-ক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা কি? এই সম্বন্ধে বলা যায় যে, সব ক্ষুদ্রে ও সব রকম আবহাওয়ার সব রকম উদ্ভিদের সকল অংশের বৃদ্ধি বা বীজের অঙ্কুরোদগম হয় না। আবহাওয়া প্রতিকূল হলে উদ্ভিদ তার বৃদ্ধি বা বংশবিস্তার বন্ধ করে দিতে বাধ্য হয়। এটা তার আত্মরক্ষার একটা অঙ্গ। প্রতিকূল অবস্থার বাধক হরমোনগুলি সক্রিয় হয়ে বিভিন্ন অংশের বৃদ্ধি রোধ করে।

বিভিন্ন উদ্ভিদ-হরমোনের আবিষ্কার এবং হরমোন-সমূহের ক্রিয়া সম্বন্ধে জ্ঞান কৃষি-জগতে যুগান্ত

আনয়নে সক্ষম হয়েছে। গবেষণার ফলে এমন হর্যোন সংশ্লেষণ করা সম্ভব হয়েছে, বাতের প্রয়োগে মূল্যবান ও প্রয়োজনীয় শক্তির কোন ক্ষতি না করে আগাহার বৃদ্ধি রোধ করা বা তাদের ধ্বংস করা যেতে পারে। বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ-হর্যোন প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন ধরনের উদ্ভিদ ও ফল ফলি করতে সক্ষম হয়েছেন। এছাড়া অনিবিষ্ট

গর্ভকোষ থেকে ফলের ফলি, টোম্যাটো, শসা, আপেল প্রভৃতি ফলের দ্রুত উৎপাদন, অকালে ধানী ফুল ও ফলের উৎপাদন, বীজহীন ফলের ফলি এবং হিমঘর বা বীজাগারে রক্ষিত আলু ও অন্যান্য বীজের অঙ্কুরোদগম রোধ প্রভৃতিতে হর্যোনের দান কৃষিভিত্তিক অর্থনীতিতে এক বিরাট সাফল্যের সূচনা করেছে।

## আগ্নেয়গিরি

### সৌম্যানন্দ চট্টোপাধ্যায়\*

পৃথিবীতে বজা, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প, ধূম ইত্যাদির মত আগ্নেয়গিরিও প্রকৃতির শক্তি প্রকাশের অন্ততম উৎস। ভূপৃষ্ঠের দুর্বল স্থানগুলির মধ্যে হ্রিৎপথে ভূগর্ভস্থ ধূম, তাম্র, কপাট, গলিত বাতব পদার্থ প্রভৃতি প্রবল বেগে উৎক্ষিপ্ত হয়ে যে কোণাকৃতি পর্বতের উৎপত্তি হয়, তাকেই বলা হয় আগ্নেয়গিরি। যে পর্বত দিয়ে তাম্র, ধূম, গলিত বাতব পদার্থ, লিলা প্রভৃতি বের হয়ে আসে তা Crater বা জালাসুখ নামে পরিচিত। এই জালাসুখের সঙ্গে নীচের Magma chamber-এর সংযোগকারী স্তূভকে Vent বলা হয়। জালাসুখ থেকে নিক্ষিপ্ত গলিত পদার্থকে লাভা এবং লাভার উৎক্ষেপণকে অগ্ন্যুৎপাত বলে। আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে যেখানে লাভা সঞ্চিত থাকে, তাকে Magma chamber বলা হয়।

ম্যাগমা প্রধানত: অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, লোহা, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাশিয়াম, হাইড্রোজেন, অল্প পরিমাণে টিটানিয়াম, কার্বন, কপরাশ এবং ক্লোরিন নিয়ে গঠিত।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে গ্যাস বের হয়, তার মধ্যে Hydrogen sulphide ( $H_2S$ ),  $SO_2$ , কার্বন ডাইক্সাইড ( $CO_2$ ), কার্বন মনো-

ক্সাইড ( $CO$ ),  $HCl$ , অক্সিজেন ( $O$ ), হাইড্রোজেন ( $H$ ), আরগন, ক্লোরিন ( $Cl$ ) এবং ফ্লোরিন ( $F$ ) প্রধান। এই সব গ্যাসের তাপমাত্রা প্রায়  $100^\circ$  সে.। বাষ্প বা বেরোর, তার বেশীর ভাগই গ্যাসীয় পদার্থ।

ভরল পদার্থের মধ্যে লাভাই প্রধান। লাভার গঠন ও ম্যাগমার গঠনে বিশেষ তারতম্য নেই, কেবল লাভার মধ্যে ম্যাগমার চেয়ে বাষ্প ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিমাণ কম। সিলিকার পরিমাণ কম-বেশীর উপর লাভাকে অ্যাসিড ও বেসিক শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়। লাভার রাসায়নিক প্রকৃতিই তার বাহ্যিক গঠন ও অগ্ন্যুৎপাত নির্ধারণ করে। বেসিক লাভা বেশী দূর গড়িয়ে যেতে পারে, কিন্তু অ্যাসিড লাভা আগ্নেয়গিরি থেকে বেশী দূরে যায় না।

অগ্ন্যুৎপাতের সময় গ্যাসের প্রচণ্ড চাপ ও বিস্ফোরণের ফলে জালাসুখ দিয়ে জালাসুখের কিছু অংশ এবং প্রচুর পরিমাণে লাভা বাইরে এসে জমাট বেঁধে যায়। মাকুর মত দেখতে 5-10 সেন্টিমিটার দীর্ঘ আগ্নেয় বোমা উপরের দিকে উঠে



25-30 কিলোমিটার পর্যন্ত হড়িরে পড়ে। এদের মধ্যে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকারগুলিকে (1-3 সে: মি: দীর্ঘ) Lapilli বলে। এগুলি আগ্নেয়গিরির চতুর্দিকে হড়িরে পড়ে। অপেক্ষাকৃত বৃহৎকৃতির পদার্থ, তাম্র, বালি, Feldspar, Leucite, Augite, Magnetite প্রভৃতিও নির্গত হয়ে থাকে।

ম্যাগমা পৃথিবীর ভিতর থেকে খুব কমই বেরিয়ে আসে। অনেক সময়েই ভূত্বকের গভীরে ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বেঁধে বিভিন্ন রকমের আকৃতি ধারণ করে। এদের মধ্যে Batholith সহস্র বর্গ কিলোমিটার আয়তনবিশিষ্ট পাহাড়ের আকারে ভূত্বকের নীচে জমাট বাঁধে। এগুলি প্রধানত: গ্র্যানাইড শিলা Granite ও Granocliorites দিয়ে গঠিত।

Batholith-এর চেয়ে ক্ষুদ্রাকৃতির Lacolith-ই ভূত্বকের নিকটে স্পষ্টাকারে দেখা যায়। এর উপর দিকে উত্তল অংশ এবং ভূমি সমান হয়। এর দৈর্ঘ্য 100-200 কিলোমিটার পর্যন্ত দেখা যায়। ভজিল পর্বতের ভাঁজের উপর ভেদে Lacolith থেকে ছোট Phacolith দেখা যায়, দেখতে Lacolith-এর মত—অনেক সময় ম্যাগমা সঞ্চীর্ণ কাটলের মধ্যে জমাট বাঁধে এবং তার মধ্যে অল্পভূমিকভাবে অবস্থান করে। এগুলি Sil নামে পরিচিত। যখন লব্ধভাবে অবস্থান করে, তখন জমাটবাঁধা কঠিন ম্যাগমাকে ডাইক বলা হয়। এই ধরনের ডাইককে পার্শ্ববর্তী কোমল শিলা ভেদ করে উঠতে দেখা যায়। ছোটনাগপুরের বিভিন্ন অঞ্চলে করলা খনির বাদে ডাইক অনেক সময় হুই করলা ত্বরের মধ্যে দৃষ্ট বাধা সৃষ্টি করে করলা উত্তোলনে অসুবিধা ঘটায়। অনেক সময় বিভিন্ন শিলাস্তরের মধ্যে অল্পভূমিকভাবে ম্যাগমা ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধলে তাকে Interbedded intrusion বলে।

এখন এর ঠাণ্ডা বাতাবিক যে, আগ্নেয়-

গিরিগুলির অগ্ন্যুৎপাতের সঠিক কারণ কি? কারণ হিসাবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি প্রাধান্য-বোধ্য।

আগ্নেয়গিরিগুলি ভূত্বকের অস্থিতিস্থাপক অংশে অবস্থিত ও মালার আকারে সজ্জিত। অগ্ন্যুৎপাতের সময় যে সব বিভিন্ন রকমের শিলা বাইরে বেরোয়, তার শতকরা 90 ভাগই ব্যাসাল্ট শিলা। ভূত্বকের প্রায় 36 মাইল গভীরে মহাদেশগুলির নীচে গভীর ও মহাসাগর-গুলির নীচে অগভীর একটি ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পৃথিবীর অভ্যন্তরে অবস্থিত। ভূত্বকের অভ্যন্তরে তাপমাত্রা বৃদ্ধি হয় প্রতি কিলোমিটারে 10° সেন্টিগ্রেড। অতএব 100 কি: মি: অভ্যন্তরে তাপমাত্রা 1,000° সেন্টিগ্রেড, কিন্তু অভ্যন্তর তাপের 20 বা 30 কিলোমিটার নীচে উপরের শিলাস্তরের চাপ খুব বেশী না হওয়ার শিলাস্তর কঠিন অবস্থায় আছে। পৃথিবীর ভিতরের stress-এর জন্তে পৃথিবীর স্বকে কাটলের সৃষ্টি হয়ে অভ্যন্তরের ব্যাসাল্ট শিলাস্তর পর্যন্ত নেমে যায় এবং শিলাস্তরের চাপ কোনও অজ্ঞাত কারণে কমে গেলে কিছু শিলা তরল অবস্থায় পৌঁছায় ও গ্যাস জমে ওঠে এবং উপরের আগ্নেয়গিরির মুখ দিয়ে বাইরে বেরিয়ে আসে। এই একটি মাত্র কাটল ও আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাতকে কেন্দ্রীয় অগ্ন্যুৎপাত বলা হয়। অনেক সময় একটি মাত্র কাটলের পরিবর্তে অসংখ্য কাটলের মধ্য দিয়েও লাভা বেরিয়ে আসে, তখন তাকে Fissure eruption বলে। কেউ কেউ মনে করেন যে, স্থানীয়ভাবে সৃষ্ট ভূত্বকের নিকটের ম্যাগমা চেঁচারে সঞ্চিত লাভাই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি করে। ব্যাথোলিথ-গুলিকে পৃথিবীর ভজিল পর্বতশ্রেণীর কাছেই দেখা যায়। ব্যাথোলিথের উত্তম তরল ম্যাগমা উপরে উঠলেই পার্শ্ববর্তী শিলার সংস্পর্শে এসে তাদের তরল অবস্থায় পরিণত করে রাসায়নিক পরিবর্তন সাধন করে। ব্যাথোলিথের উপরের

বহুর অংশকে cupolas বলে। তরল পদার্থ ও গ্যাসীয় পদার্থের পরিবাহী ধর্মের জন্তে অনেক সময় অত্যন্ত উত্তপ্ত লাভা cupolas-এর উপরে যেখানে তুষক পাতলা, সেখানে জমা হয়। কলে সেখানে কাটল দেখা দিলে আগ্নেয়গিরির স্টি হয়ে থাকে। ব্যাথোলিথগুলি সম্পূর্ণ কঠিন ও ঠাণ্ডা হয়ে গেলে আগ্নেয়গিরিও নিক্রিয় হয়ে পড়ে।

সূর্য থেকে পৃথিবীর স্টি হয়েছে বলে পৃথিবীর অভ্যন্তরভাগ এখনও উত্তপ্ত অবস্থায় আছে। অভ্যন্তরে রাসায়নিক পরিবর্তন ও পৃথিবীর আবর্তনের জন্তে বর্ষণের কলে উত্তাপের স্টি হয়। এছাড়া নবীন তজিল পর্বতশ্রেণীর ভূতাত্ত্বিক গঠন সমুদ্রের গঠন অপেক্ষা ভিন্ন। তজিল পর্বতশ্রেণীর নিয়ে হুগডীর sial স্তর যেখানে রয়েছে, সেখানে granite শিলাস্তরের গভীরতা ৫০ কি: মি:-এরও বেশী। অ্যাসিড শিলার মধ্যে তেজস্ক্রিয় ধনিজের পরিমাণ অল্প আগ্নেয়শিলার চেয়ে বেশী বলে অ্যাসিড শিলা প্রায়  $50 \times 10^{-13}$  ক্যালরী / সেন্টিমিটার পরিমাণ তাপ উৎপন্ন করে। বেসিক শিলা এর চেয়ে কিছু কম তাপ স্টি করে। এই তাপ বিকিরণের কলে সিয়াল স্তর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে এবং গলিত অবস্থায় পৌঁছায়। এই তাপই ম্যাগমা চেম্বারের পদার্থগুলিকে অনেক সময় গলিত অবস্থায় পরিণত করে। গ্যাসই অগ্ন্যুৎপাতের অন্ততম প্রধান সহায়ক শক্তি। বাষ্পের মধ্যে ৮০-৮৫% তাপ থাকে এই গ্যাস। এই গ্যাসের অধিকাংশই ম্যাগমার মধ্যে জমা থাকলেও অনেকাংশ ভূগর্ভস্থ জলরাশি বা তুষকের করেক সহস্র মাইল নীচে আগ্নেয়গিরির নীচেকার তরল শিলাস্তরে পৌঁছায় এবং তা অগ্ন্যুৎপাতের সহায়তা করে। যে সব আগ্নেয়গিরি সমুদ্রের নীচে বা পূব ধারে অবস্থিত, সেখানে অবশ্য সমুদ্রের জলই নীচে প্রবেশ করে।

অগ্ন্যুৎপাতের কলে নানা আকৃতিবিশিষ্ট

আগ্নেয়গিরির স্টি হয়। যে সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢালই সমান, তাদের আকৃতিকে Composite cone বলে। এই সব আগ্নেয়গিরির দুই দিকের ঢাল ভূমির সঙ্গে  $35^\circ$  কোণ করে অবস্থিত। জাপানের ফুজিয়ারা আগ্নেয়গিরির ঢাল আরও কম, তাদের আকৃতিকে cinder cone বলে। ক্ষত্রাকৃতির আগ্নেয়গিরিকে spatter cone বলা হয়। অনেক সময় লাভা অত্যন্ত ঝাড়াভাবে ভূপাকারে থাকে। তাকে গম্বুজাকৃতির আগ্নেয়গিরি বলে; যেমন—মাইউকি পিপি।

অনেক সময় আগ্নেয়গিরি থেকে লাভা, ঝাঝা ও ছাই বায়ুবাহিত হয়ে অবক্ষেপিত হয়ে যে সমভূমির স্টি করে, সেগুলি হলো লাভা সমভূমি। অগ্ন্যুৎপাতের গোড়ার দিকে ধূলা, বালি, ঘনীভূত বাষ্প ও বৃষ্টির সঙ্গে মিশে কাদার মত বেরিয়ে আসে এবং আগ্নেয়গিরির ঢালের নীচের দিকে সমভূমির স্টি করে। এমনও দেখা গেছে যে, লাভাশ্রোত অসংখ্য কাটল থেকে বেরিয়ে বহুদূর পর্বত বিস্তৃত হয়ে বিরাট লাভা-মালভূমির স্টি করেছে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির স্টি এভাবেই হয়েছে। এখানে প্রায় ১০০,০০০ কিউবিক মিটার লাভা উৎক্ষেপ হয়েছিল।

পৃথিবীর আগ্নেয়গিরিগুলিকে তাদের অগ্ন্যুৎপাতের ধরণ অনুযায়ী শ্রেণীবদ্ধ করা হয়। উনবিংশ শতকে আগ্নেয়গিরিগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা হতো, যেমন—যে সব আগ্নেয়গিরি থেকে প্রায়ই অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে জীবন্ত, যেগুলি থেকে মাঝে মাঝে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে, সেগুলিকে স্তপ্ত এবং যেসব আগ্নেয়গিরি থেকে অগ্ন্যুৎপাত ঘটে না, সেগুলিকে মৃত বলা হতো। বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে (১৯০৮) Lacroix আগ্নেয়গিরিগুলিকে চারটি শ্রেণীতে ভাগ করেন। এগুলি হলো

(1) Hawaiian (2) Stromblian, (3) Vulcanian এবং (4) Pelean। হাওয়াইয়ান শ্রেণী হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এই শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে গ্যাস বীরে বীরে নির্গত হয় এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত কম হয়। ষ্ট্রমব্লীর শ্রেণী সিসিলির কাছে ভূমধ্যসাগরে অবস্থিত এবং বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাত এক্ষেত্রে বেশী বলে একে ভূমধ্যসাগরের বাতিঘর বলা হয়ে থাকে। তালকানীর শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি সিসিলির উত্তরে তালকানো দ্বীপে দেখা যায়। বিস্ফোরক ধরণের অগ্ন্যুৎপাতের জোর এসব আগ্নেয়গিরিতে বেশী। এর লাভাও ষ্ট্রমব্লীর শ্রেণীর লাভার চেয়ে বেশী ঘন ও আঠালো। পিলীর শ্রেণী পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে দেখা যায়। এখানে অতি উত্তপ্ত গ্যাস, প্রদীপ্ত তাম্র বহু উচুতে উঠে উজ্জ্বল মেঘের সৃষ্টি করে। এছাড়া Solfatric শ্রেণীর আগ্নেয়গিরি থেকে শুষ্কমাত্র গ্যাস নির্গত হয়। এই ধরণের আগ্নেয়গিরি ইটালীর নোপল্লে দেখা যায়। অনেক সময় স্থপ্ত আগ্নেয়গিরির আলাবুথের মধ্যে দ্বিতীয় জ্বালাবুথের সৃষ্টি হয়, সেগুলি Somma নামে পরিচিত। তিসুজিয়াস আগ্নেয়গিরির আলাবুথে এই রকম দ্বিতীয় জ্বালাবুথ দেখা যায়। এই শ্রেণীগুলি ছাড়া আইসল্যান্ড দ্বীপে বিরাট অকল জুড়ে অসংখ্য কটিল থেকে লাভা নির্গত হয়ে করেক হাজার বর্গকিলোমিটার লাভার আচ্ছাদন গড়ে ওঠে। দাক্ষিণাত্যের মালভূমির কথা আগেই বলা হয়েছে।

সমস্ত পৃথিবীতে প্রায় 500 আগ্নেয়গিরি আছে। অধিকাংশ আগ্নেয়গিরি প্রশান্ত মহাসাগরের দুই ধারে অবস্থিত। এই আগ্নেয়গিরিগুলি প্রশান্ত মহাসাগরীয় আগ্নেয় মেঘলা (Pacific ring of fire) নামে পরিচিত। প্রশান্ত মহাসাগরের পশ্চিম তীরে কাম্চাট্কা উপদ্বীপে, কিউরাইল দ্বীপপুঞ্জে, জাপান দ্বীপপুঞ্জে,

কিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে, নিউগিনি, সলোমন, নিউহিব্রাইডিস ও নিউজিল্যান্ড দ্বীপপুঞ্জে এই বলয়ের একটি অংশ দেখা যায়। প্রশান্ত মহাসাগরের অপর তীরে দক্ষিণ আমেরিকার টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগো দ্বীপ থেকে উত্তরে অ্যান্ডিস পর্বতের মধ্য দিয়ে সিরেরা নেভেডা ও রকি পর্বতের মালভূমির মধ্য দিয়ে অ্যান্টিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জ ও আলাস্কার মধ্যে বিস্তৃত আছে। এর পাখাটি আন্টিউসিয়ান দ্বীপপুঞ্জের মধ্য দিয়ে অল্প পাখার সঙ্গে যুক্ত। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জের মোনা লোয়া ও কীলাউয়া আগ্নেয়গিরি, গ্যালাপেগোস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ইটাল ও জুরন কার্ণেভিস দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি ও টেকা, সামোয়া, কারমাদেক ও অন্তান্ত দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি আছে। এছাড়া আর একটি আগ্নেয়গিরি-মণ্ডল আফ্রিকা পর্বতমালা থেকেই ইটালীর অ্যাপোনি-ইন পর্বতের মধ্য দিয়ে ভূমধ্যসাগরে চলে গেছে। এখানে আছে তিসুজিয়াস, এটনা, লিপারি দ্বীপপুঞ্জের আগ্নেয়গিরি, ইজিরান সাগরের আগ্নেয়গিরি, ককেশাস অঞ্চলের এলবাস, কাজবেক ও ছুরতের আরারাট ইত্যাদি। মালয় উপদ্বীপ ও সুমাত্রার 19টি, জাভার 15টি, সুমাত্রা দ্বীপে 3টি এবং মালাকাস দ্বীপেও আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। এই মণ্ডলটি প্রশান্ত মহাসাগরীয় মণ্ডলের সঙ্গে যুক্ত। আটলান্টিক মহাসাগরে আইসল্যান্ড দ্বীপে 25টি আগ্নেয়গিরির মধ্যে হেক্কা বিখ্যাত। জন সাইমেন দ্বীপের আগ্নেয়গিরি ও গ্রোটোর এন্টিলিসের বাউন্ট পিদি বিখ্যাত। তাছাড়া ক্যানারী দ্বীপ, অজোর দ্বীপ, কেপ ভার্ড দ্বীপ, গিনি উপসাগর, সেন্ট হেলেনা দ্বীপ ও ব্রিস্টল ডা কুনহা ও আফ্রিকার প্রান্তর উপত্যকার আগ্নেয়গিরি দেখা যায়। আফ্রিকার বাউন্ট কিলিবাঙ্গারো একটি বৃহৎ আগ্নেয়গিরি, ভারত মহাসাগরে কমোরো, মরিশাস, রিইউনিয়ান দ্বীপ ও ব্যারন দ্বীপে আগ্নেয়

গিরি আছে। ব্যারন বীপের আগেরগিরি বৃত্ত এবং এটাই ভারতের একমাত্র আগেরগিরি।

আগেরগিরিগুলির ভৌগোলিক অবস্থান লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে, এদের অধিকাংশই নবীন পর্বতশ্রেণীর কাছে বা এমন সব দ্বীপপুঞ্জের কাছে, যেগুলি আধুনিক ভঙ্গিম পর্বতের সন্নিবিষ্ট। কিন্তু পৃথিবীর প্রাচীন শিলায় গঠিত মাগত্বির উপরে আগেরগিরি দেখা যায় না বললেই হয়।

পৃথিবীর বিখ্যাত অগ্ন্যুৎপাতের মধ্যে তিস্ত-তিয়াসের অগ্ন্যুৎপাতে (৭৯ খৃ:) হারকিউলিয়াস ও পম্পিরাই শহর ধ্বংস হয়। পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জের জাকাতোরা আগেরগিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে (১৮৮৩ খৃ:) জাকাতোরা দ্বীপের ছুই-তৃতীয়াংশ সমুদ্রে বিলীন হয়ে যায়। অনেক সময় পৃথিবীর বড় বড় ভূমিকম্পের ফলেই অগ্ন্যুৎপাতের সৃষ্টি হয়েছে।

আগেরগিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে চিরকালই মাহুকের কতি সাধিত হয়েছে। বর্তমানে বিজ্ঞান এর মধ্য থেকেই সৃষ্টির উপাদান খুঁজে বের করে তাকে মাহুকের সেবার নিয়োজিত করেছে।

ইটালীর টাস্কানীতে এই আত্যাঙ্করীণ উত্তপ্ত বাষ্প থেকেই ইটালীর মোট উৎপাদিত বিদ্যুৎশক্তির শতকরা ৬ ভাগ উৎপন্ন হচ্ছে। বোরিক অ্যাসিড, অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, অ্যামোনিয়াম ক্রোমাইড, বোরাক্স, কার্বন ডায়োক্সাইড, অ্যামোনিয়াম কার্বোনেট, হিলিয়াম ইত্যাদি পদার্থও তৈরি হচ্ছে। এছাড়া ইটালীর বহু জায়গায় উষ্ণ প্রস্রবণ আগেরগিরির নিকটে থাকায় সেখান থেকে রোগাক্রান্ত লোকেরা উপযুক্ত আশ্রয়ের সুযোগ পেয়ে থাকে।

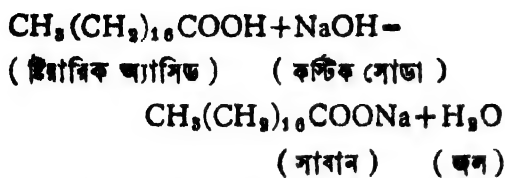
## ডিটারজেন্ট ও তার আধুনিক প্রয়োগ

সমীরকুমার রায়

মাহুকের সত্য হবার সঙ্গে সঙ্গেই পরিষ্কার এবং অপরিষ্কার সম্বন্ধে একটি স্পষ্ট ধারণা করতে পেরে। অপরিষ্কার বলতে বোঝানো হয়—কোন বস্তুর আবাহিত স্থানে অবস্থান। টোম্যাটো-সস খাবার প্লেটেই মানান, কিন্তু পোবাক-পরিচ্ছদে লেগে থাকাকে নিচ্ছাই পরিচ্ছন্নতার পর্যায়ে ফেলা যায় না। অতএব টোম্যাটো-সসকে আবাহিত স্থান থেকে মুক্ত করা প্রয়োজন। এই শিক্ষা থেকেই মলিনতা দূরীকরণের প্রেরণা আমরা পেরেছি এবং তার পার্থক্য প্রয়োগের মধ্যেই পরিষ্কার-ব্যবহার উৎপত্তি। মলিনতার প্রকারভেদে চার প্রকারের পরিষ্কার-প্রকরণ উদ্ভাবন করা হয়েছে; যেমন—(১) হাত দিয়ে ঝেড়ে ফেলা,

(২) জলের সাহায্যে ধুয়ে ফেলা, (৩) বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের সাহায্যে স্থানচ্যুত করা এবং (৪) বিশেষ দ্রাবকের সাহায্যে দ্রবীভূত করা। আলোচ্য প্রবন্ধে এই তৃতীয় পর্যায়ের বিশেষ ক্ষমতাসম্পন্ন পদার্থের বিষয়েই আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখা হবে। তৃতীয় পর্যায়ের মলিনতা হলো, যা শুধুমাত্র হাত দিয়ে ঝেড়ে বা জল দিয়ে ধুয়ে ফেললে অপসারিত হয় না। এর জন্মে প্রয়োজন—বিশেষ ধরনের পরিষ্কার করবার ক্ষমতাসম্পন্ন বস্তু। এই বিশেষ বস্তুটির আবিষ্কার হয়েছিল বহু প্রাচীন কালে এবং সেই সময় থেকেই এর ব্যাপক ব্যবহার প্রচলিত। সেই বস্তুটি হলো সাবান—প্রাকৃতিক ক্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম

যুক্ত একটি লবণ। সাবান প্রস্তুত-প্রণালীও সাধারণ। ক্যাটি অ্যাসিডকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের দ্বারা saponify করলেই সাবান প্রস্তুত হয়; যেমন—



পরিষ্কার করবার এই বিশেষ ক্ষমতার অধিকারী সাবান কি কারণে হলো, সে সম্বন্ধে তলিয়ে দেখলে দেখা যাবে, Electrolytic dissociation-এর কালে সাবান জলে দ্রবীভূত হয়; অর্থাৎ নেগেটিভ চার্জযুক্ত ক্যাটি অ্যাসিড এবং পজিটিভ চার্জযুক্ত সোডিয়াম বন্ধনযুক্ত হয়। এই যুক্তির সঙ্গে সঙ্গে জলের OH আয়ন সোডিয়ামের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড উৎপন্ন করে এবং জলের H আয়নটি কার্বোজিল গ্রুপের সঙ্গে মিলে আবার ক্যাটি অ্যাসিড  $\text{CH}_3(\text{CH}_2)_{10}\text{COOH}$  উৎপন্ন করে। কলম্বরণ দেখা যাচ্ছে, জলের প্রতি সোডিয়ামের স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকার সহজেই জলে দ্রবীভূত হয়; কিন্তু হাইড্রো-কার্বন অংশটি ঠিক সোডিয়ামের বিপরীত। জলের প্রতি এর কোন আকর্ষণ নেই—তাই জল থেকে বেরিয়ে আসতে চায়। বিজ্ঞানীরা এইরূপ আচরণকে hydrophilic বা water loving এবং hydrophobic বা water hating আখ্যা দিয়েছেন। এটাও ঠিক সত্য যে, এই বিপরীত-ধর্মী আচরণের মধ্যেই পরিষ্কার-ক্ষমতা সীমাবদ্ধ। কারণ hydrophilic অংশটি জলের মধ্যে hydrophobic অংশকে টানতে থাকে এবং hydrophobic অংশটি সর্বদাই এই টান থেকে মুক্ত হতে চেষ্টা করে। কালে hydrophobic অংশ জলের উপরিভাগে জমা হয় এবং জলের উপরি-ভাগের স্বাভাবিক অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়;

অর্থাৎ জলের তলটান (Surface tension) কমিয়ে দেয়। তলটান কমে যায় বলেই ওয়েটিং, ফোমিং এবং পরিষ্কার সম্ভব হয়। এই প্রকার পদার্থকে Surface active agent বলা হয়। এই সম্বন্ধে আরও একটু বিশদভাবে দেখলে দেখা যায়, জলের মধ্যে water repellent নেগেটিভ আয়নগুলি নিজেরা দলবদ্ধ হয়ে একটা গোষ্ঠী গঠন করে Spherical colloid রূপে হিসাবে জটলা পাকায়। এদের বলে Micelles। এতে 50 থেকে 100টা আয়ন থাকে। Micelles এমন ভাবে তৈরি হয় যে, hydrophobic অংশগুলি গোলকের কেন্দ্রে থাকে এবং hydrophilic অংশের সাহায্যে সমস্ত গোলকটি আবৃত থাকে। ময়লা সাধারণতঃ hydrophobic এবং সেই কারণে ডিটারজেন্টের লবণ শৃঙ্খলের নেগেটিভ আয়নগুলি ময়লার সঙ্গে জোট বাঁধে। এইভাবে water hating parts অর্থাৎ ময়লাকে water loving আন্তরণের মাধ্যমে জলে দ্রবণীয় করে তোলে। সাবানের এই ধর্মই হলো Surface active agent-এর স্বাভাবিক ধর্ম।

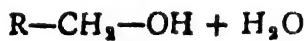
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার দ্বারা Surface active agent উদ্ভাবনের চেষ্টা শুরু হয়। 1913 সালের প্রথম দিকে একজন বেলজিয়ান রসায়নবিদ Reychler গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে ডিটারজেন্ট আবিষ্কার করেন। তাঁর আবিষ্কারের বিষয় তিনি একটি বৈজ্ঞানিক পত্রিকায় প্রকাশ করেন। এই আবিষ্কারের অঙ্গপ্রেরণা থেকে 1917 সালে Dr. Fritz Gunthar কোলটারের (Coal tar) উপজাত পদার্থ হিসাবে ডিটারজেন্ট সংশ্লেষণে সক্ষম হন। 1925 সালে 'Nekal' নামে এই ডিটারজেন্ট বাজারে প্রথম বের হয় এবং এর ব্যবহার প্রচলিত হয়। সংশ্লেষিত ডিটার-জেন্টের সঙ্গে সাবানের মূলগত পার্থক্য আছে। এই নতুন দ্রব্যটি খর জলের ক্যালসিয়াম এবং

ম্যানসেনিয়াদের সঙ্গে সাবানের যত কোন আ-  
ত্মিক লবণ প্রস্তুত করে না। কলে ধর কলে এর  
পরিষ্কার করার ক্ষমতার কোন তারতম্য হয় না  
এবং অল্প মাত্রায় ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলেই  
বাহিত কল পাওয়া যায়। T. E. Larsen.  
(Journal of the American Water Works  
Association, April, 1949) ভাল ডিটারজেন্টের  
কি কি বিশেষ গুণ থাকা প্রয়োজন, তা  
নির্ণয় করেছেন—(১) জলে সহজে দ্রবণীয়,  
(২) ডিটারজেন্টে মিশ্রিত জলের দ্রবণটি কৈশিক  
(capillary) তত্ত্বের মধ্যে সহজে প্রবেশ করতে  
সক্ষম এবং (৩) Emulsion প্রস্তুতের ক্ষমতা।

সংশ্লিষ্ট ডিটারজেন্টের প্রস্তুত-প্রণালী  
সম্বন্ধে বিস্তৃত বিবরণ না দিয়ে অল্প কথায় বলতে  
পাওয়া যায়—ক্যাটি অ্যাসিড একটি অম্লঘটকের  
সাহায্যে উচ্চ তাপ এবং উচ্চ তাপমাত্রায় হাই-  
ড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যাটি অ্যাল-  
কোহল উৎপন্ন করে।



( ক্যাটি অ্যাসিড ) ( হাইড্রোজেন )



( ক্যাটি অ্যালকোহল ) ( জল )

এবারে এই ক্যাটি অ্যালকোহলের সঙ্গে সাল-  
ফিউরিক অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়া ঘটানো  
হয়। কলে ক্যাটি অ্যালকোহল সালফেট উৎপন্ন  
করে।



( ক্যাটি অ্যালকোহল ) ( সালফিউরিক অ্যাসিড )



( ক্যাটি অ্যালকোহল সালফেট ) ( জল )

পরিশেষে ক্যাটি অ্যালকোহল সালফেট  
কঠিন সোডার সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যাটি অ্যাল-  
কোহল সালফেটের একটি সোডিয়ামযুক্ত লবণ  
প্রস্তুত করে। এই লবণটিই হলো সংশ্লিষ্ট  
ডিটারজেন্ট।

Dr. Fritz Gunthar-এর পর থেকে আধু-  
নিক কাল পর্যন্ত বহু প্রকারের ডিটারজেন্ট আবি-  
ষ্কৃত হয়েছে। Ionisation-এর প্রতি লক্ষ্য রেখে  
ডিটারজেন্টগুলিকে তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা  
হয়েছে। প্রথম ভাগ—Anionic, যেমন— $CH_3$ ,  
 $(CH_2)_{11}OSO_3Na$ ; দ্বিতীয় ভাগ—Cationic,  
যেমন— $CH_3$ ,  $(CH_2)_{11}N(CH_3)_3Cl$  এবং  
তৃতীয় ভাগ—Nonionic, যেমন— $CH_3$ ,  
 $(CH_2)_{11}-O-CH_2-CH_2-O-CH_2-CH_2-OH$ .

E. E. Dreger, G. I. Kein, G. D. Miles, L. Shedlovsky এবং J. Ross (Ind. Eng. Chem. 36, 610-617, 1944) কার্বনমালায়  
দৈর্ঘ্যের সর্বোচ্চ সীমা এবং হাইড্রোকিলিক গোষ্ঠীর  
অবস্থান সম্পর্কে একটি তথ্য প্রকাশ করেন, যার  
কলে কার্বনমালায় দৈর্ঘ্য এবং হাইড্রোকিলিক  
গোষ্ঠীর অবস্থান দেখেই তার Wetting pro-  
perty এবং Foam stability নির্ণয় করা সহজ  
হবে। দেখা গেছে, হাইড্রোকিলিক গোষ্ঠী কার্বন-  
মালায় যত শেষের দিকে থাকবে, ততই তার  
পরিষ্কারের ক্ষমতা বাড়বে এবং যত দূরে অবস্থিতি  
হবে, ততই Wetting property বাড়বে।

পরিষ্কার করার ক্ষমতা অর্থাৎ detergency  
আরও দুটি বিশেষ অবস্থার উপর নির্ভরশীল—  
তাপমাত্রা এবং pH (Hydrogen ion concen-  
tration)। আমরা অবগত আছি যে, উচ্চ  
তাপমাত্রায় সাবানের পরিষ্কার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।  
সংশ্লিষ্ট ডিটারজেন্টের বেলায়ও তাপের প্রভাব  
লক্ষ্য করা যায়। যে ডিটারজেন্ট 12টি কার্বনের  
দ্বারা গঠিত, তারা অল্প তাপমাত্রায় ভাল কাজ  
করে; কিন্তু 18টি কার্বনের দ্বারা গঠিত ডিটারজেন্ট  
উচ্চ তাপমাত্রায় সক্রিয় হয়। তবে বেশীর ভাগ  
ডিটারজেন্টকেই দেখা যায় 100° থেকে 140° কা:-  
এর মধ্যে সক্রিয় থাকে। সাবানের উপর pH-  
এর প্রভাব আমরা জানি। pH কমতে থাকলে

অর্থাৎ অ্যানিভের মাধ্যমে সাবান ঘোটেই সক্রিয় থাকে না, কারণ সাবানের desaponification ঘটে। কিন্তু pH বাড়তে থাকলে কার্যের মাধ্যমে সাবানের পরিষ্কার-ক্ষমতা বজায় থাকে। দেখা গেছে সাবান pH 10.50 থেকে pH 11.0-এর মধ্যে সবচেয়ে কার্যকর হয়। সংশ্লিষ্ট ডিটারজেন্টের ক্ষেত্রে কিন্তু এত কড়াকড়ি নিয়ম নেই। pH 7.0-এর নীচেও এরা কার্যকর থাকে এবং তরপুর ফেনা হতেও কোন অসুবিধা হয় না। তবে সাধারণতঃ 10.5 pH-এ ডিটারজেন্ট ব্যবহার করলে যে সবচেয়ে বেশী কার্যকর হয়, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

আধুনিক কালে Surface active agent-সমূহ যে শুধু মাত্র পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতার কাজে ব্যবহৃত হচ্ছে, সে কথা মনে করলে ভুল হবে। এর প্রয়োগের দিক থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে ব্যাপক গবেষণা হয়েছে, তা আলোচ্য বিষয়গুলি অজ্ঞান করলেই উপলব্ধি করা যাবে। 1935 সালে Domagk প্রকাশ করেন যে, Alkyl benzyl dimethyl ammonium chloride-এর জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতা আছে। তারপর থেকেই এই বিষয় নিয়ে নতুনভাবে গবেষণা শুরু হবার কালে জীবাণু প্রতিরোধের ব্যাপারে একটি নতুন দিগন্তের আবরণ উন্মোচিত হয়। বিশদ পরীক্ষার কালে আমরা জানতে পারি যে, ক্যাটারনিক এবং অ্যানায়নিক—এই উভয় প্রকার যৌগই জীবাণু প্রতিরোধের ক্ষমতাসম্পন্ন, কিন্তু দান-আয়নিক যৌগসমূহের অধিকাংশ জীবাণুর উপর প্রতিরোধ-ক্ষমতা নেই। ক্যাটারনিক যৌগ গ্র্যাম-পজিটিভ ও গ্র্যাম-নেগেটিভ উভয় প্রকার জীবাণুকেই প্রতিরোধ করতে সক্ষম। জীবাণু প্রতিরোধক ক্ষমতার উপরও pH-এর প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। ক্যাটারনিক যৌগগুলির জীবাণু প্রতিরোধ-ক্ষমতা pH বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। আবার অ্যানায়নিক যৌগের

ক্ষেত্রে pH কমবার সঙ্গে সঙ্গে জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। Quisno এবং Foter (J. Bact. 1946, 52, 111) পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, Cetyl pyridinium chloride-এর জীবাণু-প্রতিরোধক ক্ষমতা pH 2.0 থেকে 10.0 পর্যন্ত অপরিবর্তনীয় থাকে। বাছোক, সংশ্লিষ্ট Surface active agent-সমূহ যে জীবাণুনাশক, সে বিষয়ে দ্বিমত নেই।

Fogelson এবং Shoch প্রমাণ করেন যে, gastric ও duodenal ক্ষতে Sodium alkyl sulphate ব্যবহার করলে সুফল পাওয়া যায়। মলমের মধ্যে 2% Sodium lauryl sulphate ব্যবহার করে পাকস্থলী এবং অন্ত্রের তগন্ধর এবং ক্ষতের উপশমে বিশেষ সুফল পাওয়া গেছে। কৃষিকার্যে Alhyl benzene sulphate (ABS) ব্যবহার করে যে সুফল পাওয়া গেছে, সে ধরনের আমরা 1954 সালে E. A. Clark-এর গবেষণা থেকে জানতে পারি। তিনি দাবী করেন যে, ABS ব্যবহার করলে মাটিতে জল প্রবেশের এবং মাটির জলধারণ ক্ষমতা বাড়ে। এর কালে মাটির উন্নতি ঘটে এবং গাছের বৃদ্ধিকে ত্বরান্বিত করে। যে সব মাটিতে হিউমাস কম থাকে, সেই সব মাটির হিউমাসের অভাব পূরণ করে। কালে উদ্ভিদ তার পুষ্টিকর খাদ্যসমূহ শিকড়ের সাহায্যে গ্রহণ করতে সক্ষম হয়। আরও সম্ভবনাপূর্ণ সংবাদ হলো, অজুর্ষর এবং কারখানা মাটি, যেখানে চাষ-আবাদ হয় না, সেই সব জমিতে ABS প্রয়োগ করলে জমি উর্বর হয় এবং সেখানে কসল কলানো সম্ভব হয়।

আমরা জানি, Froth flotation পদ্ধতির দ্বারা বনিক পদার্থকে অপ্রয়োজনীয় পদার্থ থেকে পৃথক করা হয়। এই পদ্ধতিতে বনিক মিশ্রিত পদার্থকে ভেঙ্গে ভেঁড়া করা হয়। তারপর এই ভেঁড়া Flotation cell-এর মধ্যে নিয়ে জল ও Flotation reagent বেশানো হয়।



এবারে একটি Agitator দিয়ে খুব বেশী আলোড়নের সৃষ্টি করে বায়ু প্রবাহিত করা হয়। ফলে প্রচুর ফেনার তরে বায়ু এবং সেই ফেনার সঙ্গে প্রয়োজনীয় বনিজ পদার্থ উপরে ভেসে ওঠে আর অবাহিত পদার্থসমূহ নীচে পড়ে থাকে অথবা এর ঠিক উল্টো ব্যাপারও ঘটতে পারে। তির তির বনিজ পদার্থের পৃথকীকরণের ক্ষেত্রে তির তির Surface active agent ব্যবহৃত হয়ে থাকে। Galena-কে পৃথক করতে হলে Alkyl xanthates ব্যবহার করা হয়, আবার Cassiterite সংগ্রহ করতে Sodium cetyl sulphate ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

Surface active agent-এর রাসায়নিক ক্রিয়ার কলাকল যদি অল্পধাবন করা যায়, তাহলে তার সার্থক প্রয়োগ দেখা যাবে Twitchell প্রক্রিয়ার মধ্যে—যেখানে চব্বির অণুকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ার ভেত্রে ফেলা হয়। এই পদ্ধতিতে চব্বিকে জল ও Anionic surface active agent-এর মাধ্যমে উচ্চ তাপমাত্রায় গরম করা হলে চব্বির hydrolysis ঘটে এবং Glycerol আর Free fatty acid উৎপন্ন করে। এখানে Surface active agent অল্পঘটকের কাজ করে এই রাসায়নিক বিক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করে।

সীসা, ক্যাডমিয়াম এবং পারদ ক্যাথোড যেখানে জৈব পদার্থের বিশেষ Electro-chemical reduction সংঘটিত করে, সেখানে Surface active agent বর্ডমান থাকতে তড়িৎ-প্রবাহের কার্যকর ক্ষমতার হ্রাসপ্রাপ্তি ঘটে। ক্যাটায়নিক

যৌগগুলি ক্যাথোডের উপরিভাগে লেগে থাকার ফলে জৈব পদার্থসমূহের reduction-এ বাধা ঘের অর্থাৎ সেগুলি ঐ Surface active পদার্থের আশ্রয়' ভেদ করে ক্যাথোডে পৌঁছতে পারে না।

সংশ্লিষিত ডিটারজেন্ট বা Synthetic surface active agent আবিষ্কৃত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত এর ব্যবহার বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। খাত্তুবিজ্ঞা, ইলেক্ট্রোপ্লেটিং, খাত্তুজ্বা, প্রসাধন সামগ্রী এবং আরো অনেক শিল্পে Surface active পদার্থের ব্যবহার হচ্ছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আমাদের দেশে এর উৎপাদনের পরিমাণ তেমন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায় নি এবং প্রয়োগবিজ্ঞার দিক থেকেও তেমন প্রসার লাভ করে নি। যেহেতু এই পদার্থগুলি কৃষিকার্ষে বিশেষ উপযোগী, সেহেতু আমাদের দেশে, যেখানে খাত্তুসমস্তা একটি অত্যন্তম প্রধান সমস্তা—জমির উর্বরতা ফিরিয়ে আনতে এবং প্রচুর শস্ত ফলনের ক্ষেত্রে একান্ত আবশ্যক। খাটির ক্ষয়প্রাপ্তি যেখানে ঘটেছে, সেখানে এই পদার্থগুলির কার্য-কারিতা পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। সর্বশেষে মাহুবেদ শরীফে Surface active agent-এর প্রভাব বিবরণ, সে সত্যকে সত্যক গবেষণা করলে আরও হয়তো বিচিত্র রহস্যের সম্ভাব পাওয়া যাবে। কারণ Surface active agent এখনও অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষার অপেক্ষা রাখে এবং তথ্যভূতে আরো অনেক চমকপ্রদ কলাকল হয়তো অপেক্ষা করে আছে।



# প্রজাতির উদ্ভব

মুহুরা নৌলিক\*

প্রজাতি বলতে প্রাণী বা উদ্ভিদের এমন স্বাভাবিক গোষ্ঠীকে বোঝায়, যারা অপর প্রাণী বা উদ্ভিদের স্বাভাবিক গোষ্ঠী থেকে উৎপত্তিগতভাবে ভিন্ন, সংজ্ঞানে স্বতন্ত্র। পৃথিবীতে লক্ষ লক্ষ প্রজাতির উদ্ভিদ ও প্রাণী আছে, যারা প্রত্যেকেই প্রত্যেকের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। সৃষ্টির আদিকাল থেকে আজ পর্যন্ত অসংখ্য নতুন নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়েছে এবং এর কালে জীবের ক্রমবিকাশের ধারা বাহিত হচ্ছে। কিন্তু এদের উদ্ভব সম্বন্ধে কিছুদিন আগে পর্যন্তও আমাদের ধারণা অস্পষ্ট ছিল। বিগত দশকের বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারগুলি এই বিষয়ে সম্যক ধারণা এনে দিয়েছে। ক্রোমোজোম\*\* এবং জিন\*-এর উপর ভিত্তি করে বংশগতি পদ্ধতির বিষয় আলোচনা করলে আমরা প্রজাতির উদ্ভবের বিষয় ভালভাবে বুঝতে পারি।

অষ্টাদশ ও ঊনবিংশ শতকে এই সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক ধারণা ছিল কিছুটা অসম্পূর্ণ এবং প্রমাণসাপেক্ষ। বিজ্ঞানী জিন ব্যাপটিষ্ট লামার্কের (1744-1829) মতে, জীবদেহের অঙ্গিত সমস্ত দৈহিক গুণাগুণ বংশপরম্পরায় উত্তর-পুরুষদের মধ্যে সঞ্চারিত হবার ফলে নতুন প্রজাতির সৃষ্টি হয়। বিভিন্ন প্রজাতির মধ্যে যে

পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়, লামার্কের মতে ঐগুলি সাধারণতঃ প্রাকৃতিক প্রভাব বা অভ্য-প্রত্যাহার ব্যবহার বা অব্যবহারের ফল। এই পার্থক্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে ডারউইনের সম্যক (1809-1882) ধারণা ছিল না, কিন্তু তিনি এই পার্থক্যগুলি লক্ষ্য করেছিলেন। তাঁর মতে, প্রাকৃতিক নির্বাচনে কতকগুলি পার্থক্য স্থিতিলাভ করে। পরবর্তী কালে অগাস্ট ওয়েজম্যান (1834-1914) উক্ত মতবাদকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করেন।

কারণ যে কোন জীবের জীবদেহের অঙ্গিত বাবতীয় গুণাগুণ তার উত্তর পুরুষেরা উত্তরাধিকার হস্তে লাভ করে না। তাই চীনা ঘেরদের লোহার জুতা পরিয়ে পা ছোট করার চেষ্টা করলেও পরবর্তী পুরুষে ঘেরদের পা ক্ষয় থেকেই ছোট হয় না। কাজেই উপরিউক্ত দুটি মতবাদের একটিও সম্পূর্ণ নিতুল নয়।

আজকের জিন-মতবাদ অনুসারে আমরা জানতে পারি যে, উত্তরাধিকার হস্তে কোন ভিন্ন বা পরিবর্তিত গুণাগুণ পেতে হলে ক্রোমোজোম ও জিন\*-এর মধ্যে পরিবর্তন আনা বাহনীয়। তাই ক্রোমোজোমের সংখ্যা ও উপাদানের কোনও বিশেষ পরিবর্তন নতুন প্রজাতি গঠনে একান্ত প্রয়োজনীয়। ক্রোমোজোমের এই সংখ্যা বা উপাদানের পরিবর্তনকে মিউটেশন বা পরিব্যক্তি বলে। সাধারণতঃ প্রত্যেক প্রজাতিতেই ক্রোমোজোমের সংখ্যা নির্দিষ্ট থাকে। কিন্তু কোন বিশেষ ভৌতিক বা রাসায়নিক কারণে এদের

\*\* ক্রোমোজোম—জীবদেহের কোষের নিউক্লিয়াসে বর্তমান—অটিল রাসায়নিক উপাদানে গঠিত। কোষ-বিভাজনে এগুলি অংশ গ্রহণ করে। প্রত্যেক প্রজাতিতে এদের সংখ্যা নির্দিষ্ট। অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয় অটিল রাসায়নিক অংশের দ্বারা ক্রোমোজোম তৈরি—প্রতিটি ক্ষুদ্র অংশকে জিন\* (Gene) বলে।

\* জাতীয় উদ্ভিদ সংরক্ষণাগার, ভারতীয় উদ্ভিদ-উদ্ভান, হাওড়া-3

যেট সংখ্যা বেড়ে যায়। তখন এদের বলা হয় পলিপ্লয়েড অথবা কোমোজোমের মধ্যে জিনের গঠনের কিছু তারতম্য ঘটতে পারে ঐ একই কারণে। তখন তাকে বলা হয় জিন-মিউটেশন, কিন্তু এর বহিঃপ্রকাশ খুবই কম। আবার বর্ণ-সঙ্কর (Hybrid) উৎপন্ন করার সময় কোমো-জোমের মধ্যে জিনের সজ্জারীতিতে কিছুটা বৈচিত্র্য আসে, যার ফলে আমরা তিস্ত গুণাগুণের বহিঃপ্রকাশ দেখতে পাই।

উপরিউক্ত তিনভাবে কোমোজোমের মধ্যে পরিবর্তন ঘটলে সম্পূর্ণ জিন গুণাবলীর প্রকাশ হয়, যদি এই নতুন গুণাবলীবিশিষ্ট জীব বংশ-বিতারে সক্ষম হয়, তবেই নতুন প্রজাতি উৎপন্ন হতে পারে। তাই কোমোজোমের পরিবর্তন যেমন একান্ত প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন প্রাকৃতিক নির্বাচনের।

উপরিউক্ত তিনটি উপায়ের মধ্যে কোমো-জোমের সংখ্যাবৃদ্ধিই প্রজাতি উদ্ভবে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ করে। বিজ্ঞানী মুটজিং-এর মতে, পৃথিবীর প্রায় অর্ধেক প্রজাতির উদ্ভব কোমো-জোমের সংখ্যাবৃদ্ধির সাহায্যেই হয়েছে। কোমো-জোমের সংখ্যাবৃদ্ধির বিশেষ প্রাধান্য থাকলেও বর্ণসঙ্কর উৎপত্তির ফলে নতুন প্রজাতির উদ্ভবও বিরল নয়।

জীবদেহের অভ্যন্তরে ঐ পার্থক্যগুলিই প্রজাতি

উৎপত্তির সব কথা নয়, এর জন্তে অবস্থিতির পরি-বর্তন বা বিচ্ছিন্নতা একান্ত প্রয়োজন। অবস্থিতির এই বিচ্ছিন্নতা বিভিন্ন কারণে হতে পারে; যেমন—ভৌগোলিক বাধা, ইকোলজিক্যাল বাধা প্রভৃতি। এই বাধার ফলে জীবের দেহকোষ বা জনন-কোষের কোমোজোমের মধ্যে বিভিন্ন পরিবর্তন ঘটতে পারে। এভাবে একই গোত্রের কিছুটা পৃথক ছুটি জীব যখন প্রাকৃতিক বাধা কাটিয়ে বর্ণসঙ্কর উৎপন্ন করতে পারে, তখনই একটি সম্পূর্ণ আলাদা জীব-গোত্রের সৃষ্টি হয়। এই জীব-গোত্রী সংজ্ঞানবে সম্পূর্ণ আলাদা। এরা যদি বংশবিতারে সক্ষম হয়, তবেই এরা নতুন প্রজাতি হিসাবে পরিচিত হতে পারে। আমাদের অলক্ষ্যে কত শত পরি-বর্তন হচ্ছে কোমোজোমের মধ্যে, কিন্তু প্রাকৃতিক নির্বাচনে তাদের বেশীর ভাগই পরিত্যক্ত হয়। কাজেই জিন এবং কোমোজোমের মধ্যে পরি-বর্তনের ফলে নতুন প্রাণী বা উদ্ভিদ সৃষ্টি হলেও এই পরিবর্তনের সাথের উপর নির্ভর করে এই নতুন জীবের বেঁচে থাকা, না থাকা।

বিভিন্ন ধরনের সূর্যরশ্মির প্রভাবে এবং তাপ-মাত্রার তারতম্যের ফলে বিভিন্ন ধরনের প্রাণী ও উদ্ভিদ পৃথিবীর বুকে আমরা দেখতে পাই। ক্ষুদ্র সরল অ্যামিবা-গোত্রী জীব থেকে অতি জটিল গঠনসময়িত জীবের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ একই কারণে সম্ভব।

## পৃথিবীর গভীরে

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়\*

পৃথিবীর কেন্দ্রের গভীরতা প্রায় 4000 মাইলের কাছাকাছি। তার অত্যন্তরের সমস্ত রহস্য বাহ্যিক এখনও উদ্ঘাটন করতে পারে নি। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশের খবর জানবার কোন প্রত্যক্ষ উপায় নেই। পৃথিবীর কেন্দ্রদেশ পর্যন্ত নল-কূপ বসাবার চিন্তা অপ্রবিলাস ছাড়া কিছুই নয়, কারণ পৃথিবীর গভীরতম তেলের (পেট্রোলিয়াম) কূপের গভীরতাও 5-6 মাইলের বেশী নয়। উপর্যুক্তর না থাকায় ভূ-বিজ্ঞানীরা নানারকম অপ্রত্যক্ষ উপায়ে পৃথিবীর অভ্যন্তরের যে ধরাদেয় সংগ্রহ করেছেন, তা নেহাৎই অপ্রভুল।

অনেক বিজ্ঞানী মনে করেন, গলিত অবস্থা থেকে ক্রমে ঠাণ্ডা হতে হতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌঁচেছে। সুতরাং সূর্যের নত পৃথিবীর উপরে সৃষ্টি হয়েছে এক পাতলা স্তর, যাকে বলা হয় ভূত্বক (Crust)। বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর উপরের স্তর ঠাণ্ডা হয়ে এলেও অভ্যন্তর তাপ ক্রমে অভ্যন্তর উত্তপ্ত অবস্থায় রয়েছে—কয়লা বা সোনার খনিতে নামলে এই বিষয়ে বিন্দুমাত্র সন্দেহ থাকে না। বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা-নিরীক্ষা থেকে ধারণা করা হয়েছে যে, সাধারণভাবে প্রতি 20 থেকে 100 মিটার গভীরতা বৃদ্ধির কালে  $1^\circ$  সেন্টিগ্রেড উষ্ণতা বেড়ে যায়। কিন্তু শুধুমাত্র গভীরতা নয়, শিলাপ্রকৃতির উপরেও উষ্ণতাবৃদ্ধি নির্ভরশীল। যেমন শক্ত আগ্নেয় অথবা পরিবর্তিত শিলার ক্ষেত্রে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার পাললিক শিলার চেয়ে বেশী। আবার বেসব অঞ্চলে আগ্নেয়গিরি রয়েছে, সেখানে উষ্ণতাবৃদ্ধির হার তো বেশী হবেই। তাছাড়াও ভূত্বকে ভেজক্লির পদার্থ বেশী রয়েছে বলে ভূপৃষ্ঠে উষ্ণতাবৃদ্ধির হারো ভূ-অভ্যন্তরের

ভুলনার অনেক বেশী। সুতরাং স্পষ্টই বুঝতে পারা যায় যে, এই ধরনের পরীক্ষা প্রমাণ থেকে পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের উষ্ণতার হিসেব নিতান্তই আনুমানিক হতে বাধ্য। পৃথিবীর কেন্দ্রস্থলের তাপ কত? এই প্রশ্নের উত্তরে বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ভেরহগেন বলেছেন, পৃথিবীর অভ্যন্তরের (Core) উপরিভাগের তাপমাত্রা  $1500^\circ$  ডিগ্রী সেন্টিগ্রেডের কাছাকাছি। অবশ্য ওটেনবার্গ, ড্যালি, আডাম্‌স্, জেক্সরী বা হোম্‌সের মতে এই তাপমাত্রা অনেক বেশী। এই মতের অধিল অভ্যন্তর বাতাবিক, কারণ এই তাপমাত্রার পরিমাণ নিছক বৈজ্ঞানিক ধারণা ছাড়া কিছুই নয়। আর সেই কারণে এই সম্বন্ধে চুলচেরা গবেষণা আপাততঃ নির্বন্ধক।

গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে শুধু তাপমাত্রাই নয়, চাপের পরিমাণও অনেকাংশে বৃদ্ধি পায়। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দেখা গেছে, পৃথিবীপৃষ্ঠের এক মাইল নীচে চাপ প্রতি বর্গফুট জায়গায় প্রায় 450 টনের কাছাকাছি। এই গড় হিসেব থেকে কেন্দ্রে চাপের পরিমাণ স্থিরীকৃত হয়েছে, প্রতি বর্গফুটে প্রায় 20 লক্ষ টনের কাছাকাছি। তবে এই হিসেব যে নিতান্তই আনুমানিক, একথা বলাই বাহুল্য। কেন্দ্রের গভীরে তাপ ও চাপের প্রাবল্য থেকে স্বভাবতঃই অভ্যন্তরের প্রকৃতি সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন মনে উদ্ভিত হয়। তাপমাত্রা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে কোন পদার্থই আয়তনে বৃদ্ধি পায়, আবার অল্প দিকে চাপমাত্রা বৃদ্ধি গেলে পদার্থের আয়তন হ্রাস পায়। সুতরাং দেখা বাচ্ছে, পৃথি-

বীর কেন্দ্রাকলে অতিরিক্ত চাপ ও তাপ—ছই বিরোধী শক্তি একই সঙ্গে কাজ করছে। কলে পৃথিবীর অন্তঃস্থলের পদার্থ অকঠিন অথচ অন্তরল—এমন এক অবস্থার বিরাজ করছে বলে বিজ্ঞানীরা মত পোষণ করেন।

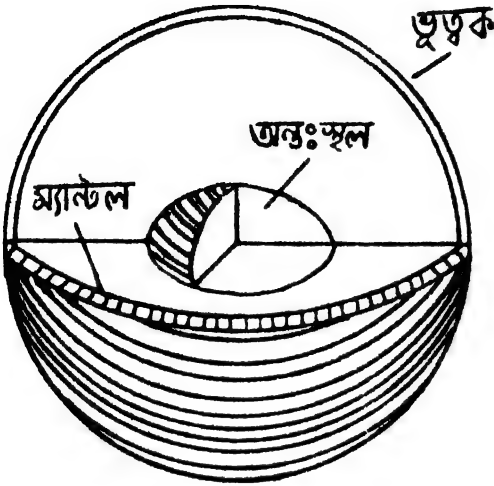
পৃথিবীপৃষ্ঠে যে ধরণের শিলা দেখতে পাওয়া যায়, তার গড় আপেক্ষিক গুরুত্ব (Sp. gravity) প্রায় তিনের কাছাকাছি। অথচ সমগ্র পৃথিবীর আপেক্ষিক গুরুত্ব প্রায় সাড়ে পাঁচ। স্বভাবতঃই ভূ-বিজ্ঞানীরা মনে করছেন যে, ভূ-অত্যন্তরে পদার্থের আপেক্ষিক গুরুত্ব নিশ্চয়ই আরো বেশী—হয়তো সাত বা আটের কাছাকাছি। কিন্তু তদুপায় চাপের প্রভাবে পদার্থের ঘনত্বের এতখানি পরিবর্তন সম্ভব নয়। তাই বিজ্ঞানীদের ধারণা, পৃথিবীর অন্তঃস্থল নিশ্চয়ই কোন ভারী ধাতব পদার্থে গঠিত। মহাকাশের বুক থেকে ছুটে-আসা উদ্ভাপিত পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সেগুলি সাধারণতঃ লোহা ও নিকেলজাতীয় পদার্থে তৈরি। একথা বলাই বাহুল্য, বেশীর ভাগ উদ্ভাপিতওই সৌরজগতের মৃত বাসিন্দা। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ঘর্ষণে বাইরের অংশটুকু জলেপুড়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পড়ে থাকে শুধু ক্রান্তরেখার লোহা ও নিকেলের মিশ্র অংশটুকু। একই সৌরজগতের অংশ বলে উদ্ভাপিতের সঙ্গে পৃথিবীর মূলগত সাদৃশ্য থাকবে, এটাই স্বাভাবিক। পৃথিবীর অন্তঃস্থল লোহা ও নিকলে তৈরী—বিজ্ঞানীদের এই অনুমানের সাহায্যে পৃথিবীর চৌম্বক শক্তিকে ব্যাখ্যা করা সহজতর হয়েছে।

পৃথিবীগর্ভের আকৃতি ও প্রকৃতির বহুপট্ট উপলব্ধি বিজ্ঞানীদের মূলতঃ নির্ভর করতে হয়েছে ভূকম্পনজনিত তরঙ্গের গতি-প্রকৃতির বিশ্লেষণের উপর, যদিও তরঙ্গের বিশ্লেষণের ব্যাপারে বিজ্ঞানীমহলে প্রচুর মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। নিম্নতরঙ্গ জলে ঢিল ছুড়লে যেমন জলের ঢেউ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, তেমনভাবেই ভূকম্পনজনিত

তরঙ্গমালা উৎসস্থল থেকে পৃথিবীর সর্বত্র ছড়িয়ে পড়ে। আর সেই সব তরঙ্গই ক্যামেরার ছবির মত সিস্ফোগ্রাফ যন্ত্রে ধরা পড়ে। যন্ত্রে ধরা পড়েছে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের মধ্য দিয়ে চলবার সময় মাঝে মাঝে তরঙ্গের গতিবেগের পরিবর্তন ঘটে। এই গতিবেগের তারতম্য থেকে পৃথিবীর বিভিন্ন স্তরের প্রকৃতি ও গভীরতা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে।

সাধারণভাবে তিন ধরণের ভূকম্পন তরঙ্গের কথা বলা হয়েছে। P বা প্রাথমিক তরঙ্গ, S বা গোপ তরঙ্গ এবং L বা দীর্ঘ তরঙ্গ। এদের গতি ও প্রকৃতি পরস্পর থেকে আলাদা। যেমন P ও S তরঙ্গমালা কেবলমাত্র কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে পারে, কিন্তু L তরঙ্গ কঠিন পদার্থের মধ্য দিয়ে চলতে অক্ষম। সুতরাং পৃথিবীর অত্যন্তরের প্রকৃতি নির্ধারণে কেবলমাত্র P ও S তরঙ্গমালার বিশ্লেষণের উপরে নির্ভর করতে হয়েছে। সিস্ফোগ্রাফ রেকর্ড থেকে দেখা গেছে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বোক্ত তরঙ্গ ছটির গতিবেগ ক্রমেই বেড়ে চলে। কিন্তু 60 থেকে 80 কিলোমিটার গভীরতার তরঙ্গবেগ হ্রাস পায়। 160 কিলোমিটারের পর থেকে আবার গতিবেগ বাড়তে থাকে, যদিও 950 কিলোমিটার গভীরতার কমে যায়। 950 কিলোমিটারের পর থেকে 2900 কিলোমিটার পর্যন্ত গতিবেগ আবার বাড়তে থাকে। কিন্তু 2900 কিলোমিটার গভীরে তরঙ্গমালার গতিবেগ হঠাৎ অত্যন্ত কমে যায়। ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগের এরকম গুঠা-নামা দেখে স্পষ্টই বোঝা যায়, পৃথিবীর অত্যন্তরে সব জারণীয় শিলার গঠন-প্রকৃতি এক রকম হতে পারে না। গতিবেগের তিনটি পর্যায় থেকে পৃথিবীর তিনটি স্তরের কল্পনা করা হয়েছে। যেমন—সবচেয়ে উপরের স্তরের নাম ভূত্বক (গভীরতা 60 কিলোমিটার), মধ্যবর্তী স্তরের নাম ম্যাটল (গভীরতা 2900 কিলোমিটার) ও সবচেয়ে

নীচের স্তরের নাম অন্তস্তল, বা পৃথিবীর কেন্দ্র পর্যন্ত প্রসারিত (চিত্র দ্রষ্টব্য)। অনেক বিজ্ঞানীর মতে অন্তস্তলের পদার্থ গলিত অবস্থায় রয়েছে, যদিও এই বিষয়ে কিছু কিছু বিজ্ঞানী সংশয়ান্বিত।



পৃথিবীর অন্তস্তল, ম্যাটেল ও ভূত্বক।

ভূত্বক ও ম্যাটেল এবং ম্যাটেল ও অন্তস্তলের মধ্যে দুটি বিরতি (Discontinuity) রেখা কল্পিত হয়েছে। প্রথমটি বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী মহরোভিসিকের নামে এবং দ্বিতীয়টি ভূ-বিজ্ঞানী শুটেনবার্গের নামে পরিচিত। তাছাড়া আরও কয়েকটি বিরতি রেখা রয়েছে। অবশ্য এগুলির গুরুত্ব অনেক কম।

একথা আগেই বলা হয়েছে যে, পৃথিবীকে শামুকের খোলার মত আবৃত করে যে কঠিন স্তরটি বিরাজ করছে, তার নাম ভূত্বক। গভীরতা প্রায় 60 কিলোমিটার। এই ভূত্বকের মধ্যে আবার দুটি ভাগ। উপরাংশে সিয়াল (Sial—সিলিকা ও অ্যালুমিনিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ) ও নিম্নাংশ সিমা (Sima—সিলিকা ও ম্যাগনেসিয়ামসমৃদ্ধ পদার্থ)। ভূত্বকে অক্সিজেন, সিলিকন, অ্যালুমিনিয়াম, পটাশিয়াম বা সোডিয়ামের পরিমাণ বেশী, যদিও লোহা ও ম্যাগনেসিয়ামের পরিমাণও কম নয়। ত্যাটার গ্র্যাট, শুটেনবার্গ প্রমুখ ভূ-বিজ্ঞানীরা কিন্তু ভূত্বকের তিনটি ভাগ

করেছেন, যেমন—সবচেয়ে উপরের স্তরে রয়েছে গ্র্যানাইট জাতীয় পাথর—প্রায় 10 কিলোমিটার পুরু। এখানে একটি কথা বলা প্রয়োজন। সমুদ্রের তলদেশে কিন্তু গ্র্যানাইট পাথর দেখতে পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় স্তরটি প্রায় 20 কিলোমিটার পুরু—বাসাল্ট ও অ্যান্ডিকবোলাইট পাথরে তৈরী। আর সবচেয়ে নীচের স্তরে রয়েছে ডিউনাইট ও পেরিডোটাইটজাতীয় পাথর—প্রায় 30 কিলোমিটার পুরু। সাধারণভাবে ভূত্বকে আগ্নেয়শিলার প্রাচুর্য দেখা যায়। ক্রাকের মতে, ভূত্বকের প্রথম 1.6 কিলোমিটারে শতকরা প্রায় 95 ভাগ আগ্নেয়শিলা, বাকীটা পাললিক শিলা।

কোন কোন ভূবিদ্যুৎ কল্পনা করেছেন, পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে মাত্র 40 কিলোমিটার নীচেই রয়েছে গলিত লাতার স্তর। কিন্তু ভূ-পদার্থবিদেরা এই ধারণাকে অমূলক বলে অতিহিত করেছেন। কারণ সে রকম কোন গলিত লাতার স্তর থাকলে ভূকম্পন তরঙ্গের গতিবেগে তারতম্য ঘটতো। স্বাভাবিক কারণে অনেকে পাণ্টা প্রশ্ন তুলেছেন, তবে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎসার সময় গলিত লাতা আসে কোথা থেকে? উত্তরে ভূ-পদার্থবিদ্রা বলেছেন, 40 কিলোমিটার গভীরতার শিলার উত্তাপ বেশী হলেও সেখানে কোন গলিত শিলাস্তর নেই। হয়তো কোন কারণে শিলাগর্ভে ফাটলের সৃষ্টি হলে চাপের পরিমাণ হ্রাস পায় এবং তারই ফলে ভূগর্ভের শিলা গলিত হয়ে লাতার সৃষ্টি করে।

ভূত্বকের নীচে রয়েছে ম্যাটেল—এটি 2900 কিলোমিটার গভীরতা পর্যন্ত বিস্তৃত। বিখ্যাত ভূ-রসায়নবিদ গোডফ্রিডের মতে, ম্যাটেলের দুটি ভাগ। উপরে এক্সোগাইট স্তর, নীচে অক্সাইড-সালফাইড স্তর। এই স্তর দুটিতে অক্সিজেন, সিলিকন, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম ও লোহা ছাড়া নিকেলসমৃদ্ধ পদার্থের সমাবেশ দেখা যায়। এই স্তরটির আপেক্ষিক গুরুত্ব আনুমানিক 4 থেকে 5।

পেরিডোটের তিতরের কোয়ার মত পৃথিবীরও

রয়েছে অন্ততল। এটি ম্যাটেল বা তৃষ্ণকের চেয়ে অনেক বেশী ভারী পদার্থে গঠিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এটি মূলতঃ লোহা, নিকেল ইত্যাদি ভারী পদার্থে তৈরি। কিন্তু বিজ্ঞানী স্যাক্সের মতে, ম্যাটেলের সঙ্গে অন্ততলের পদার্থের বেশী অমিল নেই। একথা আগেই বলা হয়েছে যে, গভীরতার সঙ্গে সঙ্গে যেমন একদিকে তাপমাত্রা বেড়ে যায়, অন্যদিকে তেমনি চাপের পরিমাণও বেড়ে যায়। ফলে অন্ততলের অবস্থা অনেকটা ত্রিশঙ্কুর মত। অকঠিন অবচ অন্তরল এমনি এক অদ্ভুত অবস্থায় রয়েছে অন্ততলের পদার্থ। সম্প্রতি বিখ্যাত বিজ্ঞানী বুলেন ভুকম্পন-তরঙ্গের প্রকৃতি বিশ্লেষণ

করে নতুন এক তত্ত্ব উপহার দিয়েছেন। তাঁর মতে, পৃথিবীর অন্ততলে লোহা-নিকেলের ছুটি স্তর। ২৯০০ কিলোমিটার থেকে ৫০০০ কিলোমিটার পর্যন্ত তরল স্তর এবং তার নীচে কঠিন স্তর।

বিংশ শতাব্দীর পারমাণবিক যুগে মানুষ পাড়ি দিচ্ছে গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে। চতুর্লোক আজ মানুষের পদানত। নিখিল বিশ্বচরাচরের বিচিত্র রহস্য উন্মিলিত হচ্ছে মানুষের অদম্য জ্ঞানস্পৃহায়। বিজ্ঞানের এই আশ্চর্য প্রগতির যুগে নিজেদের পৃথিবী সযত্নে অজ্ঞতা সত্যই বিশ্বাস কর। এই প্রসঙ্গে একটি আপ্তবাক্য মনে পড়ছে—Nearest to the Church, farthest from the God.

## চুলকুনি প্রসঙ্গে

### সুখাংশু বল্লভ মণ্ডল

“যে জানা অত্যন্ত প্রয়োজন, সে বিষয়ে সংশয়ান্বিত থাক। মানবমনের পক্ষে এক অতি হতবুদ্ধিকর পরিস্থিতি। এই অনিশ্চয়তাকে দীর্ঘ কাল সে সমর্থন করতে পারে না; যেমন করেই হোক—অজ্ঞান সত্য নয় কেনেও এই অজ্ঞতাকে সে জয় করবেই। কারণ জ্ঞানের অভাবকে ‘কিছুই নয়’—এই ভ্রান্ত বিশ্বাসের প্রলেপ দিয়ে আবৃত রেখে আত্মতুই থাক। মানবমনের ধর্ম নয়।”

—ডে. জে. ক্রসো

কোন বর্ণাঢ্য, শব্দব্যঞ্জনাময় সংজ্ঞায় অলঙ্কৃত না করলেও নিত্যনৈমিত্তিক জীবনের বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকেই চর্মরোগের বিশেষ এই লক্ষণটিকে অতি সহজেই চিনতে আমাদের ভুল হয় না। সুস্থ আত্মবিক জীবনযাত্রাকে অনেক সময়েই ব্যাহত করে এই বস্তুটি এবং এমনি অস্বস্তিকর করণ অভিজ্ঞতা বাদে আর, সংসারে

তাদের সংখ্যাও নিতান্ত নগণ্য নয়। তাই অজ্ঞতঃ সাধারণভাবে এই চুলকুনিকে চিনতে সচরাচর কোন চিকিৎসকের প্রয়োজনও হয় না।

এটা আসলে কোন রোগ নয় বরং একে কোন কোন চর্মরোগের বা অবস্থার অস্বস্তিকর বলাই সঙ্গত হবে। অনেক কারণেই এর প্রকাশ হতে পারে। ঘোঁস, পাঁচড়া, দাঁদ, কাউর, হাজা, লাইকেন, প্র্যানাস প্রভৃতি চর্মরোগের ক্ষেত্রে চুলকুনির উপস্থিতি প্রায় অবশ্যব্রিতভাবেই লক্ষ্যীয়। আবার শরীরের অভ্যন্তরস্থ কোন কোন রোগের বহিঃপ্রকাশের হেতু, যেমন—জ্বাৰা, বহুমূত্র, হৃৎকীন রোগ, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি অথবা বিবাক্ত কোন প্রাকৃতিক বা রাসায়নিক পদার্থের সংস্পর্শ বা কোন কীট-পতঙ্গাদির দংশন প্রভৃতি বহুবিধ কারণেই এর উদ্ভব হতে পারে। আবার আপাত গ্রহণের অব্যবহৃত কারণ-বিহীন অজ্ঞাত উৎস নির্ধারণ এক চুলকুনি থাকে

যাকে আমাদের অর্থাৎ করে তোলে—এমন কি, স্থানকাল নির্বিশেষে শালীনতা রক্ষার চেষ্টাকেও ব্যর্থ করে দেয়, আপাত বিচারে বার কোন কারণই খুঁজে পাওয়া যায় না। এই চুলকুনির বিষয়েই এখানে আমরা আলোচনা করবো।

বস্তুতঃ চর্মরোগের বহুবিধ লক্ষণাদির মধ্যে যেগুলি প্রকাশবৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র, তাদের মধ্যে চুলকুনি অন্যতম। প্রকৃতপক্ষে এই চুলকুনি রোগী ও চিকিৎসক উভয়ের কাছেই সমান অস্বস্তিকর ও সমস্যার বিষয়। কবাসীরা তাই খুব সম্ভবত কারণে ও সার্থকভাবেই একে চিকিৎসক ও রোগী উভয়েরই betenoire (বিশেষ অপছন্দের বস্তু) সংজ্ঞায় চিহ্নিত করে থাকেন। কোন চর্মরোগকে এককভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে যে চেষ্টার প্রয়োজন হয়, একমাত্র চুলকুনির ক্ষেত্রে অসুখাবন-যোগ্য, কার্যকরী চিকিৎসার সূচনার বিলম্ব হলে অবশ্যই চিকিৎসকের প্রতি আর্ত রোগীর নির্ভরতা-বোধ ও আস্থার অভাব দেখা দেবে। ফলে চিকিৎসার সূচল লাভের ক্ষেত্রে শুধুমাত্র সুদূর-প্রসারী বিরাগ প্রতিক্রিয়াই দেখা দেবে না, উপরন্তু চর্মক্ষেত্রে রোগের প্রসারও হবে ব্যাপক। তাই বত সন্তুর সম্ভব এই চুলকুনির প্রযুক্তিকে নিয়ন্ত্রণাধীন করা যায়, ততই উভয়ের পক্ষে মঙ্গল-জনক।

কিন্তু এই যে সমস্যাসমূহ ব্যাধি বা রোগাঙ্ক-যজ্ঞ—এর কারণই বা কি আর উৎসই বা কোথায়? নিদানশাস্ত্রের দুর্গমতা আর শারীর-বিজ্ঞান জটিলতাকে যথাসাধ্য দূরে রেখে এর প্রকৃত স্বরূপ উন্মোচনের চেষ্টা করা বাক। চিকিৎসক সমাজে যদিও অভাববিধি এর প্রকৃত কারণ বহুবিভক্তিত ও স্পষ্ট বোধগম্যের অভীত, তথাপি হাভি, উল্ফ ও শুডেল (1952), ব্রডবেক্ট (1953), রথম্যান (1954), শেলী ও আর্থার (1957), লুইস ও কিলে (1957), উল্ফটেনহফ (1959) প্রমুখ চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের গবেষণাভিত্তিক

জ্ঞানের উপর নির্ভর করে মোটামুটি সর্বসম্মত-ভাবে স্বীকৃত হয়েছে যে, সম্ভবতঃ বহুপ্রাণবাহী কিকিং পরিবর্তিত উত্তেজনাই প্রকারান্তরে এই চুলকুনির সূচনা করে। এই এসঙ্গে দুটি প্রভাবিত হুত্র এর কারণরূপে বর্ণিত হয়েছে। প্রথমতঃ, চর্মস্থিত আহত এপিডারম্যাল কোষসমূহের দ্বারা নিঃসৃত হিষ্টামিন বা হিষ্টামিনসদৃশ কোন রাসায়নিক পদার্থই সম্ভবতঃ একাধিক অ্যানার্জি-ঘটিত চর্মরোগের ক্ষেত্রে বিশেষতঃ আমবাতি প্রণীত চর্মরোগে চুলকানি সৃষ্টিকারী প্রান্তিক জৈব রাসায়নিক বাহকের কাজ করে। কিন্তু অন্যতঃ কিছু কিছু চুলকুনির ক্ষেত্রে এই হুত্রের ব্যবহারিক প্রযুক্তির ব্যর্থতা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হওয়ার হুত্রটি সর্বজনগ্রাহ্যরূপে সমাদৃত হয় নি। দ্বিতীয়তঃ, বিবিধ ও ব্যাপক ক্ষতিকর উত্তেজনার কলে এপি-ডারম্যাল কোষসমূহ আহত হলে প্রোটিনেজ নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ নিঃসৃত হয়। প্রোটিন ধ্বংসী বা আমিবজাতীয় বস্তুকে ধ্বংস করাই এর ধর্ম। এই রাসায়নিক পদার্থই পরিশেষে প্রান্তিক স্নায়বিক কলার্কোশলকে পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত করে চুলকুনি সৃষ্টির ভূমিকার অংশ গ্রহণ করে। চুলকুনির সংবেদন উত্তেজক হিসাবে এই প্রোটিনেজের সাধারণতঃ তথ্য অবশ্য বহু পূর্ব থেকেই প্রমাণিত ও বিদিত। তাছাড়াও কেন্ডবার্গ ও শেকড (1954) বিড়ালের উপর সার্বক নিরীক্ষা করে প্রমাণ করেছেন যে, কোন কোন সময়ে খোদ মস্তিষ্ককেও থেকেও চুলকুনির উৎপত্তি হওয়া সম্ভব। হজকীন রোগ, ভাবা, বহুসূত্র, দীর্ঘমেয়াদী নেফ্রাইটিস প্রভৃতি রোগের ক্ষেত্রে, যেখানে চর্মের কোন প্রাথমিক ব্যাধি ও আঙ্গ-যদিক পরিবর্তন ছাড়াই ব্যাপক চুলকুনি থাকে, তা সম্ভবতঃ এই মস্তিষ্ককেও থেকেই উৎস্ট হয়।

মস্তিষ্কস্থিত সংবেদন কেন্দ্রের উত্তেজনা যে কোন প্রকার প্রান্ত-প্রসূত চুলকুনির তীব্রতাকে বহুাংশে প্রভাবিত করে। এসম্বন্ধে উল্লেখ



করা যেতে পারে যে, চর্মপ্রাক্তাগ থেকে চুল-  
কুমির সংবেদন-প্রবাহী সমস্ত স্নায়ুতন্ত্র মূল ও  
চরম গন্তব্য স্থল হলো মস্তিষ্কস্থিত খ্যালামাসের  
নির্ধারিত অংশবিশেষ। এই সব বিশেষ স্নায়ু-  
তন্ত্রসমূহ একত্রে কশেরুকার (Spinal cord)  
মধ্যে অবস্থিত স্নানির্দিষ্ট, নির্ধারিত প্লাইনো-  
খ্যালামিক সড়কের মধ্যে দিয়ে প্রবাহিত হয়ে  
সংবেদন সঙ্কেতগুলিকে বর্ণাধানে সরবরাহ  
করে। এই বিশেষ অংশ বা কেন্দ্র পরিশেষে সেই  
সঙ্কেতগুলিকে বর্ণাবধি অঙ্গকৃতিতে রূপান্তরিত  
করে। এই রূপান্তরিত সঙ্কেতই চুলকুমিরূপে  
অঙ্গকৃত হয়।

আবার এটিটি দীর্ঘমেয়াদী চুলকুমির সঙ্গে  
প্রত্যক্ষভাবে জড়িত রয়েছে ভাবোদ্দীপক প্রতি-  
ক্রিয়ার এক মৌলিক উপাদান। কারণ এই  
দীর্ঘমেয়াদী চুলকুমিজাত কতকগুলি বিশেষ



মানসিক প্রযুক্তি, যেমন—অবসাদ, উদ্বেগ,  
উত্তেজনা ইত্যাদি মূলতঃ খ্যালামাসের বিশিষ্ট  
কেন্দ্রকে উত্তেজিত ও কার্যকর করে। কেন্দ্রীয় এই  
উত্তেজনাই আবার চুলকুমির সংবেদনের সঙ্কল্পিত  
সীমারেখাকে নিয়ন্ত্রণ করে চুলকুমির বোঝকে  
তীব্রতর করে। এমনভাবেই সৃষ্টি হয় এক  
বিষাক্ত চক্রের; অর্থাৎ মানসিক প্রযুক্তি থেকে  
কেন্দ্রীয় উত্তেজনা এবং তা থেকে চুলকুমির তীব্রতা।  
অর্থাৎ এই বৃত্তপথেই আবর্তিত হতে থাকে একই  
ঘটনাবলীর পুনরাবৃত্তি (১নং চিত্র দ্রষ্টব্য)।

২নং চিত্রে চর্মপ্রাক্ত থেকে মস্তিষ্কেজগামী  
চুলকুমির সংবেদন-প্রবাহের সম্ভাব্য গতিপথকে  
চিত্রিত করা হয়েছে। চর্মপ্রাক্তদেশের ক স্থানে  
সৃষ্ট সংবেদন-প্রবাহ স্নায়ুতন্ত্র মাধ্যমে ক ক পথে  
কশেরুকার মধ্যে নির্দিষ্ট করে বিপরীত প্রান্ত  
অতিক্রম করে য় স্থানে যায় এবং সেখান থেকে  
সোজা উদ্ভগামী হয়ে য় পথে প্লাইনো-খ্যালা-  
মিক সড়কে গ স্থানে খ্যালামাসে পৌঁছায় এবং  
পরিশেষে করটেক্সের নির্ধারিত য স্থানে উপনীত  
হয়। এই য স্থান থেকেই সংবেদন-প্রবাহ সঙ্কেত-  
সমূহ রূপান্তরিত হয়ে চুলকুমিতে পরিণত হয়।  
কশেরুকারে বিশেষ এক স্তরে আড়াআড়িভাবে  
যুক্ত করে তার অভ্যন্তরভাগ ও অংশে পৃথক-  
ভাবে দেখানো হয়েছে।

চিকিৎসালোচনা—বেতার বন্ধ, দৈনিক সংবাদ-  
পত্র ও অন্যান্য পত্র-পত্রিকা প্রভৃতিতে নানা  
ধরনের বিজ্ঞাতিকর বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে বতঃপ্রসুত  
হয়ে অথবা অযাচিত ও অবাহিত উপদেশ  
প্রবণ আত্মীয়পরিক্রমের পরামর্শে প্ররোচিত  
হয়ে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া অধিকাংশ  
ক্ষেত্রেই সৃচনার রোগীদের মধ্যে নিজে নিজেই  
চিকিৎসা করার প্রবণতা বেশ প্রবলভাবেই  
দেখা যায়। বর্তমান শতাব্দীর অর্থনৈতিক  
অস্থিরতা অবস্থা এর জন্তে যথেষ্ট দায়ী। কিন্তু  
সে যাই হোক, এর পরিণামে রোগী ও রোগের  
যে করণ ও শোচনীয় পরিণতি হয়, সে অবস্থার  
সঙ্গে চর্মবিশেষজ্ঞ চিকিৎসকমাজেরই সম্যক  
পরিচয় আছে। অনেক সময় আবার অনভিজ্ঞ  
ও হাতুড়ে চিকিৎসকের দ্বারাও এই একই  
পরিহিতির উদ্ভব হয়ে থাকে। এই প্রকার  
অবৈজ্ঞানিক চিকিৎসা ও সম্পূর্ণ অকার্যকর কিছু  
ওষুধের কার্যকার্য নির্বিশেষে অবাধ ব্যবহার যে  
কত নিরর্থক ও নিরাময়ের পরিণামী, তা এই  
আলোচনা থেকে সহজেই অনুমান করা যাবে।  
যেহেতু এই ব্যাধি দীর্ঘমেয়াদী, সেহেতু এর নিরা-





লাগবে উপযোগী ওষুধগুলি এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ চুলকুনির আবেগবাহী স্নায়ুতন্তুসমূহ এই অংশেই সংহত ও কেন্দ্রীভূত হয়ে পরে নির্দিষ্ট মস্তিষ্ককেন্দ্রে প্রবাহিত হয়। সে কেন্দ্রেই উপরিউক্ত ওষুধগুলি এককভাবে অথবা একাধিক সংমিশ্রণের সঙ্গে অত্যন্ত কেন্দ্র নিবৃত্তিকারী ওষুধের একত্র ব্যবহার অপেক্ষাকৃত অধিক সুকল প্রদান করে। আলোচ্যগ্রন্থত দৃষ্টান্ত হিসাবে মরকিন বা ওপিথেট শ্রেণীভুক্ত অত্যন্ত ওষুধগুলির চুলকুনি প্রশমিত করা উচিত। কিন্তু কার্যতঃ কেন্দ্রকে নিবৃত্ত করা সত্ত্বেও চুলকুনি প্রশমিত না করে বরং ঠিক বিপরীত ঘটনা ঘটে। এই ঘটনা আপাত বিচারে অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে এর কারণ সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। এক্ষেত্রে উল্লেখিত ওষুধের দ্বারা কটেক্সের নিবৃত্তিই আসলে খ্যালামাসের কার্যকারিতা বর্ধিত করে এবং তার কলে চুলকুনির সংবেদন বোধের সীমারেখা নিয়মিত হওয়ায় চুলকুনি বর্ধিত আকারে অগ্রভূত হয়। সে জন্যেই এই বিবরণ প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। সুতরাং এই দৃষ্টান্ত থেকে এটাও স্পষ্ট হচ্ছে যে, চিকিৎসার বিষয়ে সুকল প্রত্যাশার ক্ষেত্রে এমনি ধরণের সূক্ষ্ম ব্যতিক্রমের কার্যকারণ সম্পর্কেও সর্বিশেষ জ্ঞান অত্যাৱশ্যক। আলোচ্য পদ্ধতির ক্ষেত্রে প্রোমেথাজিন, ক্লোরফেনী-রামিন প্রভৃতি ওষুধগুলির ব্যবহারে প্রত্যাশিত সুকল পাওয়া যায়।

আমবাতজ্বাতির চর্মরোগের ক্ষেত্রে আহার্য চিকিৎসা-পদ্ধতিতে কোন ওষুধের চুলকুনি-প্রতিরোধ-কমতার মূল উৎস কিন্তু প্রধানতঃ প্রাক্কদেপে নিঃসৃত হিষ্টামিন-প্রবাহ অবরোধের উপর প্রত্যকভাবে নির্ভরশীল। এই হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধগুলি মূল্যতঃ হায়ালইট্রোনিডেজের কার্যকারিতাকে নিবৃত্ত করে। কাজেই সাইপ্রো-হেপ্টাডিন, ডাইমেথিওন, অ্যাডোজোলিন প্রভৃতি হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধের ব্যবহারে সম্ভবতঃ হিষ্টা-

মিন প্রতিরোধের চেয়ে বরং হায়ালইট্রোনিডেজের সংহারকার্যই প্রবলতর হয়। কলে কোন প্রদাহোত্তর চর্ম-প্রতিবেদন অতি সহজেই নিবৃত্ত হয়। সুতরাং চুলকুনি প্রশমনের ব্যাপারে উল্লেখিত হিষ্টামিন-বিরুদ্ধ ওষুধগুলির কার্যকারিতা খুব আশাশ্রয়ী নয় এবং এদের অবদানের মান-নির্ধারণও অতঃপর বিচারসাপেক্ষ।

আবার কতকগুলি বিশেষ নির্ধারিত তীব্র চুলকুনিযুক্ত চর্মরোগের ক্ষেত্রে স্থানিক (Topical or local) ও প্রণালীবদ্ধ (Systemic) পদ্ধতিতে চিকিৎসা-জগতের আধুনিকতম হাতিয়ার কটিকোটেরয়েডের ব্যবহারও আশাতিরিক্ত সুকল-দায়ক। কিন্তু এসব ক্ষেত্রে চুলকুনি প্রশমনের সার্থকতা মূল্যতঃ প্রদাহ-অস্তিক চর্মের প্রতিবেদনের নিরাময়-পথে পরিবর্তনের উপর বশেষ নির্ভরশীল। কাজেই এসব ক্ষেত্রে আলোচ্য পদ্ধতির দ্বারা ব্যবহৃত টেরয়েড যদি প্রদাহ-অস্তিক চর্মের প্রতিক্রিয়াকে লাঘব করতে সক্ষম না হয়, তাহলে চুলকুনির তীব্রতা হ্রাসের ক্ষেত্রেও বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বা আশাশ্রয়ী পরিবর্তন সাধিত করতে পারে না।

অতএব এই আলোচনা থেকে এটা স্পষ্ট অগ্রদাবন করা যাবে যে, এই ব্যাধির সার্থক চিকিৎসার জন্তে প্রয়োজন—সঠিক রোগনির্ণয়, তার প্রকৃতিগত কারণ সম্পর্কিত যথাযথ জ্ঞান ও পরিশেষে যথোপযুক্ত ঔষধাদি প্রয়োগের যৌক্তিকতা এবং তাদের প্রয়োগের পর দেহাত্মকরে ঘটিত ক্রিয়াকলাপ সযত্নে সর্বিশেষ জ্ঞান। কাজেই বিজ্ঞানিকর প্রচারের দ্বারা প্রচারিত হয়ে বা স্ব-প্রণোদিত হয়ে ব্যবহারের অযোগ্য, কখনও বা রীতিমত ক্ষতিকর আবার কখনও বা সূক্ষ্মপ্রসারী যারাস্বক প্রতিক্রিয়াশীল কতকগুলি মেকী ওষুধের অবাধ ব্যবহারে তথ্যাত্মক আধিক অপচয়ই হয় না, উপরন্তু তবিশেষে চিকিৎসার সহজসাধ্য পথও

দুর্গম হয়ে ওঠে। এই বিষয়ে যথেষ্ট সতর্কতা অবলম্বন করা যে অত্যাৱশ্যক, তা বলাই বাহুল্য। বরং এসব ক্ষেত্রে চর্মরোগের বিষয়ে উপযুক্ত শিক্ষা-

প্রাপ্ত বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করা রোগ ও রোগী উভয়ের পক্ষেই বাঞ্ছনীয়।

## গোখাত্তের চাট্‌নি বা সাইলেজ

শ্রীমুণালকান্তি ভৌমিক\*

গবাদি পশুর উন্নয়নের কথা ভাবলে গোখাত্তের উৎপাদন বৃদ্ধির কথা ভাবতে হয়। মাহুকের মতই গবাদি পশুর পুষ্টিকর খাত্তের প্রয়োজনীয়তা শুধু দুধ বা মাংস বৃদ্ধির জন্তে নয়, উন্নত ধরণের পশুপালন করতে গেলে এর প্রয়োজন আছে। তারতবর্ষের সব দেশে সব ঋতুতে কাঁচা ঘাসের অভাব। কিন্তু এই অভাব বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করে যতদূর সম্ভব মেটানো যায়। গোখাত্তের উপযুক্ত সংরক্ষিত কাঁচা ঘাসকে সাইলেজ (Silage) বলে। যে আধারে সাইলেজ তৈরি করা হয় তাকে বলা হয় সাইলো (Silo)। আমাদের দেশে সারা বছর প্রয়োজনমত গোখাত্ত উৎপাদন করা সম্ভব হয় না; কলে পশুপালন খুবই কঠিন হয়ে পড়ে। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে বিভিন্ন রকমের কাঁচা ঘাস উৎপাদন করে সংরক্ষণ করলে পুষ্টিকর সবুজ ঘাসের চাহিদা মেটানো সম্ভব। এই উপায়ে সংরক্ষিত কাঁচা সবুজ ঘাসে গোখাত্তের খাত্তগুণাবলী বজায় থাকে।

প্রচুর পরিমাণে ফলনশীল এবং শর্করায়ুক্ত ঘাসেই সাইলেজ তৈরি হয়। বাংলা দেশে প্রধানত: নেপিরার, জই (Oat), জোরার, ভুট্টা এবং ভুটি জাতীয় ঘাস সাইলেজ তৈরির পক্ষে উপযোগী। ভুটিজাতীয় ঘাসে প্রোটিনের ভাগ বেশী থাকায় একে জই, জোরার, ভুট্টা ইত্যাদির সঙ্গে মিশিয়ে সাইলেজ তৈরি করা উচিত। সাইলেজ তৈরির জন্তে ঘাসে উপযুক্ত রস থাকা দরকার। শুকনো ঘাসে

খাত্তের গুণাবলী পুরাপুরি না থাকায় তা সাইলেজ তৈরির পক্ষে অনুপযোগী। নিম্নে বিভিন্ন প্রকার ঘাস কতদিন পর কাটলে সাইলেজের উপযোগী হয়, তা বলা হলো।

ঘাসের নাম	কাটবার দিন	সাধারণ লক্ষণ
নেপিরার	60-65 "	ডাটাগুলি রসাল অবস্থায়
জই	65-75 "	দানার দুধ প্রস্- তির অবস্থায়
ভুট্টা	65-70 "	"
জোরার	80-90 "	ফুল আসবার সময়

সাইলো প্রস্তুত-প্রণালী—যেখানে জল জমবার সম্ভাবনা নেই এমন উঁচু জায়গায় 6-9 ফুট গর্ত করতে হবে। ইটের গাঁথুনি দিয়ে গর্ত পাকা করা দরকার। এর উদ্দেশ্য, গর্তের তিড়রে বাতে বাইরের জল ঢুকতে না পারে। এই গাঁথুনি মাটি থেকে অন্তত: 1½-2 ফুট উঁচু করা দরকার। প্রথমে উচ্চতার সমান এবং বৈধা প্রস্থের প্রায় তিন গুণ হওয়া দরকার। এই ধরনের সাইলোকে পিট সাইলো বলে। এছাড়া অত্যন্ত বিভিন্ন ধরনের সাইলোতে সাইলেজ তৈরি করা সম্ভব; যেমন—(1) বাঁকার সাইলো—এতে মাটির

উপরে 6/7 ফুট পাকা গাঁথুনী করতে হয়, (2) ট্রেক সাইলো—এতে মাটির নীচে লম্বা ধরনের গর্ত করতে হয়, (3) বুকজ সাইলো (Tower silo) এগুলি কাঠ বা ইটের তৈরি।

ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি—ঘাসের ডাঁটাগুলি রসালো অবস্থায় কেটে 1-1½ ইঞ্চি আকারে নিতে হবে। এরপর ছোট ছোট আঁট খুলে গর্তের মধ্যে এমনভাবে বিছিয়ে দিতে হবে, যাতে গোড়ার দিকটা উপরের দিকে থাকে। ঘাস ছোট না করেও সাইলেজ তৈরি করা যায়। কিন্তু তাতে সংরক্ষণ ভাল হয় না বলে সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট হয়। ছোট করে ঘাস কাটলে বাতাসমুক্ত অবস্থায় খুব চাপে ঘাস রাখা যায়। এছাড়া এতে গবাদি পশুর পরে আর কেটে খাওয়াতে হয় না এবং নষ্ট হবার সম্ভাবনাও কম থাকে। গর্ত তৈরির পর ধারের দিকে ভালভাবে পা দিয়ে মাড়িয়ে দিতে হয়, এতে বতটা সস্তব বাতাস বেরিয়ে যায়। কারণ ঘাসের ভিতর বেশী বাতাস থাকলে বিভিন্ন প্রকার ছত্রাকের আক্রমণে ঘাস নষ্ট হয়ে যায়। ঘাস স্তরে স্তরে বিছিয়ে গর্ত তৈরি করার পর কমপক্ষে 2-2½ ফুট উঁচু করে ঠেসে দিতে হয়। এরপর শুকনো খড় 4 ইঞ্চি উঁচু করে বিছিয়ে দিয়ে এক ফুট কাঁদামাটি লেপে দিতে হয়। গর্তটি 4/5 দিনের মধ্যেই সবুজ ঘাসে ভর্তি করা উচিত। কয়েক দিন পরে চাপে ঘাস বসে গেলে মাটির কাটল দেয়া যায়। এই কাটলগুলি কাঁদামাটি দিয়ে বদ্ধ করে দিতে হয়, যাতে হাওয়া বা জল ঢুকতে না পারে। গর্তের উপর ছাউনি দেওয়া ভাল; কারণ তাহলে বৃষ্টির জলে সাইলেজ নষ্ট হতে পারে না। উৎকৃষ্ট ধরনের সাইলেজ দেখতে উজ্জল সোনালী রঙের, নিকট ধরনের সাইলেজ গাঢ় ধূসরী রঙের ও ছাতাধরা। এই ধরনের সাইলেজ থেকে এক প্রকার দুগ্ধ নির্গত হয়। 70-80 দিনে ঘাস সাইলেজে

পরিণত হয়। প্রয়োজন অল্পসারে সাইলেজ গর্ত থেকে বের করে শুকনো খড়কুটা দিয়ে ভাল করে ঢেকে দিতে হয়।

গর্ত তৈরির পর জীবন্ত ঘাসের কোষগুলি এক সময়ে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতে আরম্ভ করে এবং খুব তাড়াতাড়ি অক্সিজেন নেয় ও কার্বন ডাইঅক্সাইড পরিত্যাগ করে। পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সমস্ত অক্সিজেন বহির্ভূত হয় এবং এতে কোন ছত্রাক বৃদ্ধি পায় না। কারণ অক্সিজেন ছাড়া ছত্রাক বাড়তে পারে না। এই সময়ে আর প্রভুতকারী ব্যাক্টেরিয়াগুলি (Acid forming bacteria) খুব অস্বাভাবিকভাবে সাইলেজে বৃদ্ধি পেতে থাকে। দু-দিন পরে প্রতি গ্রাম সাইলেজের রসে কয়েক বিলিয়ন ব্যাক্টেরিয়া জন্মায়। এই ব্যাক্টেরিয়াগুলি সাইলেজের শর্করাকে ভেঙ্গে প্রধানতঃ ল্যাকটিক অ্যাসিড, অ্যাসিটিক অ্যাসিড ও অ্যালকোহল তৈরি করে। এই অ্যাসিডগুলি খুবই প্রয়োজনীয়, বা অন্য কোন অবাছনীয় ব্যাক্টেরিয়ার বৃদ্ধি ব্যাহত করে এবং এতে সাইলেজ পচা ও দুগ্ধ-যুক্ত হয়। যখন অতিরিক্ত অ্যাসিড তৈরি হয়, তখন fermentation বন্ধ হয় এবং পরে এসব প্রক্রিয়া বন্ধ হয়ে যায়। বাতাস না ঢুকলেই সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী অনেকদিন পর্যন্ত বর্তমান থাকে। যদি ঘাসে জলের পরিমাণ বেশী থাকে, তাহলে fermentation ঠিক মত হয় না। এতে ল্যাকটিক বা অ্যাসিটিক অ্যাসিডের পরিবর্তে বিউটারিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়, বা সাইলেজের খাদ্যগুণাবলী নষ্ট করে। এই সময়ে সাইলোতে 100° কা. তাপ বর্তমান থাকে। ঘাসের প্রোটিনের ভাগ সাইলেজ তৈরির পদ্ধতিতে কিছু পরিমাণে নষ্ট হয়, অবশ্য অল্পাংশ খাদ্যগুণাবলী ঠিকই থাকে।

সাইলেজের শ্রেণীবিভাগ—(1) সুমিষ্ট গাঢ় বেগুনী সাইলেজ দেখতে উজ্জল গাঢ় বেগুনী রঙের

এবং স্রবধূর গন্ধযুক্ত। ভূট্টার ঘাসকে 113° কা. তাপে টাওয়ার সাইলোতে দিয়ে এই ধরনের সাইলোজ তৈরি করা হয়।

(2) অ্যাসিড হাফা বেগুনী সাইলোজ—প্রধানতঃ জই ঘাসকে পিট সাইলোতে দিয়ে তৈরি করা হয়। এই ধরনের সাইলোজ 80°-104° কা. তাপে তৈরি হয়। অ্যাসিটিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এতে স্নিগ্ধ গন্ধ পাওয়া যায়।

(3) সবুজ শস্তের সাইলোজ—এই ধরনের সাইলোজ জই বা ভূট্টার ঘাস থেকে তৈরির উপযোগী। দানায় ছুঁচ আসবার অবস্থায় ঘাস কেটে সাইলোতে সংরক্ষণ করা হয়। সবুজ রঙের এই সাইলোজের গন্ধ খুবই আকর্ষণীয়। এই ধরনের সাইলোজে অন্ন স্বাদ বর্তমান থাকে না। এই সাইলোজ সহজপাচ্য।

(4) টক সাইলোজ—দেখতে উজ্জল বেগুনী রঙের। ঘাসের ডাঁটা রসালো অবস্থায় কেটে সংরক্ষণ করা হয়। বিউটারিক অ্যাসিড বর্তমান থাকে বলে এই সাইলোজ স্বীকালো গন্ধযুক্ত।

(5) ছাতাধরা সাইলোজ—সাইলোতে বাতাস চুকলে সাইলোজ গাঁজে উঠতে পারে না। কলে ছত্রাক জন্মে সাইলোজ নষ্ট হয়। সাইলোর উপরে বা কিনারায় এই ধরনের সাইলোজ উৎপন্ন হয়। এতে অ্যামোনিয়ার গন্ধ বর্তমান। এই ধরনের সাইলোজ গাভীকে খাওয়ালে উদরাময় হয়।

(6) এ. আই. ডি. সাইলোজ—প্রধানতঃ কিন-ল্যাওে তৈরি করা হয়। সাইলোতে ঘাস সংরক্ষণ করবার সময় যুঁচ সালকিউরিক বা হাই-ড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে দিতে হয়। কলে যে কোন প্রকার ব্যাক্টেরিয়া বা ছত্রাক বৃদ্ধি পেতে পারে না।

সাইলোজ অতি উপাদেয় খাদ্য। এর খাদ্য-গুণ নির্ভর করে ঘাসের সংরক্ষণ পদ্ধতি এবং

বিভিন্ন রকম ঘাসের গুণাবলীর উপর। উৎকৃষ্ট ধরনের সাইলোজে প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন-এ ও ডি থাকে। সাইলোজ যুঁচ বিরেকক। গবাদি পশু শীতকালে যখন Non-legume খাদ্য গ্রহণ করে তখন এদের কোষ্ঠবদ্ধতা দেখা দেয়। এই সময়ে সাইলোজ বেশ উপকারী বিরেকক। সাইলোজের জৈব অম্ল (Organic acid) গবাদি পশুর কৃতি করে না। কারণ ঐ অম্ল পদার্থ পরিপাকের সময় পাকস্থলীতে তৈরি হয়। এরা শরীরের মতই এই জৈব অম্লকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে। সাইলোজ ব্যবহারে ছুঁচের উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। তাছাড়া ঝাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি কারক বলে বলদের খাদ্য হিসাবে সাইলোজ ব্যবহার করা হয়। পুষ্টির খাদ্য হিসাবে সাইলোজ সর্বদা বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে প্রস্তুত করা উচিত, নতুবা বদহজমের একটি বিশেষ কারণ হয়ে উঠতে পারে। দলানো পাকা ও ছাতাধরা সাইলোজ গবাদি পশুকে খেতে দেওয়া অছচিত। নিম্নোক্ত পরিমাণে সাইলোজ বিভিন্ন গবাদি পশুর খাদ্য-তালিকায় যোগ করা উচিত—

হুঁচবতী গাভী	দৈনিক	25-35 পাউণ্ড
হিপার (Heifer)	"	15-20 "
বলদ	"	30-50 "
হাগল	"	2 "

সাইলোজের বৈশিষ্ট্য—1. অতি কম ধরতে বহরের যে কোন বস্তুতে বিশেষতঃ শীত বা গ্রীষ্মে এটি একটি উচ্চ ধরনের রসালো খাদ্য। 2. আগাছা সমন্বিত শস্ত, যাতে অতি নীচু মানের খড় তৈরি হয়, তাতেও সাইলোজ তৈরি করা সম্ভব। 3. বিভিন্ন আবহাওয়ার যখন খড় প্রস্তুত করা অসম্ভব, তখন অতি সহজেই সাইলোজ তৈরি করা সম্ভব। 4. নির্দিষ্ট এলাকার শস্ত অতি অল্প জায়গায় সাইলোজ হিসাবে সংরক্ষণ করা সম্ভব।

# রিয়াক্টর

মল্লোরঞ্জন বিশ্বাস\*

পারমাণবিক রিয়াক্টরের প্রসঙ্গে কিছুদিন আগে প্রচারিত একটি ছোট সংবাদে বলা হয়েছিল যে, ভারতপুত্রের রিয়াক্টরটি Critical অবস্থায় এসে পৌঁছেছে এবং পূর্ণাঙ্গুরি বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে আরও কিছু দিন সময় নেবে। সংবাদটি সাধারণ মানুষকে খুব একটা উৎসাহ বোপাতে পেরেছিল কিনা জানি না, তবে বিজ্ঞানী, প্রযুক্তিবিদগণ, গবেষক এবং আরও অনেকের মনে যথেষ্ট আশার সঞ্চার করেছিল। সাধারণ লোক—এমন কি, সাধারণ বিজ্ঞানের ছাত্র-ছাত্রীরাও জানতে চাইবেন—রিয়াক্টর যন্ত্র কি এবং Critical অবস্থায় কি তার পরিণতি?

রিয়াক্টর শব্দটির সঙ্গে বিজ্ঞানীরা সবাই পরিচিত। বিশেষ ব্যবহার কোন কক্ষে যদি বিক্রিয়া ঘটানো হয়ে থাকে, তবে সেই বিশেষ ব্যবস্থাসহ কক্ষটিকে রিয়াক্টর বলে ধরে নেওয়া যেতে পারে। যদি কোন রাসায়নিক বিক্রিয়া ঐ কক্ষে ঘটানো হয়, তবে সেটাকে রাসায়নিক রিয়াক্টর বলা হয়। আর যদি এমন কোন ব্যবস্থা করা হয়, যাতে পরমাণুকে তেজে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা যায় এবং তাৎক্ষণিক কালে উৎপন্ন তাপকে অল্প কোন ভাবে রূপান্তরিত করে কাজে লাগানো সম্ভব হয়, তবে ঐ সম্পূর্ণ ব্যবস্থাকে পারমাণবিক রিয়াক্টর বা অণু রিয়াক্টর বলা হয়। সাধারণ রাসায়নিক বিক্রিয়ার তুলনায় পরমাণু বিচূর্ণ করবার ব্যাপারটা খুবই জটিল এবং এতে কারিগরি বাধাবিপত্তিও অনেক বেশী। কাজেই পারমাণবিক রিয়াক্টর তৈরি করতে যেমন অভিজ্ঞ পদার্থ-বিজ্ঞানীর প্রয়োজন, তেমনই প্রয়োজন অভিজ্ঞ ইঞ্জিনিয়ারেরও। এসব বাধাবিপত্তি সত্ত্বেও আমাদের দেশে

কিছুকাল আগে গবেষণার জন্তে তৈরি হয়েছে অমরা নামক রিয়াক্টর। এটি তাবা-পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অবস্থিত। আর সেদিন তৈরি হলো ব্যবসায়িক ভিত্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্তে ভারতের প্রথম পারমাণবিক রিয়াক্টর। এর বিদ্যুৎ উৎপাদনের ক্ষমতা প্রায় 380 মেগাওয়াট। এর পরে রাণা প্রতাপ সাগর (রাজস্থান) ও কলকাতা (বাজাজ) দ্বিতীয় ও তৃতীয় রিয়াক্টর তৈরির কাজ আরম্ভ হয়ে গেছে। কাজে কাজেই ভারত যে পারমাণবিক শক্তিতে বেশ এগিয়ে গেছে, এতে কোন সন্দেহ নেই।

এ তো গেল ভারতের রিয়াক্টরের কথা। এখন স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন জাগে যে, সৃষ্টিতত্ত্বের পরমাণু থেকে কিভাবে এত প্রচণ্ড শক্তি উৎপন্ন হচ্ছে? খুব সহজ একটা হিসাবের সাহায্যে এই প্রচণ্ড শক্তি সবচেয়ে মোটামুটি একটি ধারণা করা যেতে পারে। পরমাণু-কেন্দ্রীনের বিভাজন (Fission) সবচেয়ে দু-একটা কথা বললেই এই সবচেয়ে আমাদের ধারণা অনেক স্পষ্ট হয়ে যাবে। একটি ইউরেনিয়ামের (U-235) কেন্দ্রীকে ধীরগতি নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করলে U-235-এর কেন্দ্রী দু-ভাগে ( $Ba^{141}$  এবং  $Kr^{92}$ ) তেজে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে বেরিয়ে আসে তিনটি নিউট্রন। এই ভাঙ্গনের কালে যে শক্তি পাওয়া যায় (আইন-ষ্টাইনের তর-শক্তি সূত্র থেকে বা গণিতের ভাষায় দাঁড়ায়  $\Delta E = \Delta mc^2$ ), তার পরিমাণ প্রায় 200 মিলিয়ন ইলেকট্রন ভোল্ট অর্থাৎ  $200 \times 1.6 \times$

পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, নিউ আলিপুর কলেজ, কলিকাতা—53

$10^{-6}$  বা  $3.2 \times 10^{-4}$  আর্গ। যদি এই শক্তিকে অ্যাভোগ্যাড্রোর সংখ্যা N-এর (Avogadro number) দ্বারা গুণ করা যায়, তবে এক গ্রাম পরমাণু থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে প্রায়  $1.93 \times 10^{10}$  আর্গ। যদি এক কিলোগ্রাম বিশুদ্ধ U-235 নেওয়া যায়, তবে তা থেকে প্রাপ্ত শক্তির পরিমাণ দাঁড়াবে আরও অনেক বেশী প্রায়  $821 \times 10^{10}$  আর্গ অথবা প্রায়  $2 \times 10^{10}$  কিলোক্যালরী। এই তাপ, 20,000 টন টি. এন. টি. বিস্ফোরণের কালে যে তাপের সৃষ্টি হয়, প্রায় তার সমান। শুধু তাই নয়, হিসাব করে দেখা গেছে যে, রিয়াক্টরের মধ্যে এক কিলোগ্রাম U-235-এর বিভাজন ঘটলে যে বিদ্যুৎ-শক্তি পাওয়া যায়, তার পরিমাণ প্রায় 2500 টন করলা গোড়ার কালে উৎপন্ন বিদ্যুৎ-শক্তির সমতুল্য। যে চেম্বারের মধ্যে এত তাপ উৎপন্ন হচ্ছে, তার জন্তে কত সতর্কতা অবলম্বন প্রয়োজন, তা বোধ হয় কাউকে আর বেশী বোঝাবার প্রয়োজন নেই। এসব হলো তাপের কথা। যে U-235-কে তেজে একপ্রকার প্রচণ্ড তাপ পাওয়া যায়, সেটি আসলে কিন্তু সাধারণ পদার্থ নয়, সেটি তেজস্ক্রিয় পদার্থ এবং তার নিজস্ব এমন কতকগুলি রশ্মি আছে, যা মাহুকে রোগগ্রস্ত বা পুঞ্জ করে দেয়। এসব বিপদের কথা জেনে নিজে কাজ করা যে কত কঠিন, তা সহজেই অজ্ঞান করা যায়।

রিয়াক্টরের Critical অবস্থার ব্যাপারটা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ। তাই বোধ হয় এই সংবাদটিকে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েই প্রচার করা হয়েছিল। একটি U-235 কেন্দ্রের বিভাজনের কালে মুক্ত নিউট্রনের সাহায্যে যদি আর একটি পরমাণু-কেন্দ্রের বিভাজন ঘটানো সম্ভব হয়, তা হলে আমরা বলি রিয়াক্টরের মধ্যে এক স্বনির্ভরশীল শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া (Self-sustaining chain reaction) প্রতিষ্ঠিত হয়েছে এবং রিয়াক্টরটিও Critical পর্যায়ে এলে পৌঁছেছে। আগেই বলা হয়েছে যে,

কোন বিভাজনকম পদার্থের (যেমন U-235) কেন্দ্রীক যদি নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করা হয়, তবে ঐ পদার্থের কেন্দ্রীক দু-ভাগে ভেঙে যায় এবং কিছু নতুন নিউট্রনেরও সৃষ্টি হয়। এই নতুন নিউট্রনই শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখে এবং ধাপে ধাপে এই প্রক্রিয়াকে দীর্ঘায়ী করে।

প্রাকৃতিক ইউরেনিয়ামে শতকরা প্রায় 99.3 ভাগ থাকে  $U^{238}$  আইসোটোপ, বাকী 0.7 ভাগ অল্প আইসোটোপ  $U^{235}$ ।  $U^{238}$  আইসোটোপের কেন্দ্রীক নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে  $U^{238}$ -এর মত দু-ভাগ করা সহজ নয়। তাই যে সব নিউট্রন  $U^{238}$ -কে আঘাত করে, সে-গুলিকে  $U^{238}$  তবে নেয় এবং এরই কালে  $U^{238}$ -এর কেন্দ্রীক পরিবর্তিত হয়ে নতুন কেন্দ্রীক-নের ( $Pu^{239}$ ) সৃষ্টি হয়। এভাবে বা অল্প কোন ভাবে রিয়াক্টরের মধ্যে নিউট্রন নষ্ট হতে থাকলে বিক্রিয়া ধেমে যেতে পারে। অপর পক্ষে, যদি সব নিউট্রন (একটা  $U^{238}$  কেন্দ্রীক ভাঙলে গড়ে 2.5টি নিউট্রন পাওয়া যায়) বিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে, তবে শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার হার ক্রমাগত এমন একটা পর্যায়ে এসে দাঁড়ায় যে, যখন তখন একটা প্রচণ্ড বিস্ফোরণ ঘটাও অসম্ভব নয়। বিক্রিয়া বৃদ্ধি হয়ে যাওয়া বা বিক্রিয়ার কালে বিস্ফোরণ ঘটা—কোনটাই প্রকৃতপক্ষে প্রত্যাশিত নয়। এসব অসুবিধা দূর করে এমন একটা অবস্থার বিক্রিয়া চালানো প্রয়োজন, যখন একটা কেন্দ্রীক তেজে গিয়ে কেবলমাত্র অল্প একটাকেই ভাঙতে সাহায্য করে এবং রিয়াক্টরে এই বিশেষ অবস্থার নাম দেওয়া হয়েছে Critical অবস্থা। রিয়াক্টরের মধ্যে যখন একটা  $U^{238}$ -এর কেন্দ্রীক তেজে গড়ে একের চেয়ে কম নতুন কেন্দ্রীককে ভাঙতে সাহায্য করে, তখনকার অবস্থাকে Sub-critical এবং যখন একাধিক নতুন কেন্দ্রীককে ভাঙতে সাহায্য করে, তখন তাকে Supercritical অবস্থা বলা হয়। পারমাণবিক রিয়াক্টরে Sub-critical ও Super-

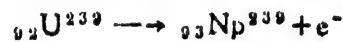
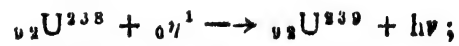


critical অবস্থা এড়াবার বখাবখ ব্যবস্থা সর্বদাই রাখা হয়, তা না হলে রিয়াক্টিব চালু হবার পর নানা রকম বিপদের আশঙ্কা থাকে।

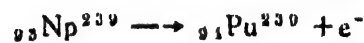
পারমাণবিক রিয়াক্টিবের বিশেষ বিশেষ অংশ ও বৈশিষ্ট্যগুলি শৃঙ্খল-প্রক্রিয়ার খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সাধারণতঃ প্রথমতঃ নিউট্রনের শক্তির কথাই ধরা যাক। উচ্চশক্তি থেকে স্তর করে নিয়ন্ত্রিত খার্যাণ নিউট্রন এতে অংশ গ্রহণ করে বিভাজনে সহায়তা করে। দ্বিতীয়তঃ জালানী। জালানীর মধ্যে সাধারণতঃ রিয়াক্টিবে যেটা ব্যবহার করা হয়, তা হলো সাধারণ ইউরেনিয়াম, যার মধ্যে  $U^{235}$  আইসোটোপটি শতকরা ০.৭২ ভাগ বর্তমান থাকে। এছাড়া যেগুলি  $U^{238}$  আইসোটোপে সমৃদ্ধ, সেই সব অংশও জালানীর পক্ষে বিশেষভাবে উপযোগী। প্লুটোনিয়াম ( $Pu^{239}$ ) এবং ইউরেনিয়ামের অপর একটি আইসোটোপ  $U^{233}$ -কেও জালানী হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। পারমাণবিক রিয়াক্টিবে এছাড়া রাখা হয় বিশেষ বিশেষ পদার্থের মডারেটর, যেগুলির প্রধান কাজ হলো নিউট্রনের গতি নিয়ন্ত্রণ করা। গ্রাফাইট, সাধারণ জল, ভারী জল ( $D_2O$ ) অথবা বেরিলিয়ামই এই সব মডারেটরের কাজ করে থাকে। রিয়াক্টিবের চালু অবস্থার প্রচণ্ড তাপের সৃষ্টি হয়—তাই একে ঠাণ্ডা রাখবার জন্তে বায়ু,  $CO_2$  (কার্বন ডাইঅক্সাইড), He (হিলিয়াম) অথবা সাধারণ জল ব্যবহার করা হয়ে থাকে। কোন রিয়াক্টিব সমসত্ত্ব (Homogeneous), না অসমসত্ত্ব (Heterogeneous), তা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে তার মধ্যে অবস্থিত জালানী ও মডারেটরের উপর। সাধারণতঃ  $D_2O$  (ভারী জল) যদি মডারেটর হিসাবে কাজ করে, তবে রিয়াক্টিবটি সমসত্ত্বই হয় এবং জালানীকে একেত্রে দ্রবণ হিসাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। তাছাড়া গ্রাফাইটকে যখন মডারেটর হিসাবে ব্যবহার করা হয়, তখন জালানীকে কঠিন অবস্থার রাখা হয় এবং এই

ধরনের ব্যবস্থা যে সব রিয়াক্টিবের বর্তমান থাকে, সেগুলিকে অসমসত্ত্ব রিয়াক্টিব বলা হয়।

পৃথিবীতে  $U^{235}$ -এর পরিমাণ বাই থাকুক না কেন, আমাদের দেশে এর বেশ অভাব আছে। সে বাহ্যিক বর্তমানে যে তাবে ব্যবসায়িক ভিত্তিতে পারমাণবিক শক্তির ব্যবহার বেড়ে যাচ্ছে, জনৈক সোভিয়েট বিশেষজ্ঞের মতে—এভাবে চলতে থাকলে আগামী পঞ্চাশ বছরের মধ্যে বিশ্বের বার্ষিক ইউরেনিয়ামের খরচ ঠাঁড়াবে প্রায় কুড়ি থেকে চল্লিশ মিলিয়ন টন। ইউরেনিয়ামের এই বিপুল পরিমাণের কথা তেবেই বিজ্ঞানীরা নতুন নতুন জালানীর বিষয় চিন্তা করছেন। এরই মধ্যে দুটি জালানীর নাম ( $Pu^{239}$  এবং  $U^{233}$ ) আমরা আগেই উল্লেখ করেছি।  $U^{238}$ -কে নিউট্রনের সাহায্যে আঘাত করে বিভাজন ঘটানো সম্ভব নয়। শুধু তাই নয়, যে নিউট্রনের দ্বারা  $U^{238}$ -এর কেন্দ্রীক আঘাত করা হয়,  $U^{238}$  সেটিকে শুধে নিয়ে নির-নিষিত নিউক্লিয়ার রিয়াকশনের মধ্য দিয়ে একটা প্লুটোনিয়াম কেন্দ্রীক রূপান্তরিত হয়—



(T=23 মিনিট)



(T=2.3 দিন)



(T=25000 বছর)

১৯৪০ সালে McMillan এবং Abelson একটি নতুন মৌলিক পদার্থের সন্ধান পেলেন। যার পারমাণবিক সংখ্যা (Atomic number=Z) ৯৩। এই নতুন মৌলিক পদার্থের নাম হলো নেপচুনিয়াম (Np)।  $U^{238}$ -কে নিউট্রনের দ্বারা আঘাত করে তারা প্রথমে পেলেন  ${}_{92}U^{239}$ , যেটি পরবর্তী দাপে বিটা রশ্মি ত্যাগ করে  ${}_{93}\text{Np}^{239}$ -এ



রূপান্তরিত হয়েছিল। এই রূপান্তরের জন্যে সময় লাগে প্রায় 23 মিনিট। তাঁরা আরও লক্ষ্য করেছিলেন যে, এই  ${}_{93}\text{Np}^{239}$  পরবর্তী ধাপে পুনরায় বিটা রশ্মি ত্যাগ করে  ${}_{94}\text{Pu}^{239}$ -এ পরি-বর্তিত হয় এবং এর জন্যে সময় নেয় পূর্ণাঙ্গেকা অনেক বেশী—প্রায় 2.3 দিন। এই  ${}_{94}\text{Pu}^{239}$  যদিও একটি আলফা কণিকা ত্যাগ করে  ${}_{92}\text{U}^{235}$ -এ রূপান্তরিত হয়, তবুও এর স্থায়িত্ব অনেক বেশী। রূপান্তরের সময় প্রায় পঁচিশ হাজার বছর। এই  ${}_{94}\text{Pu}^{239}$ -কে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পৃথক করা সম্ভব এবং দ্রুত ও ঘোর গতিসম্পন্ন নিউট্রনের দ্বারা একে তাজাও যেতে পারে। ঠিক এভাবেই  $\text{Th}^{232}$ -কে  $\text{U}^{233}$ -এ রূপান্তরিত করে নতুন জালালীর সংখ্যা আরও একটি বৃদ্ধি করা হয়েছে।

এই দুই জালালীর সন্ধান পাবার পর রিয়াক্টরের আর এক নবযুগ আরম্ভ হলো এবং জন্ম নিল Fast Breeder Reactor। Breeder শব্দের আভিধানিক অর্থ—যে জন্ম দান করে। আলোচ্য প্রবন্ধে আমরা পদার্থের যে জোল পাটাবার কথা উল্লেখ করেছি, ব্রীডার রিয়াক্টরে তা অনায়াসেই করা সম্ভব। পরমাণুর বিভাজনে মুক্ত নিউট্রনগুলিকে মডারেটরের সাহায্যে মন্দীভূত করার প্রয়োজন হয় না বলেই এই জাতীয় রিয়াক্টরকে কাঁট ব্রীডার রিয়াক্টর বলা হয়। এই রিয়াক্টরের নাম থেকেই বোকা যায় যে, এর মধ্যেই জালালী তৈরি হচ্ছে। শুধু তাই নয়, অতিরিক্ত জালালীও এখান থেকে কিছু সংগ্রহ করা যেতে পারে। সাধারণ রিয়াক্টরে যদিও কিছু  $\text{Pu}^{239}$  তৈরি হয়ে থাকে, তবুও এর রাসায়নিক পৃথকীকরণ বেশ জটিল। ব্রীডার রিয়াক্টরে অতিরিক্ত জালালী তৈরির ব্যাপারটা তাত্ত্বিক চর্চাকার। মনে করা যাক প্রতি বিভাজনে তিনটি নিউট্রন ছাড়া পাচ্ছে, যদিও এর গড় মান 2.5। এর মধ্যে একটি নিউট্রন শৃঙ্খল-প্রক্রিয়া চালু রাখতে খরচ হবে।

দ্বিতীয়টি  $\text{U}^{238}$ -কে  $\text{Pu}^{239}$ -এ রূপান্তরিত করে জালালীর খরচ যোগাবে। তৃতীয় নিউট্রনটি একই-ভাবে  $\text{U}^{238}$  থেকে অতিরিক্ত জালালী  $\text{Pu}^{239}$  প্রস্তুত করবে। এ থেকে সহজেই বোকা বাচ্ছে যে, একটি  $\text{U}^{238}$ -এর পরমাণু খরচ হলেও দুটি  $\text{Pu}^{239}$  পরমাণু তৈরি হচ্ছে এবং এর কলে একটি অতিরিক্ত জালালী পরমাণু অনায়াসেই পাওয়া বাচ্ছে। কাজেই দেখা বাচ্ছে যে, দুটির বেশী নিউট্রন প্রাথমিক বিক্রিয়ার তৈরি হলেই জালালীর খরচ ছাড়াও অতিরিক্ত জালালী রিয়াক্টরের মধ্যেই জমা হয়। এই অতিরিক্ত জালালী অল্প রিয়াক্টরে ব্যবহার করাও সম্ভব। এর কলে জালালীর অভাব অনেকাংশে কমানোও সম্ভব।

আমাদের দেশে বস্তুতঃ  $\text{U}^{238}$ -এর বেশ অভাব আছে। এজন্তেই এখানে ব্রীডার রিয়াক্টরের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। এক ধরনের প্রকাশ যে, আমাদের দেশে শীঘ্রই পরীক্ষামূলকভাবে একটি কাঁট ব্রীডার-রিয়াক্টর তৈরি হতে চলেছে। এই ব্যাপারে ক্রালের পূর্ণ সহযোগিতাও পাওয়া যাবে। এটা তৈরি হলে আমাদের দেশে যে প্রচুর প্রাকৃতিক থোরিয়াম ( $\text{Th}^{232}$ ) রয়েছে, তাকে  $\text{U}^{233}$ -তে রূপান্তরিত করে জালালীর কাজে ব্যবহার করা যাবে এবং ইউরেনিয়ামের স্বল্পতা আমাদের দেশের পরবর্তী পারমাণবিক কার্যনুষ্ঠা বিস্তৃত করতে পারবে না।

সাধারণ রিয়াক্টর অথবা কাঁট ব্রীডার রিয়াক্টর, যেটার কথাই ধরা যাক না কেন, এদের এখান কাজ হলো বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা। গবেষণাগারে অবশ্য শক্তি-উৎপাদন অপেক্ষা বিভিন্ন রেডিও আইসোটোপ তৈরি করাই রিয়াক্টরের প্রধান কাজ। ইতিমধ্যেই ভারতের তাবা পারমাণবিক গবেষণা কেন্দ্রে (BARC) অনেক রেডিও আইসোটোপ তৈরি করা হচ্ছে

এবং দেশের চাহিদা মিটিয়েও বিদেশে পাঠানো হচ্ছে। এছাড়া কিছু উর্বর পদার্থকে বিভাজনযোগ্য (Fissionable) পদার্থে পরিণত করাও রিসার্চের কাজ। এজন্তে দিন দিন রিসার্চের কৃষিকা বিজ্ঞানীদের নিকট খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে

উঠছে। আশা করা যায়, বিজ্ঞানীরা এই নতুন হাতিয়ারের সাহায্যে অদূর ভবিষ্যতেই পারমাণবিক শক্তিকে আরও অনেক কল্যাণকর কাজে লাগিয়ে মানবসমাজকে কয়েক ধাপ এগিয়ে নিয়ে যাবেন।

## উদ্ভিদ ও কস্করাস

শচীনন্দন বাগচী \*

সোনা, রূপা, লোহা, তামা প্রভৃতি মৌলিক পদার্থের মধ্যে কস্করাস একটি। কস্করাস উদ্ভিদের কল-ফুল ধারণ, শক্তের বীজ গঠন, শক্তের মান উন্নয়ন প্রভৃতির ক্ষেত্রে একটি অত্যন্ত প্রয়োজনীয় উপাদান। রোগ প্রতিরোধেও কস্করাস উদ্ভিদকে সাহায্য করে থাকে। শুধু মাত্র উদ্ভিদেরই নয়, প্রাণিদেহেও হাড়, দাঁত প্রভৃতির গঠনে কস্করাস অত্যন্ত প্রধান উপাদান। আমরা কস্করাস পাই দুধ, ডিম প্রভৃতি থেকে প্রোটিনরূপে। আর উদ্ভিদ পায় মাটি থেকে কস্কেটরূপে। বিভিন্ন প্রকার কস্কেট সার কস্করাসেরই নানা রকম বোঁগ। মাটির এই কস্কেট ও উদ্ভিদের সম্পর্কের বিষয়ে হু-চার কথা বলছি। কস্কেট সার সব মাটিতেই যে পর্যাপ্ত পরিমাণে থাকে তা নয়, কোথাও কম, কোথাও বা বেশী। আমাদের দেশের মাটিতে কস্কেটের পরিমাণ কমই দেখা যায়। তবে মাটিতে কস্কেট বেশী থাকলেই যে তা উদ্ভিদের পক্ষে সহজপ্রাপ্য হবে, এমন কোন নিশ্চয়তা নেই। আবার জমিতে কস্কেট সার প্রয়োগ করলেই যে উদ্ভিদ তার সবটাই গ্রহণ করতে পারবে, তাও নয়। জমির মোট কস্কেটের খুব সামান্য অংশই উদ্ভিদ

গ্রহণ করতে পারে আর বাকীটা কতকগুলি বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাটি বন্ধন করে রাখে, যা উদ্ভিদের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব হয় না। মাটির এই বন্ধন করে-রাখা কস্কেটই কৃষি-বিজ্ঞানীদের কাছে এক বিরাট সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছিল। কারণ, অনেক মাটিতেই দেখা গেছে যে, প্রচুর পরিমাণ কস্কেট থাকা সত্ত্বেও উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না, বার কলে উদ্ভিদের কল-ফুল ধারণ করবার ক্ষমতাও হ্রাস পেতে থাকে। তাই কৃষি-বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে লাগলেন, কেমন করে মাটির এই ধরে-রাখা কস্কেটকে মুক্ত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য করা যায়। ফলে আবিষ্কৃত হলো অনেক প্রকার পদ্ধতি।

মাটিতে কস্কেট থাকে প্রধানতঃ তিন প্রকারে— (১) মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে, বার পরিমাণ খুবই সামান্য, (২) জৈব পদার্থে, (৩) অজৈব বোঁগ ও বিভিন্ন প্রকার অজৈব পদার্থের দ্বারা শোষিত কস্কেটরূপে।

মাটিতে জলীয় দ্রবণ হিসাবে যে কস্কেট থাকে, একমাত্র সেটাই উদ্ভিদ তার মূলের দ্বারা গ্রহণ করে থাকে। কস্কেটের জলীয় দ্রবণ

\* কৃষিবিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

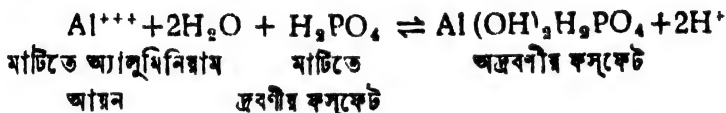
আসে জৈব ও অজৈব দুই প্রকার উৎস থেকেই।

মাটিতে phytin, nucleic acid, phospholipids প্রভৃতি জৈব পদার্থগুলিই হচ্ছে জৈব কস্করাসের উৎস। তবে অনেক মনে করেন, এগুলিই একমাত্র উৎস নয়, আরো অনেক জৈব পদার্থ আছে, বা থেকে জৈব কস্করাস পাওয়া যেতে পারে। মাটিতে অজৈব কস্করাস পাওয়া যায় প্রধানত: ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম, ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির বিভিন্ন প্রকার যৌগরূপে। এসব অজৈব কস্করাসগুলি মাটির বিভিন্ন রকম অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে নানানভাবে উদ্ভিদকে কস্করাস সরবরাহ করে থাকে। অগ্নাশ্বক মাটিতে লৌহ,

অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বেশী পরিমাণে থাকে। তাই এই জাতীয় মাটিতে কস্করাস সার প্রয়োগ করলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ বিভিন্ন প্রক্রিয়ার দ্রবণীয় কস্করাস সারকে অদ্রবণীয় কস্করাসে পরিণত করে, যার ফলে মাটিতে কস্করাস থাকে সত্ত্বেও অনেক সময়েই দেখা যায় যে, উদ্ভিদ তা গ্রহণ করতে পারে না।

এবার দেখা যাক, কি কি উপায়ে লৌহ প্রভৃতি খাতব যৌগগুলি কস্করাসকে অদ্রবণীয় অর্থাৎ উদ্ভিদের পক্ষে অপ্রাপ্য পদার্থে পরিণত করে তোলে।

1. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজের দ্বারা দ্রবণীয় কস্করাসের অদ্রবণীয় কস্করাসে অধঃক্ষেপণ।



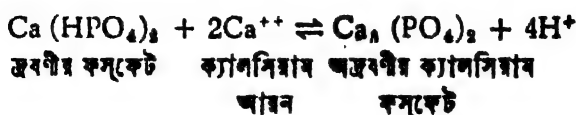
2. জৈব কস্করাসের অদ্রবণীয় কস্করাসে রূপান্তর:—জৈব কস্করাসের পদার্থ phytin উদ্ভিদকে কস্করাস সরবরাহ করতে পারে। কিন্তু অগ্নাশ্বক মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি phytin-কে দ্রবণীয় ফাইটেটে পরিণত করে থাকে।

3. লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম ও ম্যাঙ্গানিজ প্রভৃতির hydrated oxide-এর দ্বারা কস্করাসের আবদ্ধীকরণ:—মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির hydrated oxide, limonite, goethite ইত্যাদি দ্রবণীয় কস্করাসকে আবদ্ধ করে রাখতে পারে। তখন উদ্ভিদের পক্ষে কিছুতেই আর এই আবদ্ধ কস্করাস গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

4. মাটির montmorillonite, kaolinite, illite প্রভৃতি silicate mineralগুলির গঠন

চওড়া পাতলা প্লেটের মত। এরা কস্করাসকে নিজেদের প্লেটসমূহ চাক্তির গায়ে ion exchange, adsorption প্রভৃতি প্রক্রিয়ার দ্বারা ধরে রাখতে পারে।

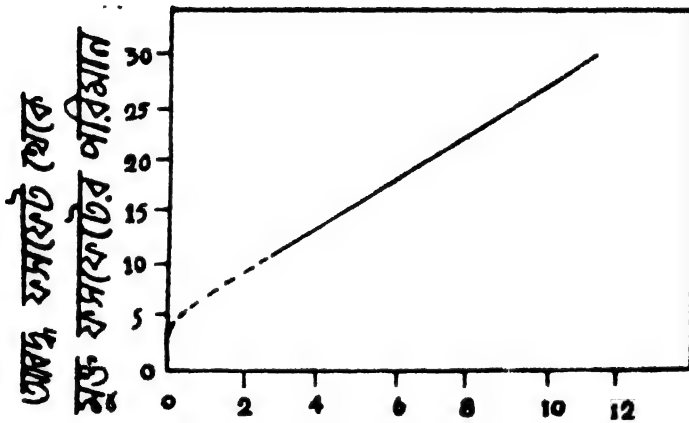
এ তো গেল অগ্নাশ্বক মাটিতে কস্করাসের আবদ্ধীকরণ। কারীর মাটিও অগ্নাশ্বক মাটির দ্বারা কস্করাসকে বদ্ধন করে রাখে। কারীর মাটিতে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, সোডিয়াম ইত্যাদি যাতুগুলি বেশী পরিমাণে থাকে। এদের মধ্যে সোডিয়ামের কস্করাস ধরে রাখবার কোন ক্ষমতা নেই; কিন্তু ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের অত্যধিক পরিমাণ কস্করাস বদ্ধন করবার ক্ষমতা আছে। এই রকম মাটিতে কস্করাস প্রয়োগ করলে তা অদ্রবণীয় ক্যালসিয়াম-ম্যাগনেসিয়াম কস্করাসে রূপান্তরিত হয়। রূপান্তর ঘটে এইভাবে—



যদি অনেকদিন বাবং এই অম্লবণীয় ক্যাল-  
সিয়াম কস্কেট মাটিতে থাকে, তাহলে সেগুলি  
অধিকতর অম্লবণীয় পদার্থ oxy, hydroxy,  
carbonate, fluor প্রভৃতি apatite বোলে  
পরিণত হয়। এসব apatite সেই সব মাটিতেই  
হয়, যে মাটিতে প্রচুর পরিমাণে ক্যালসিয়াম থাকে।

তাহলে দেখা গেল, অম্লান্বক ও ক্ষারীয় দুই  
ধরনের মাটিই অম্লবণীয় কস্কেটকে অম্লবণীয়  
কস্কেটে পরিবর্তিত করে থাকে। বিভিন্ন প্রক্রিয়ার  
মাধ্যমে এই fixed, adsorbed, স্থপাকরিত  
অম্লবণীয় কস্কেটকে অম্লবণীয় করে উদ্ভিদের পক্ষে  
সহজলভ্য করা যায়।

সাহায্যে মাটিতে আণুবীক্ষণিক জীবাণু অতি দ্রুত  
বৃদ্ধি পেতে থাকে। এরা মাটির অম্লবণীয় কস্কেটকে  
গ্রহণ করে নিজেদের দেহে আবদ্ধ করে।  
মাটিতে জৈব পদার্থ নিঃশেষিত হতে থাকলে  
এদের বংশবৃদ্ধি করার ক্ষমতাও কমে যেতে  
থাকে। অবশেষে জৈব পদার্থের অভাবে এদের  
সংখ্যা লোপ পেয়ে যায়। এই সব দ্রুত জীবাণুর  
দেহের কস্কেট মাটিতে কিয়ে আসে উদ্ভিদের  
কাছে সহজলভ্য হয়ে। তাছাড়া জৈব সার  
থেকে নানারকম জৈব অ্যাসিড, হিউমাস প্রভৃতি  
উৎপন্ন হয়। এরা মাটির লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম  
প্রভৃতির সঙ্গে বিক্রিয়া করে জটিল যৌগ উৎপন্ন



বেশীর ভাগ উদ্ভিদের পক্ষেই উপযুক্ত হচ্ছে  
neutral মাটি। খুব সাহায্য অম্লান্বক বা খুব  
সাহায্য ক্ষারীয় মাটিতেও অধিকাংশ উদ্ভিদ বেশ  
ভাল জন্মায়।

এবার দেখা বাক, কিতাবে মাটির অম্লবণীয়  
কস্কেটকে দ্রুত করে উদ্ভিদের পক্ষে সহজলভ্য  
করা যায়।

প্রথমতঃ, মাটিতে জৈব সার, যেমন—সবুজ  
সার, পাক্তা, গোবর ইত্যাদি পচা compost  
প্রয়োগের দ্বারা। এই জাতীয় সারে প্রচুর পরি-  
মাণে জৈব পদার্থ থাকে। এই জৈব পদার্থের

করে থাকে। কলে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতি  
এই জটিল যৌগে আবদ্ধ হয়ে পড়ে এবং মাটির  
কস্কেটের সঙ্গে কোন রকম বিক্রিয়া করতে পারে  
না। তখন কস্কেটও মোটামুটি দ্রুত অবস্থায়  
থাকতে পারে। জৈব সার থেকে উৎপন্ন টিউ-  
মাসের কস্কেট দ্রুত করার ক্ষমতা উপরের লেখ-  
চিত্রের দ্বারা দেখানো যেতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ অম্লান্বক মাটিতে চুন প্রয়োগ করলে  
আবদ্ধ কস্কেট দ্রুত হয়ে উদ্ভিদের পক্ষে সহজ-  
লভ্য হয়।



অম্লবর্ষীয় কস্কেট

চুন

জল

দ্রবণীয় কস্কেট

চুন প্রয়োগের দ্বারা অম্লবর্ষীয় কস্কেটের রূপান্তর—এই প্রসঙ্গে চুন প্রয়োগজনিত উপকারের কথা একটু বলা দরকার। কারণ এথেকে চাষীরা বুঝতে পারবেন, জমিতে চুন প্রয়োগ কেন করতে হয় এবং এর আসল সার্থকতা কোথায়। জমিতে নাইট্রোজেন সার, যেমন—অ্যামোনিয়াম সালফেট, অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট, ইউরিয়া ইত্যাদি ব্যবহার করলে মাটি ক্রমশঃ অম্লান্বক হয়ে পড়ে। মাটির অম্লতা বাড়তে থাকলে তা অধিকাংশ উদ্ভিদের পক্ষেই অসহ্য হয়ে পড়ে। অধিকাংশ উদ্ভিদই এই সব মাটিতে বাঁচতে পারে না। তাছাড়া অম্লান্বক মাটিতে লৌহ, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির কস্কেট বন্ধন-প্রক্রিয়া তো আছেই। ঠিক পরিমাণ চুন প্রয়োগের দ্বারা অম্ল ও কস্কেট বন্ধন দুই-ই কমানো যায়।

তাছাড়া চুন জমির মাটির গঠন উন্নত করে এবং micronutrient ঠিক পরিমাণে পেতে উদ্ভিদকে সাহায্য করে।

চুন প্রয়োগের পরিমাণ বিভিন্ন রকম নাইট্রোজেন সারের জন্তে বিভিন্ন পরিমাণে হয়; যেমন—জমিতে 100 কে.জি. অ্যামোনিয়াম সালফেট ব্যবহার করলে তার জন্তে জমিতে যে অম্লতা বৃদ্ধি পাবে, তাকে পূর্ণবছর কিরিয়ে আনবার জন্তে 110 কেজি চুনাপাথর জমিতে দিতে হবে। তবেই জমির অম্লতা ও ক্যালসিয়ামের পরিমাণ ঠিক আগের মত থাকবে। কতকগুলি বহল প্রচলিত সারের ব্যবহারজনিত অম্লতা বৃদ্ধি রোধের জন্তে কি পরিমাণ সারের জন্তে কতটা চুন ব্যবহার করা উচিত, তার একটা হিসাব নীচে দেওয়া গেল।

সারের নাম	সারের পরিমাণ	চুনের পরিমাণ
1. শুষ্ক অ্যামোনিয়া (Anhydrous ammonia)	100 কেজি	148 কেজি চুনাপাথর
2. অ্যামোনিয়াম ক্রোরাইড	100 „	128 „ „
3. অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট	100 „	60 „ „
4. অ্যামোনিয়াম সালফেট-নাইট্রেট	100 „	93 „ „
5. অ্যামোনিয়াম সালফেট	100 „	110 „ „
6. ইউরিয়া	100 „	৪০ „ „

## সঞ্চয়ন

### চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মহাকাশ-গবেষণার সুফল

মানুষ এবং নানা বৈজ্ঞানিক সরঞ্জাম পৃথিবী ছাড়িয়ে মহাকাশে পাঠানোই মহাকাশ-বিজ্ঞানের আসল উদ্দেশ্য। এই লক্ষ্য সাধন করতে গিয়ে চিকিৎসা-বিজ্ঞানের পক্ষেও সহায়ক বহু নূতন তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে।

মহাকাশযাত্রার শারীরবিজ্ঞান সম্পর্কে যে সকল তথ্য সংগৃহীত হয়েছে, কারিগরি-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে সকল নূতন আবিষ্কার হয়েছে—শরীরের যন্ত্র ও স্বাস্থ্যের উন্নতিবিধানে সেগুলি ক্রমেই অধিক পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে।

1969 সালে জুলাই ও অগাস্ট মাসে অরুণাচল মার্কিন মহাকাশযান মেরিনার-6 ও মেরিনার-7 মঙ্গলগ্রহের যে সব ছবি পৃথিবীতে পাঠিয়েছিল, সে সব ছবি এক বিশেষ পদ্ধতিতে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এগুলি ছবি তোলবার ব্যাপারে এই কম্পিউটার পদ্ধতিকে কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে ছবি তুললে অবাস্তব খুঁটিনাটি বাদ দিয়ে মূল বিষয়ের অতি স্পষ্ট ছবি তোলা সম্ভব হয়ে থাকে।

মহাকাশচারীরা মাধ্যম যে টুপী পরে থাকেন, অক্সিজেন ব্যবহার সম্পর্কে সেই টুপী নিয়ে ক্যান্সাস বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিক্যাল সেক্টরের বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়েছেন। এই টুপী পরে অতি জোরে শ্বাস টানলেও শ্বাস-প্রশ্বাসের ব্যাপারে কোন কষ্ট হয় না। রেম্পিরো-মিটার যন্ত্রটির ইদানীং কালে খুবই উন্নতি হয়েছে এবং শারীরবৃত্তীয় শ্বাস-প্রশ্বাস সম্পর্কে তথ্যসম্ভান ও গবেষণার ব্যাপারে নূতন দিগন্তের সন্ধান দিয়েছে।

আগেককার রেম্পিরোমিটার যন্ত্র যারা ব্যবহার করতেন, তাদের নাকে ক্লিপ এঁটে দেওয়া হতো এবং যে যন্ত্রটি লাগানো থাকতো, তা দিয়ে তারা মুখে শ্বাস-প্রশ্বাস নিতেন। কাজের সময় এটি যথাস্থানে থাকতো না, সেরে যেত।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের কল্যাণকর ভূমিকা রচনা করতে হয়েছে, ভেষজ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে এখনও তা হয় নি। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নানা সমস্যা সমাধানে মহাকাশসংক্রান্ত কার্যশূচী যাতে সহায়ক হতে পারে, সেই ভাবে পরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়েছে ও কারিগরিবিদ্যাকেও রূপদান করা হয়েছে।

দেশে এবং বিদেশে মহাকাশ-বিজ্ঞান ও কারিগরি বিষয়ে যে সকল তথ্য উদ্ভাবিত হয়েছে, নূতন নূতন যে সব তথ্যাদির আবিষ্কার হয়েছে, সে সব সংগ্রহ করে তথ্যভাণ্ডারে মজুদ রাখা হয়। এই ভাণ্ডারে আড়াই লাখেরও বেশী বৈজ্ঞানিক ও কারিগরি বিষয়ক প্রামাণিক তথ্যাদি মজুদ রয়েছে। তাছাড়া প্রতি বছর 75 হাজার রিপোর্ট ও প্রবন্ধ এখানে জমা হচ্ছে। এই সব তথ্য কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে কম্পিউটারের কিণ্ডার শূচীভুক্ত হয় এবং চতুর্কোণ মাইক্রোফিল্মের উপর মুদ্রণের পর বক্তাদের ব্যবস্থা করা হয়।

কম্পিউটার যন্ত্রের সাহায্যে শূচীভুক্ত তথ্যাদির এই ভাণ্ডার থেকে যে সব আবিষ্কার ও উদ্ভাবন সংক্রান্ত তথ্যাদি চিকিৎসা-বিজ্ঞান এবং অন্যান্য ক্ষেত্রে কাজে লাগানো সম্ভাবনা আছে, সেগুলি সংগ্রহ করে আটটি আঞ্চলিক কেন্দ্রের মাধ্যমে বিজ্ঞানী-সমাজে পরিবেশন করা হয় এবং

সকল কাজ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

নানা স্থান থেকেই তথ্যাদি সংগৃহীত হয়ে থাকে। যেমন—জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ক্যালিফোর্নিয়ার অবস্থিত এমজ গবেষণা কেন্দ্রের জনৈক বিজ্ঞানীর উপর মিটিংরাইট বা অতি ক্ষুদ্র উডাকণার অস্তিত্ব-সন্ধানী একটি সেলার নির্মাণের তার দেওয়া হয়। তিনি অতি ক্ষুদ্র একটি যন্ত্র তৈরি করেন। এক সেন্টিমিটার উপর থেকে একটি নুনের কথা মাটিতে পড়লে যে সংঘাতের সৃষ্টি হয়, সেই সংঘাতের এক হাজার ভাগের এক ভাগও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়।

এই সেলার নির্মাণের কিছুকাল পরে দু-জন জীববিজ্ঞানীর মধ্যে আলোচনাকালে তিনি উপস্থিত ছিলেন। ডিমের মধ্যে সুরগীর বাচ্চার

হৃদস্পন্দন নিরূপণের বিষয়েই তাদের মধ্যে কথা হচ্ছিল; অর্থাৎ ডিমের খোঁসটি না ভেঙে কিতাবে হৃদস্পন্দন নিরূপণ করা যেতে পারে, সেই সমস্যা নিয়েই তারা আলোচনা করছিলেন।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থার ঐ বিজ্ঞানী এই সমস্যা সমাধানের পথ তাঁদের ঘেঁষিয়ে দিলেন। তাঁর নির্মিত এই সেলার যন্ত্রটির সাহায্যে অদলবদল করে নিলেই যে এই কাজ সম্পন্ন হতে পারে, তা জানিয়ে দিলেন।

বর্তমানে পার্কিনসন রোগে মাংসপেশীর সামান্য কম্পন রেকর্ড করার জন্যে এই যন্ত্রটি ব্যবহার করা হচ্ছে। স্নায়ুর শল্যচিকিৎসারও এই যন্ত্রটি বিশেষ কাজে লাগবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

মহাকাশ-বিজ্ঞানের সম্ভাবনা অনেক। চিকিৎসা-বিজ্ঞানের বহু ক্ষেত্রেই এর সুফল পাওয়া যাচ্ছে। এখানে মাত্র কয়েকটির কথা উল্লেখ করা হলো।

### সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ

হাজার হাজার বছর ধরেই মানুষ সামুদ্রিক সম্পদ সংগ্রহ করে আসছে। কিন্তু কি পরিমাণ সম্পদ যে সমুদ্রে সঞ্চিত রয়েছে এবং তা আহরণের জন্যে বিজ্ঞান ও কারিগরিবিভার কতখানি উন্নতি সাধন করা প্রয়োজন, সে বিষয়ে মানুষ মাত্র গত দশ বছরের মধ্যে বিশেষভাবে অবহিত হয়েছে।

আগামী ত্রিশ বছরের মধ্যে পৃথিবীর জনসংখ্যা বর্তমানে বা আছে, তার দ্বিগুণ হয়ে যাবে। পৃথিবীতে যে পরিমাণ জল রয়েছে, সে দিন তাতে কসল কলিয়েই সেই বিপুল জনসংখ্যার খাতির চাহিদা মেটানো যাবে না। নিম্নোৎপাদন ক্ষমতাসহিত বেড়ে গেলেও কাঁচা মালের উপরও তখন টান পড়বে। সে দিন মানুষের দিকে তাকানো ছাড়া মানুষের অন্ত

কোন গতি থাকবে না। খাদ্য ও কাঁচামালের সন্ধান যে তখন সমুদ্রেই করতে হবে, সেটা অবধারিত।

তবে সমুদ্রগর্ভে প্রাকৃতিক সম্পদের সন্ধান অনেক কাল যাবৎ সূত্র হয়ে গেছে এবং কোন কোন ক্ষেত্রে খুব উন্নতিও হয়েছে। বহু প্রকার ধাতব সম্পদই সমুদ্র থেকে সংগৃহীত হচ্ছে। কিন্তু ঐ সকল সম্পদের খোঁচ মূল্যের শতকরা 90 ভাগই পাওয়া যাচ্ছে সমুদ্রগর্ভ থেকে আহরিত গ্যাস ও তৈলসম্পদ থেকে। বর্তমানে গ্যাস ও তৈলসম্পদ সমুদ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগৃহীত হচ্ছে এবং ম্যাগনেসিয়াম, দস্তা, তামা, রূপা, ইউরেনিয়াম, ব্রোমিন, রিভক, হীরা, বালি প্রভৃতি সম্পদও বখেঁট পরিমাণে পাওয়া যাচ্ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন মহাদেশের মাত্র তীর-

সংলগ্ন এলাকা থেকেই এই সব সম্পদ সংগৃহীত হয়েছে। তার জন্তে সমুদ্রের খুব গভীরেও যেতে হয় নি। সমুদ্রের মাঝ ৬৫৬ ফুট অথবা ২০০ ফিটের বা তারও কম নীচে গিয়ে মাল্য এই সব সম্পদ আহরণ করে। অকৃত্রিম বিশাল সমুদ্রের প্রায় সবটাই আজও এমনি পড়ে আছে, সেখানে সম্পদ সংগ্রহের কোন চেষ্টাই হয় নি।

তবে জলই সমুদ্রের সবচেয়ে মূল্যবান অক্ষুণ্ণ প্রাকৃতিক সম্পদ। পারমাণবিক শক্তির সাহায্যে সমুদ্রের লবণাক্ত-জল লবণমুক্ত করে মানুষের বিভিন্ন কাজে ও চাষ-আবাদে ব্যবহারের চেষ্টা হচ্ছে। বর্তমানে সমুদ্রের জল লবণমুক্ত করার ৬৪০টি কারখানা চালু অথবা নির্মাণমান অবস্থায় রয়েছে।

আগামী দশ বছরে এই সব কারখানার সংখ্যা প্রতি বছরে শতকরা ২৫টি হারে বেড়ে যাবে। সমুদ্রের জল বর্তমানে লবণমুক্ত করতে খরচ খুবই বেশী পড়ে। তবিশ্যতে কারিগরি-বিজ্ঞানের উন্নতির ফলে এই খরচের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। পৃথিবীর বহু রক্ষণশীলকে এই জলের সাহায্যে শস্ত-কলনোপযোগী এবং বাসযোগ্য করে তোলা যেতে পারে। এছাড়া খাচ্ছে প্রোটিনের অভাব পূরণেও সমুদ্র খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করতে পারে। সে দিন বিবেচনা করে পৃথিবীর খাদ্যভাবব্রত এলাকার বাস্তবপ্রাণ বা প্রোটিনের অভাব পূরণে সামুদ্রিক মৎস্য প্রভৃতি খুবই সহায়ক হবে। এই সকল বাস্তব খুবই সত্য এবং প্রচুর পরিমাণে পাওয়াও যায়। তবে বর্তমানে সমুদ্রে যে পরিমাণ খাদ্য রয়েছে, মাল্য তার শতকরা মাত্র দুই ভাগ প্রতি বছর সমুদ্র থেকে আহরণ করছে। সমুদ্রে মাল্যের

চাষ করার যে পরিকল্পনা করা হয়েছে, তাতে মাল্যের উৎপাদন তবিশ্যতে বর্ধিত পরিমাণে বেড়ে যাবে।

তাছাড়া চিকিৎসা-বিজ্ঞানীরা সমুদ্রে নানা রকম তেজস্কর সন্ধানও করছেন। সামুদ্রিক স্টোন মাল্য একপ্রকার বিব উদ্‌গীরণ করে থাকে। রক্তের চাপ হ্রাস পেলে এই বিব ঔষধ হিসাবে ব্যবহার করা যায় কিনা, সে বিষয়ে দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হচ্ছে। দক্ষিণ মেক্সিকোতে পেঙ্গুইন পাখীর অস্ত্র পরীক্ষা করে বিজ্ঞানীরা একটি নতুন ধরনের অ্যান্টিবায়োটিকেরও সন্ধান পেয়েছেন। একেই সামান্য তথ্যগ্রন্থস্থানই হয়েছে। বহু রকমের তেজস্কর এবং সামুদ্রিক জীবজন্তুর বিষয় অমুসন্ধানের ফলে সমুদ্রগর্ভে অনেক কিছু প্রয়োজনীয় জিনিস পাওয়া যাবে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

পৃথিবীর তিন ভাগের দু-ভাগই রয়েছে সমুদ্রের তলায়। এই বিশাল অংশে লুক্কায়িত সম্পদের সন্ধানের উদ্যোগ শুরু হয়েছে মাত্র। কাঁচামাল যখন মূলভাগে তেমন পাওয়া যাবে না, তখন কলকারখানা চালু রাখবার জন্তে সেই কাঁচামালের সন্ধান নিতে হবে সমুদ্রে। যে সব ক্ষুদ্রদ্বীপে এই সব সামুদ্রিক কাঁচামাল ব্যবহার করে গড়ে উঠবে, তাদের বিপুলভাবে সম্প্রসারণের সুযোগ-সুবিধা রয়েছে।

সামুদ্রিক সম্পদের উন্নয়নে, কলকারখানার তাদের প্রয়োজনীয় ব্যাপারে বেসরকারী ক্ষেত্রের বিভিন্ন উদ্যোগ ও সংস্থার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকলেও দেশের সরকার, শিক্ষা-প্রাধিকার প্রভৃতি এই বিষয়ে উদ্যোগী হলেই তবে এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।



# ধাতুনিষ্কাশনী কোক করলা

হরেন্দ্রনাথ রায়

করলার সহিত অল্পবিস্তর পরিচয় আমাদের সকলেরই আছে। সাধারণের কাছে করলা একটি অতি তুচ্ছ কালো রঙের কঠিন পদার্থ, যাহার ময়লা শত বার ধোঁত করিলেও যায় না। কিন্তু বিজ্ঞানীদের কাছে এই বস্তুটি একটি মূল্যবান সম্পদ। এই বস্তুটিকে তাঁহারা বত কাজে লাগাইয়াছেন, লাগাইতেছেন এবং ভবিষ্যতেও লাগাইবেন—তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে—তা কলিত বিজ্ঞানই হউক আর সাধারণ বিজ্ঞানই হউক—করলার দান অস্বল্প।

ধাতুনিষ্কাশনের ক্ষেত্রে করলার ব্যবহার সাম্প্রতিক নয়—সুপ্রাচীন। ধাতুর অক্সাইডকে করলা সহযোগে বিজারিত করিয়া মূল ধাতুটিকে নিষ্কাশিত করা হয়। এই প্রথা যুগ যুগ ধরিয়া চলিয়া আসিতেছিল। তবে আধুনিক যুগে কাঁচা করলার পরিবর্তে এক বিশেষ ধরনের কোক করলা ব্যবহার করা হয়। কোক করলা কাঁচা করলারই রূপান্তর যাত্র। ইহাকে বলা হয় মেটালার্জিক্যাল কোক বা ধাতুনিষ্কাশনী কোক।

ধাতুনিষ্কাশনী করলা বিস্তৃত করলা নয়। যদি হইতে উত্তোলিত কাঁচা করলাকে আংশিক পোড়াইয়া রন্ধনকার্যের জন্য আলানী করলা উৎপন্ন করা হয় আর কাঁচা করলাকে বায়ুনিরুদ্ধ কক্ষে 1000° - 1200° ডিগ্রী তাপে অক্সিজেন পাতন করিয়া কোক করলা প্রস্তুত করা হয়। যদি হইতে উত্তোলিত কাঁচা করলার মধ্যে থাকে প্রায় 55—60% শতাংশ বিস্তৃত করলা বা কার্বন, 24—25% শতাংশ উদ্বারী পদার্থ (Volatile matter), যার মধ্যে থাকে কোল গ্যাস, আলকাতরা, বিনোল, তাপ-খ্যালিন ইত্যাদি আর বাকীটা

(প্রায় 16-18% শতাংশ) থাকে ছাই বা অদাহ্য অক্রেব পদার্থ (Mineral matter)। কোক করলার মধ্যে উদ্বারী পদার্থ থাকে না বলিলেই চলে। ইহার মধ্যে থাকে প্রায় 75% ভাগ কার্বন আর কিছুটা জলীয় পদার্থ (3% ভাগের বেশী না হওয়াই বাঞ্ছনীয়); বাকীটা ছাই (প্রায় 20-22% শতাংশ)।

অক্সিজেন পাতনের দ্বারা কোক করলা উৎপন্ন করা যায় বটে, তবে সব কোক করলাকে মেটালার্জিক্যাল কোক হিসাবে ব্যবহার করা যায় না। মেটালার্জিক্যাল কোকের কতকগুলি বিশেষ গুণ থাকা দরকার নচেৎ ধাতুনিষ্কাশনে ইহা অচল হইয়া পড়ে। আমাদের দেশে উৎকৃষ্ট শ্রেণীর করলার অভাব খুবই বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী করলার অভাব আরও বেশী। মেটালার্জিক্যাল কোকের উৎকর্ষ নির্ভর করে করলার ছাই এবং আরও কয়েকটি বিষয়ের উপর। ইংল্যান্ড প্রভৃতি দেশে, যেখানে করলার ছাইয়ের পরিমাণ 6½-7½% শতাংশ, আমাদের দেশে সেখানে 16-17% শতাংশ—এমন কি, আরও বেশী। ছাইয়ের এতটা আধিক্য মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে খুবই অসুবিধাজনক। ছাই ব্যতীত করলার মধ্যে আরও কয়েকটি পদার্থের আধিক্যও অবাঞ্ছনীয়—সালফার, কস্ফরাস এবং লৌহ ইহাদের অন্ততম। করলার সালফার এবং কস্ফরাসের আধিক্য উৎকৃষ্ট লৌহ প্রস্তুতের পক্ষে অন্তরায়। লৌহের আধিক্য ছাইয়ের রংটিকে লালচে করে এবং উহার গলনাঙ্কের তাপমাত্রাও (Ash fusion temperature) কমাইয়া আনে। ইহা কোকের পক্ষে ক্ষতিকর।

মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে কোকিং বা কোকিং কোলের প্রয়োজন। কোকিং যানে সূক্ষ্মভাবে জমাট বাঁধার কক্ষতা। সকল করলার এই গুণ থাকে না। যে সকল করলার থাকে, তাহা-নিগকে কোকিং কোল বলা হয়। করলাকে বদী ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করা যায়, তাহা হইলে  $340^{\circ}$ - $450^{\circ}$  ডিগ্রীর মধ্যে করলা নমনীয় বা প্লাষ্টিক হইয়া পড়ে। এই তাপে করলা ধীরে ধীরে বিস্মিত হইতে শুরু করে। তখন তাহার মধ্য হইতে গ্যাসীয় পদার্থ নির্গত হইতে থাকে। আরও অধিক তাপে  $450^{\circ}$ - $550^{\circ}$  ডিগ্রীতে এই বিশ্লেষণ জিয়ার গতিবেগ আরও দ্রুত হয় এবং ঐ নমনীয় করলা জমাট বাঁধিয়া কঠিন কোকে পরিণত হয়। যে সকল করলার এই গুণ থাকে না, তাহা-নিগকে নন-কোকিং কোল বলা হয়। নন-কোকিং কোল বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হইলেও মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে অঙ্গুণযোগ্য। নন-কোকিং কোলে উদ্যমী পদার্থ ১৭ শতাংশের কম হইয়া থাকে। কোকিং কোলে এই জিনিষটি ২০-৩৫ শতাংশ পর্যন্ত হইয়া থাকে।

মেটালার্জিক্যাল কোলের আর একটি বিশেষ ধর্ম হইতেছে, তাহার Swelling property। যে সকল করলা উত্তপ্ত করিলে আরতনে বাড়ে না, সেই সব করলা মেটালার্জিক্যাল কোকের উপযোগী। উত্তাপের সহিত আরতন বাড়িতে থাকিলে অর্থাৎ করলা আরতনে ক্ষীত হইতে থাকিলে, অল্পধূম পাতনের সময় চুই-গুলির সমূহ ক্ষতি হইবার সম্ভাবনা। সেই জন্য করলার আরতন-ক্ষীতির মান (Swelling index) পরীক্ষা করিয়া দেখা প্রয়োজন। এক গ্রাম করলাকে ৭২ ঘেস-এ চূর্ণ করিয়া একটা নির্দিষ্ট আরতনের জুসিবলের মধ্যে এমনভাবে উত্তপ্ত করিতে হয়, যাহাতে ২½ মিনিটে তাপমাত্রা  $800^{\circ}$  ডিগ্রীতে উঠে। তারপর তাহাকে ঠাণ্ডা করিয়া তাহার আরতন কতকগুলি ট্যাণ্ডার্ড

আরতনের সহিত মিলাইয়া দেখিতে হয়। ট্যাণ্ডার্ডগুলি নথর করা থাকে। যে নথরের সহিত এই করলার আরতনের মিল হয়, সেই নথরই তাহার Swelling index। সাধারণতঃ আরতনের বিশেষ পরিবর্তন না হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ট্যাণ্ডার্ডের সহিত আরতন না মিলিলে তাহা অঙ্গুণ্যুক্ত বলিয়া বিবেচিত হয়।

আমাদের দেশে দুইটি অঞ্চল—রাণীগঞ্জ এবং ঝরিয়া হইতে করলা আমদানী হয়। রাণীগঞ্জ অঞ্চলের করলা উচ্চ শ্রেণীর বাটে, কিন্তু ঝাডু-নিষ্কাশনী করলার পর্যায়ে পড়ে না। ইহাতে ছাইয়ের পরিমাণ কম (১৩-১৬ শতাংশ)। ইহার ক্যালোরিক্যাল জ্যালিউ বা তাপপরিবর্ধক ক্ষমতা বেশী এবং লাক্স পদার্থ বা উদ্যমী পদার্থ বেশী। কিন্তু ইহা কোকিং কোল নয়। পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকিং কোল না হইলে মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত করা সম্ভব নয়। রাণীগঞ্জ এলাকার করলার কোকিং ইনডেক্স (Caking index) এবং সোরেলিং ইনডেক্স—কোনটিই মেটালার্জিক্যাল কোকের পক্ষে উপযোগী নয়।

ঝরিয়া অঞ্চল হইতে যে করলা পাওয়া যায়, তাহা কোকিং কোল, ইহার কোকিং ইনডেক্স এবং সোরেলিং ইনডেক্স দুই-ই মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী। তবে এষ্ট অঞ্চলের করলার ছাইয়ের পরিমাণ অত্যধিক—১৮-২০ শতাংশ, ক্ষেত্রবিশেষে ইহারও বেশী হইয়া থাকে। এত অধিক ছাইবহুল করলা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুতের পক্ষে উপযোগী নয়। তাই ঝরিয়া এবং রাণীগঞ্জের করলা নির্ধারিত অঙ্গুণ্যেতে মিশ্রিত করিয়া এমন একটি মিশ্রণ প্রস্তুত করা হয়, যাহা হইতে ধাতুনিষ্কাশনী কোক উৎপন্ন করা সম্ভব। ইহার সহিত বরাকর অঞ্চলের করলাও সময় সময় মিশ্রিত করা হইয়া থাকে।

ঝরিয়া অঞ্চলের করলার সহিত রাণীগঞ্জের

কয়লা মিশ্রিত করা হয় বটে, তবে সরাসরি নয়। বরিসার কয়লাকেও বাছাই করা হয়। হাতে বাছাই করা হয় না, ভাসমান পদ্ধতি বা গ্র্যাভিটি সেপারেসনের দ্বারা বাছাই করা হয়। কয়লার ভিতর ছাইয়ের পরিমাণ অল্পবাহারী কয়লা হাডা বা ভারী হইয়া থাকে। এমন একটি মাধ্যম প্রস্তুত করা হয়, বাছাতে ভারী কয়লাগুলি ডুবিয়া যায় এবং হাডা কয়লাগুলি ভাসিয়া উঠে। ওয়াসারিতে এই প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়। আজকাল কয়লাখনি অঞ্চলে অনেকগুলি ওয়াসারি স্থাপন করা হইয়াছে। আবার কোন কোন ষ্টীল প্রাচীরেও নিজস্ব ওয়াসারি আছে। এই সকল স্থানেই হাডা কয়লা ভারী কয়লা হইতে পৃথক করা হয়।

মাধ্যম প্রস্তুত করা হয় জলের সহিত 200-300 মেস-এর ম্যাগনেটাইট ( $Fe_3O_4$ ) পাউডার মিশ্রিত করিয়া। জলের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1'00, ম্যাগনেটাইটের প্রায় 5'00। দুইটিকে এমনভাবে মিশ্রিত করা হয়, বাছাতে মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব দাঁড়ায় 1'40-1'60-এর মধ্যে। ম্যাগনেটাইটের পরিমাণ কমাইয়া বা বাড়াইয়া মিশ্রণটির আপেক্ষিক গুরুত্ব কমাইতে বা বাড়াইতে পারা যায়। ম্যাগনেটাইট চৌম্বকধর্মী হওয়ার ম্যাগনেটাইট পাউডার ব্যবহার করা হয়। সুতরাং এই পাউডারকে চুম্বকের দ্বারা আকর্ষণ করিয়া পুনরুদ্ধার করা যায় এবং সেই চূর্ণকে আবার ব্যবহার করা বাইতে পারে। ম্যাগনেটাইট পাউডার ভারী। সেই জন্য তলার থিতাইয়া পড়িবার সম্ভাবনা খুব বেশী। সেই কারণে বৈজ্ঞানিক পাখার সাহায্যে মিশ্রণটিকে এমনভাবে আলোড়িত করা হয়, বাছাতে ম্যাগনেটাইটের মিহি ভঁড়া তলার থিতাইয়া পড়িতে না পারে।

গ্র্যাভিটি সেপারেসন বা ভাসমান পদ্ধতিতে হাডা ও ভারী কয়লার পৃথকীকরণের কাজ সম্পন্ন করা হয় অতিকার চোঙাকৃতির ড্রামের মধ্যে। এই ড্রামের মধ্যে জল ও ম্যাগনেটাইটের মিশ্রণটি

রাখা হয় এবং টন টন কয়লা ইহার মধ্যে চালিয়া দেওয়া হয়। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1'40, 1'45, 1'50—এইভাবে আস্তে আস্তে বৃদ্ধি করা হয় এবং ভাসমান কয়লাগুলিকে ছাঁকিয়া তোলা হয়। এইভাবে যে কয়লা পাওয়া যায়, তাহার পরিমাণ প্রায় 70-75%। এই সকল কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম থাকে। যে কয়লাগুলি তলার পড়িয়া যায়, তাহাদের মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ বেশী। সেগুলির দ্বারা মেটালার্জিক্যাল কোক প্রস্তুত হয় না। তবে সব কয়লাটাই পরিত্যক্ত হয় না। মাধ্যমের আপেক্ষিক গুরুত্ব 1'60, 1'65 পর্যন্ত বাড়াইয়া আরও কিছুটা কয়লা ছাঁকিয়া তোলা হয়। এই কয়লাগুলিকে মিডলিং বলা হয়। অবশিষ্ট কয়লা পরিত্যক্ত হয়। মিডলিং-এ ছাইয়ের পরিমাণ প্রায় 30-35 শতাংশ। ইহাকে বিভিন্ন কাজে, যেমন—বৈজ্ঞানিক ধার্মাল প্রাচীরে ব্যবহার করা হয়। পরিত্যক্ত কয়লা, বাহার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ চল্লিশের উর্ধ্বে তাহার ব্যবহারিক চল নাই। তবে অসামান্য ব্যবসায়ীদের কাছে পরিত্যক্ত বলিয়া কিছু নাই। তাহারা হয়তো এই কয়লাকেই অন্তান্ত কয়লার সহিত মিশাইয়া আমাদের দৈনন্দিন কাজে যোগান দেয়। কলে এক দিকে আমরা যেমন আর্থিক ক্ষতিগ্রস্ত হইতেছি, অন্য দিকে তেমনি আমাদের দৈনন্দিন কয়লার খরচও বাড়িতেছে আর উহনে ছাইয়ের পরিমাণও বাড়িতেছে।

এইভাবে পৃথক-করা বরিসার হাডা কয়লার সহিত রাণীগঞ্জ এবং বরাকরের কয়লার সংমিশ্রণ বা রেভিং করা হয়। রাণীগঞ্জ কয়লার মধ্যে ছাইয়ের পরিমাণ কম, সুতরাং তাহার গ্র্যাভিটি সেপারেসনের প্রয়োজন হয় না। কয়লাকে অল্পদূর পাতন করিতে হইলে তাহাকে চূর্ণ করিতে হয়। সেই জন্য গ্রাইভিং মিলে সংমিশ্রণটিকে ছাই ম্যানানিজ হাডুড়ির সাহায্যে ভঁড়া করা হয়। চূর্ণীকৃত কয়লার আকার  $\frac{1}{8}$ "-এর কম

হওয়া বাহনীয়। কাজের বড় সাইজের করলার দ্বারা বেশ জঘাট-বীধা কঠিন কোক প্রস্তুত হয় না। এই চূর্ণীকৃত করলার দ্বারা কোকচূর্ণী বা তত্ত্বেরগুলিকে পূর্ণ করা বা চার্জ করা হয়। এক-একটা চূর্ণীতে করলা ধরে প্রায় ২০টন। এই রকম কম-বেশী ৪০টি চূর্ণী পাশাপাশি অবস্থান করে। পাশাপাশি অবস্থিত ৪০টি চূর্ণীকে বলে একটা ব্যাটারী। কোন কোন ঈল প্র্যাণ্টে ৪টি, ৫টি—এমন কি, আরও বেশী ব্যাটারী থাকে কোক উৎপাদনের জন্য। চূর্ণীকে শুঁড়া করলার দ্বারা বোঝাই বা চার্জ করা হইতে কোক উৎপাদন পর্বত সময় লাগে প্রায় ১৬ ঘণ্টা। চূর্ণীগুলিকে গরম গ্যাসের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। দুই পাশ হইতে এমনভাবে উত্তপ্ত করা হয়, বাহ্যতে তাপ করলার খুণ ভেদ করিয়া অভ্যন্তর তাপ পর্বত প্রবেশ করিতে পারে। অন্তর্ভূম পাতনের সময় চূর্ণীর দরজাগুলিকে এমন নিষ্ক্লিষ্টভাবে বন্ধ রাখা হয়, বাহ্যতে বাতাসের অহুপ্রবেশ ঘটতে না পারে। চূর্ণীগুলির বাহিরের তাপ বেশী, কিন্তু ভিতরের তাপ ১১০০°-১২০০° ডিগ্রী রাখা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তাপ বাড়িবার সঙ্গে সঙ্গে করলা নমনীয় বা প্লাস্টিক অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উহা বিগ্ৰিষ্ট হইতে থাকে। সেই সঙ্গে কোল গ্যাস নির্গত হয়। এই কোল গ্যাসের সঙ্গে মিশ্রিত থাকে আলকাতরা, অ্যামোনিয়া গ্যাস, তাপ-খ্যালিন, ক্রিয়োজোট অয়েল, টলুইন, জাইলিন, বেজল প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ। কোল গ্যাসকে ঠাণ্ডা করিয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার এই সব মূল্যবান পদার্থগুলিকে পৃথক করা হয়। করলাকে অন্তর্ভূম পাতন করা হয় দুই রকম উদ্দেশ্যে। একটির মুখ্য উদ্দেশ্য হইল কোক করলা উৎপাদন করা। সে ক্ষেত্রে কোল গ্যাসটি গোপ। ইহা তখন উপজাত পদার্থ বা বাই-প্রোডাক্ট।

ইম্পাত কারখানায় এই উদ্দেশ্য লইয়া করলার অন্তর্ভূম পাতন করা হয়। দ্বিতীয়টির মুখ্য

উদ্দেশ্য হইল কোল গ্যাসের উৎপাদন। সেই ক্ষেত্রে কোক হইল গোপ। যেমন দুর্গাপুরে বাংলা গভর্ণমেন্টের কোকওভেন একেট। এখানে করলার অন্তর্ভূম পাতনের দ্বারা কোল গ্যাস উৎপন্ন করা হয়। কোক করলা হয় উপজাত পদার্থ। ঈল প্র্যাণ্টে কোক এবং কোল গ্যাস উভয়েরই প্রয়োজন। কোকের প্রয়োজন রাষ্ট্র কার্পেসে পিগ-লৌহ উৎপাদনে এবং কাউল্ডিতে আর কোল গ্যাসের প্রয়োজন হয় ওপেন হার্ব কার্নেসে ইম্পাত গলাইবার কাজে। ইহা ছাড়াও এই গ্যাসের প্রয়োজন হয় শহরে আলো জ্বালাইবার কাজে, পারিবারিক রন্ধনের কাজে, লেবরেটরীতে বার্নার জ্বালাইবার কাজে। যে প্র্যাণ্টে কোক উপজাত পদার্থ হিসাবে উৎপন্ন হয়, সেখানে কোককে বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া অন্য পথ নাই।

অন্তর্ভূম পাতনের সময় যখন চূর্ণী হইতে আর কোন গ্যাস নির্গত হয় না, তখনই বুঝিতে পারা যায়, করলা কোকে পরিণত হইয়াছে। ইহার পর চূর্ণীর দরজা খুলিয়া কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। কোক বাহির করিবার প্রণালীটাও একটু বিচিত্র ধরণের। চূর্ণীর সম্মুখে একখানা উল্লু ওয়গন আনিয়া রাখা হয়। ইহার নাম Quenching car। পিছন দিক হইতে বৈদ্যুতিক হাতের সাহায্যে সেই বিশাল জলন্ত অঙ্গারের খুণটিকে ধাক্কা দিয়া Quenching car-এর মধ্যে ফেলিয়া দেওয়া হয়। তার পর সেই জলন্ত অঙ্গারকে বর্ণাধারার তলার আনিয়া অগ্নি নির্বাপিত করা হয়। লক্ষ্য রাখা দরকার, যেন প্রয়োজনের অতিরিক্ত জল ব্যবহার না করা হয়। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্প ২-৩ শতাংশের অতিরিক্ত না হওয়াই বাহনীয়। সেই ক্ষেত্রে রাষ্ট্র কার্পেসে জটিলতার সৃষ্টি হয়।

রাষ্ট্র কার্পেসে যে কোক ব্যবহার করা হয়, তাহার নির্দিষ্ট আকৃতি বা সাইজ আছে। ১½' হইতে ২' সাইজের কোক ব্যবহৃত হয়। বেশী

বড় বা বেশী ছোট আকারের কোক অহুবিধা-জনক। বড় বড় চাইকে তাকিয়া সঠিক আকারে পরিণত করিতে গেলে কত কোক যে ভুঁড়া হইয়া যায় এবং কার্ণেলে ব্যবহারের অহুপযোগী হয়, তাহা বলা যায় না। সেগুলি সস্তা দরে ধোলা বাজারে বিক্রয় করা ছাড়া উপায় থাকে না। এক শত টন করিয়া হইতে কোক উৎপন্ন হয় 70-72 টন। খুব বেশী যদি হয় 74-75 টন; কারণ করলার মধ্যে বারবীর পদার্থই (আল-কাতরা সমেত) থাকে 24-25 শতাংশ।

কাঁকেই কোকের দাম স্বভাবতঃই বেশী। অতএব ইহার বতবানি সম্ভাব্য হইয়াছে, ততই ভাল। আজকাল সিনট্যারিং প্রাণ্টে কিছু কিছু কোককে কাঁকে লাগান হইতেছে। এক্ষেত্রে ভুঁড়া কোকই উপযুক্ত।

ব্রাট কার্ণেসের জন্ত নিয়োজিত কোকের আকার বা সাইজ (1½"-2") ছাড়া আরও কয়েকটি গুণ থাকা প্রয়োজন। ব্রাট কার্ণেসে কোক, কঠিন লাল মাটি বা আররন ওর এবং চুনা পাথর বা লাইম স্টোনের সঙ্গে পাশাপাশি অবস্থান করিয়া সুউচ্চ চুল্লীর মাথার উপর হইতে নীচের দিকে নামিতে থাকে। সুতরাং তাহাকে বিলম্ব উপরের চাপ এবং গড়াইয়া পড়িবার জন্ত ঘর্ষণ-চাপ সহিতে হয়। সে ক্ষেত্রে কোক নরম প্রকৃতির হইলে অচল হইবে। উত্তর প্রকার চাপের মধ্যে পড়িয়া কোক তাকিয়া ভুঁড়া ভুঁড়া হইয়া পড়িবে এবং সেই সঙ্গে কার্ণেসের প্রক্রিয়াও শুরু হইয়া আসিবে। তাই কোক উৎপন্ন হইবার পর তাহার উপর কয়েকটি পরীক্ষা চালাইয়া তাহার উপযোগিতা হাতে-কলমে বাচাই করিয়া দেখা হয়। এই সব পরীক্ষার মধ্যে একটি হইল ড্রাম টেস্ট বা মাইকাম টেস্ট (Micam test)। ইহাকে এক প্রকার অ্যান্‌সন টেস্টও বলা চলে।

মাইকাম টেস্ট করা হয় একটি বিদ্যুৎ-চালিত ড্রামের মধ্যে। ড্রামটি নির্দিষ্ট আকারের হওয়া

চাই। তাহার আবর্তমান গতিবেগও নির্দিষ্ট হওয়া চাই (যেমন মিনিটে 100 বার)। ড্রামের মধ্যে 100 কিলোগ্রাম কোক বোঝাই করিয়া দুখ বন্ধ করিবার পর তাহাকে একটা নির্দিষ্ট সময় (পাঁচ মিনিট) পর্যন্ত বৈদ্যুতিক শক্তিতে একাধিকমে আবর্তিত করা হয়। নির্দিষ্ট সময়ের পর ড্রামের আবর্তন থামাইয়া সব কোক বাহির করিয়া লওয়া হয়। তাহার পর 1½" ছাঁকনীর সাহায্যে ছাঁকা হয়। যদি 75 বা তদুর্ধ্ব ভাগ কোকের আকারে 1½" উপর থাকিয়া যায়, তাহা হইলে সেই কোক কার্ণেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। 75 ভাগের কম হইলে কোক নরম বলিয়া বিবেচিত হয় এবং কার্ণেসের পক্ষে অহুপযুক্ত হয়। 75 শতাংশ হইল সর্বনিম্ন মান। ইহাকে নরম কোক বলা হয়। যে কোকের 80 শতাংশ 1½" বা তদুর্ধ্ব থাকে, তাহাকে মাঝারী প্রকৃতির কোক বলা হয়। আর যে কোকের 85 শতাংশ 1½" বা তদুর্ধ্ব থাকে তাহাকে কঠিন বা শক্ত কোক বলা হয়। কার্ণেসের পক্ষে মাঝারী প্রকৃতির কোকই সবিশেষ উপযোগী।

দ্বিতীয় পরীক্ষার নাম হইতেছে শ্রাটার টেস্ট (Shatter test)। এই পরীক্ষা নির্দিষ্ট ওজনের কোককে 24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে নীচে ফেলা হয়। অবশ্য 24 ফুট উচ্চ স্থান লেবরেটরীর মধ্যে পাওয়া সম্ভব নয় বলিয়া 6 ফুট উচ্চ স্থান হইতে চার বার নীচে ফেলিবার পর কোকগুলিকে 1½" ছাঁকনীর সাহায্যে ঢালা হয়। এই ক্ষেত্রে যদি 90 শতাংশের উপর কোক 1½" অথবা তদুর্ধ্ব হয়, তাহা হইলে কোক কার্ণেসের উপযোগী বলিয়া গণ্য হয়। উত্তর পরীক্ষাতে শুধু 1½" বা তদুর্ধ্বের কোক ছাড়াই ভুঁড়া কোক কতখানি উৎপন্ন হয়, তাহার পরিমাণও ছাঁকনীর সাহায্যে মাপিয়া দেখা হয়।

24 ফুট উচ্চ স্থান হইতে ফেলিবার কারণ হইতেছে এই যে, ব্রাট কার্ণেসের মাথার উপর হইতে চার্জ বধন ভিতরে ঢালিয়া দেওয়া হয়, তখন সে মাল প্রায় 24 ফুট নীচে আসিয়া পড়ে। কলে

কোকের ভাঁড়া ভইরা বাইবার সম্ভাবনা অধিক। সেই জন্ত ভাঁটার টেব্লেট ২৪ ফুট উচ্চ স্থান হইতে করা হয়।

পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, কোকের মধ্যে সালফার এবং কস্ফরাসের আধিক্য অবাহনীয়। করণা হইতেই এই দুইটি পদার্থ কোকে অল্পপ্রবেশ করে। কোকের মধ্যে সালফার এবং কস্ফরাস বেশী থাকিলে ব্লাষ্ট কার্বেসে পিগ প্রস্তুত করিবার সময় পিগ লৌহ কোক হইতে ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থ গ্রহণ করে। ফলে পিগের মধ্যে ঐ দুইটি পদার্থের পরিমাণ বেশী হইলে পিগের দ্বারা অ্যাসিড ইম্পাত প্রস্তুত করা সম্ভব হয় না। অ্যাসিড ইম্পাতে (যে ইম্পাত অ্যাসিড কার্বেস হইতে প্রস্তুত হয় তাহাকে অ্যাসিড ইম্পাত বলে) ঐ দুইটি মৌলিক পদার্থের পরিমাণ খুব কম থাকে। কোকের মধ্যে জলীয় বাষ্পের আধিক্যও অবাহনীয়। এই পদার্থটির পরিমাণ তিন শতাংশের বেশী না হওয়াই উচিত। চুরী হইতে নির্গত জলজ কোকের আশুন বধন বর্ণার জলধারার সাহায্যে নির্বাণিত করা হয়, তখনই জলীয় বাষ্প উহার মধ্যে আটকা পড়ে। ব্লাষ্ট কার্বেসে কোক হইতে এই জলীয় বাষ্প নির্গত হইয়া কার্বেসের তাপ শোষণ করিবার ফলে কার্বেসের তাপ কমিয়া যায়। সুতরাং কোকের পরিমাণ বাড়াইয়া এই তাপের ভারসাম্য রক্ষা করিতে হয়। এই জন্ত উৎপাদন ধরচাও বাড়িয়া যায়। সেই জন্ত কোয়েকিং করে বধন জলজ কোক ঠাণ্ডা করা হয়, তখন বাহাতে অল্প পরিমাণ জল ব্যবহার করা হয়, সেদিকে লক্ষ্য রাখা বিশেষ প্রয়োজন।

কোকের হাই সম্বন্ধে পূর্বেই আলোচনা করা হইয়াছে। কোকের হাই বত কম হয়, ততই ভাল। ইংল্যান্ড, আমেরিকা প্রভৃতি দেশে করণার হাইয়ের পরিমাণ কম। কিন্তু আমাদের দেশে এই পরিমাণ খুব বেশী—১৬-১৮ শতাংশেরও বেশী। এই সকল করণা হইতে কোক প্রস্তুত হইলে প্রায় ২৪-২৫ শতাংশ বারবীর পদার্থ নিকাশনের পর হাইয়ের পরিমাণ দাঁড়ায় ২০-২১ শতাংশে। করণার শ্রেণী অনুসারে সব সময় এই মান রাখাও দায়। সেই ক্ষেত্রে লৌহ প্রস্তুতে কোকের পরিমাণ লাগে বেশী। এক টন লৌহ উৎপাদনে লাল মাটির প্রয়োজন প্রায় ১.৫ টন, কোকের প্রয়োজন প্রায় ০.৪ টন। কিন্তু সময় সময় এই পরিমাণ গিয়া দাঁড়ায় এক টনে। সেই ক্ষেত্রে লৌহ উৎপাদনের ধরচা অনেক বাড়িয়া যায়।

হাইয়ের আর একটা প্রয়োজনীয় গুণ হইল তাহার গলনাঙ্ক (Ash fusion temperature)। এই গলনাঙ্ক বত উচ্চ তাপের হয়, ততই ভাল। হাইয়ের মধ্যে প্রধানতঃ থাকে সিলিকা এবং অ্যালুমিনা ( $Al_2O_3$ ), একটা অপরটার প্রায় দ্বিগুণ। ইহা ছাড়া থাকে কিছু ম্যাগনেসিয়া, কিছু লৌহ অক্সাইড। লৌহের অক্সাইড বেশী থাকিলে হাইয়ের রং হয় লালচে এবং ইহার গলনাঙ্কও কম হয়। সেই ক্ষেত্রে কার্বেসের তাপে হাই যদি গলিয়া যায়, তাহা হইলে কোক বাহার আকার ধারণ করে এবং লৌহ উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটায়। সুতরাং হাইয়ের গলনাঙ্ক বেশী হওয়াই বাহনীয়, অল্পতঃ ১৬০০° ডিগ্রীর কাছাকাছি হওয়াই ভাল।

## বিজ্ঞান-সংবাদ

### বৃহস্পতি গ্রহের সন্ধান

মার্কিন মহাকাশ সংস্থা বৃহস্পতি গ্রহটির বিপরীত অক্ষানের জন্তে পরিকল্পনা প্রস্তুত করছে। ক্যালিফোর্নিয়ার রেডওগো বীচের টি. আর. ডব্লিউ. ইনকরপোরেটেডের সঙ্গে সম্প্রতি এই সম্পর্কে এক চুক্তি হয়েছে। চুক্তি অনুসারে এই সংস্থাটি 1972-'73 সালে বৃহস্পতি গ্রহের অভিবৃথে উৎক্ষেপণের জন্তে দুটি উন্নত ধরনের মহাকাশযান নির্মাণ করবে। এই মহাকাশযানে কোন আরোহী থাকবে না। এই মহাকাশযান দুটির নাম দেওয়া হয়েছে—পায়োনীর-এক ও পায়োনীর-জি। এরাই বৃহস্পতির প্রথম ক্লোজআপ ছবি তুলবে। বৃহস্পতি সৌরজগতের বৃহত্তম গ্রহ। মঙ্গল ও বৃহস্পতির মধ্যে যে গ্রহাণুপুঞ্জ রয়েছে, সেগুলির পর্ববেষ্ণণ এবং বৃহস্পতির পরিবেশ ও আবহমণ্ডলের সন্ধানও এই পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত। এই পরিকল্পনার আর একটি উদ্দেশ্য হলো ননি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটো প্রভৃতি দূরবর্তী গ্রহগুলিতে পৌঁছাবার জন্তে কৌশল উদ্ভাবন।

### আখের ছোবড়া থেকে গৃহনির্মাণের উপাদান

বুর্টেনে আখের ছোবড়াকে কাজে লাগাবার এক নতুন পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। এর ফলে উন্নয়নশীল দেশগুলিতে গৃহ-নির্মাণের উপাদান সম্ভার পাওয়া বাবে।

লন্ডনের কার্ব চার্লস রাইট ডেভেলপমেন্টস লিমিটেডের মি: সি. রাইট পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, আখের ছোবড়ার (Bagasse) সঙ্গে অম্ল পরিমাণ Propionic acid মিশ্রিত করলে জৈব কণিকাগুলি (বা জীবিকার মতো

ব্যাগাসোসিস রোগ সৃষ্টি করে ও সংরক্ষিত ব্যাগাসির ক্ষতিসাধন করে) একই রকম থেকে যায়।

মি: রাইট ব্যাগাসোসিস রোগ বরণ করে নিয়ে এই রোগের কারণ জৈব কণিকাগুলিকে আলাদা করতে সাহায্য করেন। ত্রিনিদাদে পরিচালিত পরবর্তী পরীক্ষার ব্যাগাসির উপর প্রোপিয়োনিক অ্যাসিডের কাজ ধরা পড়ে। এই পরীক্ষা চালান মি: রাইট ও বি. পি. কেমিক্যালস্।

এই নতুন উপাদান সম্পর্কে বি. পি. কেমিক্যালস্ বলেন—পৃথিবীর অন্ন-অগ্রসর দেশগুলিতে এই প্রথম একটি অন্ন ব্যয়ের সর্বার্থসাধক গৃহ-নির্মাণের উপাদান পাওয়া বাবে।

ভীরা আরও বলেন যে, এপর্বত শিলে অতি অল্প পরিমাণে আখের ছোবড়া কাজে লাগানো হয়েছে (যেমন—ভারত, দক্ষিণ আমেরিকা, তাইওয়ান এবং যুক্তরাষ্ট্রে কাইবার বোর্ড তৈরির কাঁচামাল হিসাবে)। কিন্তু এটি চিপ বোর্ড, হার্ড বোর্ড, গ্যালভানাইজড ব্লক, সফট উড, কার্ডবোর্ড এবং থার্মোসেটিং প্লাস্টিক প্রভৃতি তৈরির এক আশ্চর্য অল্প মূল্যের বিকল্প উপাদান হিসাবে গণ্য হবার যোগ্যতা রাখে।

### ইঁদুরের বংশবিস্তারের অভিনিব পদ্ধতি

বছাঘ সৃষ্টি করে কীট-পতঙ্গ ধ্বংস করার অভিনিব পদ্ধতি আমেরিকা এবং পৃথিবীর অন্যান্য রাষ্ট্রে প্রয়োগ করা হচ্ছে। কলকাতা কীট-পতঙ্গের ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই কলপ্রসূ হয়েছে। ইঁদুর প্রভৃতি নিমূল করার জন্তেও বিভিন্ন দেশে এই অভিনিব পদ্ধতি নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে।



আমেরিকার বিশিষ্ট রাসায়নিক আগন কোম্পানীর ডাঃ আর. জে. ডিকিনসন এবং নোয়েল ডিকোনর এই বিষয় নিয়ে গবেষণা করছেন। তাঁরা পুরুষ ইঁদুরকে ক্রোরো হাইড্রিনস নামে এক প্রকার রাসায়নিক দ্রব্য বাইরে বেবেছেন যে, এতে পুরুষ ইঁদুরগুলি ডিরকালের জন্মে বন্ধ্যা হয়ে গেলেও তারা যৌন আবেগ হারায় না। তাদের সঙ্গে জী-ইঁদুরের মিলনে বিখ্যা গর্ভস্ফারণ হয়ে থাকে। ঐ সময়ে জী-ইঁদুরেরা অল্প পুরুষ ইঁদুরদের কাছেও ঘেঁষতে দেয় না। এর ফলে নতুন ইঁদুরের সংখ্যা কমেই কমে আসবে এবং এভাবেই এদের নিমূল করা সম্ভব হবে।

এই রাসায়নিক উপাদানটি এখনও বাজারে ছাড়া হয় নি। কারণ এখনও এই বিষয়ে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা বাকী রয়েছে।

### অতি শক্তিশালী ভিটামিন-ডি

যুক্তরাষ্ট্রের উইসকন্সিন বিশ্ববিদ্যালয়ের জৈব রসায়ন-বিজ্ঞানীরা স্থপার ভিটামিন-ডি নামে এক ধরনের অতি শক্তিশালী ভিটামিন আবিষ্কার করেছেন। এই সকল বিজ্ঞানীদের অন্তর্গত হেট্টর এক. ডি. লিউকা বলেছেন, শিশুদের রিকেট রোগ এবং ঐ ধরনের অস্থি-সংক্রান্ত রোগ প্রতিরোধ ও নিরাময়ে সাধারণ ভিটামিন-ডি-এর তুলনায় স্থপার ভিটামিন-ডি ৪০ গুণ বেশী কার্যকরী হয়ে থাকে। তিনি এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন যে, এই আবিষ্কারের ফলে পৃথিবীর লক্ষ লক্ষ লোক, বারা অস্থিসংক্রান্ত রোগে ভুগছে, তারা খুবই উপকৃত হবে।

### কারবাইন

প্রাকৃতিক দৃষ্টি নয় এবং এই গ্রহে পাওয়া যায় না, এমন এক জাতের উচ্চ আণবিক যৌগিক-পদার্থ (High Molecular Compound) সোভিয়েট বিজ্ঞান অ্যাকাডেমীর লেবরেটরীতে নির্মিত হয়েছে।

অজ্ঞানের প্রাকৃতিক রূপ তিনটি—কয়লা, হীরক ও গ্রাফাইট। সাধারণ পেন্সিলের শীশ আর হীরকের মত উজ্জ্বল পদার্থ একই অণু দিয়ে তৈরি। তবে তাদের ভেতরে পার্থক্য নির্ভর করে অণুর গঠনের উপর। এই গঠনের পরিবর্তন হলেই গ্রাফাইট হীরক হয়ে যায়। অত্যধিক উত্তাপ ও প্রচণ্ড চাপে এই গঠন বদলানো যায়।

তবে কয়লা, হীরা ও গ্রাফাইটের বাইরে অজ্ঞানের রূপ আছে কি? এ. স্নাডকতের ১৯৬৪ সালের এই প্রকল্পটি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা গবেষণার দ্বারা সত্য বলে প্রমাণ করেছেন এবং বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন কারবাইন। বিজ্ঞানী ডি. কোরশাক, এ স্নাডকত এবং ওয়াই. কুজিয়াভসেভ এই পদার্থটি তৈরির কাজে লিপ্ত ছিলেন।

কারবাইন কালো শুঁড়ার মত পদার্থ। পৃথিবীতে এই পদার্থটি নেই, তবে অন্ত কোন গ্রহে থাকা সম্ভব। গ্রাফাইট ও কারবাইন মিলিয়ে 'খুব শক্তিশালী ইলেক্ট্রন তৈরি সম্ভব হবে। বৈজ্ঞানিক গবেষণার দিক থেকেও এই অজ্ঞানটি খুবই প্রয়োজনীয়। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞানের এক নতুন শাখা উন্মুক্ত হয়েছে।



## পুস্তক পরিচয়

**প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা : মনোভাষ**  
**সরকার**

প্রকাশক রাডিক্যাল বুক ক্লাব, ৬ কলেজ  
স্টোরার কলিকাতা-১২, দাম ৪ টাকা।

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতে গণিতচর্চা  
প্রচলিত। প্রাক্‌বৈদিক যুগে মহেন্দ্রগড়ো-  
হরপ্পার সুপ্রাচীন ভারতীয়েরা কেমন জীবনের  
সহজ ও সাধারণ প্রয়োজনের দাবিতে পাটিগণিত,  
জ্যামিতি, জ্যোতির্বিজ্ঞানের প্রাথমিক জ্ঞানার্জন  
করেছিলেন, বৈদিক যুগে তেমনি জ্ঞানচর্চার  
ক্ষেত্রে গণিতশাস্ত্র এক বিশিষ্ট মর্যাদার আসন  
গ্রহণ করেছিল, আর বেদোত্তর যুগে গণিতশাস্ত্র  
সহ বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখার প্রভূত উন্নতি  
সাধিত হয়েছিল। আলোচ্য গ্রন্থে এই তিনটি  
যুগ-পর্বে প্রাচীন ভারতের গণিতচিন্তা সম্পর্কে  
লেখক নিপুণভাবে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করেছেন।  
নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ মন নিয়ে তিনি সব কিছু  
বিশ্লেষণ করেছেন। তাঁর আলোচনার ‘সবই  
ব্যাধে আছে’—জাতীয় মনোভাষ যেমন দেখা  
যায় নি, অপর দিকে তেমনি উগ্র ভারতবিদ্বেষী  
মনোভাষও নেই। একারণে সত্যসন্ধানী সাধকের  
কাছে তাঁর আলোচনার আকর্ষণ বিশেষভাবে  
অনুভূত হবে। লেখক এছাড়া প্রতিটি যুগের  
সামাজিক, রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করবার  
সঙ্গে গণিতচর্চার কাহিনী এবং প্রধান প্রধান  
গণিতজ্ঞ ও গণিতগ্রন্থের পরিচয় মনোজ্ঞভাবে  
বিবৃত করেছেন। দশমিক দ্বানীর মান, অকপাতন

পদ্ধতি ও শূন্য আবিষ্কারের কাহিনী, পূর্বসিদ্ধান্ত,  
লীলাবতী গ্রন্থের বিবরণ এবং আর্ষতট্ট, ভাস্করা-  
চার্য প্রভৃতি প্রাচীন ভারতীয় গণিতজ্ঞদের  
পরিচয় পাঠকমাত্রকেই আকৃষ্ট করবে।

লেখকের রচনাশৈলী মনোজ্ঞ, ভাষা সহজ ও  
সাবলীল। তিনি যে বহু পরিশ্রম ও গভীরভাবে  
চিন্তা করে আলোচনার প্রবৃত্ত হয়েছেন, তার  
পরিচয় এই গ্রন্থের সর্বাংশে পরিফুট। করেকটি  
চিত্র থাকার গ্রন্থের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। ছাপা  
ও মুদ্রণ পরিফুট প্রশংসনীয়। বইটি পাঠকমহলে  
সমাদৃত হবে বলেই আমরা মনে করি।

**সমাজ ও কারিগর :** শ্রীঅমূল্যধন দেব  
প্রকাশক মনীষা গ্রন্থালয়, ৭/৩ বি বঙ্কিম  
চ্যাটার্জি স্ট্রীট, কলিকাতা-১২। দাম ৩ টাকা।

লেখক পেশায় একজন ইঞ্জিনিয়ার, পেশায়  
একজন লেখক। কর্মজীবনে বহু বছর কারি-  
গরদের সাক্ষাৎ সংস্পর্শে এসে যে অভিজ্ঞা অর্জন  
করেছেন, তারই প্রতিকলন এই গ্রন্থে আছে।  
আমাদের কারিগরেরা তাঁদের স্বাধিকার অর্জন  
করবার জন্যে উপযুক্ত জ্ঞানের অধিকারী হোন,  
যাতে তাঁরা পরমুখাপেকী না হয়ে নিজেরাই  
নিজের ভালমন্স বুঝতে পারেন—এই উদ্দেশ্য  
নিয়ে লেখক আলোচনার প্রবৃত্ত হয়েছেন। শিক্ষিত  
মধ্যবিত্ত পরিবারের বহু যুবক—যারা কারিগরী  
বৃত্তি গ্রহণ করেছেন, এই বইটি পড়ে বিশেষ  
লাভবান হবেন। লেখকের ভাষা সাবলীল, বইটির  
ছাপা ভাল।

র. ব.

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

## জ্ঞান ও বিজ্ঞান

জুলাই — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — সপ্তম সংখ্যা



শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের **Dr. Albert Crewe** তাঁর উদ্ভাবিত অতি শক্তিশালী ইলেকট্রন অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বোরিয়াম অণুর মধ্যে একক পরমাণুর আলোকচিত্র গ্রহণে সর্বপ্রথম সক্ষম হয়েছেন।

চিত্রে ছোট সাদা ফুটকিগুলি হচ্ছে একক বোরিয়াম পরমাণু।

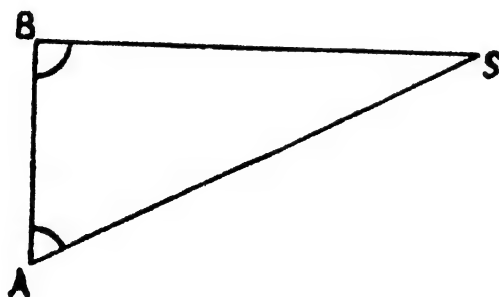
## পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব প্রায় নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটারের মত। এই ধরনের ব্যবধান আমরা কল্পনায় ঠিকমত আনতে পারি না। কারণ এই দূরত্বটা এমনই প্রকাণ্ড যে, আমাদের সাধারণ চিন্তাধারায় ওটা অসীম বলেই মনে হয়। তবে কয়েকটা সাধারণ কাল্পনিক ঘটনা দিয়ে এই দূরত্বটা উপলব্ধি করা যেতে পারে; যেমন—বর্তমানে একটি এরোপ্লেনের গতিবেগে ঘণ্টায় 500 মাইল বা 800 কি. মি.। এই গতিবেগে যদি কেউ পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে সূর্যের দিকে ছুটে যায়, তবে তার সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছতে সময় লাগবে একুশ বছর। অথবা ঘণ্টায় 5000 মাইল বেগে ছুটে-চলা কোন রকেটে চড়ে যদি ঐ পথ অতিক্রম করা হতো, তবে পৃথিবী থেকে সূর্যপৃষ্ঠে পৌঁছতে সময় লাগতো দু-বছর দু-মাস—যেখানে ঐ রকেটে চড়ে চাঁদে যেতে সময় লাগবে মাত্র দু-দিন। কামানের মুখ থেকে একটা গোলা বেরোবার সময় যে গতি লাভ করে, সেই গতিতে ক্রমাগত ছুটে গেলে সূর্যে পৌঁছতে তার সময় লাগবে নয় বছর। শব্দের গতিতে ছুটে গেলে পৃথিবী থেকে সূর্যে পৌঁছতে সময় লাগবে চৌদ্দ বছর। তবে আলোক-তরঙ্গ বা বেতার-তরঙ্গের গতিবেগ সেকেন্ডে 186000 মাইল বা 300000 কি. মি. হওয়ার আলো বা বেতার-তরঙ্গের সূর্য থেকে পৃথিবীতে আসতে সময় লাগবে মাত্র আট মিনিট। আমেরিকান জ্যোতিবিদ চার্লস ইয়্যাং পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বটা একটা চমৎকার ঘটনার সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। Helmholtz প্রমুখ বিজ্ঞানীরা পরীক্ষার সাহায্যে দেখিয়েছেন যে, দেহের কোন স্থানের অল্পভূতির স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে মস্তিষ্কের দিকে ছুটে চলবার বেগ হলো সেকেন্ডে 100 ফুট বা দিনে 1637 মাইল। সুতরাং যদি কোন স্নায়ুকের এমন একটি বিভাগ হাত থাকে, যেটি সূর্য পর্যন্ত পৌঁছতে পারে, তবে সেই হাত সূর্যে ঠেকাবার সঙ্গে সঙ্গেই পুড়ে ছাটি হয়ে যাবে। এখন ওর দেহের স্নায়ুতন্ত্র দিয়ে ঐ পুড়ে-যাওয়া হাতের জ্বালা-বন্ত্রণা আসতে সময় লাগবে দেড়-শ' বছর। কাজেই তার আগেই লোকটির মৃত্যু ঘটলে ঐ বন্ত্রণা সে আর উপলব্ধি করবে না।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব একটা মডেল থেকেও উপলব্ধি করা যেতে পারে। এই মডেলে যদি পৃথিবীটাকে ধরা যায় এক মিলিমিটার ব্যাসের একটি সর্ষের দানা, তবে সূর্যের ব্যাস হবে দশ সেন্টিমিটার ব্যাসের একটা গোলাকার বল। এই মডেলে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব হবে দশ মিটারের মত; অর্থাৎ একটা প্রকাণ্ড হল ঘরের এক কোণে থাকবে সূর্যবল্লব বলটি এবং ঘরের বিপরীত কোণে থাকবে পৃথিবীবল্লব সর্ষের দানাটি। মনে রাখতে হবে, এই মডেলে 1/4 মি. মি. ব্যাসের চাঁদ বলবে পৃথিবী অর্থাৎ সর্ষের দানা থেকে মাত্র তিন সেন্টিমিটার দূরে। আর একটা ঘটনা দিয়েও সূর্য থেকে

পৃথিবীর দূরত্ব উপলব্ধি করা যেতে পারে। যেমন কলিকাতা থেকে বোম্বাই—এই চার-শ' মাইল দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট একটি মাকড়সার জালের সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন যদি 10 গ্রাম ধরা হয়, তবে পৃথিবী থেকে চাঁদ পর্যন্ত ঐ সূক্ষ্মতম তন্তুর ওজন হবে ছয় কিলোগ্রামের মত। আর পৃথিবী থেকে সূর্য পর্যন্ত বিস্তৃত ঐ তন্তুর ওজন হবে 2.3 টন। এথেকেই বোঝা যাচ্ছে, পৃথিবী সূর্যের খুব কাছে নেই। এখন উপরের এই উদাহরণগুলি থেকে সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব মোটামুটি আন্দাজ করা যায়। কিন্তু কথা হলো, এই প্রকাণ্ড দূরত্বটা বিজ্ঞানীরা উপলব্ধি করলেন কেমন করে? কিভাবে তাঁরা জানলেন, পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নয় কোটি তিরিশ লক্ষ মাইল বা পনেরো কোটি কিলোমিটার?

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের যে বিভিন্ন পদ্ধতিগুলি অঙ্গুলরণ করা হয়, তার মধ্যে প্রথমটি হলো ভ্রমিণ পদ্ধতি। এই পদ্ধতিতে পৃথিবীপৃষ্ঠের উপর দুটি বিন্দু A



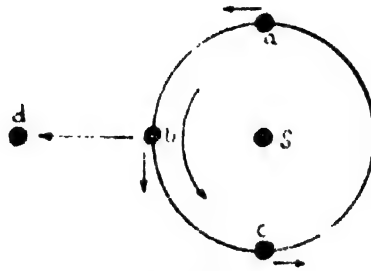
1নং চিত্র

এবং B স্থির করে AB ভূমিরেখা মনোনীত করা হয় (1নং চিত্র)। S বিন্দুতে সূর্যের অবস্থান হলে A কোণ এবং B কোণ পরিমাপ করে S কোণ নির্ণয় করা হয়। এখন যেহেতু AB ভূমিরেখার দূরত্ব জানা আছে, সেহেতু ত্রিকোণমিত্তির সাহায্যে SB এবং SA-এর দূরত্ব নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতির নিভুলতা নির্ভর করে AB ভূমিরেখার দৈর্ঘ্যের উপর। AB রেখার দৈর্ঘ্য যত বেশী হবে, সূর্যের দূরত্ব তত নিভুলভাবে পরিমাপ করা যাবে। এখন পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপের ক্ষেত্রে যদি পৃথিবীর ব্যাস (12755.9 কি. মি.) ভূমিরেখা হিসাবে ধরা হয়, তবে S কোণের মান হবে মাত্র 17'6 সেকেন্ড অর্থাৎ এক ডিগ্রীর প্রায় 1/210 ভাগ। এর অর্থকোণকে সৌর-লখন (Solar parallax) বলে। একটি দ্বিগুণ সৌর-লখন সৃষ্টি হয় এক মিটার দূরে রাখা একটি চুলের দারা। এত ছোট কোণ নিভুলভাবে পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যদি পরিমাপে 0.1 সেকেন্ড কোণের ভারতম্য ঘটে, তবে সৌর দূরত্বের ক্ষেত্রে বহু লক্ষ মাইলের পার্থক্য ঘটবে। সুতরাং এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব সঠিকভাবে নির্ণয় করা কখনও সম্ভব নয়।

এই কারণে জ্যোতির্বিদেরা বিকল্প উপায়ে সূর্যের দূরত্ব পরিমাপ করে থাকেন। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থান থেকে গুরু গ্রহের সূর্যখালাটি অতিক্রম করবার সময় নির্ণয় করা হয়।

এটা সৌর-সম্বন নির্ধারণের সহায়তা করে। কিন্তু শুক্র গ্রহের সূর্যখালা অতিক্রম করা অর্থাৎ সূর্য, শুক্র ও পৃথিবীর এক সরলরেখায় আসা একটি হ্রগত ঘটনা। শুক্র গ্রহের সূর্যখালা অতিক্রম করবার শেষ যুগ্ম বছর হলো ১৮৭৪ এবং ১৮৮২ খৃষ্টাব্দ। এরপর এই ঘটনা ঘটবে ২০০৪ খৃষ্টাব্দের ৪ই জুন এবং ২০১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই জুন। এই সময়ের ব্যবধান থেকে বোঝা যায়, এই পদ্ধতিতে সূর্যের দূরত্ব খুব ঘন ঘন যাচাই করে দেখবার উপায় নেই।

পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ণয়ের আধুনিকতম সহজ উপায় হলো স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতি (Spectroscopic method)। ২নং চিত্রে S হলো সূর্য এবং পৃথিবীর কক্ষপথে



২নং চিত্র

a, b এবং c হলো পৃথিবীর তিনটি বিভিন্ন অবস্থান। d হলো দূরবর্তী একটি নক্ষত্রের অবস্থান। এখন স্পেকট্রোস্কোপ-পদ্ধতিতে কেবলমাত্র দৃষ্টিপথের রেখা বরাবর বেগের উপাংশ পরিমাপ করা যায়। পৃথিবী যখন b স্থানে থাকে, তখন নক্ষত্রের বেগ পরিমাপ করা হয়। লক্ষ্যভাবে ক্রিয়াশীল পৃথিবীর বেগ এই অবস্থায় নক্ষত্রের বেগের কোন তারতম্য ঘটায় না। কিন্তু পৃথিবী যখন a স্থানে অবস্থান করে, তখন নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের অন্তর ফল এবং পৃথিবীর c অবস্থানে নক্ষত্রের বেগ এবং পৃথিবীর বেগের যোগফল পরিমাপ করা হয়। b অবস্থানে প্রাপ্ত নক্ষত্রের বেগ a অথবা c অবস্থানে প্রাপ্ত বেগের পার্থক্য থেকে পৃথিবীর বেগ নির্ণয় করা হয়। এই পদ্ধতিতে পাওয়া যায় কক্ষপথে পৃথিবীর ছুটে চলবার বেগ ২৯.৭ কি. মি./সে.। এক বছরে যত সেকেন্ড হয়, সেই সংখ্যা দিয়ে এই বেগ গুণ করে পৃথিবীর কক্ষপথের পরিসীমা নির্ণয় করা হয়। ঐ পরিসীমাকে  $(2 \times 3.14)$ -এর দ্বারা ভাগ করে পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্ব নির্ভুলভাবে মাপা হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত পৃথিবী থেকে সূর্যের দূরত্বের মান হলো  $(1495 \pm 2) \times 10^6$  কিলোমিটার।

গিরিজাচরণ ঘোষ

## করাতের গুঁড়া থেকে কোক

অনেক জিনিষই আমরা কাজে লাগাই না বলে ফেলে দিই বা কাজ শেষে সেগুলির কোন দাম আছে বলে মনে করি না।

এভাবে অবহেলা করে ফেলে দেওয়া অতি তুচ্ছ নগণ্য জিনিষ থেকে কিভাবে সহজে ও অল্প খরচে প্রয়োজনীয় জিনিষ তৈরি করা যায়, তা নিয়ে পৃথিবীর সব দেশের বিজ্ঞানীরাই চেষ্টা করে চলেছেন। বেশ কয়েকটি প্রয়োজনীয় জিনিষও আমরা পেয়েছি এসব গবেষণার ফলে।

সম্প্রতি সোভিয়েট বিজ্ঞানীরা এমনি এক তুচ্ছ জিনিষ—করাতের গুঁড়া (Saw dust) থেকে কোক তৈরি করে সকলকে অবাক করে দিয়েছেন। গোর্কীর সেন্ট্রাল রিসার্চ টিম্বার অ্যান্ড কেমিক্যাল ইনস্টিটিউটে এই করাতের গুঁড়া থেকে কোক তৈরি করার পরীক্ষাটি সফল হয়েছে।

সাধারণতঃ কোক তৈরি করা হয়, বায়ুদ্বন্দ্ব পাত্রে কয়লাকে অন্তর্ধূম পাতনের (Destructive distillation) দ্বারা। এই প্রক্রিয়ায় হালকা ও কালো রঙের যে কঠিন পদার্থ পাওয়া যায় তাকেই কোক বলে। কোক প্রধানতঃ ধাতুনিষ্কাশন ও রাসায়নিক কাজে ব্যবহার করা হয়।

করাতের গুঁড়া কয়েকটি জৈব পদার্থের সঙ্গে মিশিয়ে মিশ্রণটিকে সেপারেসন, ড্রাইং ও মিলিং প্রভৃতি কয়েকটি সহজ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে 500-750 কে. জি প্রতি বর্গসেন্টিমিটার চাপে রেখে দিলে তাথেকে ছোট ছোট কোকের ব্লক তৈরি হয়। এই ব্লকগুলিকে বলে ব্রিকোয়েট (Briquette)। কাঠের বাতিলকরা তরল অংশ, রাসায়নিক কারখানার বাতিল তরল পদার্থ বা তৈল, শোধনাগারের শুকনো বাতিলকরা জিনিষ জৈব পদার্থ হিসেবে রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা ব্যবহার করেছেন।

এভাবে তৈরি করা কোক কাঠকয়লা থেকে ঘনত্ব, রোধ ও প্রতি একক আয়তনে কার্বনের পরিমাণ বেশী আছে। কাঠের গুঁড়া ও কাঠের কারখানার ফেলে দেওয়া জিনিষ ও কলকারখানার বাতিল জিনিষ মিশিয়ে যে কোক তৈরি করা হয়, তার খরচ পড়ে খুবই কম, অথচ কাজের দিক থেকে তা খুবই উন্নত ধরনের।

এই প্রক্রিয়া চলবার সময় উপজাত পদার্থ হিসেবে রেজিন পাওয়া যায়। কাঠের কাজ ও অন্যান্য কাজেও এই রেজিন নামমাত্র খরচায় সালফোয়র সঙ্গে ব্যবহার করা

গেছে! যেকোনো হলো কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের একটি যৌগ। রাশিয়ার বিজ্ঞানীরা প্রমাণ করেছেন—কগাতের গুঁড়োও নগণ্য নয়, তা থেকে পাওয়া যায় কোক।

তোমাদেরও কোন জিনিষই অংগহলার চোখে দেখা উচিত নয়। কারণ বিজ্ঞানীরা এভাবেই কেলে দেওয়া জিনিষ থেকে কাজের জিনিষ তৈরি করে চলেছেন।

শ্রীঅজয় গুপ্ত

## শব্দের ব্যবহার

তোমরা হয়তো শব্দ সম্পর্কে অনেক কিছু পূর্বেই জেনেছ। শব্দের বিভিন্ন ধরনের ব্যবহার কেমন করে এবং কোথায় কোথায় হচ্ছে, এখানে সেই সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করবো। প্রথমেই শব্দের প্রতিকলনকে কি কাজে লাগাতে পারা যায়—সে সম্বন্ধে বলছি। তোমরা চোভাকুতি মেগাফোনের নাম শুনেছ এবং কেউ কেউ দেখেও থাকবে। এই মেগাফোনের সাহায্যে শব্দ খুব জোরে শোনা যায়। কিন্তু কেমন করে? বক্তা যখন যন্ত্রের ক্ষুদ্র মুখ দিয়ে কথা বলে, তখন শব্দ ঐ মেগাফোনের ভিতরকার গায়ে বারবার প্রতিকলিত হয়। ফলে তরঙ্গগুলি বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে না পড়ে একটি নির্দিষ্ট দিকে প্রবাহিত হয়। তাই নির্গত শব্দের মাত্রাও খুব জোরালো হয় এবং অনেক দূর পর্যন্ত বেশ পরিষ্কার শোনা যায়। প্রতিকলনের আরও অনেক ব্যবহার আছে। যেমন—শব্দের প্রতিধ্বনিকে কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা যায়। সমুদ্রের গভীরতা মাপবার জন্তে হাইড্রোকোন নামে শব্দগ্রাহী যন্ত্রকে জলের ভিতরে রাখা হয়। বিস্ফোরণের সাহায্যে শব্দ সৃষ্টি করে সেই শব্দকে সমুদ্রের তলদেশ থেকে প্রতিকলিত হইয়া আসতে দেওয়া হয়। হাইড্রোকোন ধ্বনি ও প্রতিধ্বনির মধ্যে সময়ের ব্যবধান স্বয়ংক্রিয় বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের সাহায্যে লিপিবদ্ধ করে। তারপর সমুদ্র-জলে শব্দের বেগ এবং সময়ের ব্যবধান হিসাব করে সমুদ্রের গভীরতা নির্ণয় করা হয়। সমুদ্র-বন্ধে জাহাজ থেকে চোরা পাহাড় বা হিমশৈলের দূরত্ব নির্ণয় করার জন্তেও প্রতিধ্বনির সাহায্য নেওয়া হয়। এই প্রতিধ্বনি যদি শব্দ সৃষ্টি করার ১০ সেকেন্ড পরে শোনা যায়, তবে বুঝতে হবে চোরা পাহাড় বা হিমশৈল জাহাজ থেকে এক মাইল দূর আছে; কেন না, শব্দ-তরঙ্গ ৫ সেকেন্ডে এক মাইল বিস্তার লাভ করে। এভাবে কামান-গর্জনের প্রতিধ্বনির অনুসরণ করে প্রথম মহামুখে জার্মেনী জাহাজের প্রকৃত অবস্থান নির্ণয় করে।

মানুষ তার কণ্ঠস্রোতের সাহায্যে কেমন করে শব্দ সৃষ্টি করে এবং কান কেমন



করে শব্দ গ্রহণ করে, এতলে তার আলোচনা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মানুষের কণ্ঠস্বর তার শ্বাসনালীর উপরের দিকে ল্যারিংস নামে একটি বিশেষ অংশ থেকে উৎপত্তি হয়। এই ল্যারিংস একটি হাড়ের খাঁচাবিশেষ। এর মধ্যে রয়েছে দুটি শক্ত ঝিল্লী, যাদের বলা হয় ভোক্যাল কর্ড। এই ভোক্যাল কর্ডের কম্পন থেকেই শব্দের উৎপত্তি হয়। শ্বাস-প্রশ্বাস যখন স্বাভাবিক থাকে, তখন কর্ড দুটির মধ্যে অনেকটা ফাঁক থাকে। ফলে শ্বাসনালীর মধ্যে বায়ু চলাচলের সময় কোন শব্দ হয় না, তবে কথা বলবার সময় কর্ড দুটি খুব কাছাকাছি চলে আসে এবং বায়ুর ধাক্কায় কাঁপতে থাকে। কথা বলবার সময় এই কম্পন থেকেই শব্দের সৃষ্টি হয়।

পৃথিবীর যাবতীয় শব্দ আমাদের কানে এসে প্রবেশ করছে আর আমরা শব্দময় জগতের বিচিত্র অমুভূতি উপলব্ধি করছি। কানের গঠন তিনটি ভাগে বিভক্ত :—(1) বহিঃভাগ—এই ভাগে আছে কানের বাইরের অংশ, যা আমরা সরাসরি দেখিতে পাই। (2) মধ্যভাগ—এই ভাগে আছে তিনটি ছোট ছোট হাড়, যথা—হ্যামার, এনভিল ও টিরাপ। (3) অন্তর্ভাগ—এই অংশে আছে কানের পর্দা, কক্লিয়া এবং অবশ্রাব্য।

এখন দেখা যাক, কেমন করে আমাদের শব্দের অমুভূতি হয়। প্রথমে শব্দ-তরঙ্গ উৎস থেকে এসে কানের নালীপথে প্রবেশ করে। তারপর নালীপথ দিয়ে পর্দায় এসে আঘাত করে। এই সময়ে মধ্যভাগের তিনটি হাড় কাজ করতে থাকে। তারা শব্দ-তরঙ্গকে কক্লিয়াতে পৌঁছে দেয়। কক্লিয়ার তরল পদার্থ তরঙ্গকে অবশ্রাব্যে নিয়ে আসে এবং সেখান থেকে মস্তিষ্কে এসে পৌঁছায়। সমস্ত প্রক্রিয়াটি অত্যন্ত দ্রুত গতিতে সম্পন্ন হয়। প্রসঙ্গতঃ বলা যায়, কান খারাপ হলে তার কম্পন-সংখ্যা অমুভূতির বিস্তার 20 থেকে 20,000 বারের অনেক কম হয়ে পড়ে। শুধু তাই নয়, শব্দের শক্তি যথেষ্ট না হলে তা ক্রটিগোচর হয় না। সুতরাং অবশ্রাব্যের একটা সীমা আছে। এই কম্পাঙ্কের নীচে বা উপরের শব্দ আমাদের কানে এসে পৌঁছলেও আমরা শুনতে পাই না। তোমরা নিশ্চয়ই জান—সেকেন্ডে 20 কম্পাঙ্কের নীচের শব্দকে বলে Infrasonic শব্দ আর সেকেন্ডে 20,000 কম্পাঙ্কের উপরের শব্দকে বলে Supersonic বা Ultrasonic শব্দ।

শব্দের আধুনিক ব্যবহারের কথা বলতে গিয়ে প্রথমেই মনে পড়ে কনোগ্রাফের কথা। কনোগ্রাফের আবিষ্কার হলেন বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক টমাস আলভা এডিসন। এডিসনের কনোগ্রাফ ছিল একটি হাতলের দ্বারা চালিত পিনসমের একটি সিলিণ্ডার। এরপর অবশ্রাব্য এডিসন আর এই বিষয়ে মনোযোগ দিতে পারেন নি। আরও উন্নত ধরনের যন্ত্র তৈরি করেন আলেকজান্ডার গ্রাহাম বেল। তাঁর যন্ত্রের নাম হলো গ্র্যামোফোন। এই যন্ত্রে তিনি হাতলের বদলে ঘড়ির কল ব্যবহার করেন। বেল ও তাঁর সহকর্মীরা পাভ্‌লা কাগজের সিলিণ্ডারের উপর মোমের পাভ্‌লা মিশ্রণ ব্যবহার করেছিলেন। এর পর এই যন্ত্রের আরও উন্নতিসাধন করেন একজন জার্মান বিজ্ঞানী

এমিল বারলিনার। তিনি আমাদের পাণ্ডে কণ্ঠধরের রেকর্ড গ্রহণ করা নিয়ে অনেক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেন। আজ আমরা যে ধরনের রেকর্ড বাজাই—তিনি অবশেষে সেই যন্ত্রের উদ্ভাবন করেন ১৮৮৭ সালে এবং তার নামও রাখা হয় গ্রামোফোন। এরপর অবশ্য এই যন্ত্রের আরও উন্নতি সাধিত হয় এবং আজ বিদ্যৎ-শক্তিতে চালিত গ্রামোফোন যন্ত্র, যাকে বলা হয় রেকর্ড প্লেয়ার, তার সাহায্যে আরও সুন্দর এবং বর্ধিত মাত্রার রেকর্ডের কথা ও গান আমরা শুনি।

শব্দ ধরে রাখবার ক্ষেত্রে নানারকম পদ্ধতি আছে। এটা নির্ভর করে, সেই শব্দকে কি কাজে লাগানো হচ্ছে, তার উপর। যদি গ্রামোফোন বা রেকর্ড প্লেয়ারে এই শব্দ শুনতে ইচ্ছা করি, তবে ডিস্ক রেকর্ডে সেই শব্দকে ধরে রাখতে হবে। এই ধরনের রেকর্ডিং-এ আছে মাইক্রোফোন, অ্যাম্প্লিকায়ার ও কাটার। কাটারে আছে কাটিং নিডল বা ষ্টাইলাস। শব্দ-তরঙ্গের সমান তালে এই ষ্টাইলাসটি কাঁপতে থাকে। কলে একটি নরম মোমের চাক্তির উপর ভাঁজে ভাঁজে দাগ পড়ে। এটি হলো মূল রেকর্ড। এথেকে যে হাঁচ তৈরি হয়, সেই হাঁচকে কাজে লাগিয়ে thermoplastic চাক্তির উপর আধুনিক রেকর্ড সৃষ্টি হয়।

এই ডিস্ক রেকর্ড হাড়াও বর্তমানে টেপ রেকর্ডার নামে একটি যন্ত্রের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। এই যন্ত্রটিতে আছে একটি ফিতা, যার উপর প্রকৃত রেকর্ডিং হয় আর বাকী অংশটুকু ডিস্ক রেকর্ডিংয়ের অনুরূপ। এই ফিতাটি চুম্বকের দ্বারা প্রভাবিত হয় এরূপ বলের দ্বারা তৈরী। এর একটি দিক ফেরিক অক্সাইডের ফটিক দিয়ে আচ্ছাদিত থাকে। এই ফটিকগুলির প্রত্যেকটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চুম্বকের কাজ করে এবং তাদের প্রত্যেকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু থাকে। এই ফটিকগুলির বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এই যে, তারা তাদের চুম্বকত্বকে অনিদিষ্ট কালের জন্তে ধরে রাখতে পারে। যখন রেকর্ড করা হয় তখন মাইক্রোফোন শব্দ-তরঙ্গকে বিদ্যৎ-তরঙ্গে পরিণত করে এবং একটি ইতস্ততঃ পরিবর্তনশীল বিদ্যৎ-প্রবাহের সৃষ্টি করে। অ্যাম্প্লিকায়ার সেই তরঙ্গকে শক্তিশালী করে এবং তারপর রেকর্ডিং হেডে তা প্রবাহিত হয়। এই রেকর্ডিং হেডের অনুরূপ আর একটি play-back head আছে, যার মধ্য দিয়ে টেপটি চালালে আমরা আবার সেই শব্দ লাইভ স্পীকারে শুনতে পাই। উপরিউক্ত হেড দুটির মত আর একটি অংশ আছে, তাকে বলে ইরেজিং হেড। প্রকৃতপক্ষে রেকর্ডিংয়ের সময় ইরেজিং এবং রেকর্ডিং হেড একই সঙ্গে কাজ করে। মনে রাখা প্রয়োজন, ইরেজিং হেডের বিদ্যৎ-প্রবাহ প্রতি সেকেন্ডে ৫০,০০০ বার হওয়া বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে একটি বিশেষ অসিলেটরের ব্যবস্থা রাখা হয়। ডেনমার্কের ভানডেমার পলসন ১৯০০ খ্রষ্টাব্দে এটা আবিষ্কার করেন।

সবাক চলচ্চিত্রে যে শব্দ শুনতে পাই, তা অনেকটা কনোগ্রাফ ও বেতারের যোগকল অ্যাম্প্লিকায়ারে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের স্পন্দন একটি আলোকশিখাকে এপাশে ওপাশে নড়াতে

সাহায্য করে। শব্দ জোর হলে আলোর এই টিউবটি উজ্জ্বল হয়ে জ্বলবে এবং কম হলে এর উজ্জ্বলতা কমবে। এভাবে শব্দ প্রথমে বৈজ্ঞানিক স্পন্দনে এবং পরে আলোক-স্পন্দনে পরিবর্তিত হয়। ফলে কিল্লের উপর একটি রেখার সৃষ্টি হয়। এই রেখাটি সর্বত্র সমান ঘন হয় না। এটা নির্ভর করে শব্দ জোর বা আন্তে হবার উপর।

শব্দের ক্ষেত্রে আর একটি আধুনিক বাস্তব ব্যবহারকে বলে টিরিয়োকোনিক ব্যবস্থা। এর উদ্ভাবন হয় 1958 সালে। এর ফলে সমবেত মিউজিকে বিভিন্ন বাস্তবস্থের সুর ধরের বিভিন্ন অংশ থেকে আসছে বলে মনে হয়। প্রেক্ষাগৃহে দর্শকের মনে এই বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়—যেন সে ছবির ঘটনাস্থলেই রয়েছে। এই রেকর্ডে একই খাঁজের দুটি খাতে আলাদা দুটি রেকর্ডিং করা হয়—একটি তলায় আর একটি পাশে। টিরিয়োকোনিক নিডল্ দুটি রেকর্ডিংকেই গ্রহণ করে স্পীকারে তা পুনরুৎপাদন করে।

আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে এমনভাবে শব্দ নিয়ন্ত্রণের বন্দোবস্ত থাকে যেন বক্তা বা গায়কের কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হয়ে শ্রোতার কানে না পৌঁছায়। শব্দ-বিজ্ঞানের এই শাখার পথিকৃৎ হলেন ইউ. এস. এ-র হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থ-বিজ্ঞানের অধ্যাপক ডার্লিউ. সি. স্যাবাইন। বিশাল প্রেক্ষাগৃহে শব্দ নিয়ন্ত্রণের যদি কোন সুবন্দোবস্ত না থাকে, তবে প্রতিধ্বনির ফলে শ্রোতা কিছুই ভালভাবে বুঝতে পারে না, সবই গোলমালে পরিণত হয়। এই অনুবিধা দূর করবার উদ্দেশ্যে প্রেক্ষাগৃহের দেয়াল এবং ছাদ বিশেষ উপাদান দিয়ে তৈরি করা হয় ও জানলা, দেয়ালগুলি তাদিয়ে এমনভাবে আচ্ছাদিত থাকে যে, শব্দকে সহজে শুধে নিতে পারে। তাছাড়া চেয়ারের পদি ও শ্রোতাদের গায়ের পোষাকও শব্দ-তরঙ্গের শোষক হিসাবে অনেকটা কাজ দেয়। তবে প্রতিটি শ্রোতা যাতে নিজের আসনে বসে সুস্পষ্টভাবে শুনেতে পার, সে জগ্রে আবার শব্দের যথাযথ প্রতিফলন হওয়াও প্রয়োজন। এজগ্রে প্রেক্ষাগৃহের ছাদ একটু বাঁকানো ও উঁচু করা হয় এবং শব্দের সৃষ্টি বস্তুনের জগ্রে নানানকম বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা রাখা হয়। মাঝে মাঝে দেয়ালে নানা ধরনের প্রতিফলক লাগিয়েও শব্দের প্রতিফলনের বন্দোবস্ত করা হয়ে থাকে।

শব্দের ব্যবহারকে আরও উন্নত ও আধুনিক করার জগ্রে দেশ-বিদেশে এখন গবেষণা চলছে। সুতরাং এই বিষয়টি সম্পর্কে আরও বেশী তথ্য পরে জানা যাবে আশা করা যায়।

ত্রিবিধমাথ বড়াল\*

\*পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, চন্দ্রনগর কলেজ, চন্দ্রনগর।

## উদ্ভিদের দান

তোমরা জান যে, ভূগর্ভ থেকেই মানুষ নানারকম খনিজ পদার্থ আহরণ করে আনে। কোনও জায়গায় মাটির তলায় খনিজ পদার্থ সঞ্চিত আছে কিনা, তা নানারকম ভাবে পরীক্ষা করে দেখা হয়। এক্ষেত্রে নানারকম যন্ত্রপাতি ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আজকাল এরোপ্লেন বা হেলিকপ্টারের সাহায্যেও এরকম জরীপের কাজ করা হচ্ছে।

এত সব পরীক্ষার পরেও কিন্তু মানুষ কাজ আরম্ভ করে অনেক সময় হয়তো কিছুই পায় না। একটা উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটা বলা চলতে পারে। অনেকের বাড়ীতে মল-কূপ বসাবার কাজ শুরু করে হয়তো কয়েক শ' ফুট পাইপ বসিয়েও ভাল জল পাওয়া গেল না।

তেমনি মাটির নীচে শিলাস্তরের কোনও ভাঁজে খনিজ তেল আছে মনে করে ডেরিক বা কাঠামো বসিয়ে ড্রিলিং পদ্ধতিতে মলকূপ বসিয়েও অনেক সময় হয়তো কিছুই পাওয়া যায় না।

অবশ্য এই পদ্ধতি বাড়ীর জলের মলকূপ বসাবার তুলনার অনেক খাটুনির এবং এতে অনেক টাকাও লাগে। অনেক সময় তেল ভোলবার জন্তে এই কাজেই 25-30 হাজার ফুট গভীর মলকূপ বসাবার দরকার হয়ে পড়ে আর তাতে 30-35 লক্ষ টাকা খরচও হয়ে যায়।

সে জন্তে বৈজ্ঞানিকেরা অনেকদিন থেকেই চিন্তা করছিলেন এমন কোনও উপায় বের করতে—যাতে খুব সহজেই তেল এবং অন্যান্য খনিজ পদার্থের সন্ধান করে এই সমস্তার সমাধান করা যেতে পারে।

এই প্রসঙ্গে আমেরিকার রকওয়েল কর্পোরেশনের রকেটডাইন ডিভিশনের (ক্যানোপা পার্ক, ক্যালিফোর্নিয়া) বৈজ্ঞানিকদের প্রচেষ্টার কথা উল্লেখ করতে হয়। এখানকার বিজ্ঞানীরা উদ্ভিদ-জীবন এবং খনিজ পদার্থের আকরের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে বলে মনে করেছিলেন।

তাদের গবেষণার ফল থেকে তাঁরা এই আশা প্রকাশ করেছিলেন যে, এর ফলে ভূগর্ভস্থ খনিজ পদার্থের অবস্থান সঠিকভাবে নির্ণয় করা সম্ভব হতে পারে।

এখানকার অন্ততম প্রধান কর্মকর্তা ডক্টর আর. জে. টমসন একবার এসবকে বলেছিলেন যে, খনিজ পদার্থ উদ্ভিদের ক্ষেত্রে বাহ্যিক পরিবর্তন ঘটিয়ে থাকে; যেমন—পাতার রং হলুদ হয়ে যায়, বৃদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় বা অতিরিক্ত বৃদ্ধি হয়ে থাকে। কোনও কোন উদ্ভিদের মূল ভূগর্ভের 70 ফুট নীচ পর্যন্ত খনিজ পদার্থের অবস্থানের সন্ধান দিতে পারে।

ভাড়াও দেখা গেছে যে, কয়েক রকম বিশেষ ধরণের উদ্ভিদের অবস্থানকে সূচক হিসাবে ব্যবহার করে ইউরেনিয়াম, দস্তা এবং সোনার আকরের সন্ধান পাওয়া সম্ভব।

ডক্টর টমসন এই প্রসঙ্গে আরও জানিয়েছিলেন যে, অনেক উদ্ভিদের কাণ্ড এবং পত্রপুষ্পে বেশ কিছু পরিমাণে ইউরেনিয়াম, দস্তা ও তামা প্রভৃতি ভারী ধাতু থাকে। এই সব উদ্ভিদের কাণ্ড বা পত্রপুষ্প সেখানকার মাটিতে খনিজ পদার্থের অবস্থান সহজেই বের করতে সাহায্য করে। এই পদ্ধতি যে ড্রিলিং করে খনিজ পদার্থের অবস্থান নির্ণয় করার চেয়ে অনেক বেশী কার্যকর, এ কথা সবাই স্বীকার করে নিয়েছেন। এই পদ্ধতির সার্বিক প্রয়োগের এক চাকল্যকর খবর পাওয়া গিয়েছিল সোভিয়েট রাশিয়ার উল্বেকিস্তান আর তাজিকিস্তান থেকে।

সেখানকার বিজ্ঞানীরা মধ্য-এশিয়ার একটি স্বর্ণখনি অঞ্চলে পরীক্ষা চালিয়েছিলেন। ঐ পরীক্ষা থেকে তাঁরা দেখেছিলেন যে, ঐ অঞ্চলের উদ্ভিদের গড়ে প্রতি টন সবুজ অংশে দুই গ্রাম পরিমাণ সোনা থাকে। আবার কোনও কোন উদ্ভিদের প্রতি টন সবুজ অংশে এগারো গ্রাম সোনাও পাওয়া গেছে। বেশীর ভাগ সোনাই তাঁরা পেয়েছিলেন উদ্ভিদের পাতা থেকে।

উদ্ভিদের পাতা পরীক্ষা করে যদি সোনা পাওয়া যায়, তাহলে সহজেই বোঝা যাবে যে, সেখানে মাটির নীচে সোনার খনি আছে, কেন না, উদ্ভিদ মাটির তলা থেকে যে খনিজ পদার্থ আহরণ করে এনেছিল, তা তার দেহেই সঞ্চিত করে রেখে দিয়েছে।

ঐচুনীলাল রায়

## দূরবীনের জন্মকথা

কাচ জিনিষটি যে মানুষ কবে কোথায় প্রথম তৈরি করেছিল, তার কোন সঠিক ইতিহাস আজ আর মানুষের দপ্তরে নেই। ওটি একটি বহু প্রাচীন আবিষ্কার, যা প্রায় মানুষের সমস্ত জীবনকে এসেছে তার সভ্যতার সূত্র থেকে। ইতিহাসে এমন সংবাদ আছে যে, রোমের সম্রাট নিরো তাঁর অ্যাম্পিথিয়েটারে বসে এক খণ্ড স্নবহং গোল কাচের ভিতর দিয়ে গ্যাডিয়েটরদের খেলা দেখতেন, কারণ তিনি চোখে একটু কম দেখতেন। এটি ছিল নিশ্চয়ই ম্যাগ্নিফাইং গ্লাস বা আতল কাচ। নিরো ছিলেন খ্রীষ্টের সমসাময়িক।

চশমার উদ্ভাবন করেন ভিনিশীয়রা। ভিনিশ ইটালীর একটি শহর, যা ছিল এক সময় কাচের কাজের জন্যে প্রসিদ্ধ, তা প্রায় খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতাব্দীর কথা।

এই চশমার নাম ছিল তখন ভিনিশীয় কল বা Venician device, সেখান থেকেই তা হাড়িরে পড়ে সারা ইউরোপে।

সেটা খৃষ্টীয় পঞ্চদশ শতাব্দী—ইতালীর মিডলসবার্গ সহরে লিপারহেইম নামে এক চশমার কাচ প্রস্তুতকারী ছিলেন। একদিন তাঁর ছেলেরা খেলছিল বাবার তৈরী কেল-দেওয়া কিছু চশমার লেন নিয়ে। এমন সময়ে একটি ছেলে ছুটি লেন একটু আগে-পিছে করে চোখের সামনে ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখে—তাদের কারখানা থেকে বেশ কিছুটা দূরের গির্জার চূড়ার ওয়েদার-ককটি যে কেবল উন্টোই দেখা যাচ্ছে তা নয়, সেটিকে বেশ বড়, পরিষ্কার এবং অনেক কাছেও দেখা যাচ্ছে। তাড়াতাড়ি ছেলেরা তাদের বাবাকে এই ব্যাপারটা ডেকে দেখায়। দেখে তিনি আর একটু এগুলেন, অর্থাৎ একটি লেনকে একটি বোর্ডের পায়ে এঁটে আর একটি লেনকে আগু-পিছু করে এমন ব্যবস্থা করলেন, যাতে সবটাই খুব পরিষ্কার দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যবস্থায় লেন দুটিকে তিনি ঠিক কোকাল করতে সক্ষম হলেন। দূরবীন যন্ত্র উদ্ভাবনের মূলে এই হলো এক কাহিনী।

আর এক কাহিনী—জেমস্ মিটিয়াস নামে এক ব্যক্তি, সেও ডাচ দেশীয়—এক দিন লেন নাড়াচাড়া করতে করতে একটি অবতল (Concave) ও একটি উত্তল (Convex) লেন একটু আগু-পিছু ধরে তার ভিতর দিয়ে দেখতে গিয়ে দেখলেন—দূরের বস্তুকে বেশ কাছে এবং পরিষ্কার ও বড় দেখা যাচ্ছে। কিন্তু এবার আর উন্টো নয়, সোজাই দেখা যাচ্ছে তাকে। এটি দ্বিতীয় কাহিনী।

আবার এও বলা হয় যে, জেনসন নামে এক ডাচ দেশীয় চশমার কাচ নির্মাণকারী ছুটি লেনকে একটি চোঙের এমুখে আর ওমুখে লাগিয়ে দেখতে গিয়ে অমনি দূরের বস্তুকে কাছে, বড় এবং পরিষ্কার দেখতে পান। তখন তিনি তাঁর এই যন্ত্র নিয়ে দেখান অরেঞ্জের রাজা মরিসকে। মরিস তখন যুদ্ধে ব্যাপৃত ছিলেন ফ্রান্সের সঙ্গে। তিনি নিজে ছিলেন একজন দক্ষ বোদ্ধা। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হন যুদ্ধে এই যন্ত্রের উপযোগিতা। তাই তিনি জেনসনকে ফরমাস করেন তাঁকে একটি বড় আর ভাল করে এই যন্ত্র তৈরি করে দিতে আর কথাটি সম্পূর্ণ গোপন রাখতে।

কিন্তু এমন একটি ব্যাপার কি কখনো গোপন থাকে! কয়েক দিনের মধ্যেই অনেক লোকই এই যন্ত্র তৈরি করে লোকের কাছে বেচতে লাগলো। তার ভিতরে পূর্বো-ল্লিখিত লিপারহেইমও একজন।

এই আবিষ্কারের সংবাদ লোকমুখে ক্রিড়ে ক্রিড়ে হাজির হলো ভিনিস নগরে প্রখ্যাত জ্যোতির্বিদ গ্যালিলিওর কাছে। এই বিষয়ে তিনি বলেছেন—

“মাস দশেক আগে আমার কাছে এমন এক সংবাদ পৌঁছায় যে, কে এক ডাচ ভ্রমলোক দূরের বিনিস কাছে দেখবার একটি যন্ত্র নির্মাণ করেছেন। কেউ কেউ কথাটা

বিশ্বাস করেন, কেউ কেউ করেন না। কাজেই আমিও তখন খুব একটা লাম দিই নি। কিন্তু কিছুদিন বাদে ফ্রান্স থেকে আমার এক বন্ধুর চিঠিতে এই ব্যাপার সত্য বলে জানতে পারলাম। তখন আমি এই যন্ত্রটি কিস্তাবে তৈরি করতে হয়, তার খবর সংগ্রহ করতে থাকি নিজে একটি তৈরি করবো বলে। কিছুদিন বাদে আমি একটি সীসার নলের দুদিকে দুটি লেন্স (অবতল ও উত্তল) সংযোগ করে একটি টেলিস্কোপ তৈরি করতে সক্ষম হই। এই যন্ত্র চোখে লাগিয়ে আমি সত্যিই দূরের বস্তু কাছে এবং বড় আর পরিষ্কার দেখতে পাই। আমার প্রথম যন্ত্রে বস্তুকে তিন গুণ কাছে এবং নয় গুণ বড় দেখতে পেয়েছিলাম। তার পরেই আমি তেমনি আর একটা যন্ত্র তৈরি করি, যাতে দশ গুণ বড় বাট গুণ বড় দেখায়। তারপর আরও একটি যন্ত্র নির্মাণে সক্ষম হই, যাতে বস্তুটিকে হাজার গুণ বড় দেখায় আর দেখা যায় প্রায় ত্রিশ গুণ কাছে।

আমার এই যন্ত্র তৈরির সংবাদ যখন ছড়িয়ে পড়লো, দেশের রাজা দিগ্‌নর আমাকে এই যন্ত্রটি দেখাবার জন্তে ডেকে পাঠালেন। আমি তা রাজাকে দেখাই। বহু লোক, বহু বুদ্ধ ব্যক্তিও এই জিনিষে চোখ লাগিয়ে দেখবার জন্তে চার্চের ছাদে ওঠেন। তাঁদের আমি সমুদ্রে একটি জাহাজ দেখাই, যেটা খালি চোখে দেখতে আরও দু-ঘণ্টা সময়ের প্রয়োজন হয়েছিল। আমার যন্ত্রের ক্ষমতা ছিল কোন বস্তুকে ত্রিশ গুণ কাছে দেখাবার।”

গ্যালিলিও ডিনিসের সেনেটকে এই একটি যন্ত্র উপহার দেন এবং তা তৈরি করবার পদ্ধতিও লিখে দেন সঙ্গে সঙ্গে। এই ব্যাপারের পর গ্যালিলিওর মাইনে বাড়িয়ে দেওয়া হয় তিন গুণ।

তারপর লোক এই মজা দেখবার জন্তে—(মানুষের কাছে তা একটা মজা বলেই মনে হয়েছিল তখন) প্রতিদিন অসংখ্য লোক আসতে লাগলো গ্যালিলিওর কাছে। এখন এই যন্ত্রকে তিনি লাগালেন আকাশ দেখবার কাজে, যেখানে ছিল তাঁর প্রধান আগ্রহ আর যা ছিল তাঁর প্রথম কাজ। প্রথমেই তাকালেন চাঁদের দিকে। এই প্রথম মানুষ টের পেল চাঁদে আছে পাহাড়-পর্বত-প্রান্তর। কিছুদিনের মধ্যেই তিনি আকাশে অনেক নতুন তারা দেখতে সক্ষম হন। বৃহস্পতির চাঁদগুলিকেও চারদিকে তিনি দেখতে সক্ষম হয়েছিলেন। চাঁদগুলিকে বৃহস্পতির চারদিকে ঘুরতে দেখেই তিনি স্থির করেন যে, পৃথিবীর চাঁদও পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে। তারপর তিনি গ্রহগুলির ঘোরা-ফেরা দেখে স্থির করেন যে, পৃথিবীও একটি গ্রহ এবং এই সবগুলি গ্রহই ঘোরে সূর্যের চারদিকে।

এই দূরবীক্ষণ যন্ত্র উদ্ভাবিত হয়েছিল ঐ ডাচ দেশীয় লোকদের দ্বারাই। গ্যালিলিও তাকে প্রথম উন্নততর করে লাগান আকাশ দেখবার কাজে। তাই দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের সম্মানটা তাঁকেই দেওয়া হয়। তিনি এই যন্ত্রের বহু উন্নতি সাধন করেন এবং তার প্রধান কাজে ব্যবহার করেন। কিন্তু এর আবিষ্কারকের মর্যাদা তাঁর প্রাপ্য নয়, ডাচ দেশের চশমার কাচ প্রস্তুতকারীদের সেই মর্যাদা প্রাপ্য।



## পাই-এর উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস

বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে পাই ( $\pi$ ) বহুদিন থেকেই সুপরিচিত। অঙ্ক করতে গেলে অনেক জায়গায়ই  $\pi$ -এর প্রয়োজন হয়। আগে  $\pi$ -এর সংজ্ঞাটা বলে দিই।  $\pi$  আর কিছুই নয়—কোন বৃত্তের পরিধি এবং ব্যাসের অনুপাতকে পাই-এর দ্বারা সূচিত করা হয়। অঙ্কের বিভিন্ন বিষয়কে একটু খুঁটিয়ে দেখলেই বোঝা যায়, পাই-এর গুরুত্ব কতখানি।

পাই এমনই একটা সংখ্যা, যার মান  $3.1415926\ldots$ । আশ্চর্যের বিষয়, দশ-মিকের পর ছয়টা সংখ্যা বসিয়েও  $\pi$ -এর মান সম্পূর্ণ হয় না, কারণ পাই একটা অমেষ (Incommensurable) রাশি। বহু দিন ধরে পাই-এর সঠিক মান সম্পর্কে জল্পনা-কল্পনা চলছিল গণিতজ্ঞ মহলে। 1761 সালে Lambert-ই প্রথম প্রমাণ করে দিলেন  $\pi$ -এর উপরিউক্ত মান। এর কিছুদিন পরে 1803 সালে Legendre দেখালেন—পাই-এর বর্গ অর্থাৎ  $\pi^2$ ও একটা অমেষ রাশি। চেষ্টার অন্ত নেই বিজ্ঞানী মহলেও। বেশ কয়েক বছর কেটে গেল। এর পর 1882 সালে Lindemann প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই কখনও মূলদ সংখ্যার (Rational number) বীজ (Root) হতে পারে না।

এই পাই-এর আবিষ্কারক হলেন উইলিয়াম জোন্স। তিনিই প্রথম এই গ্রীক বর্ণ (Letter) পাই-এর প্রয়োগ করেন অঙ্কশাস্ত্রে। এ নিয়ে দ্বন্দ্বও চলেছিল কম নয়। Bernoulli আবার  $\pi$  এর পরিবর্তে  $c$  ব্যবহার করেন। এরপর Euler কিন্তু  $p$  এবং  $c$  এই দুটিরই প্রয়োগ করলেন। Goldback আবার উইলিয়াম জোন্সের পক্ষ সমর্থন করেন। তিনি তাঁর ছাত্রদের  $\pi$  ব্যবহার করতে পরামর্শ দেন। শেষ পর্যন্ত দ্বন্দ্ব-কোলাহলের মধ্যে দিয়ে  $\pi$ -এরই জয় হলো। Euler-এর 'Book On Analysis' বইতে  $\pi$ -এর ব্যবহার হয়। তারপর থেকে আনয়ী  $\pi$  ব্যবহার করে আসছি।

$\pi$ -এর উৎপত্তি কি করে হয় আর কি করেই বা  $\pi$ -এর মান ঠিক করা হয়েছিল, এই বিষয়ে সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে দুটি পদ্ধতি অনুসৃত হয়। প্রথম শতাব্দী পর্যন্ত যে পদ্ধতি অনুসৃত হয়েছিল, সেটা হচ্ছে জ্যামিতিক পদ্ধতি। এই পদ্ধতি একটা বৃত্তের ভিতরে এবং বাইরে একটা সুষম বহুভুজ (Regular polygon) আঁকি তার সীমা বের করা হয়। এই সীমা বের করবার সময় ধরে নেওয়া হয় যে, বৃত্তের পরিধি বৃত্তের ভিতরের ও বাইরের বহুভুজের সীমার মধ্যবর্তী। তবে এই পদ্ধতি একেবারে বর্ধার্থ নয়। বর্তমানে অবশ্য এই পদ্ধতি অনুসৃত হয় না।

অঙ্কশাস্ত্রের বিবর্তনের ইতিহাস এক বিরাট মহাকাব্যের মতই। বিভিন্ন সময়ে পাই-এর বিভিন্ন মান ব্যবহৃত হয়েছে। মিশরের লোকেরা পাই-এর মান বের করেছিল



$\frac{1}{\pi} = 3.1605$ । ব্যাবিলনীয়েরা আবার পাই-এর মান 3 ধরে হিসাব করতো। বিশিষ্ট অঙ্কশাস্ত্রবিৎ ইউক্লিডের নাম সবার কাছেই পরিচিত। ইউক্লিড প্রমাণ করে দেখালেন যে, পাই-এর মান  $\frac{22}{7}$ -এর কম, কিন্তু  $\frac{22}{7}$ -এর বেশী অর্থাৎ 3.1408 এবং 3.1428-এর মধ্যেই পাই-এর মান বর্তমান। তিনি জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন। 96 বাহুবিশিষ্ট একটা বহুভুজের (Polygon) সাহায্যে তিনি তাঁর মত ব্যক্ত করেন। ত্রিকোণ-মিতিতে আমরা দেখেছি  $\tan\theta > \theta > \sin\theta$  যেখানে  $\theta = \frac{\pi}{n}$ । ইউক্লিডের পরে এলেন আর্কিমিডিস। পাই-এর মান বের করতে গিয়ে নানারকম বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হলেন তিনি। কারণ আর্কিমিডিস যে সময়ের লোক, আজকালকার মত তখন প্লাইড রুল বা লগ্ টেবিলের আবিষ্কার হয় নি। তখন বড় বড় যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ কবে কবে বের করতে হতো। আর্কিমিডিসের চেষ্টা চলেছিল বেশ কয়েক বছর ধরে। এরপর এলেন টলেমি। তাঁর মতে, পাই-এর মান  $3.830^\circ$  (অর্থাৎ  $3 + \frac{8}{10} + \frac{30}{1000} = 3.1416$ )। তখনকার ইঞ্জিনিয়ারেরা নিজেদের কাজের সুবিধার জন্তে পাই-এর মান 3.78 ধরে নিয়ে হিসাব করতেন।

যে সময়ের কথা বলছি, তখন ভারতবর্ষেও অঙ্কশাস্ত্রের উপর নানারকম গবেষণা চলছিল। বৌদায়ন, আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত, ভাস্কর প্রভৃতি ভারতীয় অঙ্কশাস্ত্রবিদদের নাম তখন বিভিন্ন দেশের লোকমুখে উচ্চারিত হতো। শুনে অবাক হতে হয়, তখনকার দিনে রোম, গ্রীস, ভারতবর্ষের মধ্যে যাতায়াতের অনুবিধা থাকা সত্ত্বেও গণিতবিদদের পারস্পরিক বৈঠকের ব্যবস্থা ছিল। বৌদায়ন বললেন, পাই-এর মান  $\frac{1}{\pi}$  আর আর্যভট্টের মতে 3.1416। আর্যভট্ট 384 বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ নিয়ে তাঁর মতের সত্যাসত্য প্রমাণ করেন। তিনি একটা করমূল্য বের করলেন। সেটি হলো  $b^2 = 2 - (4 - a^2)^{\frac{1}{2}}$ , যেখানে  $a$  = বৃত্তস্থ সুষম বহুভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য,  $n$  = বহুভুজের বাহুসংখ্যা,  $b = 2n$  বাহুবিশিষ্ট ঐ একই বৃত্তস্থ বহুভুজের এক বাহুর দৈর্ঘ্য। আর্যভট্ট তাঁর গণিতপাদ বইতে সংস্কৃত শ্লোকের মাধ্যমে পাই-এর মান বিবৃত করেছেন। আবার Alkarishma তাঁর বীজগণিতের বইতে আর্যভট্ট প্রদত্ত পাই-এর মান অক্ষরে অক্ষরে অনুসরণ করেছেন। তিনি অবশ্য মাঝে মাঝে  $\frac{1}{\pi}$  অনুপাতের সাহায্যেও পাই-এর মান বের করেছেন। ব্রহ্মগুপ্ত আবার বললেন  $\pi = \sqrt{10}$ । তিনি পাই-এর মান অবশ্য জ্যামিতিক পদ্ধতিতে বের করেছেন। তাঁর মতে, কখনও কখনও  $\frac{1}{\pi}$ -এর অনুপাত থেকে পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। আরব দেশের গণিতজ্ঞেরা  $\frac{1}{\pi}$ ,  $\sqrt{10}$ ,  $\frac{1}{\pi}$  থেকে পাই-এর মান নির্ণয় করেন। শুধু আরব কেন, পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্তে চীনাদের অবদানও অসামান্য। পঞ্চম শতাব্দীতে Tsu. Chung Chih প্রমাণ করেন যে, পাই-এর মান 3.1415926 এবং 3.1415927-এর মধ্যে থাকবে। তখনকার দিনে তাঁর সময়ে হয় দশমিক স্থান পর্যন্ত এটাই ছিল বিস্তৃত মান। তিনি  $\frac{1}{\pi}$  অনুপাত থেকে পাই-এর হয় দশমিক স্থান পর্যন্ত

মান বের করেছেন। এটা নেহাৎই একটা হঠাৎ আবিষ্কার। পরে অবশ্য এটাই প্রমাণিত হয় যে, পাই-এর মান  $\frac{22}{7}$  এবং  $\frac{355}{113}$ -এর মধ্যে। এর পর ত্রয়োদশ ও পঞ্চদশ শতাব্দীতে পাই-এর মান বের করার জন্যে বিভিন্ন পদ্ধতি আবিষ্কৃত হয়। কিন্তু পঞ্চদশ শতাব্দীর এই চীনা গণিতজ্ঞের মত আর কেউ হয় দশমিক স্থান পর্যন্ত সঠিক মান বের করতে পারেন নি। প্রখ্যাত গণিতজ্ঞ ভিরেটা ১৫৭৯ সালে নয় দশমিক স্থান পর্যন্ত পাই-এর মান বের করেন। তিনি  $6 \times 2^{10}$  বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ একে পাই-এর মান বের করেছিলেন। তখন থেকে গণিতজ্ঞ মহলে সাড়া পড়ে যায় পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত মান বের করার জন্যে। Romanus আবার  $2^{10}$  বাহুবিশিষ্ট বহুভুজ একে পনেরো দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করেন। এর পর L. Van Ceulen বের করেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করার পর তিনি এতই উল্লসিত হয়েছিলেন যে, মৃত্যুর কিছুদিন আগে তিনি নিজের কটোর চারদিকে একটা বৃত্ত একে পাই-এর মান লিখে রেখেছিলেন কুড়ি দশমিক পর্যন্ত। তাঁর মৃত্যুর পর বিভিন্ন স্মৃতিস্তম্ভেও পাই-এর মানটা খোদাই করে লিখে দিয়েছিল দেশবাসী। L. Van Ceulen-এর পর Greinberger বের করলেন ৩৯ দশমিক পর্যন্ত মান। তিনিই শেষ গণিতবিদ, যিনি পাই-এর মান বের করার জন্যে জ্যামিতিক পদ্ধতি অবলম্বন করেছিলেন।

এখানেই শেষ নয়। ১৬৫৬ সালের পর থেকে পাই-এর মান নির্ণয়ের জন্যে বিশেষ সহায়ক হয় Convergent Series। ত্রিকোণমিতিতে আমরা দেখেছি,

$$\theta = \tan \theta - \frac{\tan^3 \theta}{3} + \frac{\tan^5 \theta}{5} \dots \dots \text{যেখানে } \theta\text{-র মান } -\frac{\pi}{4} \text{ এবং } +\frac{\pi}{4} \text{ এর মধ্যে। এই}$$

Series এর সাহায্যে একান্তর দশমিক পর্যন্ত পাই-এর যথার্থ মান বের করা যেতে পারে। কিছুদিন যেতে না যেতেই Machin আবার এক নতুন Series-এর সাহায্যে পাই-এর একশততম পর্যন্ত মান বের করেন। Machin-এর পর De Lagny বের করেন ১২৭-তম পর্যন্ত মান। এরপর গণিতজ্ঞদের মধ্যে হিড়িক পড়ে যায় ১২৭-এরও বেশী দশমিক স্থান পর্যন্ত মান বের করার জন্যে। আশ্চর্যের বিষয়, ৫২৭ দশমিক পর্যন্ত ১৮৫৩-টি মান নির্ণীত হয়েছে তখনকার দিনে। আজকাল অবশ্য কম্পিউটার আবিষ্কৃত হবার পর ৫২৭ কেন, আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত পাই-এর মান বের করা যেতে পারে। চেষ্টার বিরাম নেই, আজও পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের গণিতজ্ঞেরা পাই-এর আরও বেশী দশমিক পর্যন্ত সঠিক মান বের করার জন্যে উঠেপড়ে লেগেছেন। তাঁদের প্রচেষ্টা সার্থক হলে বিভিন্ন হিসাব-নিকাশে বেশ কিছু সুবিধা হবে বলে আশা করা যায়।

## প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কি কি পদার্থ থাকে ?

গোপা বিশ্বাস  
জলপাইগুড়ি  
স্মিত্রা চক্রবর্তী  
কলিকাতা—57

প্রশ্ন :—2. ছোটদের দাঁতকে 'হৃদেদাঁত' বলা হয় কেন ?

দেবশীল পাণ্ড  
ও  
সঞ্জয় মহলানবীশ  
শিকারপুর

উত্তর :—1. বেলের মধ্যে সাধারণতঃ কয়েকটি কুমারিনজাতীয় যৌগিক পদার্থ থাকে। এদের মধ্যে ম্যারমোলিনিন, অ্যাম্বলিকেরন, ম্যারমিন, অ্যালোইমেপেরোটিন ইত্যাদিরই প্রাধান্য। দেখা যায় যে, কিছু যৌগিক পদার্থ কাঁচা অবস্থায় থাকে, পাকা অবস্থায় সেগুলি অল্প যৌগে রূপান্তরিত হয়ে যায়।

উত্তর :—2. জন্মবার কিছুকাল পর থেকেই স্তন্যপায়ী প্রাণীদের ক্রমাগত দাঁত উঠতে আরম্ভ করে। এই সময় প্রত্যেক পাটিতে অল্পসংখ্যক দাঁত বের হয়, এদেরই বলা হয় হৃদেদাঁত। কালক্রমে এই দাঁতগুলি ভেঙে যায় এবং এদের জায়গায় স্থায়ী দাঁত ওঠে। মানুষের বেলায় প্রায় ছয় মাস বয়সের পর থেকেই এই হৃদেদাঁত গজায় আর সাত-আট বছর বয়স থেকে সেগুলি পড়তে আরম্ভ করে। হৃদেদাঁত বসবার লিহনে কোন বিজ্ঞানসম্মত কারণ নেই। বয়সের প্রথম দিকের দাঁতগুলি অস্থায়ী হয় বলেই এদের হৃদে দাঁত বলা হয়ে থাকে।

ভারতবর্ষের দে\*

## বিবিধ

নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা

গত 19শে জুন সন্ধ্যা ছয় ঘটিকার বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ ভবনের 'কুমার প্রমথনাথ রায় বক্তৃতা-কক্ষে' বিজ্ঞান পরিষদ কর্তৃক আয়োজিত নবম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতা প্রদান করেন কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক সুশীলকুমার মুখোপাধ্যায়। বক্তৃতার বিষয়বস্তু ছিল 'ভারতের কৃষি-সমৃদ্ধি'। ঐ সভায় সভাপতিত্ব করেন বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার নতুন কৃতিত্ব

গত 2রা জুন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের উইসকনসিন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞানীদের একটি সেমিনারে নোবেল পুরস্কারবিজয়ী ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা (জন্মস্থলে ভারতীয়, নাগরিকত্বে মার্কিন) কৃত্রিম উপায়ে জিন সংশ্লেষণের কথা ঘোষণা করেন। সম্পূর্ণরূপে জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে তাঁরা এই জিন সৃষ্টি করেছেন। কৃত্রিম উপায়ে সৃষ্ট এই জিন হচ্ছে উল্ট-কোডের অন্তর্গত জিনের প্রতিকল্প। ডক্টর খোরানার গবেষক দলের মধ্যে আছেন শ্রীঅশোককুমার ও শ্রীনব গুপ্ত নামে দু-জন তরুণ ভারতীয় গবেষক।

যে চারটি নিউক্লিয়োটাইড হচ্ছে জিনের মূল-তত্ত্ব, সেই চারটি নিউক্লিয়োটাইড নিয়েই ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহযোগীরা সংশ্লেষণ শুরু করেন। সম্পূর্ণ কৃত্রিম উপায়ে সরল জৈব রাসায়নিক পদার্থ থেকে এই নিউক্লিয়োটাইড সংশ্লেষণ করা যায়। তাঁরা প্রথমে এক প্যাঁচের একাধিক অংশে নিউক্লিয়োটাইডগুলিকে যথাব্যয় পরস্পরায় জুড়ে দেন এবং তারপর এই অংশগুলিকে জুড়ে

77টি নিউক্লিয়োটাইডসময়িত একটি সম্পূর্ণ ডবল প্যাঁচের জিন সংশ্লেষণ করেন।

জিন হচ্ছে বংশগতির মূলধার এবং তারাই জীবনের সমস্ত প্রক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে।



ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানা

কাজেই কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জিন সংশ্লেষণ বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নিঃসন্দেহে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। এই গবেষণা বংশগত ব্যাধি নিরাসনে, উন্নত ধরনের ঝাড়ু ও প্রাণী সৃষ্টিতে এবং শেষ

পৰ্বত হয়তো কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথ প্রস্তুত করতে পারে।

এই গবেষণার গুরুত্ব সম্পর্কে ডক্টর খোরানা বলেছেন—বহুদূর ও কয়েকটি মানসিক ব্যাধির চিকিৎসায় রোগাক্রান্ত ব্যক্তির চিন্তিতে স্বাভাবিক জিন সরবরাহ করে একদিন হয়তো এই সব ব্যাধি নিরাময় করা সম্ভবপর হতে পারে। একই উপায়ে ব্যক্তিবিশেষের অন্তর্গত বৈশিষ্ট্যও পরিবর্তিত করা যেতে পারে। দূর ভবিষ্যতে এই গবেষণালব্ধ জ্ঞান পরিকল্পনা অল্পব্যয়ী বৈশিষ্ট্যসম্পন্ন মানুষ (যেমন থেলোরিড বা মনোবী) সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হতে পারে।

উইস্কনসিন গবেষণাগারে কৃত্রিম উপায়ে এই জিন সৃষ্টি তাইরাসজনিত ব্যাধি ও ক্যান্সার প্রতিরোধের নতুন পথ খুলে দিতে পারে, বাধক্য প্রক্রিয়া এবং বিভিন্ন প্রকার জীবাণু ও অজ-প্রত্যঙ্গ গঠনের রহস্য উন্মোচিত করতে পারে। জিনের স্তরে বংশগত বৈকল্য সংশোধন করে জিনজনিত ব্যাধি নিরাময়ের কোন উপায় বর্তমানে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে জানা নেই। এই নতুন গবেষণার দ্বারা শেষ পর্যন্ত গবেষণাগারে ইচ্ছা-হুয়ারী জিন সৃষ্টি সম্ভব হতে পারে। কিন্তু গবেষণাগারে ইচ্ছা-হুয়ারী জিন সৃষ্টি এবং রোগ নিরাময়ে তার ব্যবহার অচিরে সম্ভব হবে না, দূর ভবিষ্যতে তা সম্ভব হতে পারে।

তবে কৃত্রিম উপায়ে জীবন সৃষ্টির পথে এখনও

বহু দূর অতিক্রম করতে হবে। জিন সম্বন্ধে বর্তমানে বড়টা জানা গেছে, তার চেয়ে জানবার বাকী অনেক বেশী। ডক্টর খোরানা ও তাঁর সহকর্মীরা 77টি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে ঈষ্ট-কোডের একটি অ্যালানাইন ইন্সলকার আর. এন. এ. জিন সংশ্লেষণ করেছেন। কিন্তু মানুষের একটি মাত্র কোডের নিউক্লিয়োস এই ধরনের 6 শত কোটি নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে গঠিত হয়। এথেকেই উপলব্ধি করা যায়, গবেষণাগারে মানুষের জিন সৃষ্টির আগে কত বিরাট জটিল পথ অতিক্রম করতে হবে।

জীবনের প্রথম সরল রূপ, বা মানুষ সৃষ্টি করতে পারবে, তা হবে সম্ভবতঃ তাইরাস। কিন্তু মানুষের সৃষ্টি এই নতুন তাইরাস নিয়ন্ত্রণে বর্তমান তেজস্কণ্ডি কার্যকর হবে কিনা, সে বিষয়ে সন্দেহের যথেষ্ট অবকাশ আছে বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।

### বিজ্ঞপ্তি

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের কার্যকরী সমিতির 12-6-70 তারিখের অধিবেশনে গৃহীত প্রস্তাব-মুতাবে ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞান’ বর্তমান মাস হইতে বাংলা সংখ্যার পত্রিবর্ডে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহৃত হইবে। লেখক-লেখিকাগণকে তাঁহাদের লিখিত প্রবন্ধে ইংরেজী সংখ্যা ব্যবহার করিবার অন্ত অস্বপ্ন করা বাইতেছে। —স

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

অগাষ্ট, 1970

অষ্টম সংখ্যা

## খাদ্যসমস্যার ভয়াবহ রূপ

শ্রীমতীকুমার মুখোপাধ্যায়\*

আমরা অনেক দিন থেকেই জানি—তারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ। এখনও এই দেশের শতকরা 70 ভাগ লোক চাষের কাজ করেন এবং দেশের উৎপাদন থেকে যে আয় হয়, তার প্রায় শতকরা 70 ভাগই চাষের জমি থেকে আসে। এর কিছু অংশ আসে পাট, চা, জুলা ও লাঙ্গা থেকে। এই বিষয়ে ভুল নেই যে, কৃষিগণ্যই আমাদের প্রধান জাতীয় সম্পদ অথচ সেই প্রধান সম্পদেরই আমরা সদ্যবহার করতে পারছি না। দেশে আজ চালের ঘাটতি দেখা যাচ্ছে—যাহ, বাংস, ভিষ, ছুখ হ্রাস হয়ে উঠছে। আমেরিকার গম না পেলে দেশে দ্রুতক রোগ করবার কোন উপায়ই আমরা বুঝে পাইছি না। কেন এই সঙ্কট?

বর্তমানের এই খাদ্যসমস্যা কেবল ভারতেই

সীমাবদ্ধ নয়, সারা পৃথিবীতে এই সমস্যা গুরুত্বপূর্ণ আকার ধারণ করেছে। খাদ্যসমস্যা বৃদ্ধির প্রধান কারণ পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধি। 1600 খৃষ্টাব্দে পৃথিবীর মোট জনসংখ্যা ছিল 50 কোটি—বর্তমানে প্রায় 350 কোটিতে দাঁড়িয়েছে। যে হারে লোকসংখ্যা এখনও বাড়ছে, তাথেকে অনুমান হয় 2000 খৃষ্টাব্দে বিশ্বের লোকসংখ্যা 600 কোটিতে দাঁড়াবে।

লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার এভাবে চলতে থাকলে এর পরে বা ঘটতে পারে, তা চিন্তা করাও তরাবহ।\* প্রকৃতির নিয়ম অগ্রহণ্য, যে পরিমাণ

\*সুড টেকনোলজি অ্যান্ড বায়োকেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগ, বামবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, কলিকাতা-32

খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হবে। সেই পরিমিত লোকসংখ্যাই পৃথিবীতে থাকতে পারবে। যদি খাদ্যের উৎপাদন বন্ধেই না বাড়ে, তবে লোকসংখ্যা নিশ্চয়ই সীমিত হবে। কিন্তু কেমন করে তা ঘটবে, আমরা এখনও জানি না। হয়তো বা তা ঘটেবে চুক্তিক, মহামারী, বিশ্বযুদ্ধ বা পরিবার পরিকল্পনার মাধ্যমে।

জনসংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও পৃথিবীর উন্নত দেশ-গুলিতে খাদ্যের উৎপাদন বন্ধেই বেড়েছে। কিন্তু অল্পসংখ্য দেশগুলির অবস্থার বিশেষ পরিবর্তন হয় নি। 1নং তালিকার দেখা যাচ্ছে যে, পৃথিবীর কিছু অংশে মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেয়েছে, কিন্তু এশিয়ার বৃহত্তম অংশে অবস্থার কোন পরিবর্তন ঘটে নি।

1নং তালিকা থেকে আরও দেখা যাচ্ছে যে, অল্পসংখ্য দেশগুলিতে গত কয়েক বছরে মোট খাদ্য-উৎপাদন বৃদ্ধি পেলেও মাথাপিছু খাদ্য-উৎপাদনের কোন তারতম্য হয় নি। কারণ লোকসংখ্যা বৃদ্ধির হার সেখানে অনেক বেশী। এই কারণে এই সকল দেশগুলির খাদ্য তালিকার পুষ্টিকর খাদ্যের পরিমাণও ক্রমশঃ কমে যাচ্ছে। 2নং তালিকা থেকে দেখা যাচ্ছে—বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলি কেবলমাত্র শস্ত্রজাতীয় খাদ্যের উপর কতটা নির্ভর করে আছে।

এদিকে লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কালে পৃথিবীতে সবসময়ে 3'29 কোটি একর জমি রয়েছে। তার মধ্যে মাত্র শতকরা 11 ভাগ চাষের উপযোগী, 19 ভাগ তৃণভূমি এবং শতকরা 70 ভাগ জমি চাষের অল্পযোগ্য এবং লোকসংখ্যা বৃদ্ধি বাড়ছে, বসতির জন্যে ততই জমির প্রয়োজন হচ্ছে। তাছাড়া বিমান বন্দর, রাস্তা, কলকারখানা প্রভৃতি চাষের জমি দখল করছে। 3নং তালিকার রয়েছে 1934 সাল থেকে 1961 সাল পর্যন্ত বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু চাষের জমি কিতাবে কমেছে, তার হিসাব।

ভারতবর্ষে শতকরা 49 ভাগ জমিই চাষের উপযোগী। কিন্তু বর্তমানে এখানে চাষের উপযোগী আরও জমি পাওয়ার সম্ভাবনা কম। হয়তো বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টার একদিন মঙ্গলকালে চাষ করা সম্ভব হবে, হয়তো সাইবেরিয়ার শীতল অঞ্চলেও চাষের সম্ভাবনা দেখা দেবে। বিজ্ঞান যদি অল্প খরচে বৈজ্ঞানিক শক্তি তৈরি করতে পারে, সমুদ্রের জল যদি অল্প খরচে লবণমুক্ত করা সম্ভব হয়, তখন পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ আরও বৃদ্ধি করা যাবে।

আমরা আরও জানি—সমুদ্রের মধ্যে বিপুল পরিমাণ খাদ্য সঞ্চিত রয়েছে। পৃথিবীর উপরি-ভাগের শতকরা 70 অংশ জল, মাত্র 30 অংশ স্থল। এই বিশাল জলভাগ অন্বেষণ নয়। এখানে অসংখ্য গাছপালা ও প্রাণী রয়েছে। ছোট ছোট উদ্ভিদ, কাইটোপ্লাঙ্কটন (Phytoplankton) তারা এই সমুদ্র। জমির সমস্ত গাছপালা আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis) প্রণালীর সাহায্যে বাতাসের প্রায় 30 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড ( $CO_2$ ) গ্রহণ করে অক্সিজেন ( $O_2$ ) তৈরি করে। বাতাসের বাকী 70 ভাগ কার্বন ডায়োক্সাইড গ্রহণ করে আমাদের অক্সিজেন দিচ্ছে এসব কাইটোপ্লাঙ্কটন। এই জাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করছে নানা জাতীয় সামুদ্রিক মাছ ও অন্যান্য প্রাণী। যদি ধরা যায়—আমাদের দৈনিক মাথাপিছু 30 গ্রাম প্রাণীজ প্রোটিন প্রয়োজন, তবে সমুদ্রে যে পরিমাণ মাছ আছে, তাথেকে পৃথিবীর বর্তমান লোকসংখ্যার দশগুণ বেশী লোকের প্রোটিনের চাহিদা মেটানো সম্ভব। অথচ বর্তমানে পৃথিবীর জনসংখ্যার বা ক্যালোরি প্রয়োজন, তার মাত্র শতকরা এক ভাগ আসে সমুদ্র থেকে। তবু নিঃসন্দেহে বলা যায়—ভবিষ্যৎ মানুষের খাদ্যসমস্যার সমাধানে সমুদ্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

বিশ্ব শতাব্দীতে বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি বন্ধেই হয়েছে। পারমাণবিক শক্তি মানুষের আয়ত্তে

১৯৭০

বিষয়ের বাত উৎপাদনের তুলনামূলক বিবরণ ( কমিউনিটি দেশগুলি ছাড়া ) \* । ( ১৯৫৭-৫৯ সালের বাত উৎপাদনের মান ১০০ ধরা হয়েছে )

	১৯৫৫	১৯৫৭	১৯৫৮	১৯৫৯	১৯৬০	১৯৬১	১৯৬২	১৯৬৩	১৯৬৪	১৯৬৫	১৯৬৬	১৯৬৭
বিষয়ের মোট বাত উৎপাদন	৯৬	৯৬	১০২	১০৩	১০৬	১০৮	১১১	১১৪	১১৮	১১৮	১২৪	১২৮
উন্নত দেশগুলির উৎপাদন	৯৬	৯৬	১০২	১০২	১০৬	১০৭	১১০	১১২	১১৬	১১৭	১২৬	১২৮
উন্নতিকারী দেশগুলির উৎপাদন	৯৬	৯৬	১০১	১০৩	১০৮	১১০	১১২	১১৮	১২১	১২০	১২০	১৩০
বিষয়ের মাথাপিছু বাত উৎপাদন	১০০	৯৮	১০২	১০১	১০২	১০২	১০৩	১০৩	১০৫	১০৩	১০৬	১০৭
উন্নত দেশগুলির মাথাপিছু উৎপাদন	৯৮	৯৭	১০২	১০১	১০৩	১০৩	১০৫	১০৫	১০৮	১০৭	১১৪	১১৫
উন্নতিকারী দেশগুলির মাথাপিছু বাত উৎপাদন	১০১	৯৮	১০১	১০১	১০৩	১০২	১০১	১০৪	১০৪	১০১	৯৮	১০৪
(১) ভারতবর্ষ	১০১	৯৬	১০২	১০৩	১০৬	১০৮	১০৬	১০৪	১০৫	১০২	৯৮	১০৩
(২) পাকিস্তান	১০৪	৯৯	৯৫	১০৬	১০৮	১০৬	১০৬	১১১	১০৮	১০৮	১০০	১০৮
(৩) এশিয়ার অন্যান্য দেশ	৯৯	৯৭	১০২	১০০	৯৯	১০১	১০২	১০৪	১০৪	১০২	১০৫	১০৫
(৪) আফ্রিকা	১০১	১০০	১০০	১০০	১০২	৯৭	১০৩	১০৩	১০২	৯৯	৯৬	৯৮
(৫) দক্ষিণ আমেরিকা	১০১	১০০	১০১	৯৯	৯৯	১০০	১০১	১০৩	১০৩	১০৭	১০২	১০৫

( উন্নত দেশগুলির মধ্যে রয়েছে—আমেরিকা, কানাডা, ইউরোপ, মালিয়া, জাপান, দক্ষিণ আফ্রিকা, আর্জেন্টিনা ও নিউজিল্যান্ড )

( \*Economic Research Service, World Food Situation—Prospects of World Grain Production, Consumption and Trade, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1967.)



১৯৫৯-৬১ সালে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে মাথাপিছু ক্যালোরির পরিমাণ ও সেই ক্যালোরি কত শতাংশ বিভিন্ন  
 খাদ্য থেকে পাওয়া যাচ্ছে—তার হিসাব \*

	ক্যালোরি শতাংশ										মোট ক্যালোরি		
	মোট	গম	চীন	ভুট্টা	অমৃত	মুগজাতীয়	ভাত	জাতীয় খাদ্য	চিনি	ফল ও শাকী		তেল ও ঘি	মাংস ও ভিন্ন বাহ্যিক
আমেরিকা	3190	17.4	0.9	2.0	0.5	3.1	3.3	15.7	6.2	20.5	16.9	13.5	135
ক্যানাডা	3100	18.8	0.6	1.0	0.9	4.5	1.9	16.3	4.8	15.1	22.0	14.1	141
অস্ট্রেলিয়া	3260	25.2	0.6	0.3	1.0	2.7	1.3	13.4	4.7	14.3	24.8	11.7	117
উত্তর ইউরোপ	3060	23.4	0.6	0.4	3.6	6.9	1.7	13.4	4.5	17.8	16.4	11.3	113
মধ্য ইউরোপ	3200	33.2	1.7	1.2	1.1	6.0	1.0	12.4	3.3	12.5	21.0	6.6	66
দক্ষিণ ইউরোপ	2720	40.1	2.4	2.5	1.3	6.0	4.4	7.6	7.4	15.6	6.9	5.8	58
পূর্ব ইউরোপ	3000	32.1	1.0	5.7	10.4	7.8	1.3	8.5	2.9	11.4	11.9	6.6	66
মধ্য আমেরিকা	2240	8.8	9.4	19.2	3.8	12.6	5.9	15.0	4.2	8.6	7.4	5.0	50
মেক্সিকো	2580	11.1	1.6	42.0	0.2	1.8	8.0	13.0	2.8	8.1	6.1	5.3	53
দক্ষিণ আমেরিকা	2260	16.9	5.9	13.8	2.2	15.5	3.9	15.9	3.9	7.5	9.0	5.5	55
ব্রাজিল	2710	8.6	14.5	11.0	0.2	20.9	8.9	15.4	2.3	5.9	8.4	3.9	39
দক্ষিণ আফ্রিকা	2670	14.0	1.1	39.1	2.5	1.1	1.7	14.0	2.4	5.3	12.4	6.4	64
পশ্চিম এশিয়া	2350	48.0	4.2	4.2	4.6	1.6	4.1	9.4	7.6	8.1	4.0	4.2	42
মালিয়া	3040	35.7	0.8	0.4	16.5	9.9	1.4	9.8	1.9	8.9	8.1	6.6	66
উত্তর আফ্রিকা	2210	26.4	3.1	7.6	28.6	1.3	5.7	6.1	6.1	6.0	4.3	4.8	48
ভারতবর্ষ	2050	11.3	33.1	4.0	15.0	2.6	13.2	8.2	2.0	4.2	0.9	5.5	55
জাপান	2360	11.7	46.9	—	4.6	7.7	5.9	6.7	4.2	5.0	5.0	1.4	14
পূর্ব এশিয়া	2150	1.8	50.1	7.1	0.6	12.7	6.6	5.2	5.4	5.7	4.1	0.7	07
দক্ষিণ এশিয়া	2120	19.4	47.1	1.9	3.0	1.0	5.9	6.7	3.6	4.0	3.0	4.4	44
পশ্চিম ও মধ্য আফ্রিকা	2460	1.2	5.7	10.0	17.2	45.3	6.5	1.5	1.0	9.0	2.0	0.6	06
পূর্ব আফ্রিকা	2390	2.3	8.4	34.1	21.8	12.4	6.5	4.3	0.8	3.4	3.6	2.4	24
কমিউনিষ্ট এশিয়া	1790	12.2	44.3	—	18.1	11.1	5.9	1.2	1.7	3.1	2.3	0.1	01

\*(Economic Research Service, The World Food Budget 1970, U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., October 1964)

৩নং তালিকা				
মাথাপিছু চাষের জমি (একর হিসাবে), ১৯৩৪ থেকে ১৯৬১ সাল পর্যন্ত*				
	১৯৩৪-৩৮	১৯৪৮-৫২	১৯৫৭/৫৮	১৯৬০-৬১
উত্তর আমেরিকা	১.৭৩	১.৫৩	১.২৪	১.১৯
দক্ষিণ আমেরিকা	০.৫৫	০.৪২	০.৪৫	০.৪৩
পশ্চিম ইউরোপ	০.৩৯	০.৩৫	০.৩৪	০.৩৩
পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়া	১.২৪	১.১০	১.১৪	১.০৮
আফ্রিকা	০.৫৯	০.৫৬	০.৫২	০.৫৩
এশিয়া	০.৪৫	০.৪৫	০.৪১	০.৪২
অস্ট্রেলিয়া ও নিউজিল্যান্ড	১.৪৫	১.১৫	১.১৩	১.৩১
বিশ্বের বাকি হিসাব	০.৬৬	০.৬০	০.৫৬	০.৫৫
				১৯৩৪ থেকে কত বছর
				৩১ শতাব্দী
				২২ "
				১৫ "
				১৩ "
				১০ "
				৭ "
				১০ "
				১৫ "

(\*Brown, L. R., Man, Land and Food : Foreign Agricultural Report No. 11., U. S. Department of Agriculture, Washington, D. C., 1963.)

এসেছে। চম্প-অতিথানও সকল হয়েছে। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অল্প খরচে সিঙ্গেটিক খাদ্য তৈরি করা সম্ভব হয় নি। এখনও আমরা আমাদের খাদ্য উৎপাদনের জন্যে মূলতঃ চাষের জমির উপর নির্ভর করে আছি।

মাথাপিছু জমি বতই কমছে, নিবিড় চাষের দ্বারা বিঘাপ্রতি ফলন বৃদ্ধির প্রয়োজন ততই বাড়ছে। অধিক ফলনশীল বীজ কৃষিপণ্যের উৎপাদন অনেক বাড়িয়েছে—বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলে হয়তো আরও বাড়বে। কিন্তু কতদিনে সেই সুকল পাওয়া যাবে, তা জানা নেই। একই জমিতে একাধিক ফলন, সার, সেচের জল, পোকা-মাকড় মারবার ঔষধ, ট্র্যাক্টর ও চাষের অন্যান্য যন্ত্রপাতির ব্যবহারে ফলন বাড়ানো সম্ভব। তাই-ওরানের প্রায় সমস্ত জমিতেই বছরে দু-বার ফসল হয়। জাপানে শতকরা প্রায় 60 ভাগ জমিতে

দু-বার ফসল ফলানো হয়। ভারতে মাত্র শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ জমিতে বছরে দু-বার চাষ হয়। তাই ভারতে বাকী জমিতে দু-বার চাষ করে খাদ্য-উৎপাদন বাড়ানো সম্ভব। রাসায়নিক সার প্রচলনের পর থেকে তার ব্যবহারও বেড়ে গেছে। ফলনও বাড়ছে ঠিকই।

কিন্তু যেখানে জমির উপর লোকসংখ্যার চাপ রয়েছে—সেখানে ফলন বাড়ানোর সঙ্গে সঙ্গে চাষের খরচও বেড়ে যায়। সার, জল, যন্ত্রপাতি ইত্যাদির জন্যে মূলধনের প্রয়োজন। সেই মূলধন কোথায় পাওয়া যাবে—তাও চিন্তার বিষয়। কিন্তু তার পরেও দেখা যাচ্ছে, উৎপাদনের খরচ বেড়ে চলেছে। ভারতবর্ষে চাল উৎপাদন করতে বা খরচ পড়ে, জাপানে তার তিন গুণ খরচ পড়ে। 4নং তালিকায় দেখা যাবে 1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের চাল ও গমের উৎপাদন মূল্যের হিসাব।

#### 4নং তালিকা

1959 সালে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রে চাল ও গমের উৎপাদন মূল্য ও মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ\*

	কিলোগ্রাম প্রতি গমের মূল্য	মাথাপিছু চাষের জমির পরিমাণ
অস্ট্রেলিয়া	6'2 আমেরিকান সেন্ট	6'6 একর
ক্যানাডা	5'4 „	5'8 „
পশ্চিম জার্মেনী	10'1 „	0'4 „
ভারতবর্ষ	9'0 „	0'9 „
জাপান	10'2 „	0'2 „
পাকিস্তান	7'2 „	0'7 „
মিশর	7'7 „	0'3 „
ইংল্যান্ড	7'5 „	0'3 „
আমেরিকা	6'4 „	2'6 „
ধানের মূল্য		
থাইল্যান্ড	4'5 „	1'1 „
ভারতবর্ষ	5'2 „	0'9 „
জাপান	17'7 „	0'2 „
সিংহল	12'1 „	0'4 „

\* (Brown, L. R. etc.)

জাপানে মাথাপিছু জমির পরিমাণ এত কম যে, বিধাপ্রতি কলন বাড়ানো ভিন্ন খাদ্যসমস্যা সমাধানের অল্প সহজ পথ নেই।

১৯৬৪ সালে শিকাগো শহরে আমেরিকান রাসায়নিক সংস্থার সভার প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ Dr. Raymond Ewell বলেছিলেন—পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় দুর্ভিক্ষ ১৯৭০ সাল থেকে ১৯৮০ সালের মধ্যে সারা এশিয়ার উপর ছড়িয়ে পড়বে এবং ১৯৮০ সালের পর আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকায় এই একই বিপদ দেখা দেবে। তিনি বলেছিলেন—পরিবার পরিকল্পনা ছাড়া এর হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার সহজ উপায় নেই। কিন্তু যতদিন না পরিবার পরিকল্পনার প্রয়োজনীয়তা সমস্ত লোক উপলব্ধি করবেন ও তার সুফল পাওয়া যাবে, ততদিন পর্যন্ত সমাধানের এক মাত্র পথ হচ্ছে—রাসায়নিক সারের ব্যবহার বৃদ্ধি করা। বর্তমানে বছরে যত রাসায়নিক সার ব্যবহার করা হচ্ছে, তার দশ গুণ সারের প্রয়োজন হবে ১৯৮০ সালে। এর কলে অবস্থার কোন পরিবর্তন হবে না। ১৯৬৪ সালে মাথাপিছু শস্ত-উৎপাদন বা হজিলো, ১৯৮০ সালেও তাই হবে। তার কারণ, ইতিমধ্যে লোকসংখ্যা অনেক বেড়ে যাবে। ১৯৮০ সালের অবস্থার পৌছোতে হলে তারতবর্ষে প্রতি বছর একটি করে সিল্কীর মত সারের কারখানা তৈরি করা প্রয়োজন।

আরও তলিয়ে দেখলে আমাদের খাদ্যসমস্যার প্রকৃত রূপ প্রকাশ পাবে। জমি থেকে আমাদের খাদ্য দু-ভাবে আসে। প্রথমতঃ, জমিতে সরাসরি বা প্রত্যক্ষভাবে বা উৎপন্ন হয়; যেমন—নানাবিধ শস্ত, কলমুল, শাকসবজি, তৈলবীজ ইত্যাদি। দ্বিতীয়তঃ, জমির কসল রূপান্তরিত হয়ে পরোক্ষভাবে কিছু খাদ্যের উৎপাদন হয়। শস্ত বা অন্যান্য কসল প্রাণীদের বাইরে আমরা অনেক পুষ্টির রূপান্তরিত খাদ্য পাই; যেমন—মাংস, ডিম ও দুধ। কিন্তু মাংস, ডিম

ও দুধ উৎপাদনে কিছু অসুবিধা আছে। শস্তজাতীয় খাদ্য রূপান্তরিত করে মাংস, ডিম বা দুধ উৎপাদন করলে তার পরিমাণ অনেক কমে যায়। প্রায় ৪০০ ক্যালোরির সমান শস্তজাতীয় খাদ্য প্রাণীকে খাওয়ালে মাত্র ১০০ ক্যালোরির সমান খাদ্য মাংস, ডিম বা দুধ হিসাবে পাওয়া যায়। তাই ডিম, দুধ ও মাংস শস্তজাতীয় খাদ্য অপেক্ষা অনেক বেশী দামী।

অনেকের ধারণা, তারতবর্ষে মাত্র শতকরা পাঁচ ভাগ কি দশ ভাগ খাদ্যের খাইতি আছে এবং সেটুকু চাল ও গম উৎপাদন করতে পারলেই এই দেশ খাদ্যে স্বাবলম্বী হবে। এই ধারণার অনেক ভুল রয়েছে। তারতবর্ষে চাষের জমি থেকে যে খাদ্য সরাসরি উৎপন্ন হয়, তা থেকে তারতবাসী মাথাপিছু প্রায় ২৫০০ ক্যালোরি পেতে পারেন। আর আমেরিকায় চাষের জমিতে প্রত্যক্ষভাবে যে খাদ্য উৎপাদন করা হয়, তা থেকে একজন আমেরিকান প্রতিদিন প্রায় ১০০০০ ক্যালোরি পেতে পারেন। অথচ একটি সূস্থ, সবল, বয়স্ক লোকের দৈনিক মাত্র ২৫০০ থেকে ৩০০০ ক্যালোরির প্রয়োজন। আমেরিকায় এই বাড়তি কসল পশুপালনে সাহায্য করেছে। তার কলে রূপান্তরিত খাদ্য ডিম, দুধ, মাংস যথেষ্ট পাওয়া যাচ্ছে। সেখানে উৎপন্ন ছুট্টা ও সরষীনের প্রায় শতকরা ৪০ ভাগই গরু, শূকর ও মুরগীদের খাওয়ানো হয়। যথেষ্ট পরিমাণে জমির কসল বাড়তি না হলে দুধ, ডিম বা মাংসের উৎপাদন বৃদ্ধি করা সম্ভব নয়। গত মহাযুদ্ধে বাইরে থেকে খাদ্যশস্ত আমদানীর অসুবিধার জন্মে ইংল্যান্ড তাদের দেশে পশুপালনের হার কমিয়ে দিয়েছিল। কলে যে বাড়তি জমির কসল পাওয়া গেল, তা সেই দেশকে সাময়িক বিপদের হাত থেকে রক্ষা করেছিল। তাই দেখা যাচ্ছে—খাদ্য উৎপাদনে আমেরিকার সমকক্ষ হতে হলে তারতবর্ষকে খাদ্যের উৎপাদন চতুর্গুণ বাড়াতে হবে।

এথেকে অহুমান করা যায়—ভারতবর্ষের খাদ্য-সম্পত্তা সাধারণ নয়।

এই বিষয়ে সন্দেহ নেই যে, বর্তমানে ভারতবর্ষে সবচেয়ে বেশী প্রয়োজন—জমিতে যত প্রকারের ফসল হতে পারে, সব কিছুই উৎপাদন বাড়ানোর উপায় গুরুত্ব দেওয়া। কিন্তু জমিতে সরাসরি অনেক রকমের উদ্ভিদ খাদ্যের উৎপাদন হয়, যেমন—শস্ত্র, কলমুল, শাকসজি, আখ, তৈলবীজ ইত্যাদি। এর মধ্যে কোন্ খাদ্য উৎপাদনের উপর বেশী গুরুত্ব দেওয়া উচিত, সে বিষয়েও চিন্তা করা দরকার।

প্রথমে দেখা যাক—ভারতবর্ষে এখন কি উৎপন্ন হয়। এখানে বছরে প্রায় 9 কোটি টন শস্ত-জাতীয় খাদ্য, 2 কোটি টন তৈলবীজ, 2 কোটি টন শাকসজি, পোনে এক কোটি টন ফল ও 8 কোটি টন আখ উৎপন্ন হয়। শাকসজি ও কলমুলে শস্ত ও তৈলবীজের তুলনায় প্রচুর জল থাকে। সেই হিসাবে শুক অবস্থায় এই সবের ওজন হবে আখ কোটিরও কম, আর এই কলের ঘোট ওজন হবে মাত্র দশ লক্ষ টন। তাই শস্তজাতীয় খাদ্যের তুলনায় সজী ও ফলের উৎপাদন এদেশে অনেক কম।

অথচ বীরা ফল বা সজি চাষ করেন, তাঁরা জানেন অধিকাংশ ফল বা সজির বিঘাপ্রতি ফলন শস্তজাতীয় খাদ্যের ফলনের চেয়ে বেশী। নিম্নের তালিকায় কয়েকটি খাদ্যের তুলনামূলক উৎপাদনের হিসাব দেওয়া রয়েছে।

গম, কলা, পেঁপে ও মিষ্টি আলুর তুলনামূলক

উৎপাদনঃ

	একর প্রতি উৎপাদন	একর প্রতি উৎপাদিত ক্যালোরির পরিমাণ
গম	0.34 টন	1,034,880
কলা	10.00 „	15,052,800
পেঁপে	48.00 „	18,923,520
মিষ্টি আলু	3.00 „	5,500,000

\* (J. Science Club, Dec.-Feb., 1966-67)

শাকসজি, কলমুল কলাতে পারলে একই জমি থেকে অধিক খাদ্য পাওয়া সম্ভব। তবু বর্তমানে এই দেশে সজি ও ফলের উৎপাদন খুবই কম। এখানে শাকসজির দায়ও শস্তজাতীয় খাদ্যের তুলনায় অধিকাংশ সময়েই বেশী থাকে। এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন কম হবার প্রধান কারণ—এগুলি তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায় বা পচে যায়; শস্তজাতীয় খাদ্যের মত সাধারণভাবে ঘরে অনেক দিন রাখা যায় না।

খাদ্য সম্পর্কে অর্থনীতির নিয়ম এই যে—মাল্লের পেট বখন তরে যায়, তখন বাড়তি খাবার বাজারে সস্তার পাওয়া গেলেও তার কোন চাহিদা হবে না (Law of inflexible demand)। তাই বিশেষ বিশেষ ক্ষুদ্রতে বাড়তি সজি ও ফল শুধু যে নষ্ট হয় তাই নয়—সজি ও ফলের ফলন বাড়াতে চাহিদা উৎসাহ পান না। অথচ এই সাময়িক বাড়তি ফল ও সজি সংরক্ষণ করে রাখতে পারলে বছরের অন্তান্ত সময়ে তার সহায়-হার হতে পারে। সজি ও ফল সংরক্ষণের সহজ উপায় যখন অল্প খরচে করা সম্ভব হবে, তখন এই জাতীয় খাদ্যের উৎপাদন বৃদ্ধি করা নিশ্চয়ই সহজ হয়ে উঠবে।

কিন্তু এর পরেও সমস্তার দ্বারী সমাধান হয়তো হবে না। কারণ লোকসংখ্যা যে হারে বাড়ছে, সে হারে খাদ্য উৎপাদন করা কঠিন হয়ে পড়বে। একথা প্রায় 180 বছর আগে বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ ম্যালথাস বলেছিলেন।

তাই বিজ্ঞানীরা এখন খাদ্যের কথা ভাবছেন, বা অল্প দিনে খুব তাড়াতাড়ি উৎপাদন করা সম্ভব। কোন কোন ক্ষুদ্র জীবাত্ম ও গুরুজাতীয় গাছকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করতে পারলে সেই দিক থেকে কিছু হুঁহা হতে পারে। তার কারণ, এরা গাছপালার তুলনায় অনেক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। 457 পৃষ্ঠার তালিকায় গাছপালা ও জীবজন্তুর তুলনামূলক বৃদ্ধির হার দেখানো হয়েছে।

জীব	দ্বিগুণিত হতে কোন জীবের কত সময় লাগে (Mass doubling time)
জীবাণু (Bacteria)	20-120 মিনিট
ছত্রাক ও শাওলাজাতীয়	
উদ্ভিদ (Mold and Algae)	2-6 ঘণ্টা
ঘাস	1-2 সপ্তাহ
সুগন্ধী	4-6 সপ্তাহ
শুক্র	1-2 মাস
মাকড়স	6 মাস

দেশা বাহ্যে—ছত্রাক ও ক্ষুদ্র জীবাণু গাছপালা ও প্রাণীদের তুলনায় অনেক তাড়াতাড়ি বাড়তে পারে। সেই ক্ষেত্রে Bacteria, Yeast, ছত্রাক বা শাওলাজাতীয় উদ্ভিদকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করতে পারলে খাদ্য-উৎপাদন খুব তাড়াতাড়ি করা সম্ভব হয়ে উঠবে।

খাদ্যভণ্ডের কথা চিন্তা করলে এই সব জীবাণু খাদ্য হিসাবে ধারণা নয়। বিশেষতঃ এতে প্রোটিনের পরিমাণ অনেক বেশী আছে। খাদ্যের দিক থেকেও এদের খাদ্যোপযোগী করে তোলা হয়তো সম্ভব হবে। তাছাড়া এই সব জীবাণুর মধ্যে শর্করা, নানা প্রকার ভিটামিন ও বনিক পদার্থও আছে।

এই সব জীবাণু নানা প্রকার বস্তু থেকে আবার উৎপাদিত খাদ্য—শর্করা, প্রোটিন, ভিটামিন ইত্যাদি সংশ্লেষণ করতে পারে। পেট্রোপিয়ামের অপ্রয়োজনীয় অংশকে (কতকগুলি বিশেষ Hydrocarbons) খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করে কোন কোন জীবাণু বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অ্যানো-নিরাম সালফেট, ইউরিয়া ইত্যাদি সহজ নাইট্রো-জেনযুক্ত রাসায়নিক পদার্থ থেকে এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে। ঠিক এমনভাবেই গাছও আমাদের ক্ষেত্রে খাদ্য তৈরি করে দেয়—বাতাসের কার্বন ডায়োক্সাইড, জল ও বাতাসের নাইট্রোজেন কিংবা জমির নাইট্রোজেনযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদার্থকে সংশ্লেষণ করে। তবে জীবাণুর ক্ষেত্রে সুবিধা এই যে, এদের বাড়বার ক্ষমতা অনেক বেশী। তাছাড়া এদের শরীরে প্রোটিনের পরিমাণও অনেক বেশী। পৃথিবীতে বর্তমানে প্রোটিনের অভাব বড় বেশী, শর্করাজাতীয় খাদ্যের অভাব তত নয়।

তাই ক্ষুদ্রতম জীবাণুকে খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করার পরিকল্পনা নতুন সম্ভাবনা নিয়ে ভবিষ্যতে মানবের কাছে আসবে। এই বিষয়ে যথেষ্ট গবেষণা চলছে। মনে হয় আরও নতুন পথের সম্ভাবনা আমরা পাব।

“যদি দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হয়, আর তাহা না করিলেও বিজ্ঞান শিক্ষা প্রকটরূপে কলবতী হইবে না, তাহা হইলে বাঙালী তাহার বিজ্ঞান শিখিতে হইবে। ছুই চারিজন ইংরেজিতে বিজ্ঞান শিখিয়া কি করিবেন?...তাহাতে সমাজের ধাতু কিরিলে কেন? সামাজিক ‘আবহাওয়া’ কেমন করিয়া বদলাইবে? কিন্তু দেশটাকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাহাকে তাহাকে যেখানে সেখানে বিজ্ঞানের কথা শুনাইতে হইবে। কেহ ইচ্ছা করিয়া শুধু আর নাই শুধু, দশবার বলিলে ছুইবার শুনিতেই হইবে। এইরূপ শুনিতে শুনিতেই জাতির ধাতু পরিবর্তিত হয়। ধাতু পরিবর্তিত হইলেই প্রয়োজনীয় শিক্ষার মূল স্রষ্টারূপে স্থাপিত হয়। অতএব বাঙালীকে বৈজ্ঞানিক করিতে হইলে বাঙালীকে বাঙালী তাহার বিজ্ঞান শিখাইতে হইবে।”






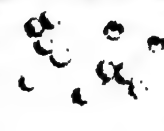



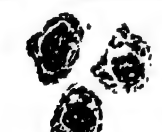

—বঙ্গ বিজ্ঞান (বঙ্গদর্শন, কার্তিক, ১৯৮০)



তার উপর নির্ভর করে বলা যায়, লিউকেমিয়া সাধারণতঃ দুই ধরনের—লিম্ফোসাইটিক ও গ্র্যানুলোসাইটিক (চিত্র-২,৩)। এর প্রধান ক্ষেত্রে অর্থাৎ লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়াতে লিম্ফ নোড বা লসিকা গ্রন্থি থেকে উৎপন্ন লিম্ফোসাইট কোষসমূহের বৃদ্ধি এবং বিভাজন নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে

অস্বাভাবিকতা। রোগের তীব্রতার উপর ভিত্তি করে উপস্থিতিতে দুই ধরনের লিউকেমিয়াকে আবার ভাগ করা হয় প্রধানতঃ দুই ভাগে; যথা—সরুটোপন ও দীর্ঘস্থায়ী।

আশ্চর্যের বিষয়, এই লিউকেমিয়া—এত ব্যাধি তীব্রতা, এত ব্যাধি ব্যাপকতা—তার উৎপত্তির কারণ

উৎপত্তিস্থল	আকৃতি	রক্ত কণিকা	মুখ্য কারণ
 লসিকা গ্রন্থি	 অপরিণত - লিম্ফোসাইট	 পরিণত - লিম্ফোসাইট	জন্মগত উৎপত্তির সম্ভাব্য কারণ মহা-স্রাবজনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকর
	 অপরিণত - মাইলোব্লাস্ট	 পরিণত - মাইলোব্লাস্ট	বিভিন্ন কারণে O <sub>2</sub> ঘটন এবং কোষের বর্ধন ক্ষমতা হ্রাসজনিত মহা-স্রাবজনিত রক্ত-হ্রাস
	 অসংক্রান্ত	 স্রোত-স্রোত	রক্ত-স্রাবজনিত মহা-স্রাবজনিত রক্ত-হ্রাস মহা-স্রাবজনিত অনিয়মিত রক্ত-হ্রাস
 অসংক্রান্ত	 অপরিণত মাইলোব্লাস্ট	 পরিণত মাইলোব্লাস্ট	বিভিন্ন বহিঃস্থ কারণজনিত রক্ত-হ্রাস মহা-স্রাবজনিত রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাসকর

১নং চিত্র

যায়। বিভিন্ন ক্ষেত্রে অর্থাৎ গ্র্যানুলোসাইটিক লিউকেমিয়াতে বেরুয়াজ থেকে উৎপন্ন কোষসমূহ দেখা দেয় বৃদ্ধি ও বিভাজনজনিত আকস্মিক

কিন্তু আজও আমাদের কাছে অজ্ঞাত। বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের এই অগ্রগতির দিনেও কোন বিজ্ঞানীই এর উৎপত্তির কারণ সনাক্ত করেন



নিশ্চিত নয়। এঁদের অনেকের মতে, Ionising radiation বা রক্টগেন-রশ্মির প্রভাবেই লিউকেমিয়ার উৎপত্তির অন্ততম কারণ। তাঁরা বলেন যে, কোন ব্যক্তি এই রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই যে লিউকেমিয়ার আক্রান্ত হবেন তা নয়, রক্টগেন-রশ্মির প্রভাবেজনিত এই পরিণাম পনেরো বছর পরেও অঙ্গভূত হতে পারে।

প্রতিপালিত অনেক প্রাণীর ( যেমন—সাদা ইঁদুর ও কোন কোন পাখী ) লিউকেমিয়ার জন্মে প্রত্যেক-ভাবে বিভিন্ন তাইরাসই দারী।

লিউকেমিয়ার উৎপত্তি যেভাবেই হোক না কেন, এই বিষয়ে আজ কোন সন্দেহই নেই যে, লিউকেমিয়ার আক্রান্ত কোষের প্রজননতন্ত্রে (Genetic machinery) এমন একটা পরিবর্তন আসে, যা শুধু



2নং চিত্র



3নং চিত্র

অল্প দিকে এই মতের বিরোধীরা বলেন, রক্টগেন-রশ্মির প্রভাবে লিউকেমিয়ার কোন সুক্তিগ্রাহ্য কারণই নয়; কারণ এমন অনেক লিউকেমিয়ার রোগী দেখা গেছে, যারা পূর্বে কখনও রক্টগেন-রশ্মির দ্বারা প্রভাবিত হন নি। এই বিষয়ে অল্প ধারণার প্রবক্তাদের মতে, তাইরাসই লিউকেমিয়ার উৎপত্তির অন্ততম কারণ। এই মতবাদ নস্রাত্কারীদের একটা মন্তব্যই তাইরাস-প্রকর মিথ্যা প্রমাণের পক্ষে বখেটে। তাঁরা বলেন, তাইরাসজনিত যে কোন রোগই সাধারণ নিয়ম অঙ্গবায়ী সংক্রামক। বলা বাহুল্য, আজ পর্যন্ত এমন কোন নিদর্শন পাওয়া যায় নি, যা থেকে আমরা লিউকেমিয়ার সম্পর্কে উপযুক্ত মন্তব্য করতে পারি। তবে একথা ঠিক যে, নাহলেই কেনে না হলেও গবেষণাগারে

কোষের আভাবিক কাজকর্মেই ব্যাঘাত ঘটায়— তা নয়, পারিপার্শ্বিক সমগোত্রীয় কোষসমূহের কর্ম-ক্ষমতাও ভীষণভাবে ব্যাহত করে। যে কোন ক্ষুদ্র কোষের বাবতীয় কার্য নিয়ন্ত্রণ করে কোষমধ্যস্থিত DNA বা ডিঅক্সিরাইবোনিউট্রিক অ্যাসিড। এই ডি-এন-এ-ই হলো জেনেটিক কোড-এর মূল কথা। বলা বাহুল্য, ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনে যে কোন পরিবর্তনই প্রতিবিধিত হবে কোষের দৈনন্দিন কার্য পরিচালনায়। ঠিক একই কারণে লিউকেমিয়ার আক্রান্ত প্রতিটি কোষের অভ্যন্তরস্থ ডি-এন-এ-র আণবিক গঠনের সামান্য-তম পরিবর্তনই রোগীর বাস্তব জীবনে এনে দেয় বিরাট বিপর্যয়।

লিউকেমিয়ার উৎপত্তির কারণ সন্ধান বখেটে মতবিরোধ থাকে সত্ত্বেও একটি বিষয়ে আজ

বিজ্ঞানীরা একমত যে, রোগের প্রকৃতির সঙ্গে রোগীর বয়সের একটা নির্দিষ্ট সম্পর্ক বর্তমান। যেমন, লিম্ফোসাইটিকে লিউকেমিয়ার প্রায় সব বয়সের লোক আক্রান্ত হলেও এর সফটপার অবস্থা বেশী দেখা যায় তিন থেকে পাঁচ বছরের শিশুদের মধ্যে, অথচ এই রোগ দীর্ঘস্থায়ী হয় সাধারণতঃ পকাশ থেকে সত্তর বছর বয়সের যুগের মধ্যে। অল্প দিকে গ্র্যাঙ্কুলোসাইটিক লিউকেমিয়ার সফটপার অবস্থা অল্প বয়স্ক যুবকদের মধ্যে বেশী দেখা গেলেও এর দীর্ঘস্থায়ী অবস্থা সাধারণতঃ তিরিশ থেকে পকাশ বছর বয়স্ক প্রবীণদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

বিংশ শতাব্দীর বিজ্ঞানে জীবজগতের ক্রম-বিবর্তন থেকে শুরু করে মানব দেহের হৃদয় পরিবর্তন পর্যন্ত সব কিছুর চাবিকাঠিই যখন বিজ্ঞানীদের হাতের মধ্যে, তখনও কিছু লিউকেমিয়ার উপযুক্ত প্রতিবেদক অনাবিষ্কৃত। অবশ্য এই বিষয়ে চেষ্টার ক্ষতি নেই, বিজ্ঞানীদের গবেষণারও অভাব নেই। এই চেষ্টার কলঙ্করূপ আজ কিছু কিছু প্রতিবেদক আবিষ্কৃত হলেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-যুক্তি আজও একান্তই নাটকীয় ঘটনা। তবে আংশিক আরোগ্য এবং রোগের বাহ্যিক লক্ষণসমূহ দূরীকরণের কাজে আধুনিক অনেক প্রতিবেদক বেশ কলপ্রদ। যে সব রাসায়নিক পদার্থ প্রতিবেদকরূপে প্রচলিত, তার মধ্যে যেথোট্রিক্সেট, লিউকেরন, মারক্যাপ্টোপিউরিণ তিনক্লটিন ইত্যাদির নাম উল্লেখযোগ্য। বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার দেখা গেছে—যেথোট্রিক্সেট সহ উপরিউক্ত প্রায় সমস্ত প্রতিবেদকই আক্রান্ত কোষের ডি-এন-এ সংশ্লেষণ বন্ধ করে কোষ-বিভাজন ব্যাহত করে।

মাত্র কিছুদিন আগে, ১৯৬৯ সালের মার্চমাসের লিউকেমিয়ার দুটি প্রতিবেদক চিকিৎসা-ক্ষেত্রে আলোড়ন এনেছেন এদের একটি হলো সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও অপরটি এল-অ্যাসপ্যার-

জাইনেজ। এদের প্রথমটির আবিষ্কার ডাঃ গর্ডন জিউব্রডের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড সমসাময়িক অত্যন্ত প্রতিবেদক অপেক্ষা অনেক বেশী কার্যকরী, বিশেষতঃ গ্র্যাঙ্কুলোসাইটিক ও লিম্ফোসাইটিক লিউকেমিয়ার আক্রান্ত রোগীর সফটপার অবস্থায়। ঐ একই বছরে হারভার্ড মেডিক্যাল স্কুলের অধ্যাপক ল্যান্ডাস ও তাঁর সহকর্মীরা পরীক্ষাগারে দেখান যে, এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজ নামে ব্যাক্টেরিয়া ই-কোলাই-এর দেহনিঃসৃত একটি জারক রস বা এন্ডোইম লিউকেমিয়ার আক্রান্ত মানব-কোষের অব্যর্থ প্রতিবেদক। আবিষ্কারের মতে, সাইটোসিন অ্যারাবিনোসাইড ও এল-অ্যাসপ্যারাজাইনেজের অপর একটি বিশেষত্ব হলো, এরা নির্দিষ্টভাবে লিউকেমিয়ার আক্রান্ত কোষসমূহের বিভাজনই ব্যাহত করে, পারিপার্শ্বিক সুস্থ কোষের উপর এদের প্রভাব উপেক্ষণীয় (সম্প্রতি কলকাতার জাতীয় ক্যান্সার গবেষণা কেন্দ্রের দু-জন বিজ্ঞানীও তাঁদের নব আবিষ্কৃত প্রতিবেদক সম্বন্ধে অল্পরূপ দাবী করেছেন)।

এখন প্রশ্ন হতে পারে—এত প্রতিবেদক থাকা সত্ত্বেও সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া রোগ-যুক্তি আজও সম্ভব নয় কেন? একথা আমরা জানি, মাত্র একটি লিউকেমিয়া আক্রান্ত কোষের উপস্থিতি একটি সুস্থ মানুষকে লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত করে তুলতে পারে। তাই লিউকেমিয়া আক্রান্ত রোগীকে সম্পূর্ণ আরোগ্য করে তুলতে হলে যাবতীয় অসুস্থ খেত কণিকা নিমূল করা আবশ্যিক। চুক্তাগোয় বিষয়, আজ পর্যন্ত যে সব প্রতিবেদক আবিষ্কৃত হয়েছে, তার কোনটাই সম্পূর্ণরূপে লিউকেমিয়া কোষ-পরিবারকে নিমূল করতে সক্ষম নয়। কারণ মানবদেহে এমন কতকগুলি অংশ আছে, যেগুলি সাধারণভাবে প্রায় সমস্ত প্রতিবেদকের কাছেই অতেন্দ্র; উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, মস্তিষ্ক ও স্নায়ু কাণ্ডের আবরণী, স্নায়ু কাণ্ডের অভ্যন্তরস্থ তরল

পদার্থ প্রভৃতি। দেখা গেছে, বেশ কিছু সংখ্যক লিউকেমিয়া কোর দেহের এই সব নিরাপদ অংশে আশ্রয় নিয়ে সম্পূর্ণ ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা পায়। তাছাড়া পারিপার্শ্বিক কোষতন্ত্রের উপর এদের ক্ষতিকর প্রভাবের জন্তে অনেক ক্ষেত্রেই প্রতিবেশকের পরিমাণ সীমিত রাখতে হয়।

অনেক অসুবিধা, অনেক ব্যর্থতা সত্ত্বেও এই

অল্প সময়ের ব্যবধানে যে সাফল্য অর্জিত হয়েছে, তাৎক্ষণিক গবেষণারত বিজ্ঞানীদের মনে, শত-সহস্র আশাবাদী মানুষের মনে এই ধারণাই জন্মেছে যে, সেই অনাগত মুহূর্ত হয়তো খুব দূরে নয়, যখন আমরা লিউকেমিয়া রোগাক্রান্ত রোগীকে তাদের রোগমুক্তি সম্পর্কে নিশ্চিত আশ্বাস দিতে পারবো।

## বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চা—অতীত ও বর্তমান

### ত্রিদিবরঞ্জন মিত্র

বাংলা দেশে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চার ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, এদেশে হাতে-কলমে আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা ভাষায়ও বিজ্ঞান-চর্চা শুরু হয়। তখন বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়ানো এবং বিজ্ঞান সম্পর্কিত প্রবন্ধ প্রকাশ দুই-ই সম্ভব হয়েছিল। এর জন্তে বিশেষভাবে উৎসাহী ছিলেন রাজা রামমোহন রায়। তিনি তাঁর ‘অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান’ স্কুলে বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াবার ব্যবস্থা করেছিলেন। তাছাড়া ‘সদাশ কোমুদী’তে প্রণীত করেকটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধও প্রকাশ করেছিলেন। শুধু তাই নয়, বিজ্ঞানের কিছু বইও রচনা করেছিলেন।

রামমোহন ছাড়া বাংলা ভাষায় বৈজ্ঞানিক বিষয় আলোচনা করতে দেখা যায় ইউরোপীয় মিশনারিদের। উইলিয়াম ইয়েটস্ 1825 খৃষ্টাব্দে বাংলা ভাষায় ‘পদার্থবিজ্ঞান সার’ এবং 1830 খৃষ্টাব্দে ‘জ্যোতির্বিজ্ঞান’ নামে বই প্রকাশ করেন। জন ম্যাক 1834 খৃষ্টাব্দে ‘কিমিয়াবিজ্ঞান সার’ নামে বাংলা ভাষায় প্রথম রসায়নের বই প্রকাশ করেন। এভাবে দেখা যায়, বাংলা দেশে বাংলা ভাষায় আধুনিক বিজ্ঞান-চর্চা শুরু হয়েছিল লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে বিজ্ঞান-শিক্ষা শুরু হবার অনেক

আগে। স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগে, যে চর্চা সূচ্যুতাবেই শুরু হয়েছিল তা ব্যাহত হলো কি কারণে? সম্ভবতাবেই বলা যায়, এর প্রধান কারণ বৈদেশী শাসন। যদিও সরকারীভাবে বলা হয়েছিল যে, ভারতবাসীকে ইংরেজী শিক্ষা দিতে হবে ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান সম্বন্ধে অবহিত করার জন্তে; তথাপি ইংরেজী শিক্ষা চালু করবার ব্যাপারে তাঁদের মতবিরোধ দেখে বোঝা যায় যে, তাঁরা শাসনকার্যে সহায়তা লাভের জন্তেই ইংরেজী শিক্ষা চালু করেছিলেন। তাই ইংরেজী শিক্ষা যখন চালু হলো, তখন সামান্য ইংরেজী শিখলেই সাধারণ একটা কেরাণীর চাকরি জুটে যেত। কলে অবিকাংশ বাঙালীই চাকরির আশায় ইংরেজী পড়তে শুরু করেন। উপরন্তু তৎকালীন শাসক-গোষ্ঠীর বাংলা ভাষায় প্রতি বিন্দুমাত্র সহানুভূতি না থাকায় প্রত্যেক ছাত্র-ছাত্রী ইংরেজী ভাষায় মাধ্যমে সমস্ত বিষয় পড়তে বাধ্য হতো। তাছাড়া তখনকার দিনের খ্যাতিনা বাঙালী বিজ্ঞানীদের মধ্যে কিছু সংখ্যক ছাড়া অবিকাংশই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান-চর্চার উৎসাহ দিলেও স্বচেষ্টায় কেউই বাংলা ভাষায় বিজ্ঞান পড়াতে অগ্রণী হন নি। ভারতের বিভিন্ন জনহিতকর আন্দোলনে

এবং ভারতের সম্মান বিদেশে প্রতিষ্ঠার জন্তে প্রত্যক্ষভাবে তাঁরা যে রকম ভাগ স্বীকার করে-ছিলেন, বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে সেই রকম কিছু করলে আজ হয়তো আমাদের এত ভাবতে হতো না। সুতরাং বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-শিক্ষা ব্যাহত হবার দ্বিতীয় কারণ হিসাবে বলা যায়, এই ব্যাপারে বিজ্ঞান-শিক্ষকদের সক্রিয় চেষ্টার অভাব।

বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-শিক্ষাদানের আধুনিক যুগের উৎসাহীদের মধ্যে পুরোধা ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি নিজের জীবনের অতিজ্ঞতা থেকে মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান-শিক্ষার উপকারিতা বুঝতে পেরে সারা জীবন ধরে এর জন্তে চেষ্টা করতে কষ্ট করতেন নি। হুঁত্যাগ্য, তিনি তাঁর প্রচেষ্টার বাস্তব রূপ দেখতে পান নি। এখানেও বলা যায়, সরকার ও বিজ্ঞান-শিক্ষক উভয়েই দায়ী। কিছু সংখ্যক শিক্ষকের মতে, বৈজ্ঞানিক শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ ও বাংলার বিজ্ঞানের পাঠ্যপুস্তকের অভাব এর জন্তে দায়ী। আজও মাঝে মাঝে এই কথা শোনা যায়। রবীন্দ্রনাথ এর উত্তর দিয়েছেন ‘শিক্ষার বাহন’ নামক প্রবন্ধে। তবে বিভিন্ন অসুবিধা সত্ত্বেও বাংলা ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা কখনো বন্ধ হয় নি। একেত্রে বৈজ্ঞানিক ও সাহিত্যিক উভয়েরই দান অপরিসীম।

আজ ভারত স্বাধীন। সরকারও মাতৃভাষার মাধ্যমে বিজ্ঞান পড়াবার ব্যাপারে বিশেষ উৎসাহী। অনেক শব্দের পরিভাষাও হয়েছে। কলে বাংলা ভাষায় বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের নানা বই ও বিজ্ঞান সাংবাদিক প্রকাশিত হচ্ছে। কিন্তু বাংলা পরিভাষার ইতিহাস পর্যালোচনা করে দেখা যায়, একটি বৈজ্ঞানিক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ সৃষ্টি হয়েছে। এর প্রধান কারণ বিভিন্ন লেখকের নিজের কাজের সুবিধার জন্তে ইচ্ছামূল্যে বৈজ্ঞানিক শব্দের প্রতিশব্দ সৃষ্টির প্রয়াস। এঁরা কখনো

খোঁজ করে দেখেন না যে, আগে কোন শব্দ সৃষ্টি হয়েছে কিনা। কলে বাংলা ভাষার শব্দকোষের আকার বৃদ্ধি হলোও পরিভাষা হয়ে উঠেছে ভাষা-ক্রান্ত। তাই এই প্রবন্ধে কয়েকটি প্রস্তাব করছি। এই প্রস্তাব অস্বাধীন বলা যায়, প্রথমেই সরকার সরকারী সাহায্যপুষ্ট একটি চিরস্থায়ী ‘বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-চর্চা সমিতি’র। সেই সমিতির মতামতাদায়ী চলবে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-চর্চা—কারণ কোন বেসরকারী প্রতিষ্ঠানকে সকলে নাও মানতে পারেন। ঐ সমিতি নিয়মিতভাবে কাজ করলে বোধ হয় অনেক ভাল হবে।

(1) একই শব্দের বেশ একাধিক পরিভাষা না হয়, তার ব্যবস্থা করা সরকার। বিভিন্ন বিজ্ঞানী যদি একটি শব্দের বদলে একাধিক প্রতিশব্দ ব্যবহার করেন, তবে বিজ্ঞানীমহলেই বিষয়বস্তু বোঝবার ব্যাপারে গোলযোগ দেখা দেবে—বিজ্ঞানীকে তখন গবেষণা ছেড়ে বিজ্ঞানের শব্দকোষ নিয়ে পড়ে থাকতে হবে। সুতরাং একটি শব্দের একটি প্রতিশব্দ প্রচলিত থাকলে কি সুবিধা হবে, তা আর কাউকে বুঝিয়ে বলবার দরকার আছে বলে মনে হয় না। এই কাজের জন্তে সমিতির উচিত প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের বর্তমান রকম পরিভাষা পাওয়া যায়, তার তালিকা প্রস্তুত করা এবং তাদের মধ্যে যদি কোনটি গ্রহণযোগ্য হয় তাকে গ্রহণ করা, নয় তো নতুন শব্দের সৃষ্টি করা। এর জন্তে বিভিন্ন প্রগতিশীল দেশে কীভাবে পরিভাষা করা হয়, তা দেখবার প্রয়োজনীয়তা আছে। শুধু এই করলেই চলবে না, তবিশ্রুতে যাতে কোন রকম গোলযোগ না দেখা দেয়, তার জন্তে বিশেষ আইন প্রণয়ন এবং নিয়মিতভাবে নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে নতুন শব্দের পরিভাষা সৃষ্টি ও প্রকাশের ব্যবস্থা করবার প্রয়োজন। বর্তমান পরিভাষা সৃষ্টি ও তা প্রকাশিত না হয়, ততদিন প্রবন্ধ ও পাঠ্যপুস্তক রচয়িতারা নতুন বৈজ্ঞানিক শব্দের কি রকম পরি-

ভাষা করবেন সবিত্তিকৃত আইনে তারও নির্দেশ থাকি চাই।

(2) বাংলা দেশের বিভিন্ন জেলার লোকের বিভিন্ন শব্দের উচ্চারণে তফাৎ দেখা যায়। কলে বহু শব্দের বিভিন্ন বানানও লক্ষ্য করা যায়। এটা অভিজ্ঞ ব্যক্তির কাজে বিশেষ বাধা সৃষ্টি না করলেও যে নতুন বিজ্ঞান শিখতে আরম্ভ করবে, তার পক্ষে খুবই অসুবিধা হবে। সুতরাং পরিতোষ্য আইনের সঙ্গে বানানের আইনেরও দরকার আছে।

(3) বাংলা ভাষার বিজ্ঞানের অধিধান প্রকাশিত হয়েছে, কিন্তু তাছাড়াও প্রতিটি বৈজ্ঞানিক শব্দের ব্যাখ্যাসম্বন্ধিত অধিধানের প্রয়োজন আছে। কারণ শব্দের ব্যাখ্যার সাহায্যে যে কোন পাঠক বিজ্ঞানের যে কোন শাখার বই অথবা প্রবন্ধ পড়ে বুঝতে পারবেন। প্রয়োজনমত বৈজ্ঞানিক শব্দ ব্যবহার না করেও কোন কিছু রচনা করা যাবে। এতে হয়তো রচনার আকার কিছু বড় হবে, কিন্তু সাধারণ মানুষকে বিজ্ঞান শিক্ষা দিতে বিশেষ সুবিধা হবে। কলে এক শব্দের একাধিক প্রতিশব্দ থাকলেও কোন অসুবিধা হবে না।

(4) কোন ভাষার কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ মানুষের ভেত্রে বিজ্ঞানের বই দেখা হবে, তা নির্ধারণ করা দরকার। আমরা কথা বলি চলিত ভাষায়, লিখি সাধু ও চলিত দুই ভাষাতেই। কিশোর-কিশোরী ও সাধারণ মানুষের কাছে চলিত ভাষা যত আপন, সাধু ভাষা ততটা নয়। সুতরাং আবার যেন হয় চলিত ভাষার মাধ্যমে সাধারণভাবে দৈনন্দিন জীবনে বা দেখতে পাওয়া যায়, তাৎক্ষণিক উপাধরণ দিয়ে বই বা প্রবন্ধ লিখলে বিজ্ঞানে অজ্ঞ যে কোন ব্যক্তি অতি সহজে বিজ্ঞানের যে কোন বিষয় বুঝতে পারবে এবং প্রাত্যহিক জীবনে বৈজ্ঞানিক শিক্ষার অভিজ্ঞতা প্রয়োগ করতে পারবে।

সব শেষে একটি কথাই বলা যায়—সব কিছুই পরিপূর্ণতা লাভ করবে সেদিন, যেদিন বাঙালী বিজ্ঞান-শিক্ষকেরা সর্বস্তরে বাংলা ভাষার বিজ্ঞান পড়াতে সাগ্রহে এগিয়ে আসবেন। যত দিন তাঁরা ত্যাগ স্বীকার না করবেন, তত দিন বাংলা ভাষার বিজ্ঞান সাময়িকীতেই নিবদ্ধ থাকবে, উচ্চ শিক্ষার দরজা দিয়ে ঢুকতে পারবে না।

“বহু শতাব্দী পূর্বে ভারতের জ্ঞান সার্বভৌমিকরূপে প্রচারিত হইয়াছিল। এই দেশে নালন্দা এবং তক্ষশিলার দেশ-দেশান্তর হইতে আগত শিক্ষার্থী সাদরে গৃহীত হইয়াছিল। যখনই আমাদের দিবার শ্রুতি জন্মিয়াছে, তখনই আমরা মহৎরূপে দান করিয়াছি। কুত্রে কখনই আমাদের তৃপ্তি নাই। সর্ব জীবনের স্পর্শে আমাদের জীবন প্রাণময়। বাহা সত্য, বাহা স্মরণ, তাহাই আমাদের আরাধ্য।”

—আচার্য জগদীশচন্দ্র

# নিষ্ক্রিয় গ্যাসের আবিষ্কার

অরূপ রায়

ইনার্ট গ্যাস—বাংলায় বলা হয় নিষ্ক্রিয় গ্যাস। ব্যবহার্য হইতেই বোকা বায়ু যে, ইহারা রাসায়নিক বিক্রিয়ার অক্ষর অর্থাৎ নিষ্ক্রিয়। হিলিয়াম, নিয়ন, আর্গন, ক্রিপটন, জেনন ও র্যাডন—এই ছয়টি গ্যাসকেই নিষ্ক্রিয় গ্যাস বলা হয়। ইহাদের সংকেত—বর্ণাক্ষরে He, Ne, A, Kr, Xe ও Rn। একমাত্র র্যাডন ছাড়া আর বাকী সব গ্যাস-গুলিই বায়ুমণ্ডলে পাওয়া যায়, তবে খুবই সামান্য পরিমাণে। বায়ুমণ্ডলে ইহাদের আয়তন হিসাবে ঘোটাছুটি আপেক্ষিক হিতি :

He-0'00052, Ne-0'0015, A=0'9323, Kr-0'0001 ও Xe=0'000009.

পৃথিবীতে স্বল্প পরিমাণে উপস্থিতির জন্যই বিজ্ঞানীদের কাছে ইহারা বহুদিন অজ্ঞাত ছিল। প্রকৃতপক্ষে 1785 সালে ইংরেজ বিজ্ঞানী ক্যাতে-গিস নিজের অজ্ঞাতসারেই একটি পরীক্ষার মাধ্যমে নিষ্ক্রিয় গ্যাসগুলি আবিষ্কারের সূত্রপাত ঘটান। সকল স্থানের বায়ুমণ্ডলের উপাদানসমূহ অতিরিক্ত কিনা দেখিবার জন্য তিনি একটি বিশেষ ধরনের পরীক্ষা-কার্য চালান। একটি আবদ্ধ কাঁচপাত্রের মধ্যে গাঢ় KOH দ্রবণের উপর অতিরিক্ত অক্সিজেন মিশ্রিত বায়ু লইয়া তাহার মধ্যে তিনি বৈজ্ঞানিক ফুরণ ঘটান। কালে নাইট্রোজেনের সহিত অক্সিজেনের বিক্রিয়া যে সকল নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়, তাহার KOH-দ্রবণে শোষিত হইয়া যায় এবং অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি পটাসিয়াম সালফাইড (K<sub>2</sub>S) দ্রবণে শোষিত করান, কিন্তু তিনি লক্ষ্য করেন যে, কিছুটা গ্যাস অশোষিত অবস্থায় পড়িয়া থাকে। বাহার আয়তন ক্যাতেগিসের ভাষায়, ".....not more than

1/10th part of the whole." তিনি এই অশোষিত গ্যাসের স্বরূপ ও রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যর্থ হন। কালে তাঁহার পরীক্ষাটিও আর বেশী দূর অগ্রসর হয় নাই।

ক্যাতেগিসের পরীক্ষার এক শতাব্দীরও পরে 1892 সালে Lord Rayleigh দেখিতে পান যে, বায়ুমণ্ডল হইতে অত্যন্ত গ্যাস অপসারণ করিয়া প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন ও নাইট্রোজেন যৌগ হইতে প্রাপ্ত এক লিটার নাইট্রোজেন গ্যাসের ওজন বর্ণাক্ষরে 1'2576 gm<sup>৭</sup>. ও 1'2506 gms, অর্থাৎ বায়ুমণ্ডল হইতে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস, রাসায়নিক উপায়ে প্রাপ্ত নাইট্রোজেন গ্যাস হইতে 0'5% ভারী। তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করিয়া যখন কোনও সহুতর দিতে পারিলেন না, তখন এই পর্যবেক্ষণের কথা তিনি Sir William Ramsay-কে জানান। লর্ড র্যালের পর্যবেক্ষণের উপর রায়কে সিদ্ধান্ত করেন যে, বাতাসে কিছু অনাবিষ্কৃত ভারী গ্যাসের উপস্থিতির কালেই নাইট্রোজেনের ঘনত্ব দুই রকম পাওয়া বাইতেছে।

রায়কে ও র্যাগে যখন এই বিষয়টির রহস্য উদ্ঘাটনে ব্যাপৃত ছিলেন, হঠাৎ তখন এক শতাব্দীরও বেশী পূর্বে সম্পাদিত ক্যাতেগিসের পরীক্ষাটির উপর তাঁহাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। অনেক রকম উন্নতি সাধন করিয়া পৃথক পদ্ধতিতে তাঁহারা পরীক্ষাটি আবার করিয়া দেখেন।

র্যাগে আয়তন হিসাবে 9 ভাগ বাতাস ও 11 ভাগ অক্সিজেনের মিশ্রণ লইয়া 50 লিটারের একটি কাচের দোবের মধ্যে সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইড (NaOH) দ্রবণের সান্নিধ্যে

প্লাটিনাম তড়িৎ-ধারের সাহায্যে বৈদ্যুতিক ক্ষরণ ঘটান। উৎপন্ন  $\text{NO}_2$  সোডিয়াম হাইড্রোক্সাইডে দ্রবীভূত হয় ও অতিরিক্ত অক্সিজেনকে তিনি অ্যালকালাইন পাইরোগ্যালেন্ট দ্রবণে শোষিত করাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটিকে সংগ্রহ করেন।

রায়মজে উদ্ভূত Cu-এর উপর দিয়া কিছু পরিমাণ বাতাস বার বার প্রবাহিত করাইয়া উহার অক্সিজেনকে সম্পূর্ণরূপে শোষিত করান ও নাইট্রোজেন গ্যাস অপসারণ করিবার জন্য উহাকে উদ্ভূত Mg-এর উপর দিয়া পরিচালিত করেন। এইভাবে অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন গ্যাস সম্পূর্ণরূপে অপসারণ করিবার পর শেষ পর্যন্ত তিনি যে অবশিষ্ট গ্যাস পান, তাহার ঘনত্ব দেখা যায় 19°4 ( $H=1.0008$ ) ও আয়তন পরীক্ষায় ব্যবহৃত বাতাসের আয়তনের  $\frac{1}{8}$  ভাগ। তিনি এই গ্যাস ও ক্যাতেডিসের পরীক্ষা অল্পবারী প্রাপ্ত গ্যাসের বর্ণালী বিশ্লেষণ করিয়া দেখেন যে, উহার অভিন্ন ও যে কোন জানা মৌল বা যৌগের বর্ণালী হইতে ভিন্ন। 1894 সালে র্যালো ও রায়মজে গ্যাসটিকে মৌলিক বলিয়া প্রমাণ করেন। গ্যাসটি উদ্ভূত খাত্ত, পটাশিয়াম পারম্যাঙ্গানেট ( $\text{KMnO}_4$ ), সোডিয়াম পারঅক্সাইড ( $\text{Na}_2\text{O}_2$ ) প্রভৃতির সহিত তো নয়ই—অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্লোরিন—এমন কি, ক্লোরিনের সঙ্গেও বৈদ্যুতিক ক্ষরণের সাহায্যে মিলিত হয় না। তাহার নিষ্ক্রিয়তার জন্য গ্যাসটির নাম দেন আর্গন (নিষ্ক্রিয়)।

1868 সালে সূর্যগ্রহণ চলিবার সময় Janseen সৌরবর্ণালী বিশ্লেষণের সময় সোডিয়ামের D-লাইন হইতে ভিন্ন জায়গায় একটি নূতন হলুদ লাইন পান। এই পর্যবেক্ষণ হইতে Frankland ও Lockyer সিদ্ধান্ত করেন যে, সূর্যে একটি নূতন মৌলিক পদার্থ বর্তমান। তাহার মৌলিক পদার্থটির নাম দিলেন হিলিয়াম (গ্রীক Helios—সূর্য)। 1889 সালে Hille-

brand ইউরেনিয়াম ধনিক ক্লেভাইট (Cleveite) লবু সালফিউরিক অ্যাসিডের সহিত উদ্ভূত করিয়া এক ধরণের গ্যাস পান, কিন্তু উহা যে কি গ্যাস, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন নাই। 1894 সালে রায়মজে গ্যাসটিকে নাইট্রোজেন সম্বন্ধে করিয়া পরীক্ষা-কাঁচ চালান। তিনি গ্যাসটির সহিত অক্সিজেন মিশাইয়া বৈদ্যুতিক ক্ষরণের সাহায্যে উহার সহিত মিশ্রিত নাইট্রোজেনকে উহার অক্সাইডে পরিণত করিয়া গাঢ় KOH দ্রবণে শোষিত করান। এইরূপে অত্যন্ত গ্যাসসমৃদ্ধ সরাইয়া অবশিষ্ট গ্যাসটির বর্ণালী লইয়া দেখিলেন যে, ইহা জানসিনের প্রাপ্ত বর্ণালী হইতে অভিন্ন। এইরূপে তিনিই প্রথম পার্থিব পদার্থ হইতে হিলিয়াম গ্যাস সংগ্রহ করেন। 1895 সালে Kayser বায়ুওলে গ্যাসটির অস্তিত্বের বিষয় প্রমাণ করেন।

রায়মজে 1896 সালে নবাবিষ্কৃত গ্যাস হিলিয়াম ও আর্গনকে পৃথাক সারণীতে একটি নূতন গ্রুপে স্থান দেন। তিনি তাহার নাম দেন জিরো গ্রুপ (Group O)। এই সময়ে তিনি সিদ্ধান্ত করেন যে, গ্রুপটিকে পূর্ণ করিতে কম করিয়া আরও একটি অনাবিষ্কৃত নিষ্ক্রিয় গ্যাস আছেই।

অবিচ্ছিন্ন তরল আর্গনকে আংশিক পাতন করিয়া রায়মজে ও Travers 1898 সালে আরও কয়েকটি মৌলিক নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পান। তাহার অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন দূর করিয়া বাতাস হইতে প্রাপ্ত অবশিষ্ট গ্যাসটিকে একটি বাষ্পে অতিরিক্ত চাপে রাখিয়া তরল বায়ুর সাহায্যে—185° সে.-এ শীতল করেন। এই সময় বেশীর ভাগ গ্যাসই তরল হইয়া যায়। বাষ্পটিকে তরল বায়ু হইতে সরাইয়া তরল অংশটিকে দ্রুত বাষ্পীভূত করিয়া গ্যাসীয় ও তরল দুইটি অংশে ভাগ করেন। প্রথমে এই গ্যাসীয় অংশটিকে তরল হাইড্রোজেনের সাহায্যে—240° ডিগ্রী সে.-এ শীতল করিলে ইহার কিছুটা অংশ কঠিন হইয়া



বার ও বাকী অংশ গ্যাসীয় অবস্থাতেই অপরিবর্তিত থাকে। গ্যাসীয় অংশটি হিলিয়াম ও কঠিন অংশটি একটি নূতন নিষ্ক্রিয় মৌলিক পদার্থ—নায় নিয়ন (গ্রীক—নূতন)। ইহার পর তরল অংশকে (বাহার বেষ্টার ভাগই আর্গন) তাঁহারা আংশিক পাতন করেন। আংশিক পাতনের (Fractional distillation) কালে প্রথমে আর্গন ও পরে বধাক্রমে ক্রিপটন (অজ্ঞাত) ও জেনন (আগজ্ঞক) নামক আরও দুইটি মৌলিক গ্যাস পান। এই গ্যাস দুইটিও নিষ্ক্রিয়। 120 টন তরল বায়ু হইতেও আর কোনও নিষ্ক্রিয় গ্যাসের সন্ধান পাওয়া যায় নাই।

পরবর্তী কালে শ্যাডন নামক নিষ্ক্রিয় গ্যাসটি তেজস্ক্রিয় বিকিরণ (Radioactive decay) উৎপাদক হিসাবে পাওয়া যায়। এই নিষ্ক্রিয় গ্যাসটির দুইটি আইসোটোপ—Actinon ও Thoron।

1907 সালে Cady ও Mc Farland-এর অহুসঙ্কানের কালে জানা গেল যে, ক্যান্সাসের বিশেষ কিছু অংশে প্রাপ্ত প্রাকৃতিক গ্যাসে আরডন হিসাবে 1.84% হিলিয়াম বর্তমান। এই হইল নিষ্ক্রিয় গ্যাস আবিষ্কারের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

## পদার্থের চতুর্থ অবস্থা

### পার্থসারথি চক্রবর্তী\*

সাধারণতঃ প্রকৃতিতে আমরা পদার্থের তিন প্রকার রূপ দেখতে পাই—কঠিন, তরল এবং গ্যাসীয়। জলের তিন রকম বিভিন্ন অবস্থার নাম বরফ, জল এবং জলীয় বাষ্প। কঠিন অবস্থার পদার্থের তিতরের অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ খুব বেশী। উত্তাপের সংস্পর্শে এলে কঠিন পদার্থের অণুগুলি উত্তেজিত হয়ে ওঠে এবং উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে অণুগুলির পরস্পরের প্রতি আকর্ষণ কমেতে থাকে। অধিক তাপমাত্রার অণুগুলি আরও দ্রুত পরিভ্রমণ করে এবং ফুটনাতে অণুগুলির নিজেনের তিতর আকর্ষণ খুব বেশী কমে যাওয়ার কালে তারা গ্যাসীয় অবস্থার রূপান্তরিত হয়।

গ্যাসকে 1000° থেকে 5000° সেন্টিগ্রেড পর্যন্ত উত্তপ্ত করলে তা পরমাণুতে পরিণত হয়। আর 10,000° সেন্টিগ্রেড উষ্ণতার পরমাণুগুলি বৈদ্যুতিক আধানসম্পন্ন নিউক্লিয়াস এবং ইলেকট্রনে ভেঙে পড়ে। এই সময় পরমাণুগুলির নিজেনের

মধ্যে ঘড়াহুড়ির ফলে তাদের বাইরের কক্ষের ইলেকট্রনগুলি সবেগে ছিটকে বেরিয়ে আসে এবং গ্যাস আয়নিত হয়। এই অবস্থাকে প্লাজমা অথবা পদার্থের চতুর্থ অবস্থা বলা হয়।

সাধারণভাবে বলতে গেলে বলা যায়, প্লাজমা অতিমাত্রার আয়নিত গ্যাস এবং এর নির্দিষ্ট আয়তনের তিতর সমসংখ্যক ধনাত্মক আয়ন এবং মুক্ত ইলেকট্রন বর্তমান থাকে। প্লাজমার মধ্যে নিরপেক্ষ গ্যাস-অণু এবং পরমাণু থাকতে পারে আবার না-ও থাকতে পারে। পদার্থের গ্যাসীয় অবস্থার সঙ্গে এর কিছুটা সাদৃশ্য আছে। তবে গ্যাসের সঙ্গে এর সবচেয়ে বড় পার্থক্য এই যে, প্লাজমা খুব ভালভাবে বিদ্যুৎ পরিবহন এবং ধারণ করতে পারে। উপরন্তু এটি চৌম্বক এবং বৈদ্যুতিক ক্ষেত্রে ক্রিয়া করে। প্লাজমার গতি-

\*রসায়ন বিভাগ, কৃষ্ণনগর সরকারী কলেজ, কৃষ্ণনগর, বঙ্গোপসাগর।



বিবিধ অত্যন্ত চার্জড বা আহিত কণিকাগুলির থেকে বত্বর।

### প্লাজ্মার উৎপত্তিস্থান

সবচেয়ে মজার কথা এই যে, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের শতকরা 99.9 ভাগই রয়েছে প্লাজ্মা অবস্থায়। পৃথিবীর অভ্যন্তর ভাগ, আয়নোফিয়ার, সূর্যের মধ্যভাগ (যেখানে উষ্ণতা প্রায়  $10^6$  কেলভিন), নক্ষত্রমণ্ডলী, নীহারিকা, নীহারিকার মধ্যবর্তী স্থান ইত্যাদির পদার্থসমূহ প্লাজ্মা অবস্থায় রয়েছে। রসায়নগারে বিশেষ বিশেষ পদ্ধতির সাহায্যে ডিসচার্জ-টিউবে প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়।

### প্লাজ্মার ইতিহাস এবং গুরুত্ব

প্লাজ্মা সম্পর্কিত পদার্থবিজ্ঞান সত্ত্বে ভালভাবে গবেষণা চলে 1929 খৃষ্টাব্দে। বিজ্ঞানী আরভিং ল্যাংম্যুর এবং টংক্ ডিসচার্জ টিউবে আননিত গ্যাসের সঞ্চালন লক্ষ্য করার সময় দেখেন, সেটা অনেকটা প্লাজ্মা জেলীর মত। প্লাজ্মা জেলী থেকেই প্লাজ্মা নাম দেওয়া হয়েছে। উইলিয়াম ক্রুক্সও নিম্নচাপের ডিসচার্জ-টিউবের বিভিন্ন ঘটনা দেখে মনে করেন, পদার্থের চতুর্থ অবস্থা সম্ভব। প্লাজ্মা অবস্থার গুরুত্ব দেখা দিল তখন, যখন প্লাজ্মা ডেট, প্লাজ্মা টর্চ ইত্যাদির প্রচলন শুরু হলো। পরে উচ্চ গতিতে রকেট চালাবার জন্তে, মহাশূন্যে যেতার-বিদ্যুতের সাহায্যে কথাবার্তার জন্তে এবং উচ্চ তাপ সম্পর্কিত গবেষণার ক্ষেত্রে প্লাজ্মা অপরিহার্য হয়ে উঠলো। বর্তমানে পৃথিবীর বহু দেশে ফিউসন বিক্রিয়ার জন্তে প্লাজ্মার নির্মিত পাত্রে আবিষ্কারের চেষ্টা চলছে পুরাতম। উত্তপ্ত প্লাজ্মা থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা যায় কিনা, সে বিষয়েও বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীরা চিন্তা করছেন।

### প্লাজ্মা উৎপাদন ও রক্ষণ

সাধারণতঃ দুটি উপায়ে প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়ে থাকে। (এক)—পিন্চ ক্রিয়ার সাহায্যে

এবং (দুই)—উচ্চ শক্তিসম্পন্ন ডায়টেরিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ভজন-2) অণুর ঘোড়ক কার্বন আর্কের সাহায্যে ডায়টেরিয়াম পরমাণুতে পরিণত করে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রে মিসর বহু, টরাস অথবা স্টিগারেটর বহুর দ্বারা ধরে রাখা প্লাজ্মার ভিতর দিয়ে উচ্চ চাপের বিদ্যুৎ-তরঙ্গ পাঠিয়ে সরাসরি ইলেকট্রনকে উত্তপ্ত করে এক কিলোইলেকট্রন ভোল্ট শক্তিতে রূপান্তরিত করা সম্ভব হয়েছে।

পিন্চ ক্রিয়া—সিলিণ্ডারের ভিতর পিষ্টনের সাহায্যে যেমন গ্যাসকে সঙ্কুচিত করা হয়, ঠিক সে রকম উপায়ে চুম্বক-প্রশমন প্রক্রিয়ার সাহায্যে Magnetic compression) প্লাজ্মা উৎপন্ন করা হয়। খুব শক্তিশালী কয়েক কোটি অ্যাম্পিয়ার একাভিমুখী বিদ্যুৎ একটি সিলিণ্ডারের ভিতরের পরিবাহী গ্যাসের মধ্য দিয়ে পাঠালে একটি চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয়। এই চৌম্বক ক্ষেত্রের এক দিক কমিয়ে এবং অন্য দিক বাড়িয়ে দিলে প্লাজ্মা খুব ক্রত চলাকরা করতে থাকে এবং সিলিণ্ডারের ভিতরের দিকের গ্যাসকে প্রশমিত করে। এই ঘটনাকেই টংক্ 1939 খৃষ্টাব্দে পিন্চ ক্রিয়া নামে অভিহিত করেন।

ফিউসনের বিষয় গবেষণার জন্তে সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো—ডায়টেরিয়াম অথবা ডায়টেরিয়াম ও ট্রিটিয়াম (হাইড্রোজেন আইসোটোপ, পারমাণবিক ভজন 3) মিশ্রণের সাহায্যে 100 কোটি ডিগ্রী পরম উষ্ণতাবিশিষ্ট অতি উত্তপ্ত বিদ্যুৎ-শক্তিতে রূপান্তরিত করে তবিত্তে বহু কল্যাণমূলক কাজ করার প্রকল্প রয়েছে বিজ্ঞানীদের হাতে।

প্লাজ্মা-কণিকাগুলি উচ্চ উষ্ণতাসম্পন্ন হবার কলে ( $10^6$ °K) ও অভিযাত্রার উদ্বেজিত অবস্থার জন্তে খুব শক্তিশালী ( $10^4$  e. v) হয়ে থাকে এবং পাত্রে গায়ে এদের আঘাত করার

সম্ভাবনা থাকে। পাত্রে গায়ে প্রাক্‌মা কণিকা-গুলির আঘাতের ফলে তাৎক্ষণিক উদ্ভূত শক্তির বেশ কিছুটা অংশ কমে বাবে। শুধু তাই নয়, উদ্ভূত প্রাক্‌মার ভিতর ইলেকট্রন ও নিউক্লিয়াসগুলির ঝড়ঝাকির ফলে তাৎক্ষণিক এক-রে বিচ্ছুরিত হয়। প্রাক্‌মার উত্তেজিত ইলেকট্রনগুলি থেকেও সিনক্রোট্রোন রশ্মি নির্গত হয় এবং তার ফলে এতদ্বারা শক্তির কিছুটা অংশ বিনষ্ট হওয়াও বিচিত্র নয়। বর্তমানে কিউসন বিকিরার ক্ষেত্রে এমন একটি পাত্র নির্মাণের চেষ্টা চলছে, যার মধ্যে খুব কমসংখ্যক প্রাক্‌মা-কণিকা পাত্রে গায়ে সজে থাকে যেতে পারে এবং যেখানে অনেককণ ধরে কিউসন-বিকির্য চালনা সম্ভব হবে। সে ক্ষেত্রে একটি বৈদ্যুতিক চুম্বক পাত্রে ভিতর প্রাক্‌মাকে রক্ষণের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই

পাত্রে মধ্যে থাকলে প্রাক্‌মা কণিকাগুলির পাত্রে গায়ে খুব বেশী ঝাঝা ঝাঝার সম্ভাবনা থাকবে না। বাইরে থেকে চৌম্বক ক্ষেত্র সৃষ্টি করে ম্যাগনেটিক মিররের সাহায্যে প্রাক্‌মার স্থায়িত্ব বাড়ানো হয়। প্রাক্‌মাকে উদ্ভূত রাধা এবং রক্ষণের ক্ষেত্রে আজকাল স্টিলারেটর পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হচ্ছে।

অতি উদ্ভূত প্রাক্‌মার উষ্ণতা প্রায়  $10^{10}$  পর্যন্ত হতে পারে এবং নিউট্রন থার্মোমিটারের সাহায্যে তা মাপা যায়। বিজ্ঞানীরা প্রাক্‌মা ব্যবহারের বিভিন্ন দিকের কথা এখন চিন্তা করছেন। আমরা সেই দিনের ক্ষেত্রে অপেক্ষা করবো, যে দিন বিজ্ঞান প্রাক্‌মাকে মানুষের দৈনন্দিন জীবনের কাজে লাগিয়ে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা করবে।

## কৃষির কয়েকটি দিক

### সভ্যত্বনাথ গুপ্ত

পৃথিবীর প্রায় দুই-তৃতীয়াংশেরও বেশী লোক উপযুক্ত খাদ্য পায় না। সমগ্র লোকসংখ্যার প্রায় শতকরা 71 ভাগ লোক অল্পরত অঞ্চলে বাস করে। তারা সমগ্র উৎপন্ন খাদ্যের মাত্র 42 ভাগ উৎপাদন করে এবং আর করে আরও কম—মাত্র 21 ভাগ। লোকসংখ্যা দ্রুতগতিতে বাড়ছে সন্দেহ নেই, কিন্তু খাদ্যের পরিমাণ বাড়ানো কি সম্ভব নয়? যদি 1952-56 সালের মাথাপিছু গড় হিসাবে উৎপন্ন খাদ্যকে 100 ধরা যায়, তাহলে দেখা যাবে 1963 সালে ওটা বেড়ে দাঁড়িয়েছিল 109-তে এবং 1965 সালে 110-এ। এটা হলো পৃথিবীর গড় হিসাব, কিন্তু দেশে দেশে ব্যতিক্রম রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ ও রাশিয়ার যেমন বেড়ে গিয়ে 1966 সালে দাঁড়িয়েছিল 141, তেমন অধিকতর খাদ্য

উৎপাদনকারী দেশগুলিতে (যেমন পশ্চিম ইউরোপ ও উত্তর আমেরিকার) বৎসরকমে 120 ও 100-তেই দাঁড়িয়ে আছে। মেক্সিকো 1952 সালের 90 থেকে 1964 সালে ছুলেছে 127, জাপান ছুলেছে 99 থেকে 120-তে। ভারতবর্ষে 1960-61 সালে বেড়ে গিয়ে হয়েছিল 108, কিন্তু 1965 সালে আবার কমে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল 97-তে।

খাদ্যের উৎপাদন বাড়াতে কি কি জিনিষের প্রয়োজন এবং কতটাই বা এর সীমা? আলো, বাতাস, জল, সার ছাড়াও দরকার উন্নত ধরনের বীজ, রোগমুক্তির ব্যবস্থা এবং সর্বোপরি সব মিলিয়ে একটা সুস্থ প্রয়োগ-কৌশল। কনসেলর জেনে বো হুর্শের আলোর দরকার হয়, তার উপর

আমাদের হাত নেই; কাজেই সেটাই শেষ সীমা।

কৃষিযোগ্য ভূমিতে ঘোঁটানুটিভাবে প্রতি বর্গ-সেন্টিমিটারে 70 থেকে 210 কিলোক্যালোরির মত সূর্যকিরণ পড়ে। এক টন শুক জৈব পদার্থ উৎপাদনে প্রায় 100 ক্যালোরির মত সূর্যকিরণ দরকার হয়। এই হিসাবে দেখা গেছে, খুব ভাল-ভাবে কসল উৎপাদনে যদি একর প্রতি 4 টন শুক জৈব পদার্থ পাওয়া যায়, তাহলেও যে পরিমাণ সূর্যের শক্তি আহরিত হয়, সেটা মাত্র ঐ স্থানে

পতিত একদিনের সূর্যকিরণের সমান। যদিও সব দিক হিসাব করে দেখানো যায় যে, অন্ততঃ শত-করা 20 ভাগ সূর্যকিরণকে আমরা কাজে লাগাতে পারি, কিন্তু নীচের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যাবে—কত সামান্য পরিমাণই মাত্র আধুনিক বিজ্ঞান ব্যবহার করতে পারছে। যে সংখ্যাগুলি নীচে দেওয়া গেল, সেগুলি উৎপন্ন কসলে অদ্বীত সূর্যকিরণ ও সেই স্থানে পতিত সমগ্র সূর্যকিরণের অনুপাতের দশ হাজার ভাগ।

	ফ্রান্স	রাশিয়া	ইউ. এস. এ.	জাপান	ইউ. এ. আর.	ভারত	পাকিস্তান
শত	36	23	28	34	19	8	7
চাল	23	10	17	16	11	3	4

কাজেই দেখা যায় যে, প্রচুর পরিমাণ শক্তি আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে। কিতাবে এর সমাধান করা যায়, তা নির্ভর করছে কসল উৎপাদনের অন্ত্যন্ত বিষয়গুলির উপর।

প্রথমেই আসে জলের কথা। উপযুক্ত পরিমাণ জলসেচের ব্যবস্থা থাকলে যেমন আকাশের দিকে তাকিয়ে থাকতে হয় না, তেমনি একই ভূমিতে একাধিকবার কসলও উৎপাদন করা চলতে পারে। আমাদের দেশে বছরের বেশ কিছু সময় যেমন বৃষ্টি হয় না, তেমনি উপকূল অঞ্চল, আসাম ও বাংলা দেশ ছাড়া অন্তত অধিকাংশ স্থানেই বৃষ্টিপাতের উপর নির্ভর করা চলতে পারে না। কাজেই কৃত্রিম জলসেচের ব্যবস্থা খুবই জরুরী। ভারতবর্ষের বার্ষিক গড় নদীর জল-প্রবাহের হিসাবে জলশক্তির পরিমাণ 1,356 বিলিয়ন একর ফুটের মত। এর মধ্যে প্রায় 450 মি: এ: ফু: জলসেচের কাজে লাগানো যেতে পারে। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার প্রাকালে প্রায় 76 মি: এ: ফু: (17%)-এর মত জলসেচের ব্যবস্থা ছিল। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে প্রায় 45%-এর মত নদীপ্রবাহ কাজে লাগানো যাবে বলে ধরা

হয়েছে, অর্থাৎ অধেকেরও বেশী নদীর জল কাজে লাগাতে পারা যাবে না 20 বছরেরও বেশী চেষ্টায়। এ তো গেল নদীপ্রবাহের কথা, এছাড়াও যুতিকার মধ্যস্থিত প্রায় 300 মি: এ: ফু: জলের অন্ততঃ 75 মি: এ: ফু: জল সেচের কাজে ব্যবহৃত হতে পারে। তৃতীয় পরিকল্পনার শেষে এর মধ্যে মাত্র 42 মি: এ: ফু: জলের ব্যবস্থা করা গেছে। এসব হলো সেচ-পরিকল্পনার অন্তর্ভুক্ত জলের পরিমাণ। এর সবটাই কৃষিকার্যে ব্যবহার করা যাচ্ছে না। 1964-55 সাল পর্যন্ত কৃষিযোগ্য জমির শতকরা মাত্র 19 ভাগ সেচ-পরিকল্পনার আওতায় আনা গেছে, বাকী সবই রয়েছে প্রকৃতির দয়ার উপর। নতুন নতুন সেচ-প্রকল্প অপেক্ষা বর্তমান সেচ-ব্যবহার পূর্ণ সমাধান করার করতে না পারাটাই এখন যারাম্বক সমস্যা হয়ে দেখা দিয়েছে। সেচ-ব্যবহার অধেকেরও বেশী জল ভূমিতে অব্যবহৃতই রয়ে গেছে।

জলের পরেই আসে সারের কথা। ভারত-বর্ষের অধেকেরও বেশী ভূমিতেই (157 বিলিয়ন হেক্টর, সমগ্র দেশের প্রায় 52%) কৃষিকার্য হয়, যেখানে আমেরিকায় 20%, জাপানে 16%,

জাশিয়া ১০% এবং ক্যানাডার মাত্র হয় ৪%, অথচ উৎপন্ন কলনের পরিমাণ কত কম। নাইট্রোজেন, জৈব সার, কস্করাস প্রভৃতির ঘাটতি এর একটি প্রধান কারণ। হিসাব করে দেখা গেছে কর্ষণযোগ্য সমস্ত জমি থেকে বছরে প্রায় ২.৫ বিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন ধুয়ে বেরিয়ে যায় অথচ ১৯৬৬-৬৭ সালে মাত্র ৭ লক্ষ টন নাইট্রোজেনের ব্যবহার হয়েছে এবং চতুর্থ পরিকল্পনার শেষে ২ বিলিয়ন টনের মত নাইট্রোজেন সার উৎপাদন করবার পরিকল্পনা রয়েছে। ১৯৭০-৭১ সালে প্রায় ১২৫ বিলিয়ন টনের মত খাত্তশস্ত উৎপাদনের জন্তে ২.৪ মিঃ টন নাইট্রোজেন, ১ মিঃ টন কস্করাস ও ৭ লক্ষ টন পটাস সারের ব্যবহার লক্ষ্যমাত্রা হিসাবে রাখা হয়েছে। সব যদি ঠিকমত চলে, তাহলে এর বেশ কিছুটাই আয়দানী করতে হবে। নাইট্রোজেন সারের জন্তে প্রধান কাঁচামাল জাপ্‌খা উৎপাদনের মোটামুটি ব্যবস্থা হলো ও কস্কেট ও কোন কোন ক্ষেত্রে নাইট্রোজেন সারের জন্তেও প্রয়োজনীয় কস্কেট খনিজ ও গন্ধকের দিক থেকে আমরা অনেকটাই পরমুখাপেক্ষী। গন্ধকের পরিবর্তে পাইরাইটের ব্যবহার ও কস্কেট খনিজের নতুন নতুন খনির খোঁজ চলছে। ইতিমধ্যে রাজহান ও উত্তর প্রদেশে কিছু খনিজ কস্কেটের খোঁজ পাওয়া গেছে। পটাসের প্রায় সবটাই আয়দানী করতে হয়।

ভারতের জমির প্রায় সর্বত্রই নাইট্রোজেন সারের অত্যন্ত প্রয়োজন, শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ আরও কস্করাস ও প্রায় ৬৩ ভাগের দরকার অভিরিক্ত পটাস। এই বেখানে অবস্থা, সেখানে সারের ব্যবহার খুবই হতাশাব্যঞ্জক। সব মিলিয়ে বর্তমানে মাত্র ৩.৪৬ কেজির মত সার প্রতি হেক্টরে, যেখানে নেদারল্যান্ডে প্রায় ৫৫৭ কেজি এবং পৃথিবীর গড় ২৭.৪৫ কেজি (১৯৬৪-৬৫)। চতুর্থ পরিকল্পনার শেষেও যদি সবটাই ব্যবহার করা যায়, তবু হেক্টর প্রতি নাইট্রোজেন

সারের পরিমাণ কাঁড়াবে মাত্র ১৪ কেজির মত, যেখানে তাইওয়ানে ১৫০ কেজি ও জাপানে ১২০ কেজির মত ব্যবহৃত হয়। এখানেই কোন কোন জমিতে পরীক্ষা করে দেখা গেছে, হেক্টর প্রতি ২০ কেজি নাইট্রোজেন ব্যবহারে প্রায় ২৫৯ কেজি বেশী চাল ও ৩৫০ কেজি বেশী গম পাওয়া যায়। তার মানে টাকার হিসাবে প্রায় ১ টাকার নাইট্রোজেন সার চালের বেলায় ২.৪ টাকা ও গমের বেলায় ২.৬ টাকা বেশী লাভ দিয়েছে।

বেশী কলনের জন্তে সারের সঙ্গে দরকার উন্নত জাতের বীজ। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে প্রস্তুত সার জাতের বীজ কৃষিতে বিপ্লব এনে দিয়েছে। এগুলির সার গ্রহণক্ষমতাও যেমন বেশী, তেমনি বিশেষ বিশেষ আবহাওয়া ও পরিবেশের উপযোগী করে তৈরি করাও সম্ভব। তবে প্রধান অসুবিধা—উপযুক্ত তত্ত্বাবধানে বীজ তৈরি করতে হবে, অত্যন্ত নিয়ম অনুসারে কলনের একটা অংশ বীজ হিসাবে রেখে দেওয়া চলবে না। উন্নত ধরনের বীজ নিয়ে গবেষণা ও উৎপাদনের জন্তে ১৯৬০ সালে জাশিয়া সিড কর্পোরেশনের সৃষ্টি হয়েছে। এরা ইণ্ডিয়ান এগ্রিকালচারাল রিসার্চ ইনস্টিটিউটের সহযোগিতার ও আমেরিকার সাহায্যে অনেক নতুন জাতের সার বীজ তৈরি করেছেন। গড় ১০১, ২ ও ৩, রজিত, ডেকান, হিমালয় ১২৩ প্রভৃতি তুটোর বীজ; সি. এস্‌ এইচ. ১ ও ২ জোয়ার; এইচ. বি. ১ বজরা; সোনারা ৬৪, লারসা রোজো ও সরবতী সোনারা গম, এ. ডি. টি. ২৭, তাইচুং নেট্ট ১, তাইনান ৩, আই. আর ৭ ও ৪ ধান; আসিরিয়া মিটুও বাদাম; পুসা সাও-রানি ঢেড়স এবং বোগেজিল ছোলা ইত্যাদি বহু রকমের সার বীজ নিয়ে গবেষণা চলছে। এছাড়াও এই কর্পোরেশন পুসা কবি টোম্যাটো, পুসা পার্পল বেগুন, পুসা কাটকি ফুলকপি, পুসা লকা প্রভৃতি নতুন জাতের উচ্চ ফলনক্ষম সারি বীজও তৈরি করেছে। ইণ্ডিয়ান কাউন্সিল অফ এগ্রি-

কাগজারাল রিসার্চ-এর তত্ত্বাবধানে উন্নত ধরনের আয়, কলা, লেবু, আঙ্গুর, পেয়ারা, আনারস ও আপেলের বীজ উৎপাদনের কাজও চলছে। বেশী কলন ছাড়াও কসলে অন্তান্ত গুণ আনবারও চেষ্টা চলছে অবিচল। রক্টগেন রস্মির প্রয়োগে অধিকতর প্রোটিনযুক্ত গমের বীজ তৈরি করা গেছে যেমন, ডেমনি পারমাণবিক রস্মির প্রয়োগেও উচ্চ কলনশীল উন্নত গুণের ধান, গম, বার্লি, সরিষা, পীচ প্রভৃতির নতুন ধরনের বীজ উৎপাদন করা হয়েছে। উন্নত জাতের বীজের সুফল একটা উদাহরণ থেকেই বোঝা বাবে। উপযুক্ত সার প্রয়োগে তাইচুং নেটিভ 1 ধান হেক্টর প্রতি প্রায় 6,000 কেজি পাওয়া গেছে, যেখানে প্রচলিত জাতে পাওয়া যেত 700 থেকে 1000 কেজি মাত্র।

ভাল কসলের জন্তে এর পরও রয়েছে গাছকে নীরোগ রাখবার ব্যবস্থা। নানারকম পোকাকীড়, ছত্রাক ও অপ্রয়োজনীয় ক্ষতিকারক গুণ ইত্যাদির হাত থেকে কসল রক্ষার জন্তে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া দরকার। কসলের ক্ষতিকারক এই গুলিকে একত্রে বলা হয় পেট। এর বিরুদ্ধে তিন রকম প্রতিকারের ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। প্রথমতঃ নিজের হাতে বা বাস্তবিক পদ্ধতিতে ক্ষতিকারক গুণের অপসারণ, বীজ বপন ও কসল রোপণের উপযুক্ত সময় নির্বাচন এবং একই জমিতে পর্যায়ক্রমে বিভিন্ন ধরনের কসলের চাষ। দ্বিতীয় পদ্ধতি হলো বায়োলজিক্যাল প্রতিকার। এক রকম শত্রুর বিরুদ্ধে অন্য রকম জীবের ব্যবহার, নির্বাণ পুষ্কর প্রাণীর সৃষ্টি এবং ক্ষতিকারক পোকাকীড় ধ্বংসকারী ব্যাসিলাসের ব্যবহার। এসব ছাড়াও তৃতীয় পথ অর্থাৎ রাসায়নিক পেষ্টিসাইডের ব্যবহারই হয় সবচেয়ে বেশী। ক্রোমিয়াম সালফেট, ডি-ডি-টি, বি-এইচ-সি, নানারকম ঔষধ কস্মকাস, রাসায়নিক, তাইকিনাইল, কার্বা-মেট ইত্যাদির বহুল প্রচলন হচ্ছে। ধানের

পাতার পোকাকার জন্তে এনড্রিন, শিকড়ের বোগে অ্যালড্রিন এবং ধান ক্ষেতের আগাছা ধ্বংসের জন্তে প্রোপানিলের ব্যবহারে ভাল কল পাওয়া যায়। অন্তান্ত জিনিষের মত এই ব্যাপারেও আবার বেশ পিছিয়ে রয়েছে। 1963 সালের হিসাবে যেখানে জাপানে হেক্টর প্রতি 10,790 গ্রাম কীটনাশক ব্যবহৃত হয়েছে, আমাদের দেশে হয়েছে সেখানে মাত্র 149 গ্রাম। আমাদের দেশে কীটনাশক তৈরিও হয় না খুব বেশী। 1965-66 সালে কীটনাশক দ্রব্যাদির আবাদনীতে খরচ হয়েছে প্রায় 2 কোটি 60 লক্ষ টাকা।

যে যুগে ছোট-বড় প্রায় সব কাজেই যন্ত্রের ব্যবহার বেড়েই চলেছে, সেই যুগে জীর্ণ বলদে টানা হাল সত্যিই করুণ নয় কি? বড় বড় কো-অপারেটিভ ফার্মিং না থাকায় একদিকে যেমন ট্রাক্টরের বহুল প্রচলন হচ্ছে না, ডেমনি কৃষিজীবী প্রমিকের বেশ কিছুটা অংশকে শিল্পে টেনে আনবার উপযুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করতে না পারলে ব্যাপক বেকারত্বের আশঙ্কা এখনই পূর্ণ বস্তীকরণের লক্ষ্য রাখাও সম্ভব নয়। কিন্তু ছোটখাটো যন্ত্রের, যেমন—পাল্পিং সেট, পাওয়ার টিলার, পাওয়ার স্প্রয়ার ইত্যাদির ব্যাপক প্রচলন হতে পারে। এর জন্তে দরকার কৃষিতে আরও অর্থের বিনিয়োগ, ধারে কৃষকদের বহু সরবরাহের ব্যবস্থা ও সরলীকৃত ছোট যন্ত্রের সম্ভাব্য উৎপাদন।

1960 সাল থেকে 17টি রাজ্যের প্রত্যেকটির একটি করে জেলায় উপযুক্ত সার, বীজ ইত্যাদির প্রয়োগে নিবিড় চাষ পদ্ধতির প্রচলন হয়। 1966-67 সালে কলম্বরণ পূর্বের তুলনায় প্রায় ছয় গুণ বেশী কসল পাওয়া গেছে। এখন আরও বেশী জেলা (130টি) নিয়ে এই পদ্ধতির প্রয়োগ করা হচ্ছে।

এখানে পৃথিবীর কয়েকটি দেশের সঙ্গে মোটা-মুটভাবে আমাদের দেশের শস্য উৎপাদনের একটি তুলনামূলক হিসাব দেওয়া গেল (1964 সাল)।

দেশের নাম	বাধাপিছু কর্ষণযোগ্য জমি, ( 1/100 হেক্টর )	হেক্টর প্রতি সারের ব্যবহার কেজি	হেক্টর প্রতি কীটনাশক কেজি	হেক্টর প্রতি প্রধান শস্ত্র উৎপাদন কেজি
জাপান	6	304'39	10'79	5,480
ইউরোপ	14 ( ইউ. কে. )	119'94	1'47	3,430
ইউ. এন. এ.	96	43'68	1.49	2,600
আফ্রিকা	69 ( দক্ষিণ-আফ্রিকা )	21'18	0'127	1,210
ভারত	35	4'43	0'149	820

( 1 হেক্টর = 10,000 বর্গমিটার = 2'47 একর )

আধুনিক বিজ্ঞান : মরুভূমিকেও শস্তাভাব  
করবার চেষ্টা করছে। পৃথিবীর সমস্ত জমির প্রায়  
তিন ভাগের এক ভাগই হয় শুষ্ক অথবা আধা  
শুষ্ক। বালুকাময় মরুভূমির মোট আয়তন আফে-  
রিকা যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিগুণেরও বেশী। ভারতের  
পশ্চিম ভাগেও বেশ কিছুটা অংশ মরুভূমিকবলিত।  
সমুদ্রের লবণাক্ত জলের সাহায্যে বালুকাময় মরু-  
ভূমিতে কসল ফলাবার চেষ্টা চলছে। এই ধরনের  
জমিতে সমুদ্রজল ব্যবহারের সম্ভাব্যতার কারণ  
হলো—এই জলের ক্ষতিকারক লবণগুলি সাধারণ  
মাটির মত বালিকণায় জমতে পারে না, কলে জলটা  
নেমে যেতে পারে এবং বালিকণাগুলির মধ্যস্থিত  
আয়রায় বায়ু চলাচলের অন্ত্রবিধাও হয় না।  
গাছের পক্ষে ক্ষতিকারক সোডিয়াম ক্লোরাইড ও  
ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড সহজেই জলের সঙ্গে  
নেমে যায়, কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম দ্রবণীয় কিছু  
কিছু লবণ বালিতে থেকে গিয়ে গাছের কিছু

সুবিধাও করে দেয়। রস আহরণকারী শিকড়ের  
ভুলনায় বালিকণায় মধ্যস্থিত কীটগুলির ব্যাস দশ  
গুণেরও বেশী, কলে বায়ু চলাচলও ভালভাবেই হয়।  
উপরন্তু রাত্রিবেলার উপরের তাপ কমে গেলে  
বালুকাময় মাটির নীচের জল বাষ্পীভূত হয়ে উপরে  
শিকড়ের উপর জমে গিয়ে গাছের পক্ষে অত্যন্ত  
প্রয়োজনীয় তাল জলের অভাবও মেটায়।  
ইসরায়েলের বিজ্ঞানীরা নেগেভ মরুভূমিতে এই  
ব্যাপারে কিছু সাকল্যলাভও করেছেন। আমা-  
দের দেশে ভবনগরে অবস্থিত সেক্ট্রাল সল্ট অ্যান্ড  
মেরিন কেমিক্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউশন অব ইতিহা-  
তেও এই বিষয়ে কিছু কাজ চলছে। সেখানে  
ভারত মহাসাগরের জল ব্যবহার করে কিছু  
তৈলবীজ এবং গমও ফলানো হয়েছে।

সব কিছু মিলিয়ে এটা দেখা যাচ্ছে—খাদ্যের  
ব্যবস্থা আমাদের হাতের মধ্যেই; শুষ্ক প্রয়োগ-  
বিজ্ঞাই এনে দিতে পারে আমাদের সমৃদ্ধি।

## সঞ্চয়ন

### পরমাণু-শক্তির কল্যাণময় ভবিষ্যৎ

পারমাণবিক প্রযুক্তিবিদ্যা বা নিউক্লিয়ার টেক-নোলোজীর ক্ষেত্রে গত 27 বছরের মধ্যে প্রভূত উন্নতি হয়েছে। ঐ সময়ে পরমাণু নিয়ে বহু রকমের গবেষণা হয়েছে, নানা ক্ষেত্রে পরমাণু-শক্তি প্রয়োগ করে বিজ্ঞানীরা প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জন করেছেন। পরমাণু-শক্তির সাহায্যে মানুষের জীবনকে সমৃদ্ধতর করার ও কল্যাণ সাধনের ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের বর্তমানে কোন সন্দেহই নেই।

1942 সালের ডিসেম্বর মাসে শিকাগো সহরে প্রথম যে দিন পরমাণু ভাঙা হয় এবং পরমাণুতে নিহিত অসীম শক্তির সন্ধান পাওয়া যায়—সে দিনই এই ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়েছিল। আজ এই শক্তির সাহায্যে মানুষের যে কত রকমের কল্যাণ সাধিত হচ্ছে, এই শক্তি জ্ঞানের সীমানাকে যে কতদূর প্রসারিত করেছে, তা বিশ্বাস করাই কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছে।

1951 সালে রসায়নশাস্ত্রে নোবেল পুরস্কার-প্রাপ্ত বিজ্ঞানী এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারমাণবিক শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর গ্লেন টি. সীবার্গ সম্প্রতি বলেছেন যে, গত 27 বছরে পরমাণু-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে অনেক উন্নতি হয়েছে এবং তাতে সমগ্র মানবজাতির জন্তে, মানুষের কল্যাণ সাধনের জন্তে এক মহান ভবিষ্যতের বিনিয়োগ রচিত হয়েছে। আজ অস্পষ্টভাবে হলেও তার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

পরমাণু-শক্তিকে শিল্প ও চিকিৎসা-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেই অবিকতর পরিমাণে প্রয়োগ করা হচ্ছে। অন্ত্যন্ত ক্ষেত্রেও এর প্রয়োগ করা হচ্ছে। তবে বিদ্যুৎ উৎপাদনের জন্তেই এই শক্তিকে সবচেয়ে বেশী কাজে লাগানো হচ্ছে। পারমাণবিক চুল্লী বা

রিয়াক্টরের সাহায্যেই পরমাণু-শক্তি থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে যে ধরনের রিয়াক্টর তৈরি করেছে, সেই ধরনের পারমাণবিক চুল্লী বর্তমানে জাপান, সুইজারল্যান্ড, জার্মানী, স্পেন, ইটালী ও সুইডেনে ব্যবহৃত হচ্ছে। এই সকল রিয়াক্টর চালু করার জন্তে যে পারমাণবিক ইন্ধনের প্রয়োজন হয়ে থাকে, তা ঐ সকল রাষ্ট্রকে আমেরিকাই জুগিয়ে থাকে।

এতকাল কয়লা, তেল ও গ্যাসকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে। এই সব ইন্ধনের স্থলে পরমাণু-শক্তিকে ইন্ধন হিসাবে ব্যবহার করলে খরচ যে খুব বেশী পড়ে, তা নয়। যেখানে প্রচুর কয়লা ও অন্ত্যন্ত প্রাকৃতিক সম্পদ রয়েছে, সে সকল অঞ্চল সবচেয়ে এই কথাটা।

পরমাণু-শক্তির সাহায্যে রিয়াক্টরের সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের অনেকগুলি সুযোগ-সুবিধা আছে। ঐ সকল কারখানা খুব পরিচ্ছন্ন রাখা যায়, তাছাড়া সেখানে কোন রকম আগুনাজি হয় না। পারমাণবিক ইন্ধন আকারে খুবই ছোট এবং দীর্ঘস্থায়ী হয়ে থাকে। এর অপচয়ও অতি সামান্যই হয়ে থাকে এবং বখাখানে এদের সরিয়ে নিয়ে আশাও তেমন কঠিন কাজ নয়। কলে পারমাণবিক শক্তিচালিত বিদ্যুৎ-শক্তির কারখানার পরিবেশকে হিমহািম রাখা যায়।

কয়লা, তৈল প্রভৃতি জালিয়ে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করার সময় প্রচুর পরিমাণে ধোঁয়ার স্রষ্ট হয়, অপচয়ের পরিমাণও প্রচুর হয়ে থাকে। কয়লা জমা রাখবার জন্তে প্রচুর স্থান এবং



পরিবহনের ক্ষেত্রে গাড়ীর প্রয়োজন হয়ে থাকে। কয়লার ঘোঁরা আবহাওয়ায় খুবই অস্বাস্থ্যকর করে তোলে। এই সকল সমস্যা পরমাণু-শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনে দেখা দেয় না। বিশিষ্ট পরমাণু-বিজ্ঞানীদের অভিমত—ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের খরচ অনেক কমানো যাবে।

ভবিষ্যতে পরমাণু থেকে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে যে ইন্ধন ব্যবহার করা হবে, তা সংগৃহীত হবে সমুদ্র থেকে। রিসার্চের ভারী হাইড্রোজেন ব্যবহার করে অসম্ভব রকমের সস্তায় বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করা হবে।

গবেষণাগারের পরীক্ষা এবং তাত্ত্বিক পর্যালোচনার প্রমাণিত হয়েছে—যে ইন্ধনটি রয়েছে সমুদ্রের জলে, তা ব্যবহার করে কিউশন বা সংযোজন প্রক্রিয়ার বিপুল শক্তি উৎপাদন করা হবে। দুই পরমাণুর মিলনের মাধ্যমে শক্তি

উৎপাদনই এর মূল কথা। কিশন-পদ্ধতিতে পরমাণু থেকে শক্তি উৎপাদন করা হয়।

সংযোজন প্রক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্পর্কে এখনও বহু রকমের কঠিন কারিগরী সমস্যা রয়েছে। বর্তমানে আমেরিকায় এই সকল সমস্যা সমাধানের চেষ্টা হচ্ছে এবং এই বিষয়ে বিজ্ঞানীরা অনেকখানি অগ্রসরও হয়েছেন।

এই ব্যাপারে পূর্ণ সাক্ষ্য অর্জিত হলে অসুস্থ বিদ্যুৎ-শক্তির সম্ভাবন পাওয়া যাবে। বায়ু বা কাজে লাগিয়ে সমুদ্রের জলকে লবণাক্ত করে যেমন কৃষিকার্যে ব্যবহার করতে পারবে, তেমনই বিদ্যুৎ-শক্তির সাহায্যে সমুদ্রগর্ত থেকেও নানা রকম সম্পদ আহরণ করা মানুষের পক্ষে সম্ভব হবে। সে দিন মানুষের অগ্রবস্ত্রের সমস্ত সমাধানের ফলে পৃথিবীতে স্থায়ী ও প্রকৃত শান্তির পথও রচিত হবে।

### মানুষের বিবর্তন-পথের নতুন নিশানা।

বিবর্তনবাদ অনুসারে বানরসদৃশ কোন প্রাণী থেকেই মানুষের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তবে এরা কখন যে বিবর্তনের পথে বংশাধিকারের ধারার মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করেছে, বিজ্ঞানীরা বহুকাল থেকেই তা জানবার চেষ্টা করছেন। লক্ষ লক্ষ বছর পূর্বকার বিস্তৃত যুগের কঙ্কালের সম্মুখে বৃত্ত-বিজ্ঞানীরা দেশ-দেশান্তরে গিয়েছেন, কিন্তু এতকাল এই প্রশ্নের উত্তর মেলে নি।

সম্প্রতি দু-জন বিজ্ঞানী অস্ট্রেলিয়ায় এক-প্রকার জীবের ছোট চোয়ালের জীবাশ্ম বা কসিলের সম্মুখে গিয়েছেন। চোয়াল দুটি পাওয়া গেছে ইথিওপিয়ায় ক্রডলফ্ হ্রদের উত্তর দিকে এক ঘোতঘিনীতে। ১৯৬৯ সালে শিকাগো বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ডক্টর পি. ব্লার্ক হাওয়ার্ডের নেতৃত্বাধীনে

আফ্রিকার পূর্বাঞ্চলে তথ্যসম্ভাবী এক অতিবানের কলেই এই নিদর্শন পাওয়া গেছে।

আমেরিকার ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানী ডক্টর এনুইন এল. সাইমনস্ এবং ডক্টর ডেভিড আর. গিলবিন এই দুটি জীবাশ্ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পরীক্ষা করে এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছেছেন যে, এই চোয়াল দুটি এক প্রকার স্তম্ভপায়ী বিশদ জীবের। এরা আশী লক্ষ থেকে দেড় কোটি বছর পূর্বে এশিয়া ও আফ্রিকায় বিচরণ করতো। বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে কোনটিতে যে এই সকল জীবকে ফেলা হবে, অর্থাৎ ঐ জীবটি দেখতে মানুষের মত না বানরের মত ছিল—এই সম্বন্ধে তাঁরা এখনও কোন স্থির সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেন নি।



তবে ডক্টর সাইমনস্ এই সম্পর্কে বলেছেন যে, গঠন-প্রণালীর দিক থেকে এই জীবটিই প্রাচীনতম মাছের পূর্বপুরুষ। এর নামকরণ করা হয়েছে রামাপিথেকাস। অক্টোপিথেকাসজাতীয় জীব থেকেই মাছের আবির্ভাব ঘটেছে এবং এদের সঙ্গেই রয়েছে মাছের নিকটতম সম্পর্ক। রামাপিথেকাস এদেরই পূর্বপুরুষ।

ডক্টর সাইমনস্ এই প্রসঙ্গে আরও বলেছেন—যে দুটি নিদর্শন আমরা সনাক্ত করেছি, তাদের সঙ্গে অক্টোপিথেকাসজাতীয় জীবের বহু ক্রিা-মূলক সাদৃশ্য রয়েছে, যাতে মনে হয় রামাপিথেকাস-জাতীয় জীবের সঙ্গে বানরগোষ্ঠীর নিকট সম্পর্ক না থাকবার সম্ভাবনাই বেশী।

১৯২০ সালের শেষের দিকে এবং ১৯৩০ সালের প্রথম দিকে ভারতের ভূগর্ভ থেকে চোয়ালের হাড়ের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছিল, সে সকল জীবাশ্ম নিয়ে ডক্টর সাইমনস্ ও ডক্টর পিলবিন গবেষণা করেছিলেন। এই সকল নিদর্শন ব্রিটিশ মিউজিয়াম এবং কলিকাতার মিউজিয়ামে একজাতীয় অধুনালুপ্ত বানরের চোয়ালের জীবাশ্ম বলে প্রদর্শিত হয়েছে। এই শ্রেণী নির্ধারণ এবং এদের কোন অধুনালুপ্ত বানরের চোয়াল বলে অভিহিত করা ঠিক হয় নি বলে তাঁরা মন্তব্য করেছেন। বৃত্ত-বিজ্ঞানীরা মাছের পূর্বপুরুষ কোন জীবের চোয়াল দেখে সেই জীবটির খাত্তের বিবরণ দিতে পারেন। তাদের তথ্যসম্মানে দাঁত থুই সহায়ক হয়ে থাকে।

ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের দু-জন বিজ্ঞানী ঐ জীবাশ্মের চোয়ালের দাঁতের পর্যালোচনা ও পরীক্ষা করে বলেছেন—এটি যে বানরজাতীয় কোন জীবের নয় তার প্রমাণ—এতে অংশত: আয়ত কোন বৃহৎ খণ্ড নেই। কিন্তু যে কোন বানরজাতীয় জীবের চোয়ালে এই জাতীয় দাঁত থাকবেই। এই দাঁত না থাকবার জন্তে

রামাপিথেকাসজাতীয় জীবেরা কোন জিনিষ বেশ চিবিয়ে খেতে পারতো। কিন্তু বানরজাতীয় জীবেরা খদন্তের জন্তে তা পারে না। তারা উপর ও নীচের দাঁতের মধ্যে কোন জিনিষ কেলে চেপে নিয়ে সিলে কেলে। তারা চোয়াল পাশেরদিকে ঘোরাতে পারে না।

ডক্টর সাইমনস্ এই প্রসঙ্গে বলেছেন, নীচের এবং উপরের—উভয় অংশের চোয়ালের গঠন-প্রণালী দেখে মনে হয়, এই দুটি বানরজাতীয় জীবেরই চোয়াল। কারণ খাত্তবস্ত্র চিবানোর ব্যাপারে এদের সঙ্গে মাছের বহু রকমের সাদৃশ্য দেখা যাচ্ছে।

তাঁরা বলেছেন যে, বানরের মাড়ির দাঁতের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয়টি একই সঙ্গে ওঠে। কিন্তু মাছের বেলায় ঐ সকল পেষক দন্ত একটির পর একটি বিভিন্ন সময়ে ওঠে। রামাপিথেকাসের চোয়ালের হাড় পরীক্ষা করে দেখা গেছে, ঐ সকল পেষক দন্তের পিছনের দিকে ক্ষয় পূর্ব কম হয়েছে—মাছের বেলায়ও তাই হয়ে থাকে।

এতে আরও বোঝা যাচ্ছে যে, মছজাতীয় পরবর্তী জীবের মত রামাপিথেকাসজাতীয় জীবের জীবনের বেশীর ভাগ সময় শৈশব ও কৈশোর অবস্থার মধ্যে অতিবাহিত হয়েছে।

পৃথিবীতে মাছের আবির্ভাব এবং তার সৃষ্টির পথের সন্ধান আজও স্পষ্টভাবে পাওয়া যায় নি। তবে প্রাক্কমানব যুগ সম্পর্কে যে সন্দেহ ছিল, তা এই আবিষ্কারটি অনেকখানি নিরসন করছে।

ভূ-বিজ্ঞানের দিক থেকে অতীতের লক্ষ লক্ষ বছরের প্রাচীন এই কয়টি নিদর্শন কয়েকটি যুগের প্রতীক মাত্র। এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছে সাত্বে চার-শ' কোটি বছর পূর্বে। আর মাছের প্রাচীন-তম পূর্বপুরুষের আবির্ভাবের প্রায় ৩০০ কোটি বছর আগে জীবনের আবির্ভাব ঘটেছে।

## আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধান

ভাবতে আশ্চর্য লাগে, যাত্র এক-শ' বছরের কিছুটা আগে ১৮৫০ ও ১৮৬০ সালে আবহাওয়াবিজ্ঞান সম্পর্কে মানুষ কতটুকুই বা জানতো! তখন অনেকে আবহাওয়া নিয়ে আলোচনাও করতো। কিন্তু তারা এই বিষয়ে প্রায় কিছুই করে নি—এমন কি, বোরবারও চেষ্টা করে নি। সে দিন প্রকৃতিতে ঝড়, জল বা কিছু ঘটেছে, তাকে সাধারণ ঘটনা বলেই ভাঙা মেনে নিয়েছে। তবে আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বিজ্ঞানীরা এই সময়েই প্রথম দ্বিধা করেন যে, তাপমাত্রা, আবহমণ্ডলের চাপ ও বাতাসের গতির ক্ষেত্রে বা ঘটছে, যে উঠানামা চলছে—তার একটা হিসাব রাখতে হবে—একটা মানচিত্র রচনা করতে হবে। কারণ এগুলির মধ্যে যে একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে, বিজ্ঞানীরা তা বিশেষভাবেই উপলব্ধি করেছিলেন। এই তথ্যানুসন্ধানের কলেই তীব্র ঝড়ো আবহাওয়ার রূপ ও তার গতি-প্রকৃতিও সে দিন তাঁরা জানতে পেরেছিলেন।

দিনের পর দিন আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতির যে পরিবর্তন হয়ে থাকে, মানুষ তা লক্ষ্য করে এসেছে। এই পরিবর্তনের উৎস যে পৃথিবী থেকে অনেক দূরে রয়েছে, তাও এর কলে সে জানতে পেরেছে। কিছুটা রয়েছে আকাশের উপরের দিকে, আর কিছুটা রয়েছে তার অনেক উল্লেখ।

পৃথিবীর উপরে রয়েছে অজস্র বাতাসের স্রোত। এই বাতাসের গতি-প্রকৃতির দ্বারাই যে আবহাওয়ার গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয়ে থাকে—এই কথা আজ আর কারো অজানা নেই। সারা পৃথিবীব্যাপী এই বাতাসের গতি-প্রকৃতি খুবই জটিল। নানা দেশের বিজ্ঞানীরা প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে গত এক-শ' বছরের মধ্যে ক্রমে ক্রমে এই কথা উপলব্ধি করেছেন, সম্পূর্ণরূপে জানতে পেরেছেন। বিগত এক-শ'

বছরের বিব্যাপী আবহাওয়ার প্যাটার্ন বা প্রকৃতি ও রূপ বিশ্লেষণ করে কোন একটি স্থানের আবহাওয়ার পূর্বাভাস যে জ্ঞাপন করা যেতে পারে, তাও বিজ্ঞানীরা এই তথ্যানুসন্ধানের কলে জানতে পেরেছেন।

আবহবিজ্ঞানের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, এই পৃথিবীর একটা বিরাট এলাকা জুড়ে আবহমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতায় বিভিন্ন স্থানের তাপ, চাপ ও বাতাসের গতির মাত্রার হিসাব একই সময়ে নেওয়া যায় নি এবং সেই সকল তথ্য বিশ্লেষণ করে আবহাওয়া সম্পর্কে ব্যাপক মানচিত্র রচনার ক্ষেত্রে বখাশী কোন দপ্তরে পাঠানোও সে দিন সম্ভব হয় নি।

সাম্প্রতিক কালে সেই অসম্ভবকে সম্ভব করেছে পৃথিবী প্রদক্ষিণরত আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যানুসন্ধানী কৃত্রিম উপগ্রহসমূহ। নানা প্রকার যন্ত্র যন্ত্রপাতি সমন্বিত এই সকল স্বয়ংক্রিয় উপগ্রহ বিভিন্ন উচ্চতায় বাতাসের চাপ, গতি ও তাপমাত্রার নির্ণীত হিসাব একই সময়ে পৃথিবীতে সরবরাহ করে যাচ্ছে, আর পাঠিয়ে যাচ্ছে সমগ্র পৃথিবীর সকল স্থানের মেঘের গঠন বা প্যাটার্নের চিত্রাবলী।

আবহবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে বার্তার দ্রুত আদান-প্রদানের বিষয়টিও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। প্রথমে টেলিগ্রাফই ছিল দ্রুত বার্তা প্রেরণের প্রধান বাহন। তার পরে উদ্ভাবিত হয়েছে বেতার বা রেডিও। এটি বার্তা আদান-প্রদানের উন্নততর ব্যবস্থা। যেখানে টেলিগ্রাফের তার বা স্রোতগর্ত দিয়ে বিদ্যুৎদ্বারী তার স্থাপন করা সম্ভব হয় নি, সেখানে এবং দূর সমুদ্রে কোন জাহাজে বার্তার আদান-প্রদান রেডিওর মাধ্যমে হয়ে থাকে। বেতারের মাধ্যমেই আজ আবহাওয়া সম্পর্কে যেমন তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে, তেমনই কৃত্রিম

উপগ্রহসমূহও টেলিভিশনের মাধ্যমে যথেষ্ট চিত্রা-  
বলী পৃথিবীতে পাঠিয়ে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্যভূমিসমূহের দিগন্ত আজ বহুদূর পর্যন্ত প্রসারিত হয়েছে। বিজ্ঞানীরা এখন কেবলমাত্র এই পৃথিবীতে বসেই তথ্যভূমিসমূহ করেন না, বর্তমানে তাঁরা পৃথিবীর কিছুটা উপরে বিমান ও বেলুন পাঠিয়ে এবং তারও উর্ধ্বে মহাকাশযানের সাহায্যে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করে থাকেন। আবহবিজ্ঞানের আওতার এখন বিজ্ঞা-  
নের নানা বিভাগ, যেমন—পদার্থবিজ্ঞা, রসায়নশাস্ত্র, ভূতত্ত্ব, যোগাযোগ, পরিবহন প্রভৃতি বিষয়গুলিও পড়ে। এছাড়া জীবতত্ত্ব এবং কৃষির পক্ষে আব-  
হাওয়া ও জলবায়ুর গুরুত্ব যে কতখানি, এই বিষয়ে গবেষণার ফলে তা বিশেষভাবে জানা গেছে। শীত, গ্রীষ্ম অর্থাৎ ঠাণ্ডা, গরম এবং আর্দ্রতার পূর্বের নানা রকমের তাপে মাছ এবং পক্ষীর স্বাস্থ্য প্রভাবিত হয়ে থাকে। তারপর ঘূর্ণিঝড়, শিলা-  
বৃষ্টি এবং প্রচণ্ড ঝড়ঝড়ার মাল্লার ধনসম্পত্তি ও কসলের বিপুল ক্ষতি হয়ে থাকে—এমন কি, জীবনহানিও ঘটে। এই অশান্ত আব-  
হাওয়ার পূর্বাভাস পেলে মাছ এই সকল দুর্বিপাক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারে। এই পূর্বাভাস জ্ঞাপনের ক্ষেত্রে আজ মাছ অনেকখানি এগিয়ে গেছে।

অনেক দেশে আবহাওয়ার পূর্বাভাস নিয়মিত-  
ভাবে প্রথমেই চারীদের দেওয়া হয়। কসল কখন রোপণ করতে হবে, কখন রোপণ করলে বেশ ভাল বর্ষা এবং কসল তোলবার সময়ে বেশ ভাল রোদ পাওয়া যাবে, তা প্রায় সকল দেশের চারীরাই নিজ নিজ দেশের প্রকৃতি পর্যবেক্ষণ করে অনেক কাল থেকেই ঘোঁটামুটিভাবে জেনে আসছেন। তবে আবহাওয়া সম্পর্কে সঠিক পূর্বাভাস পেলে কসল রোপণ ও কসল তোলবার পক্ষে খুবই সহায়ক হয়ে থাকে।

সাম্প্রতিক কালের শিল্পযুগের মাল্লার মাঝে-  
হাওয়া সংক্রান্ত কয়েকটি সমস্তার সম্মুখীন হয়েছেন। আবহবিজ্ঞানীরাও এই সকল বিষয় সম্পর্কে সচেতন। তবে এই সকল সমস্তা সমাধানের প্রতি তাঁদের বিশেষ দৃষ্টি দিতে হবে; যেমন—শিল্প প্রসারণের ফলে কলকারখানা থেকে নির্গত ধোঁয়া আকাশ আচ্ছন্ন করে ফেলে এবং বড় বড় সহরে এই ধোঁয়া ও কুয়াসা মিলে সৃষ্টি হয় ধোঁয়াসার। মহাকাশের নির্দিষ্ট স্থানের কিছুটা নীচে বিশেষ অঞ্চলে এই ধোঁয়াসার সীমানা থাকে। এই ধোঁয়াসার পূর্বাভাস দেওয়া আবহবিজ্ঞানীদের একটা যত্ন বড় কাজ। এছাড়া বাতাস বা আব-  
হাওয়া দূষিত হবার প্রতিক্রিয়া সম্পর্কেও আবহবিজ্ঞানীদের অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন।

তারপর আবহাওয়ার কার্বন ডায়োক্সাইড কি এই পরিমাণে বেড়ে যাচ্ছে যে, তাতে পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যেতে পারে? অথবা যে সকল বস্তুকণা আবহাওয়াকে দূষিত করে ও আবহাওয়ার ভেসে থাকে, সেগুলির উপর সূর্যকিরণ পড়ে প্রতিকলিত হয়—এই প্রতিকলনের ফলে পৃথিবী কি শীতল হবে? বাতাসের ক্ষুদ্র বস্তুকণা মেঘের গঠনে কি সাহায্য করে? এই সকল প্রশ্নের উত্তর আবহবিজ্ঞানীদের দিতে হবে।

আবহবিজ্ঞানীদের সীমানা আজ মাত্র আবহাওয়ার মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়। আবহাওয়ার সঙ্গে সমুদ্র অচ্ছেদ্য বন্ধনে আবদ্ধ, মেরু অঞ্চলের চিরজুয়ারাবৃত স্থানের সঙ্গে এবং মহাদেশসমূহের পাহাড়-পর্বত, মরুভূমি ও প্রান্তরের সঙ্গেও তার নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। তাই আজ আবহ-  
বিজ্ঞানীদের তথ্যভূমিসমূহের ক্ষেত্র সমগ্র বিশ্বেই প্রসারিত।

আবহাওয়া দূষিতকরণ সংক্রান্ত বিষয়ের প্রতিই মাত্র মাল্লার দৃষ্টি আজ আবদ্ধ নয়, আব-

হাওয়ার পরিবর্তন কিতাবে করা যেতে পারে, তারও চেষ্টা আজ হচ্ছে। বর্তমানে বিশেষ অবস্থায় ছুবার ও বৃষ্টিপাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটানো

যেতে পারে। কালক্রমে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন ঝড়কেও ঠেকিয়ে রাখা যাবে অথবা তার গতি কিরিয়ে দেওয়া যাবে।

## সিমেন্ট-বালির নৌকা

এই সম্বন্ধে ক্রাফ ক্রিয়েটস লিখেছেন— একেবারে গোড়ার দিকে ব্রুটনের নৌশক্তির ব্যাপ্তির মূলে ছিল তার ওক-নির্মিত কাঠের জাহাজগুলি। তারপর ব্রুটনই প্রথম লৌহ-নির্মিত জাহাজের সূচনা করলো—বার ফলে আজকের বিরাট ইম্পাতের তৈরি জলযানগুলি দেখা যাচ্ছে। এবার নরকোকেস (দক্ষিণ ইংল্যান্ড) ওরক্যাসহামের একটি ব্রিটিশ কার্বে নৌকা নির্মাণের আর একটি নতুন উপাদান উদ্ভাবিত হয়েছে।

এই নতুন উপাদানটির নাম সেক্রিট (Seacrete)। এর মধ্যে থাকে প্রধানতঃ বালি ও উচ্চ মানের সিমেন্ট। প্রায় ১০ বছর আগে এটি উদ্ভাবিত হয় এবং বর্তমানে এটি উপাদানে তৈরি ২০০-এরও বেশী জলযান ১৭টি দেশে ব্যবহৃত হচ্ছে। সীক্রিটের সাহায্যে জাহাজের খোল তৈরি হচ্ছে ১০টি দেশে এবং আরও অনেক অল্পমতি-পত্রের আবেদন নিয়ে আলোচনা চলছে।

চিরাচরিত উপাদানে তৈরি জাহাজের খোল-গুলির চেয়ে সীক্রিটের খোলগুলির সুবিধা অনেক-বেশী। বড় রকমের সংঘর্ষেও এর সাযান্তাই ক্ষতি হয়। এর আগুন বা চাপ সহ্য করার শক্তি অসাধারণ। একে রক্ষণাবেক্ষণ করাও সহজ। ঘেরামতির কাজ সঙ্গে সঙ্গে করা চলে এবং কাঠের তৈরি জাহাজের খোলের ঘেরামতের এক-দশমাংশ সময় লাগে।

অত্যন্ত উপাদানে তৈরি একই মাপের জাহাজের তুলনায় সীক্রিটে তৈরি জাহাজে

জায়গা বেশী পাওয়া যায়। সীক্রিটের নৌকা বা জাহাজ তৈরি করতে হলে বিশেষ কাঠামোর (প্রত্যেকটার জন্যে আলাদা) প্রয়োজন হয় না বলে তুলনামূলকভাবে এই পদ্ধতিতে ব্যয় অনেক কম।

সীক্রিট জলীয় বাষ্প টানে না, সে জন্যে দুর্গন্ধ হবার আশঙ্কা নেই। এই উপাদান বিদ্যুৎ-প্রতিরোধীও বটে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বহু সংস্থা (বার মধ্যে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা এক-এ-৩ রয়েছে) সীক্রিটের দ্বারা মাছ-ধরা নৌকা তৈরির পরিকল্পনা অল্পমোদন করেছেন।

তুঙ্গু মাছ-ধরবার কাজে নয়, সীক্রিটে তৈরি জলযান নাইজেরিয়ার পুলিশ প্রহরী নৌকা, ফেরি নৌকা, গারনার টাগবোট, সৌদি আরবে জলবাহী নৌকা এবং পৃথিবীর বহু দেশে বন্দর লঞ্চ হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। বার্ক, বরা ও অত্যন্ত বন্দর-সরঞ্জাম তৈরির কাজেও সীক্রিটের চাহিদা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে।

সীক্রিট জাহাজ-নির্মাণে কার্ভার ম্যানেকিং ডিরেক্টর মিঃ ডোনাল্ড হ্যাগেনব্যাক গত বছর অক্টোবরে তারত সফর করেন এবং সম্ভাব্য সীক্রিট ব্যবহারকারীদের সঙ্গে কথাবার্তা বলেন। তিনি বলেন—এটাই স্বাভাবিক যে, উন্নয়নশীল দেশগুলি নিজেদের প্রয়োজনমত জিনিষ সৃষ্টি করে নেবে। সীক্রিট তৈরি করার মত কাঁচামাল সর্বত্রই পাওয়া যায় এবং শ্রমিকদের শিখিয়ে দেওয়াও কঠিন কাজ নয়। তারতে এই ধরনের নৌকা তৈরির বিরাট সম্ভাবনা রয়েছে বলে তাঁর ধারণা।

# ভারতীয় প্রাইমেট

ঐহরিনোহন কুণ্ড\*

প্রাইমেট হলো স্তন্যপায়ী প্রাণীদের মধ্যে একটি শ্রেণী, যাহ্নবও বার অন্তর্গত। স্তন্যপায়ী এই শ্রেণীর মধ্যে যে সব জন্ত অন্তর্ভুক্ত, তারা শারীরিক ও মানসিক দিক থেকেও যাহ্নবের খুবই কাছকাছি। কাজেই যাহ্নবের বিবর্তনের ইতিহাস জানতে হলে এদের ইতিহাস জানাও প্রয়োজন।

পৃথিবীতে যে সব প্রাইমেট বর্তমানে জীবিত আছে, তাদের মধ্যে গরিলা এবং শিম্পানজি যাহ্নবের সবচেয়ে নিকটাত্মীয়। এরা আফ্রিকার অধিবাসী। তার পরেই আসে ওরাং ওটাং; এরা সুমাত্রা ও বোর্নিওর অধিবাসী।

ভারতবর্ষে যে সব প্রাইমেট বাস করে, তাদের মোটামুটি তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

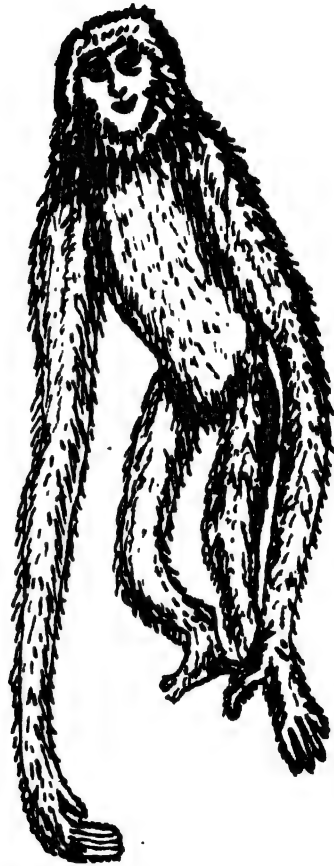
- (ক) লেজহীন মর্কট (Ape),
- (খ) লেজবিশিষ্ট বানর (Monkey),
- (গ) নিশাচর বৃহচ্চক্ষু বানর (Loris)

## লেজহীন মর্কট

এদের সাধারণ নাম গিবন। এরা Hylobates গণভুক্ত। এদের ছয়টি বিভিন্ন প্রজাতি (Species) আছে—যারা সাধারণভাবে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার বাসিন্দা। হাইলোবেটস-এর কেবল দুটি Species ভারতবর্ষে দেখা যায়। তার মধ্যে Hylobates hoolock অতি পরিচিত।

আসান, ব্রহ্মদেশ প্রভৃতি গ্রীষ্মপ্রধান বনাঞ্চলে, যেখানে প্রচুর বৃষ্টিপাত হয়, সেখানে এরা বাস করে। গভীর জঙ্গলের মধ্যে গাছের ডালে লতাগাভার আচ্ছাদিত বোশের তিতর থাকতে এরা ভালবাসে। তবে খাবার সময় বহু উঁচু

গাছের ডালের উপর উঠে যায় আবার মাটিতে নেমে বর্ণার জল পান করে। এরা দিবাচর



১নং চিত্র  
গিবন

প্রাণী। এদের খাবার হলো বনজ ফল, পাতা ও ফুল। মাঝে মাঝে পাখীর ডিম এবং বাচ্চা

---

\*প্রাণিবিজ্ঞা বিভাগ, বাঁকুড়া সন্নিধানী কলেজ, বাঁকুড়া

পাখীও খেয়ে থাকে। এরা আদিম যুগের মানুষের মতই কখনও হারীভাবে ঘর বাঁধে না।

লেজহীন এই বর্কটগুলি দেখতে আর মানুষের মতই লম্বা, এদের সারা শরীর ঘন ঝাঁকড়া লোমে আবৃত। এদের সমস্ত দেহের রং হয় ধূসর, বয়ো-বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেহের রং হয়ে যায় কালো। ঘোবনে জী হাইলোবেটসের রং থাকে পিঙ্গল বর্ণের, কিন্তু পুরুষের রং কালোই থেকে যায়, কেবল চোখের পাতাগুলি সাদা ঘন লোমে ঢাকা থাকে। মানুষের মতই এদের মোট 32টি দাঁত। বাহু দুটি পায়ের তুলনায় অনেক লম্বা। কখনও কখনও হাতে-পায়ে আবার কখনও মানুষের মত দু-পায়ে তর দিয়ে সোজা হয়ে চলাফেরা করে। রাতের বেলায় গাছের ডালে ঘন পত্র-শৃঙ্খের মধ্যে শুমার।

ঘনের মধ্যে এরা ছোট ছোট দল বেঁধে ঘুরে বেড়ায়। এক-একটি দল হলো এক-একটি পরিবার, যার মধ্যে থাকে একটি পুরুষ, একটি স্ত্রী এবং তাদের তিন-চারটি বাচ্চা। বাচ্চারা পরিণত বয়স্ক হলে নিজেদের সঙ্গী খুঁজে নিয়ে বাপ-মায়ের কাছ থেকে দূরে চলে যায়। এক একটি পরিবার জঙ্গলের মধ্যে 250 থেকে 300 একর আয়তন জুড়ে বিচরণ করে এবং তারই মধ্যে উৎপন্ন কল, ফুল ইত্যাদি খাবার খায়। এই সীমানার মধ্যে অন্য কোন পরিবার ঢুকে পড়লে ওদের মধ্যে ঝগড়া বেধে যায়।

স্বাবলক প্রাপ্তির পর স্ত্রী ও পুরুষের মিলনের কোন নির্দিষ্ট সময় সীমা থাকে না। শুক্রকালে (Menstrual cycle) এবং গর্ভবতী অবস্থারও স্ত্রী ও পুরুষের মিলন হয়। স্ত্রী-সিবনের নিয়মিত শুক্রকালের ব্যবধান 20 থেকে 33 দিন এবং 2 থেকে 4 দিন তা হারী হয়। স্ত্রী-সিবন 220 দিন গর্ভধারণের পর মানুষের মতই

একটি বাচ্চার জন্ম দেয়। বাচ্চারা জন্মের পর মায়ের কোলে-পিঠেই পালিত হয়। বাচ্চা আর 2 বছর তত্তপান করে এবং 7-8 বছর বয়সে সাধারণত প্রাপ্ত হয়। এদের আয়ুষ্কাল 30 থেকে 32 বছর।

### লেজবিশিষ্ট বানর

ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন রকমের বানর দেখা যায়। উত্তরে হিমালয় থেকে দক্ষিণে সমুদ্র এবং পূর্বে আসাম থেকে পশ্চিমে পাকিস্তান শহর, গ্রামে, পাহাড়ে, জঙ্গলে সর্বত্রই বানর সুপরিচিত। গাছের কল, পাতা, আদু, খান, গম এবং ছোট ছোট পোকামাকড়ও খাওয়া হিসাবে এরা গ্রহণ করে থাকে। এরা দিবাচর প্রাণী (2নং চিত্র)।

দেহের উচ্চতা বিভিন্ন আভের বানরের বিভিন্ন রকমের। এদের হাত-পা দেহের তুলনায় বেশী লম্বা, দেহ নানা রঙের লোমে আবৃত। এদেরও দাঁত মোট 32টি। সাধারণভাবে লম্বা লেজটি শুটরে অথবা উপরের দিকে তুলে হাত ও পায়ে তর দিয়ে এরা চলাফেরা করে—কখনও আবার দু-পায়ে তর দিয়েও দাঁড়ায়। এরা এক-এক দলে সংখ্যায় অনেকগুলি করে থাকে। কিন্তু তাদের মধ্যে সাবালক পুরুষ বানর থাকে মাত্র একটি। পুরুষ বানর দলের মধ্যে শৃঙ্খলা বজায় রাখে এবং দলের নেতৃত্ব করে। স্ত্রী-বানরের কাজ বংশবৃদ্ধি ও সন্তান পালন করা।

ভারতবর্ষে যে বানর হস্তান নামে পরিচিত, তারা এক সঙ্গে তিন থেকে এক-শ' কুড়িটি পর্যন্ত দল বেঁধে বাস করে। একটি দলে সাধারণতঃ যে পুরুষ থাকে, তাকে বলা হয় বীর হস্তান বা দল-পতি। বাকী সবাই স্ত্রী-বানর অথবা বাচ্চা। অন্য কোন পুরুষ সেই দলে প্রবেশ করলে উভয়ের মধ্যে প্রচণ্ড যুদ্ধ বেধে যায় এবং যে জয়লাভ করে,

সেই দলপতি হয়। আবার কোন কোন সময় পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে একটি দলে একাধিক পুরুষও কর্তৃত্ব করে থাকে। জী-বানরের মধ্যে যে দলপতিকে বেশী সন্মান করে, কায়দা, জী-বানরেরা যতাবতই বাচ্চা ভালবাসে। তারপর তারা মায়ের কাছে বাচ্চাকে কিরিয়ে দেয় এবং বা তার বুকের দুধ দিয়ে বাচ্চাকে পালন করে। কিন্তু সাধারণতঃ দু-বছরের মধ্যে



২নং চিত্র  
বানর

সে কিছুটা রাগীর মত কর্তৃত্ব আসীন হয়। কিন্তু সম্ভাবন প্রসব করলেই দলপতির বিরাগ-ভাজন হয়ে অন্ততঃ কিছুকালের জন্যে অবহেলিত অবস্থায় ঘুরে সবে বেতে বাধ্য হয়।

জী-হুম্যানের ঋতুকাল ত্রিশ দিন অন্তর হয়ে থাকে এবং দুই থেকে তিন দিন স্থায়ী হয়। এরা গর্ভবতী হবার 168 দিন পরে বাচ্চা প্রসব করে। বাচ্চা প্রসবের সময় প্রসূতি যখন বেহুশা অসুস্থত্ব করে তখন তিন থেকে আটটি বানর তাকে ধাত্রীর কাজের জন্যে খিরে ধরে। প্রসবের সঙ্গে সঙ্গে তারা মায়ের কাছে থেকে বাচ্চাটিকে সরিয়ে নেয় এবং দু-এক দিন ধাত্রী-বানরেরা এই বাচ্চাকে বদ্ব করে—

মায়ের কোলে যদি অল্প সম্ভাবন আসে, তখন বা বাচ্চাকে জোর করে ঘুরে সরিয়ে দেয়। বা যদি পুরুষ বাচ্চা প্রসব করে, তবে তার তয়ের সীমা থাকে না। দলপতি তার ভাবী প্রতিদ্বন্দ্বী তেবে পুরুষ শিশুটিকে স্থবিধা পেলেই হত্যা করতে ইতস্ততঃ করে না। কোনকালে রক্তা পেলে যমোত্ত্বিতির সঙ্গে সঙ্গে নিজের বীরত্ব দেখিয়ে সে দলপতির মন জয় করে এবং দলের মধ্যে নিজের স্থায়ী আসন প্রতিষ্ঠা করে নেয়।

তারতবর্ষে যে সব বানর দেখা যায়, এখানে তাদের নাম, প্রাণিধান এবং অত্যন্ত পরিচিতি দেওয়া হলো।

নাম	প্রাণিস্থান	দেহের রং	মুখ	লেজ
1. <i>Macaca radiata</i> ম্যাকাকা রেডিয়েটা (Bonnet monkey)	গোদাবরী নদী ও সাতারা পর্বতের দক্ষিণাংশ।	মুসুর পিঙ্কলাভ, পেটের তলা কিকে।	হালকা গোলাপী অথবা লালচে কপালে ছোট ছোট লোম।	দেহের দৈর্ঘ্য থেকে বড়, নরম লোমে আবৃত।
2. <i>Macaca silenus</i> ম্যাকাকা সাইলিনাস। (Lion tailed monkey)	পশ্চিমঘাট পর্বত- মালা হইতে কঙ্কাক্ষারিকা পর্বত	কালো	কালো	দেহের দৈর্ঘ্য অর্ধেক অথবা ১ তাগ। শেষ ভাগে শুষ্ক লোম থাকে।
3. <i>Macaca mullata</i> ম্যাকাকা মুলেটা। (Rhesus monkey)	সমগ্র উত্তরভারত	পিঙ্কলবর্ণের, পেটের তলা কিকে।	লালচে	দেহের দৈর্ঘ্যের প্রায় অর্ধেক, এছুর লোম থাকে।
4. <i>Macaca assam- ensis</i> . ম্যাকাকা অ্যাসামেনসিস (Assamese monkey)	আসাম, সুন্দরবন, মিশমি ও নাগা পার্বত্যাকুল	হালুদ বর্ণ থেকে গাঢ় পিঙ্কল বর্ণের	মুখের পাশ লালচে, চোখের তলা কালো।	দেহের দৈর্ঘ্যের চুলনার অর্ধেক থেকে ১ তাগ।
5. <i>Macaca speciosa</i> ম্যাকাকা স্পিসিওসা। (Stump tailed monkey)	আসাম	কালচে	লালচে কপাল কৌচকানো	লেজ দীর্ঘ, লেজে অল্প লোম।
6. <i>Presbytis entellus</i> (Semno- pithecus entellus) প্রেসবিটিস এন্টেলিস (Hanuman monkey)	ভারতের সর্বত্র	মুসুর, কালচে অথবা পিঙ্কল	মুখ খুবই কালো	লেজ দেহের দৈর্ঘ্যের চেয়ে বড়

এই প্রজাতিগুলি হাড়া হানীরভাবে প্রতিটি জাতির অনেক উপ-প্রজাতিও ভারতে পাওয়া যায়।

#### মিশাচর বৃহচ্চকু লোরিস

ভারতে দু-জাতের লোরিস দেখা যায় অর্থাৎ  
সেমোর লরিস (*Loris tardigradus*) এবং সো  
লোরিস (*Nycticebus coucang*)। প্রথমোক্ত

জন্তুটি দক্ষিণ ভারতের বাসিন্দা এবং দ্বিতীয়টি  
আসাম ও ব্রহ্মদেশে দেখা যায়।

এরা সাধারণতঃ গাছের ফল, কীট-পতল,  
ছোট ছোট সিরসিটি ও পানী খেয়ে জীবন-



ধারণ করে। রাজিবেলা ছাড়া এরা বের হয় না, জঙ্গলের মধ্যে অনেক উঁচু গাছের ডালে, ঝোপের মধ্যে অথবা কোটরের মধ্যে থাকে।



3নং চিত্র  
লোরিস

যেহ পিঙ্গল বর্ণের লোমে আবৃত, হাত ও পায়ের দৈর্ঘ্য প্রায় সমান, কান বড় এবং গোলা-

কার। চোখের আকৃতি দেখে মনে হয় যেন চশমা পরে আছে। স্নেহার লোরিসের লেজ নেই, স্নো লোরিসের লেজ খুব ছোট এবং লোমে ঢাকা।

এরা সাধারণতঃ একাকী ঘুরে বেড়ায়। দল-বদ্ধ অবস্থায় এদের দেখা যায় না। এদের একটি বিশেষত্ব হলো এই যে, চলবার সময় এরা ঘন ঘন মূত্রত্যাগ করে। বোধ হয় ঐ প্রস্রাবের গন্ধ ইচ্ছামত তাদের যে কোন অকালে বিচরণের সময় নির্ধারিত স্থান নির্ণয়ে সহায়তা করে। এরা সাধারণতঃ 160 দিন গর্ভধারণের পর একটি অথবা কখনও কখনও দুটি বাচ্চা প্রসব করে। দু-সপ্তাহের মধ্যেই বাচ্চা স্বাধীনভাবে ঘোরাফেরা করতে পারে। তিন থেকে ছয় মাস পর্যন্ত এরা মায়ের স্তন্যপান করে। প্রকৃতপক্ষে এরা অন্য সব প্রাইমেট অপেক্ষা একটু নিম্নতরের।

## ধূমকেতুর কথা।

রতনমোহন খাঁ\*

অসীম নীল আকাশের বুকে ছোট-বড় অগণিত জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে সময়ে সময়ে দেখা যায়, দু-একটি আগুনের গোলা একদিক থেকে অন্য দিকে গিয়ে অসীম আকাশে হারিয়ে যায় চির-দিনের মত। এগুলিকে বলা হয় উড়ানিও। আবার কখনও কখনও বিশাল পুচ্ছসম্বিত জ্যোতিষ্কের আবির্ভাব ঘটে আকাশের বুকে। এদেরই নাম ধূমকেতু। আদি ও মধ্যযুগে ধূমকেতুর উদয়ে নাক্ষত্র ভয়ে বিহ্বল হয়ে পড়তো। তাদের ধারণা ছিল—চরিত্রিক, মহাযারী, বুদ্ধ প্রভৃতি অন্ততের পুচ্ছ এই ধূমকেতু। বর্তমান প্রবন্ধে এই ধূমকেতু সম্বন্ধেই ঘোটাঘুটি আলোচনা করবো।

ধূমকেতু অতি দ্রুতগতিবিশিষ্ট উজ্জল জ্যোতিষ্ক। ধূমকেতু সাধারণতঃ তিনটি অংশে গঠিত—(1) উজ্জল অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াস (Nucleus), (2) উজ্জল অগ্রভাগের চারপাশে ঘূর্ণায়িত আবরণ বা কমা (Comma), (3) শুভ্র উজ্জল দীর্ঘ পুচ্ছ।

কতকগুলি বিশাল ধূমকেতু মহাবিশ্বের অপূর্ব সৌন্দর্যসম্ভার। হাজার হাজার মাইল ব্যাসবিশিষ্ট উজ্জল গোলকের অগ্রভাগ থেকে হড়িয়ে পড়ে যেন অসংখ্য আগুনের কোয়ারা আর পিছনে থাকে কয়েক হাজার মাইল দীর্ঘ উজ্জল পুচ্ছ। এই

বিশাল বস্তু সূর্যের দিকে বতই অগ্নসর হতে থাকে, পুঙ্খের সৌন্দর্য যেন ততই নানা ভঙ্গিমায় প্রকাশ পেতে থাকে।

বিজ্ঞানীদের মতে ধূমকেতু খুবই হালকা, এদের ঘনত্ব পৃথিবীর ঘনত্বের প্রায় ১০০০০০০০ তাম। আধুনিক যন্ত্রপাতির সাহায্যে, বিশেষ করে বর্ণালী বিশ্লেষণের কালে ধূমকেতুর মধ্যে  $CO$ ,  $CH_2$ ,  $CH$ ,  $CN$ ,  $NH_2$ ,  $OH$ ,  $NH$ ,  $C_2$ ,  $N_2$  প্রভৃতির অস্তিত্বের কথা জানা গেছে। সূর্যরশ্মি প্রতিফলিত হবার কালে ধূমকেতু উজ্জল রঙে সূশোভিত হয়ে ওঠে। ধূমকেতু মূলতঃ সূর্যকিরণে আলোকিত হলেও এর অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে। অগ্রভাগ বা নিউক্লিয়াসের ব্যাস ১০০ মাইল থেকে ৫০০০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। ধূমকেতুর অগ্রভাগ উজ্জল নক্ষত্রের মত দেখায়। অগ্রভাগের চারপাশে ধূমায়িত আবরণ বা কমা একটি বিরাট গোলকের মত। এই গোলকের ব্যাস ১৪০০০ মাইল থেকে ১১৫০০০০ মাইল পর্যন্ত হতে পারে। মহাকাশের বুকে ধূমকেতুর অগ্রভাগটি প্রথম দেখা দেয় একখণ্ড আবহা মেঘের মত। কোন ধূমকেতু সূর্য থেকে ২৫০,০০০,০০০ মাইল দূরে থাকলে অনেক সময় দূরপাল্লার দূরবীক্ষণ যন্ত্রেও ধরা পড়ে না। ধূমকেতু সূর্যের বত কাছাকাছি আসতে থাকে, ততই তার অগ্রভাগ উজ্জল থেকে উজ্জলতর হতে থাকে আর ক্ষীতকার পুঙ্খের আবির্ভাব ঘটে। ধূমায়িত অংশ হচ্ছে অগ্রভাগের আবরণের মত। অগ্রভাগকে মাঝে মাঝে পুরাতন আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা যায়। Donati-র ধূমকেতুকে কয়েক দিনের মধ্যে সাতবার আবরণ পরিত্যাগ করতে দেখা গিয়েছিল। Tebbuth-এর ধূমকেতু হ-সপ্তাহে একবার আবরণ পরিত্যাগ করে। Morehouse-এর ধূমকেতুর ধূমায়িত আবরণ ও পুঙ্খ পরিবর্তনের কথা সুবিদিত।

দীর্ঘ পুঙ্খই ধূমকেতুর বিশেষ আকর্ষণ।

Maxwell, Lebedeff, Nichols, ও Hull প্রভৃতি বিজ্ঞানীদের মতে, আলোক-তরঙ্গের চাপের কলেই এই হাজার হাজার মাইল দীর্ঘ পুঙ্খের সৃষ্টি হয়। পুঙ্খের বিশিষ্ট ভঙ্গিমা পরিবর্তন সূর্য থেকে এর অবস্থানের দূরত্বের উপর নির্ভর করে। সূর্য থেকে বহু দূরে অবস্থিত ধূমকেতুর কোন পুঙ্খ দেখা যায় না। ধূমকেতু বতই সূর্যের দিকে অগ্নসর হতে থাকে, উজ্জল অগ্রভাগের আকৃতি ততই ক্ষুদ্র থেকে ক্ষুদ্রতর হয় আর পুঙ্খটি দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়। অহুসর (Perihelion) বিন্দুটি (সূর্যের নিকটতম বিন্দু) অতিক্রম করবার পরেই অগ্রভাগের আকার আবার বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং পুঙ্খটি ক্রীণ থেকে ক্রীণতর হয়। ধূমকেতুর অগ্রভাগটি থাকে সূর্যের দিকে আর পুঙ্খটি থাকে সূর্যের বিপরীত দিকে। আমরা জানি, আলোক-তরঙ্গের চাপ বস্তুর বহির্ভাগের ক্ষেত্র-কলের উপর আর মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ বস্তুর আয়তনের উপর নির্ভর করে। তাই সন্ন্যাসাধীর ক্ষেত্রে আলোক তরঙ্গের চাপ মাধ্যাকর্ষণজনিত চাপ অপেক্ষা বেশী। এই সকল কারণ পর্যালোচনা করে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, সূর্যরশ্মির চাপে সূর্যকণাগুলি অগ্রভাগ থেকে বিতাড়িত হয়ে পুঙ্খের সৃষ্টি করে। মাঝে মাঝে এই চাপ এত প্রবল হয় যে, পুঙ্খটি অগ্রভাগ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে মহাবিশ্বে বিলীন হয়ে যায়। সূর্যরশ্মির প্রতিফলন ও প্রতি-সরণের কালে ধূমকেতুর পুঙ্খ কখনও কখনও নানা রঙে রঞ্জিত অবস্থাতেও দেখা যায়। ১৮৬১ খ্রীষ্টাব্দে প্রায় ২৪,০০০,০০০ মাইল দীর্ঘ ১০০০ মাইল বিস্তৃত বিশাল পুঙ্খধারী ধূমকেতু জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের চোখে পড়ে। একাধিক পুঙ্খবিশিষ্ট ধূমকেতুও দেখা যায়। ১৭৪৪ খ্রীষ্টাব্দে ডিসেম্বর মাসে হয় পুঙ্খবিশিষ্ট একটি ধূমকেতু দেখা গিয়েছিল। ১৯০৩ খ্রীষ্টাব্দে Borelly নয় পুঙ্খ-বিশিষ্ট একটি ধূমকেতুর সন্ধান পান। ১৮৬১

বুটাম্বে 23 রঙে রঞ্জিত চার পুঙ্খবিলিষ্ট ধূমকেতু জ্যোতির্বিদগণের বিশদ উৎপাদন করেছিল। 1823 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর দুই পুঙ্খের মধ্যে কৌণিক ব্যসধান ছিল 160°।

ধূমকেতুর কক্ষপথ সাধারণতঃ তিন রকমের; যথা—অধিবৃত্ত (Parabola), উপবৃত্ত (Ellipse) ও পরাবৃত্ত (Hyperbola)। আমাদের পৃথিবীর মত কতকগুলি ধূমকেতু সূর্য পরিক্রমা করে। আজ বিজ্ঞানের বিশদরকর উন্নতি সাধিত হলেও মহাবিশ্বের অনংখ্য জ্যোতিষ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান খুবই সীমিত।

মানমন্দিরের বিবরণী ও নানাবিধ বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে বতদূর জানা যায়, শতকরা 75টি ধূমকেতুরই পরিক্রমার পথ অধিবৃত্ত। অনেকের মতে, সব ধূমকেতুরই কক্ষপথ উপবৃত্ত, তবে এই পরিক্রমার পথ এত বড় (উৎকেন্দ্রিকতা বা Eccentricity প্রায় 1-এ নিকটবর্তী হবার জন্মে) যে, কয়েক হাজার বছর লাগে সূর্যকে একবার ঘুরে আসতে। তাই কোন ধূমকেতু একবার দেখা গিয়েই চিরকালের মত অনূক্ত হয়ে যায় কীণজীবী মানুষের কাছ থেকে। সাধারণতঃ এক-শ' বছরে এক থেকে কুড়িটি ধূমকেতু দেখা যায়। একজন মানুষ তার জীবনে মোটামুটি এক ডজন ধূমকেতু দেখতে পারে।

দিনের বেলায় ধূমকেতু প্রথম -দেখেন আফ্রিকার তিনজন রেলের কুলি। এই ঘটনাটি ঘটে 1910 খৃষ্টাব্দে। আজ পর্যন্ত প্রায় 50টি পর্যায়ক্রমিক (Periodic) ধূমকেতু দেখা গেছে, যাদের পর্যায়কাল 300 বছরের কম।

Halley-র ধূমকেতুর আবর্তনকাল 76 বছর। 1910 খৃষ্টাব্দে Halley-র ধূমকেতুটি দেখা গিয়েছিল এবং আবার 1986 খৃষ্টাব্দের প্রথম দিকে এই ধূমকেতুকে দেখতে পাবার সম্ভাবনা আছে। 1811 খৃষ্টাব্দের ধূমকেতুর আবর্তনকাল প্রায় 3000 বছর আর 1864 খৃষ্টাব্দে ধূমকেতুর আবর্তন-

কাল প্রায় 2,000,000 বছর। কতকগুলি ধূমকেতুর সূর্যের চারদিক পরিক্রমার পথ প্রায় একই ধরনের। এই ধূমকেতুগুলিকে একই পৌঙ্কল বলে ধরা হয়। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, একটি ধূমকেতু থেকেই এদের উৎপত্তি হয়েছে।

সূর্যের চারদিক পরিক্রমা করলেও ধূমকেতু-গুলিকে সৌরমণ্ডলের মধ্যে গণ্য করা হয় না। সৌরমণ্ডলের সবকিছু নিরম এরা যেমন চলে না। তাই এরা গ্রহ-সূর্যের মধ্যে অপাংক্তেয়। জ্যোতির্বিদদের বহুদিনের অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যায়, ধূমকেতুগুলি একই পথে ভ্রমণ করে না। গ্রহগুলির মধ্যে এরূপ পরিক্রমার পথ পরিবর্তন প্রায় দেখা যায় না। বেশীর ভাগ ধূমকেতুকেই সৌরমণ্ডলের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত দিকে ঘুরতে দেখা যায়। Halley-র ও আরও কয়েকটি ধূমকেতুর গতি এর ব্যতিক্রম। ধূমকেতুর অগ্রভাগ ও পুঙ্খ প্রথমে সূর্যরশ্মি শোষণ করে পরে তা বিকিরণ করে। সূর্যরশ্মি এদের উপর প্রতিফলিত ও প্রতিসরিত হয় এবং অগ্রভাগের নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা আছে; কিন্তু গ্রহগুলির নিজস্ব আলো বিকিরণের ক্ষমতা নেই। সূর্যের আলোকেই এরা আলোকিত এবং সূর্যরশ্মি এদের থেকে প্রতিফলিত হয়। তবে গ্রহগুলির মত ধূমকেতুরও গতিবেগ বৃদ্ধি পায়—বতই সূর্যের নিকটবর্তী হতে থাকে; আর হ্রাস পায়—বতই সূর্য থেকে দূর বাড়তে থাকে।

ধূমকেতুর উৎপত্তি সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা একমত নন। একদলের মতে, সৌরমণ্ডল সৃষ্টি হবার সময় কিছু অংশ বেরিয়ে গিয়ে ধূমকেতুর সৃষ্টি হয়েছে আর একদলের মতে, সূর্য বা গ্রহের বিস্ফোরণের ফলে এদের সৃষ্টি হয়েছে। আবার অনেকে বলেন—সূর্যের আকর্ষণে সূর্য নীহারিকা থেকে কিছু অংশ ছিটকে আসবার ফলে ধূমকেতুর উৎপত্তি হয়েছে।

পুরাকালের অশুভ ইঙ্গিতবাহী ধূমকেতু

দ্রুতিক, মহাবাহী সৃষ্টি করতে না পারলেও পৃথিবীর উপর প্রলয়ধর ভূমিকম্প ইত্যাদি সৃষ্টিতে প্রত্যাব বিস্তার করতে পারে। সময় সময় দু-একটি ধ্বংসাত্মক ভাঁদের বিশাল কলসের নিয়ে পৃথিবী বা সূর্যপুঞ্জের খুব নিকটে চলে আসে। 1680 খৃষ্টাব্দের ধ্বংসাত্মক সূর্যপুঞ্জ থেকে দূরত্ব ছিল মাত্র 147,000 মাইল। 1882 খৃষ্টাব্দে একটি ধ্বংসাত্মক পৃথিবী ও সূর্যের মধ্যে এসে পড়ে। 1921 খৃষ্টাব্দে ধ্বংসাত্মক কবল থেকে আমাদের এই পৃথিবী অল্পের ভেত্রে বেঁচে যায়। 1910 খৃষ্টাব্দে পৃথিবী ধ্বংসাত্মক পুঞ্জের মধ্য দিয়ে যাবার সময় আকাশের বৃকে

অপরূপ আলোকছটা দেখে জ্যোতির্বিদগণ বিস্মিত হয়ে বান। অনেকের ধারণা ধ্বংসাত্মক পৃথিবীর অতি নান্দ্রিযেরই ফলেই বৃহৎ উচ্চ-গতির সৃষ্টি হয়েছে।

ধ্বংসাত্মক নাম তার আবিষ্কারকের নামানুসারেই রাখা হয়। কোন ধ্বংসাত্মক দেখা যায় তার গতিপথ, আকৃতি প্রকৃতি সবকিছু বিশেষ বিবরণ Harvard College Observatory-তে জানিয়ে দিলে সেটি যদি কোন নতুন ধ্বংসাত্মক হয়, তাহলে সংবাদপত্রের নামেই তা পরিচিত হবে।

## চাঁদের পাথর

ঐ অলোকহুমার সেন

1969 সালের 21শে জুলাই অ্যাপোলো-11 মহাকাশযানের দুই আরোহী আর্নল্ড ও অলড্রিন পদার্পণ করেন চাঁদের Sea of tranquility নামক অঞ্চলে। চাঁদের বৃকে কয়েক ঘণ্টা কাটিয়ে তাঁরা কিং এলেন পৃথিবীতে, সঙ্গে করে আনেন চাঁদের পাথর। আমেরিকাসহ পৃথিবীর আটটি দেশের এক-দু' পক্ষ জন বিশিষ্ট বিজ্ঞানী চাঁদের পাথর নিয়ে নানা প্রকার গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালান। আমেরিকার গবেষকেরা গত 15ই সেপ্টেম্বর চাঁদের গবেষণার ফলাফল প্রথম প্রকাশ করেন। অত্যন্ত দেশের বিজ্ঞানীরাও চাঁদের মহাযন্ত্র প্রকাশ করেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য হলো চাঁদের পাথর বিশ্লেষণে প্রাপ্ত তথ্যাদি সম্পর্কে আলোচনা। অবশ্য এই আলোচনার আগে বলা দরকার যে, কিতাবে তাঁরা পরীক্ষা চালিয়েছেন।

অ্যাপোলো-11-এর মহাকাশচারীরা যে সকল

শিলাখণ্ড নিয়ে আসেন, সেগুলিকে রাখা হয় টেনেসের হিউস্টনের নিকটবর্তী মহাকাশ অতি-বান কেন্দ্রে। মার্কিন বিশেষজ্ঞেরা চার বছরের চেষ্টার ও 80 লক্ষ ডলার বা 6 কোটি টাকা খরচ করে বিশেষ একটি গবেষণাগার তৈরি করেছেন। এখানেই চান্সিলাস রহস্য উদ্ঘাটিত হয়—জানা যায় তার ইতিহাস। শিলাগুলি বাড়ে পার্থিব বস্তুর সংস্পর্শে না আসতে পারে, তার ভেত্রে বিজ্ঞানীদের সতর্ক দৃষ্টি ছিল। কারণ পৃথিবীর আবহাওয়া বা পার্থিব পদার্থের সংস্পর্শে এলে প্রত্নতত্ত্বের গঠন-প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটতে পারে; তাছাড়া চান্সিলা থেকে সংক্রামক বীজাণু পৃথিবীর বাতাসে ছড়িয়ে পড়তে পারে।

প্রশান্ত মহাসাগরে অবতরণের পর ক্যাপ্টেন ও অভিযাত্রীদের সংগৃহীত প্রত্নতত্ত্বসহ আবারগুলিকে উদ্ধারকারী জাহাজের সাহায্যে সরাসরি হিউস্টনে নিয়ে আসবার পর তাদের বহিরাবরণ অতিবেত্তনী রশ্মি ও

বিভিন্ন অ্যাসিডের সাহায্যে বীজাণুশূন্য করা হয়। তারপর সেগুলিকে ঘোরা হয় বীজাণু-শূন্য জলে এবং বিচ্ছন্ন নাইট্রোজেন গ্যাসের সাহায্যে ঢুকিয়ে নেবার পর আবার-গুলিকে বায়ুশূন্য প্রকোষ্ঠে রাখা হয়। পরীক্ষার উদ্দেশ্যে বিজ্ঞানীরা প্রকোষ্ঠের ছোট ছোট জানালার মধ্য দিয়ে নিরাপত্তামূলক দস্তানা পরিহিত হাত ঢুকিয়ে শিলাখণ্ডগুলিকে বের করে আনেন।

প্রথমে প্রস্তরখণ্ডের শ্রেণীবিভাগ, নির্গত তেজ-রশ্মি ও গ্যাসের পরিমাণ নির্ধারণ করে পুনরুৎপাদনে সেগুলির ওজন নেবার পর বিশেষভাবে স্থাপিত ছুটি ক্যামেরার তাদের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্যায়ে শুরু হয় পুষ্কায়ুপুষ্ক পর্ববেক্ষণ। এই গবেষণার জন্তে বিশেষজ্ঞেরা কোন কোন শিলাখণ্ডকে রাসায়নিক পদার্থের সাহায্যে গলিয়ে ফেলেন বা উত্তপ্ত করে প্রথমে তরল ও পরে গ্যাসে পরিণত করেন আবার ঠাণ্ডার আরো জ্বিয়ে ফেলেন।

তৃতীয় পর্বে অঙ্কিত হয় আরো কঠিন পদ্ধতিতে পরীক্ষা-নিরীক্ষা। এই পর্যায়ে বিজ্ঞানীরা তেজ-নির্গমন পদ্ধতির সাহায্যে চাক্ষুশিলার বয়স নির্ণয় করেন এবং সেগুলির উপাদান নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা চালান।

এই সকল গবেষণার ফলে জানা গেল চাক্ষুশিলার ইতিহাস। চাক্ষুশিলার বিস্তারনে যে সমস্ত তথ্যাদি পাওয়া গেছে, তার মধ্যে সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য হলো—পৃথিবীতে পাওয়া যায় না এমন সব পদার্থে চাঁদের দেহ গঠিত। অবশ্য এই বিষয়ে এখনো কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় নি। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই ব্যাপারে একমত হয়েছেন যে, চাঁদের গঠন ও উপাদানের সঙ্গে পৃথিবীর গঠনে বশেষে বৈসাদৃশ্য বিদ্যমান।

আরও জানা গেছে যে, চাঁদের ধূলাবালির

অর্ধেকটাই কাচ দিয়ে তৈরী। এই কাচ অবশ্য পৃথিবীতে প্রাপ্ত কাচের মত নয়। এগুলি হলো খুব ছোট ছোট চক্কে গোলাকার কণিকার সমষ্টি। আর্কট্রিং ও অলট্রিন যে সব আলোকচিত্র তুলে এনেছেন, তা দেখে মনে হয় যে, তাঁরা বেস্তুনী মণ্ডের কাচের আবরণের উপর দিয়ে হেঁটে বেড়িয়েছেন। নব আবিষ্কৃত তথ্যাদি যদি নির্ভুল হয়, তাহলে বলা যায় যে, চাঁদের জন্মের প্রথম দশ-শ' কোটি বছর চন্দ্রপৃষ্ঠের উপর উভার আঘাত ও আগ্নেয়-গিরির বিস্ফোরণ ঘটেছে, কিন্তু গত তিন-শ' কোটি বছরে চন্দ্রপৃষ্ঠে অপেক্ষাকৃত কম বিস্ফোরণ ঘটে। কিন্তু পৃথিবীপৃষ্ঠের অবস্থা তা নয়। পরীক্ষার ফলে দেখা গেছে—কয়েক কোটি বছর আগে ভূপৃষ্ঠে যে রকম সক্রিয় ছিল, আজও সেই রকম সক্রিয় আছে। এর ফলে সৃষ্টি হয়েছে পাহাড়-পর্বত এবং মহাদেশগুলি ক্রমেই দূরে সরে গেছে আর আগ্নেয়গিরিগুলি অগ্ন্যুদ্গীরণ করে চলেছে। পক্ষান্তরে চাঁদের পৃষ্ঠদেশে ক্রমশঃ নিষ্ক্রিয় হয়ে যাচ্ছে বলে অনুমান করা হচ্ছে।

চাঁদের স্রুতিকার কাচের অস্বাভাবিক উপস্থিতি, শিলার তেজস্ক্রিয়তা এবং চাঁদের অবশিষ্টাংশের তুলনায় চাক্ষুশিলার ঘনত্ব বেশী—এই তিনটি তথ্য পর্ববেক্ষণ করে নিউইয়র্কের কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর গল গাট বলেছেন—চাঁদের বিবর্তনের ইতিহাস পৃথিবী থেকে সম্পূর্ণ পৃথক।

এবার চাক্ষুশিলার উপাদান সম্পর্কে যে সব তথ্য পাওয়া গেছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক। দেখা গেছে যে, প্রায় প্রত্যেকটি পাথর একই জাতীয় পদার্থের সমন্বয়ে গঠিত। পৃথিবীতে চুআপ্য পদার্থসমূহ চাঁদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে, যেমন—ক্রোমিয়াম, টাইটেনিয়াম ও ক্রিয়কোনিয়াম। চাঁদের আগ্নেয়শিলার শতকরা বারো ভাগ টাইটেনিয়াম অক্সাইড পাওয়া গেছে, কিন্তু পৃথিবীর আগ্নেয়শিলায় এই বৈশিষ্ট্য পদার্থের উপস্থিতি এক-শ' ভাগে পাঁচ ভাগ মাত্র। চাঁদের

পাথরে প্রাপ্ত কোম্বিরামের পরিমাণ পৃথিবীতে প্রাপ্ত কোম্বিরামের দশ গুণ বেশী।

আবার এখানে যে সকল মৌলিক পদার্থ যথেষ্ট পাওয়া যায়, তাঁদের সেগুলি হুপ্রাপ্য। সীসা, সোডিয়াম, পটাশিয়াম ও বিস্মাথের মত স্বল্প গলনাঙ্কের পদার্থ তাঁদের প্রায় নেই বললেই চলে। এই বিষয়কর তথ্যের বধ্যাবধ ব্যাখ্যা এখনো জানা যায় নি। তবে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, চাঁদের নিম্নার গঠন পৃথিবীর নিম্নার গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা হওয়ার অথবা যে পদ্ধতিতে তরল পদার্থের সৃষ্টি হয়, তা অল্পকণ পাথির প্রক্রিয়া থেকে পৃথক হওয়ার এই উপাদানগত বিভিন্নতার সৃষ্টি হয়েছে।

গত ৫ই জানুয়ারী দু-জন বিশিষ্ট জাপানী বিজ্ঞানী হিউস্টনে অবস্থিত মহাকাশ-গবেষণা কেন্দ্রে তাঁদের গবেষণার চূড়ান্ত কলাকল প্রকাশ করেছেন। এঁদের একজন হলেন টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর ইকুরো কুশিরো আর অপর জন ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর টাকেশী নাগাতা। এঁরা চান্সিলার অ্যাপাটাইট ও ইলাইট নামক দু-রকমের হুপ্রাপ্য খনিজ পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। ডক্টর কুশিরো বলেন যে, যাকিন মহাকাশ সংস্থা চান্সিলার বিশ্লেষণে বারোটি খনিজ পদার্থের অবস্থিতি প্রমাণিত করেছেন, কিন্তু এঁরা অ্যাপাটাইট বা ইলাইটের উপস্থিতি সম্পর্কে কিছু বলেন নি। ইলাইট শুধুমাত্র উদ্ভাপিওই পাওয়া যায়, কিন্তু পৃথিবীতে এর অস্তিত্ব নেই।

ডক্টর নাগাতা চৌবক শক্তি বিবরক গবেষক দলের প্রধান। তাঁর মতে চান্সিলার মধ্যে চৌবক শক্তির অস্তিত্ব আছে। এই বিজ্ঞানীদ্বয়ের ধারণা—চাঁদের সৃষ্টি হয়েছে চার-শ' পঞ্চাশ কোটি বছর আগে। তাঁরা আরো বলেন যে, চাঁদের উৎস হলো গলিত লাতা, পরে তা শক্ত হয়ে জমাট বাঁধে। এসকল উল্লেখযোগ্য যে, অ্যাপেলো-১১-এর মহাকাশচারীরা চাঁদের বৃকে অনেক আগ্নেয়শিলা

দেখতে পান। বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এক সময় পাথরগুলি ছিল কতকটা তরল অবস্থায়, সংঘর্ষের ফলে উদ্ভূত তাপে তা গলিত অবস্থায় পরিণত হয়। অবশ্য কেউ কেউ বলেন যে, এগুলি অধুৎপাতের ফলেই উৎকৃষ্ট হয়েছিল।

এবার চাঁদের ভূমিকম্প সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক। এই ভূমিকম্পের বিবর বধ্যাবধভাবে নিরূপণ করার জন্যে মহাকাশচারীরা চাঁদের বৃকে সিসমোগ্রাফ রেখে আসেন।

এই বর কর্তৃক প্রেরিত চক্রকম্পনের বিশ্লেষণের তার পড়েছিল নিউইয়র্ক সহরের কলাম্বিয়া বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ল্যামট ভূবিজ্ঞান মানমন্দিরের ডক্টর গ্যারি লাথাম ও ডক্টর মরিস ইউইং-এর উপর। এঁরা প্রাথমিক বিশ্লেষণের পর বলেন যে, চক্রপৃষ্ঠের কম্পন পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের অনুরূপ। কিন্তু পরে আরো পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরে তাঁরা প্রমাণ করেন যে, পৃথিবীপৃষ্ঠের কম্পনের সঙ্গে চক্রপৃষ্ঠের পার্থক্য বিস্তারমান। ডক্টর ইউইং বলেন—সিসমোগ্রাফ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক শব্দের ফলেই প্রথম সঙ্কেতগুলি ভূকম্পনের অনুরূপ মনে হয়েছিল। ডক্টর লাথাম বলেন—পরবর্তী সঙ্কেতগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে, ভূত্বকের নিরন্তরতার অবস্থা চাঁদের অত্যন্তর ভাগের মত নয়। চক্রের অত্যন্তর ভাগের কম্পন অনেক বিকৃষ্ট ও কীর্ণ। তিনি আরও বলেন যে, হয়তো চক্রদেহে কম্পনের কোন বড় উৎস নেই অথবা চক্রদেহে বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের তৈরি, তাই কম্পনের কিয়দংশ শোষণ করে নেয়। এই কারণে এখনো পর্যন্ত সিসমোগ্রাফ কোন তরঙ্গের কম্পনের সঙ্কেত পাঠায় নি। তিনি অল্পমান করেন যে, আদিম যুগে চক্রপৃষ্ঠে উদ্ধার আঘাতেই বড় বড় কাটলের উৎপত্তি হয়েছে। বিভিন্ন জাতীয় পদার্থের অবস্থিতি এই কথাই প্রমাণ করে যে, চাঁদের অত্যন্তর ভাগ কখনও সম্পূর্ণ গলিত অবস্থায় ছিল না। অবশ্য স্তরবিহীন শীতল চাঁদের তত্ত্বটি অল্পমান যাত্র। আরও গবেষণা

ও পরীক্ষার সাহায্যে যদি প্রমাণ করা যায় যে, তাঁদের দেহে প্রকৃত কাটল রয়েছে, তাহলে গ্রহ-বিজ্ঞানের ইতিহাসে এটা হবে এক নতুন আবিষ্কার।

চান্সশিলা পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চাঁদে জীবনের কোন সম্ভাবনা এখনো পর্যন্ত পাওয়া যায় নি। প্রথম পর্যায়ের পরীক্ষার কালে চাঁদ থেকে সংগৃহীত প্রস্তুতকৃতগুলিতে বিবাক্ত দ্রব্য, সংক্রামক জীবাণু বা জীবনের কোন মূল উপাদান পাওয়া যায় নি। তবে হিউস্টনের চান্স-গবেষণাগারের কৃষিক্ষেত্রে ও চিড়িয়াখানার এখনো পরীক্ষা চলেছে। পার্থিব বস্তুর উপর চান্সশিলার কোন দূর প্রতিক্রিয়া হয় কি না, সে সম্পর্কে গবেষণা শেষ করতে বেশ কয়েক বছর সময় লাগবে। সম্ভ্রুতি একটি সংবাদে বলা হয় যে, গবেষণাগারে চান্স-মৃত্তিকা যেখানে মাটিতে উদ্ভিদ বেশ ডাড়াডাড়া বেড়ে উঠছে। এসম্পর্কে নাসার জনৈক মুখপাত্র বলেন—গবেষণাগারের গাছপালার দৈনন্দিন বৃদ্ধির রিপোর্টে বলা হয়েছে যে, চান্সমৃত্তিকা যেখানে মাটিতে চারাগাছগুলি অভ্যস্ত তুলনার বেশী বড় ও সবুজ হয়েছে। চান্সমৃত্তিকার পালিত চারাগাছসহ আর চার হাজার গাছ পর্যবেক্ষণ করে দেখা যায় যে, এদের প্রত্যেকটি আর সমান-ভাবে বাড়ছে। এখানে বলা প্রয়োজন যে, কোন চারাই পৃথিবীর সাধারণ মাটি বা শুষ্ক চান্সমৃত্তিকার রোপণ করা হয় নি। মুখপাত্রটি আরও বলেন যে, চান্সমৃত্তিকার সংস্পর্শ পার্থিব বস্তু ও প্রাণীর উপর কোন উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারে নি। চন্দ্রের উপকরণের সাহায্যে যে সকল প্রাণীর উপর পরীক্ষা করা হয়েছে, তার মধ্যে আছে ছ-শ'টি ইঁদুর, ত্রিশটি জাপানী কাঠবিড়াল, বাহি, আরশোলা, বাহ, বিহু ও চিংড়ি। এই গবেষণার প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হয়েছে। জীব-বিজ্ঞানীরা আশা করেন যে, দ্বিতীয় ও

তৃতীয় পর্যায়ের পর্যবেক্ষণ শেষ হলে আরও নতুন তথ্য পাওয়া যাবে।

চন্দ্রপৃষ্ঠে জীবনের অবস্থিতির বিষয় অল্পসংখ্যক পুর বিজ্ঞানীরা চান্সশিলার বয়স নিরূপণে সচেষ্ট হন। অ্যাপোলো 11-এর ব্যক্তিরা যে সব প্রস্তর এনেছেন, সেগুলির বয়স তিন-শ' কোটি বছর থেকে সাড়ে চার-শ' কোটি বছর। সবচেয়ে প্রাচীন উপলব্ধের বয়স চার-শ' কোটি বছর। ভেজনি-গম্বন পদ্ধতির সাহায্যে এদের বয়স নিরূপণ করা হয়। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য যে, আজ পর্যন্ত পৃথিবীর যে সর্বপ্রাচীন পাথর আবিষ্কৃত হয়েছে, তার বয়স তিন-শ' ত্রিশ কোটি বছর। এজাতীয় শিলা ভূপৃষ্ঠের বেশ নিম্নে অবস্থিত।

চাঁদের পাথর চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের আবরণ উন্মোচনে বর্ধে সাহায্য করেছে। পৃথিবীর নৈশব কালে তার দেহের এক অংশ বিচ্ছিন্ন হয়ে চাঁদের সৃষ্টি হয়—এই মতবাদের বাধ্যতায় সন্দেহ এখন নানাবিধ প্রশ্ন উঠছে। কেউ কেউ বলছেন যে, চাঁদ ও পৃথিবী একই সময় একই রকম পদার্থ থেকে সৃষ্টি হয়েছিল। আবার কয়েকজন জ্যোতি-বিজ্ঞানী মনে করেন যে, চাঁদ মহাকাশের কোন স্থানে জন্ম লাভ করে ও পরে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তার উপগ্রহে পরিণত হয়। চাঁদ ও পৃথিবীতে প্রাপ্ত পদার্থের মধ্যে লক্ষণীয় পার্থক্য পর্যবেক্ষণ করেই বিজ্ঞানীরা উপরিউক্ত মতবাদ প্রকাশ করেছেন।

চাঁদের গঠন সন্দেহ বা জ্ঞান পেছে, এখন সে বিষয়ে কিছু আলোচনা করছি। বিজ্ঞানীদের সিদ্ধান্ত অনুসারে বলা যায় যে, তার উপরের স্বকের নীচের অংশ একটা বিরাট তরুর বলের মত। এই গোলাকৃতি অংশটি খণ্ড খণ্ড শিলার সমষ্টি। চাঁদের মারিয়া বা শুক সাগর অকলে বণ্ডিত পাথর-গুলির সংহত রূপ দেখা যায়। এই কারণে চন্দ্র পরিষ্কার মহাকাশবানের উপর চাঁদের অতিকর্ষ সব জায়গায় সমান নয়। চন্দ্রপৃষ্ঠ গঠিত হয়েছে



উচ্চাশিতার সংঘর্ষ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত বা এচও প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কলে, তাই তার দেহের অধিকাংশই হলো আগ্নেয়শিলা। এই শিলার উপরিভাগ অক্ষয় কালের মত, মনে হয় ছোট ছোট কণিকার সঙ্গে অবিরাম ঘর্ষণের কলে এই আকার ধারণ করেছে।

চাঁদশিলা আমাদের যে সব নতুন তথ্য জানিয়েছে, তাদের কি আমরা কোন কাজে লাগাতে পারি? এই প্রশ্নের উত্তর দিয়েছেন টেনেসির ওকরীজের জাতীয় বীক্ষণাগারের অধ্যক্ষ ডক্টর ম্যাক ডাকি। তিনি বলেন—চাঁদে পদার্পণের আগে তার সম্বন্ধে গবেষণা চালানো হতো আল্ফা কণিকার বিকিরণ-পদ্ধতির দ্বারা, কিন্তু এখন অনেক সহজভাবে সে সম্বন্ধে তথ্যাদি সংগৃহীত হচ্ছে। চাঁদের শিলার রং বেগুনী কেন? ম্যাক ডাকির মতে, কোটি কোটি বছর ধরে চাঁদের বৃক্কে অবাধে তেজ-বিকিরণ হওয়ার বেগুনী পাথরের সৃষ্টি হয়েছে। কেন না, এই প্রক্রিয়ার রঙের তিস্তিসূচক তৈরি হয়। শিলার দ্বারা শোষিত তেজ-রশ্মির উচ্চশক্তি যখন ইলেকট্রনকে তার আত্যাবিক অবস্থা থেকে বিচ্যুত করে, তখন এই সব রঙীণ তিস্তি গড়ে উঠে।

চাঁদের পাথর জৈব অণুর দ্বারা দূষিত নয়। তাই এগুলি থেকে অতীত জৈব জীবনের অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। চাঁদের বায়ু-শূন্যতার সাহায্যে কোন গ্যাসের দূষিত অংশ হ্রাস করা সম্ভব। তাছাড়া চাঁদের বৃক্কে সহজেই বিদ্যুৎ উৎপাদন করা যাবে। তাই আশা করা যায় যে, আগামী দশকের মধ্যে চাঁদ হবে একটি স্থায়ী গবেষণাগার, যেখান থেকে বিশ্বের সৃষ্টি-রহস্যের উপর আলোকপাত করা সম্ভব হবে—আমরা যাবে জীবনের উৎস আর সন্ধান করা হবে নানা তথ্যের।

পরিণেবে চাঁদশিলা সম্পর্কে ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার কলাকলের কথা বলছি। আমেরিকার এক-ন' জন বিজ্ঞানী ব্যতীত অন্যান্য

দেশের যে হজিরা জন বিজ্ঞানী চাঁদশিলা বিশ্লেষণের জন্তে মনোনিবেশ হন, তাঁদের মধ্যে চারজন ভারতীয়। এঁরা হলেন বখাকমে ডক্টর কে. গোপালন, যুক্তরাষ্ট্রের মিনেসোটা বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি. রামমূর্তি, স্তানডিয়েগোর ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর জেমস্ আর-লণ্ডের সহকারী ডক্টর দেবেজলাল ও ইয়েল বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর ডি. পি. খারকার।

ডক্টর কে. গোপালন একজন ভূ-পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ। তিনি ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ে ভূ-পদার্থবিজ্ঞা ও গ্রহ-পদার্থবিজ্ঞা সংস্থার ১৯৬৬ সাল থেকে গবেষণা করছেন। এবছর ষড়্‌গুণে অহুষ্টিত ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশনে তিনি জানান যে, চাঁদ থেকে প্রাপ্ত উপলব্ধ-গুলির গঠন পৃথিবীতে প্রাপ্ত উপলব্ধ-গুলির গঠন থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত হলো—চাঁদে পাওয়া পাথর পৃথিবীতে পাওয়া পাথরের চেয়ে পুরনো হতে পারে। এই সিদ্ধান্ত চাঁদের সৃষ্টি-রহস্যের উপর নতুন আলোকপাত করতে সাহায্য করবে। অন্যান্য ভারতীয় বিজ্ঞানীদের গবেষণার বিষয়বস্তু হলো, শিলাখণ্ডের প্রাকৃতিক ঘর্ষণের বিশ্লেষণ। তাঁদের গবেষণার কলাকল টেক্সাসে অহুষ্টিত আন্তর্জাতিক বৈজ্ঞানিক সম্মেলনে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখন পর্যন্ত তাঁদের অহুসন্ধান সম্পর্কে বিস্তৃত তথ্য পাওয়া যায় নি।

অ্যাপোলো-১১-র সার্থক চন্দ্র অবতরণের পর গত বছর নভেম্বর মাসে অ্যাপোলো-১২-র দুই অভিযাত্রী কনরাড ও বীন আবার চাঁদের বৃক্কে নামেন। তাঁরাও সঙ্গে এনেছেন চাঁদের পাথর। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই শিলাগুলির বিশদ পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চাঁদ, পৃথিবী ও সৌরজগৎ সম্পর্কে নতুন অনেক তথ্য আবিষ্কৃত হবে। শীঘ্রই বিশ্বের নানা দেশে চাঁদশিলা নিয়ে গবেষণা শুরু হবে। স্ত্রুতরাং চাঁদ সম্পর্কে অধিকতর জ্ঞান লাভের জন্তে আমাদের আরও অপেক্ষা করতে হবে।



# নিজ্জার স্নায়ু-রাসায়নিক তত্ত্ব

সুভাষচন্দ্র বসাক ও জগৎজীবন ঘোষ\*

নিজ্জা কেন ও কিভাবে আসে—এই সম্পর্কে মাহুয়ের কোত্থল আজকের নয়, গত দশ বছরে অনেক বিজ্ঞানীই নিজ্জার রহস্য উদ্ঘাটনের চেষ্টার এগিয়ে এসেছেন। তাঁদের অক্লান্ত পরিশ্রমের কল হিসাবে জীবনের এই রহস্যবৃত্ত অংশ সবচেয়ে অনেক নতুন তথ্য আমাদের জ্ঞানগম্য হয়েছে। নিজ্জার স্বরূপ ও প্রকৃতি সম্পর্কে অনেক প্রাচীন ও ভ্রান্ত ধারণার অবসান হয়েছে। সুতরাং নিজ্জার স্বরূপ কি এবং কেনই বা তার আবির্ভাব ঘটে, সে সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা যাক।

## নিজ্জার সংজ্ঞা ও লক্ষণ

এক কথায় নিজ্জার সঠিক কোন সংজ্ঞা জানা নেই। মোটামুটিভাবে বলতে গেলে নিজ্জা প্রাণীদের জীবনের এমন একটি অবস্থা, যখন প্রাণীদের সঙ্গে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সক্রিয় যোগাযোগ হ্রাস পায় এবং এই অবস্থা থেকে প্রাণীকে স্বভাবসিদ্ধি জাগ্রতাবস্থায় ফিরিয়ে আনা যায়। নিজ্জার সময় শরীরের অনেক পেশীর কার্যকারিতা হ্রাস পায় বা লুপ্ত হয়ে যায়—প্রাণীদের চলাচলের কোন প্রবণতা থাকে না। শুধুমাত্র শ্বসনের সময় অনিয়মিতভাবে শ্বসন ও মুখমণ্ডলের পেশীসমূহ সক্রিয় হয়ে ওঠে। দেহের প্রতিটি পেশীর কর্মক্ষমতা হ্রাসই নিজ্জার বৈশিষ্ট্য—এই ধারণা কিন্তু ভুল বরং কোন কোন পেশী নিজ্জার সময় অনেক বেশী সক্রিয় হয়ে ওঠে। বিভিন্ন প্রাণীর দেহ নিজ্জার সময় বিশেষভাবে ঝাঁক অবস্থায় থাকে; যেমন—পাখীরা ঝাঁড়ের উপর বিশেষ তক্তীতে বসে ঘুমায়, বাছুর ঘুমে সময় পায়ের নখের সাহায্যে গাছের ডাল আঁকড়ে ধরে বুলে থাকে। ঘুমে সময়

প্রাণীদের চোখের পাতা বিশেষভাবে বন্ধ থাকে এবং বাইরে থেকে বল প্রয়োগে খোলবার চেষ্টা করলে আরও বেশী সংকোচন লক্ষ্য করা যায়। জাগ্রতাবস্থায় যে সব দুর্বল উত্তেজনার প্রাণীরা সাঁড়া দিতে পারে, নিজ্জার সময় সেগুলির কার্যকারিতা হ্রাস পায় অথবা একেবারেই লুপ্ত হয়ে যায়। কিন্তু উপযুক্ত উত্তেজনার দ্বারা অতি সহজেই ঘুমন্ত প্রাণীকে জাগ্রতাবস্থায় নিয়ে আসা সম্ভব। এটা নিজ্জার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। অসাড়তা (Anaesthesia) বা কোমা (Coma) বাছুর: নিজ্জার অল্পরূপ অবস্থা হলেও এমন অবস্থা থেকে প্রাণীকে জাগ্রত করার জন্যে প্রয়োজনীয় ন্যূনতম উত্তেজনার মান অনেক বেশী। তাছাড়া অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগ্রাবার পর প্রাণীর শারীরিক বা মানসিক অবস্থা এবং নিজ্জা থেকে জাগ্রাবার পরের অল্পরূপ অবস্থার মধ্যে তফাৎ অনেক। নিজ্জা থেকে জাগ্রাবার পর মাহুয় সাধারণতঃ জাগ্রতাবস্থায়ই থাকে। অপর পক্ষে, বাইরে থেকে প্রযুক্ত উত্তেজনার কার্যকাল শেষ হলেই অসাড়তা বা কোমা থেকে জাগ্রত প্রাণীর পূর্বাবস্থায় ফিরে যাবার জোর প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়।

নিজ্জা কতটা গাঢ়—সেটা জানবারও কোন স্তর উপায় নেই। নিজ্জার যে অবস্থা থেকে জাগাতে বড় শক্তিশালী উত্তেজনার প্রয়োজন হয়, সেই অবস্থাকে তত গাঢ় বলা হয়। কিন্তু উত্তেজকের কার্যকারিতা, তার গুণ এবং পরিমাণ উভয়ের উপরই সমানভাবে নির্ভরশীল। পরিচিত বেশী শক্তিশালী উত্তেজকের চেয়ে অপরিচিত দুর্বল উত্তেজনার প্রাণী অনেক প্রবলভাবে সাঁড়া দেয়। কোন কোন

\* জৈব রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

কেন্দ্রে আবার বিশেষ বিশেষ উত্তেজনার প্রাণীরা সর্বাধিক সাড়া দেয়। সামান্য শব্দেই কুকুরের গাঢ় নিদ্রা ভেঙে যায়। মায়েদের ঘুম ভাঙাবার জন্যে অল্প শক্তিশালী শব্দের চেয়ে শিশুর সামান্য কান্নাই যথেষ্ট। ঘুমন্ত বিড়ালের নাকের কাছে এক টুকরা মাংস ধরলেই তৎক্ষণাৎ সে লাফিয়ে ওঠে।

মাছের নিদ্রিতাবস্থায় যে সব বৈশিষ্ট্যগুলি মনুষ্যের প্রাণীদের বিজ্ঞানের অবস্থার দেখতে পাওয়া যায়, সেই সব অবস্থাকে আমরা নিদ্রা অবস্থা দিয়ে থাকি। কিন্তু অত্যন্ত অনেক জৈব প্রক্রিয়ার মত নিদ্রার কারণ ও প্রকৃতি বিভিন্ন প্রাণীতে বিভিন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্য নয়। তাছাড়া উপরিউক্ত বৈশিষ্ট্যগুলির সাহায্যে জাগ্রতাবস্থা, জাগ্রত বিশ্রামাবস্থা, তন্দ্রা, হাক্সা ঘুম এবং গাঢ় ঘুম ইত্যাদি বিভিন্ন অবস্থার মধ্যে পার্থক্য নিরূপণ সম্ভব নয়। Electro-encephalogram বা E. E. G-এর মাধ্যমে উপরিউক্ত অবস্থাগুলিকে অংশতঃ পৃথক করা সম্ভব হয়েছে। এই সব বিভিন্ন অবস্থার বিভিন্ন ই. ই. জি. তরঙ্গ পাওয়া যায়। জাগ্রতাবস্থায় সর্বদাই আলফা-তরঙ্গ পাওয়া যায়, তন্দ্রার সময় ই. ই. জি-তে মাঝে মাঝে আলফা-তরঙ্গের বিলুপ্তি পরিলক্ষিত হয়। গাঢ় নিদ্রার সময় ডেল্টা-তরঙ্গের ই. ই. জি পাওয়া যায়। বর্তমানে নিদ্রার লক্ষণ হিসাবে বাহ্যিক বৈশিষ্ট্য এবং ই. ই. জি.—এই দুই পদ্ধতিকেই সমানভাবে কাজে লাগানো হয়েছে।

### নিদ্রা নিষ্ক্রিয়, না সক্রিয় অবস্থা?

আগে অনেক বিজ্ঞানীর ধারণা ছিল যে, নিদ্রা একটি নিষ্ক্রিয় অবস্থা। বিজ্ঞানী ত্রেবারের মতে, জেগে থাকতে না পারলেই নিদ্রা আসে। জাগ্রত অবস্থার বীয়ে বীয়ে যে আয়বিক ক্লাসি আসে, তার কলে পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে প্রাণীদের যোগাযোগ হ্রাস পায়। এই হ্রাসই যদি নিদ্রার একমাত্র কারণ হয়, তবে নিদ্রা নিষ্ক্রিয়ই নিষ্ক্রিয় অবস্থা। কিন্তু

গত দশকে বিজ্ঞানীরা যত্নে এমন একাধিক অংশ খুঁজে পেয়েছেন, যেগুলি সক্রিয়ভাবে জাগ্রত অবস্থা থেকে প্রাণীকে নিদ্রাগ্রস্ত করে দিতে পারে। তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার যন্ত্রিকের একাধিক অংশকে উত্তেজিত করলে নিদ্রা আসে। এছাড়া যন্ত্রিকের বিভিন্ন অংশকে কেটে কতিপয় করলেও নিদ্রার পরিমাণ কমে যায়। এই সব পরীক্ষা থেকে বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, বাতাবিক নিদ্রার জন্যে যন্ত্রিকের একাধিক অংশের মধ্যে সক্রিয় যোগাযোগ প্রয়োজন। কাজেই বর্তমানে অনেক জীব-বিজ্ঞানীই মনে করেন যে, নিদ্রা একটি সক্রিয় অবস্থা।

### নিদ্রা এক, না একাধিক অবস্থা?

ঘুমন্ত প্রাণীর অবিরাম ই. ই. জি. নিতে গিয়ে জানা গেছে যে, তত্তপারী প্রাণীদের নিদ্রা অন্ততঃ একটিমাত্র অবস্থা নয়। এই সব প্রাণীদের ঘুমন্ত যন্ত্রিক পর পর দুটি অবস্থার মধ্যে দিয়ে যায়।

প্রথম অবস্থাকে বলা হয় ধীর-তরঙ্গের নিদ্রা। এই অবস্থায় ই. ই. জি-তে যে তরঙ্গ পাওয়া যায়, তা জাগ্রতাবস্থার তরঙ্গ থেকে আলাদা এবং ধীর। এই অবস্থায় প্রাণীর হাবতাব নিদ্রার অল্পরূপ থাকে এবং চোখ বন্ধ থাকে। কিছুকণ এই অবস্থা চলবার পর সম্পূর্ণ অল্প এক অবস্থার আবির্ভাব ঘটে। এই অবস্থাকে বলা হয় স্বপ্নকালীন নিদ্রা বা প্যারা-ডল্লিক্যাল নিদ্রা। এই অবস্থায়ই আমরা স্বপ্ন দেখি। জাগ্রতাবস্থার অল্পরূপ ই. ই. জি. অল্প-প্রত্যয়ের অনিরমিত সঞ্চালন এই অবস্থায় বৈশিষ্ট্য। স্বপ্নের নিদ্রায় আবার দুটি অবস্থা—1. টোনিক (Tonic) ও 2. ফেজিক (Phasic)। প্রথম অবস্থায় যন্ত্রিকের ই. ই. জি-তে দ্রুত তরঙ্গ দেখা যায় এবং ঘাড়ের পেশীর কোন কার্যকারিতা থাকে না। কিছুকণ এই অবস্থা চলবার পর ই. ই. জি-তে বিশেষ ধরনের এক প্রকার ধীর তরঙ্গের আবির্ভাব ঘটে এবং জাগ্রতাবস্থা থেকে তির এক বিশেষ

ধরনে চোখ জড় নড়তে থাকে। এই সংখ্যা হলো মিনিটে 50 থেকে 60 বার। নিজার এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হবার পর সকলেই বলে—সে স্বপ্ন দেখছিল। কিন্তু আমরা অনেকেই বলি—আমরা মাঝে মাঝে স্বপ্ন দেখি। আসলে আমরা যোজাই রাতে কয়েক বার করে স্বপ্ন দেখি এবং পরবর্তী ধীর-তরঙ্গের নিজার সময় তা ভুলে বাই। মাঝে মাঝে দু-একটা স্বপ্নের কথাই মাজ মনে থাকে। চোখ নড়বার গতি ও প্রকৃতির সঙ্গে স্বপ্নের কি সম্বন্ধ, তা জানা নেই। তবে অনেকেই মনে করেন, স্বপ্নের সময় পরিদৃশ্যমান বস্তুর সংখ্যা বত বেশী হয় বা স্বপ্নের দৃশ্য বত উত্তেজনাপূর্ণ হয়, চোখ পড়বার গতিও তত বেশী হয়। সুস্থ ও সবল প্রাণীর ক্ষেত্রে কিছুকণ ধীর-তরঙ্গের নিজা চলবার পর স্বপ্নের নিজার আবির্ভাব ঘটে। নিজার প্রথমেই কখনও প্যারাডক্সিক্যাল নিজা হয় না। মনুষ্যের প্রাণীদের মধ্যেও স্বপ্নের নিজার প্রকৃতি মানুষের নিজার অনুরূপই হয়ে থাকে। মাছ ও সরীসৃপের ক্ষেত্রে শুধু ধীর-তরঙ্গের নিজাই হয়ে থাকে। পাখীদেরও স্বপ্নের নিজা আছে, যদিও তার স্থায়িত্ব অতি সামান্য। অপর পক্ষে অপোসাম থেকে আরম্ভ করে মানুষ পর্যন্ত বাবতীর স্তম্ভপায়ী প্রাণীতেই স্বপ্নকালীন নিজার অতিশু নিখুঁতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

আরও লক্ষণীয় এই যে, যে সকল প্রাণীর কেন্দ্রীয় স্নায়ুতন্ত্রের গঠন জন্মের সময় অসম্পূর্ণ থাকে (যেমন—ইঁহর, বিড়াল, ধরগোস ইত্যাদি), তাদের ক্ষেত্রে নবজাতকের ধীর-তরঙ্গের নিজা হয় না, জাগ্রতাবস্থার পরেই স্বপ্নকালীন নিজা আসে। কিন্তু যেসব প্রাণীর মস্তিষ্কের গঠন জন্মের আগেই সম্পূর্ণ হয়ে যায়, তাদের ক্ষেত্রে প্রথম থেকেই দুই প্রকার নিজা দেখতে পাওয়া যায়।

### নিজা আবির্ভাবের কারণ

অনেকেই মনে করেন যে, ক্রান্তিই নিজার একমাত্র কারণ। শারীরিক দিক থেকে ক্রান্তি

এমন একটা অবস্থা, যখন কর্কশতা হ্রাস পায়, বাইরের উত্তেজনায় সাড়া দেবার ক্ষমতাও কমে যায়। আর মানসিক দিক থেকে ক্রান্তি হলো এমন একটা অস্বস্তিকর অবস্থা, যখন তা শেষ পর্যন্ত আমাদের কাজের মধ্যে সাময়িক ছেদ এনে দেয়। ক্রান্তির উৎস সম্পর্কে বিজ্ঞানীরা একমত নন। তবে অনেকেই মনে করেন যে, জাগ্রতাবস্থার নানাপ্রকার রাসায়নিক পদার্থ অধিক মাত্রায় কোবে জমে যায় এবং তার ফলেই প্রাণীরা ক্রান্ত হয়ে পড়ে।

Legendre পরীক্ষামূলকভাবে ক্রান্ত কুকুরের মস্তিষ্কে থেকে 5 সি. সি. তরল পদার্থ বের করে সুস্থ ও সবল অস্ত্র একটি কুকুরের মস্তকে ইন্জেকশন করে দেন। কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল, সতেজ কুকুরটি বিমূর্তে বিমূর্তে ঘুমিয়ে পড়লো। তিনি আরও দেখালেন যে, ক্রান্ত হবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোবের যে প্রকার আকৃতিগত পরিবর্তন ঘটে, এই তরল ইন্জেকশন দেবার ফলে সুস্থ কুকুরের মস্তিষ্ক-কোবেও অনুরূপ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এসব পরীক্ষা থেকে Legendre এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, জেগে থাকবার সময় মস্তিষ্কে এমন কোন পদার্থ তৈরি হয়, যার জন্মে ক্রান্তি ও নিজা আসে। তিনি এই পদার্থটির নাম দিয়েছেন হিপনোজেন (Hypnogen)। এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ব্যাপার এই যে, উপরিউক্ত ইন্জেকশন দেবার ফলে মস্তিষ্কে তরলের চাপ বেড়ে যায় এবং শুধুমাত্র এই কারণেই ক্রান্তি আসা সম্ভব।

Kroll বিড়াল ও ধরগোসের মস্তিষ্কে এমন একটি দ্রবণীয় পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন, যা সকল প্রাণীদের মধ্যে নিজা এনে দিতে সক্ষম। অপর পক্ষে, বিজ্ঞানী Monier ক্রান্ত প্রাণীর রক্ত থেকে এমন একপ্রকার রস পৃথক করতে সক্ষম হয়েছেন, যা সুস্থ ও জাগ্রত প্রাণীকে ঘুমোতে বাধ্য করে।

উপরিউক্ত পরীক্ষাগুলি থেকে বলা যেতে পারে যে, ক্রান্ত প্রাণীর হৃদিকে ও রক্তে এক বা একাধিক পদার্থ জমে যায়, যা নিজার জন্মে দায়ী। সঙ্গে সঙ্গে যে একটি মনে আসে, সেটি হলো, Kroll-এর পাওয়া হিপনোজেন ও Monier-এর পাওয়া হিপনোজেন—এই দুটি কি একই পদার্থ? এই প্রশ্নের কোন সন্তুস্তর জানা নেই।

কোন কোন বিজ্ঞানীর মতে, নিজা ও জাগ্রতাবস্থার স্থিতি ও প্রকৃতি প্রাণীর আত্যন্ত-রূপ হৃদয়ের দ্বারা পরিচালিত হয়। লক্ষ্য করা গেছে, দিন-রাত্রির ২৪ ঘণ্টার এক বিশেষ ঘূর্ণ আসে এবং এই সময়েরই এক বিশেষ অংশে নিজা সর্বাধিক গাঢ় হয়। অবশ্য একেজের বলা যেতে পারে যে, বাইরের আলোর তীব্রতা, কলরব, তাপমাত্রা ইত্যাদি বিভিন্ন কারণের জন্মে এটা হতে পারে। এই কারণগুলি নিঃসন্দেহেই নিজাকে যথেষ্ট প্রভাবিত করে। কিন্তু কোন উপায়ে এগুলিকে সরিয়ে দিলেও দেখা যায় যে, প্রাণীদের নিজা-জাগরণ চক্র একটি হৃদয়ের তালে তালে চলে। বিজ্ঞানী Mills একটি সুন্দর পরীক্ষা করেছেন। তিনি একটি লোককে ১০৫ দিন নির্জন কক্ষে রেখে দেন। প্রথম প্রথম দেখা গেল, লোকটি পূর্বকার অভ্যাস অনুযায়ী আগের মত সময়েরই ঘুমিয়ে পড়ছে, কিন্তু ধীরে ধীরে এই সময়ের পরিবর্তন হতে থাকে। Mills লক্ষ্য করেন যে, নিজার যেট সময়ের পরিবর্তন করতে গেলে সব সময়েরই কিছুটা সময়ের প্রয়োজন হয় এবং তাড়াতাড়ি পরিবর্তনের চেষ্টা করলে এই পরিবর্তিত অবস্থার সঙ্গে নিজেকে ঝাপ খাইয়ে নিতে লোকটি বেশ অসুবিধা বোধ করে।

এই আত্যন্তরূপ হৃদ্য কিভাবে পরিচালিত হয়, সে সম্পর্কে যতন্তর আছে। অনেক মনে করেন যে, আত্যন্তরূপ হৃদয়ের কিয়ার কলে এক

বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থের উৎপাদন পর্যায়ক্রমে কমে বা বাড়ে। এই কারণেই ব্যালাবাসের নিজা-নিয়ন্ত্রণ কেন্দ্রের উপর হিপনোজেনের প্রভাব পর্যায়ক্রমে কমে ও বাড়ে। এটা নিছক বিজ্ঞানীদের ধারণামাত্র, কোন পরীক্ষালব্ধ সত্য নয়। তবে উপরিউক্ত মতের সাহায্যে আমরা ব্যাখ্যা করতে পারি—কেন অনেক দিন অনিদ্রার পরেও যে সময়ে ঘুমানো অভ্যাস নয়, সে সময়ে সচরাচর ঘুম আসে না। আবার সুস্থ মানুষকেও ঘুমা-বার সময়ের ক্ষেপে থাকতে হলে প্রবলতম ইচ্ছা-শক্তি প্রয়োগ করতে হয়।

পরিবেশবাদী বিজ্ঞানী প্যাটল্ডের মতে, নিজা হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতার কল (Conditioned reflex)। তিনি প্রধানতঃ কুকুর নিয়ে পরীক্ষা চালিয়ে দেখিয়েছিলেন যে, একটি কুকুরকে খাবার দেবার সময় যদি বেশ কিছুদিন এক সঙ্গে ঘণ্টা বাজানো চালিয়ে যাওয়া যায়, তবে কুকুর খাবার দেওয়া ও ঘণ্টা বাজার ঘটনা দুটির সঙ্গে এমনভাবে অভ্যস্ত হয়ে যায় যে, পরে খাবার না দিয়ে শুধু ঘণ্টা বাজালেই কুকুরের জিভ দিয়ে লালা নির্গত হতে থাকে। এটাই হলো সংঘটিত প্রতিবর্তিতা। বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে কোন প্রাণীকে এভাবে অভ্যস্ত করতে বেশ কিছুদিন সময় লাগে। প্যাটল্ডের মতে, নিজার পূর্বে আমরা যে শব্দকে খাই, নিজার কথা চিন্তা করি—এই সব ঘটনার সঙ্গে নিজার একটি নিবিড় সম্পর্ক রয়েছে। কিন্তু বসজাতকের নিজার ক্ষেত্রে এমন কোন সংযোগ লক্ষ্য করা যায় না। সুতরাং প্যাটল্ডের মতবাদ নিজাকে পুরাপুরি ব্যাখ্যা করতে পারে না।

ধীর-ভরজের নিজা ও অল্পকালীন নিজার কারণ কি এক?

নিজা দুই প্রকার ও নিজার কারণ হিপনোজেন—এই তথ্য জানবার পরেই যে প্রশ্নটা

স্বভাবতঃই যেন আসে, সেটা হলো দুই প্রকার নিষ্কার জন্তে কি একই হিপনোজেন দারী? সুতরাং হিপনোজেন সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক। বিভিন্ন পরীকার এমন সব ভাষা পাওয়া গেছে, যা থেকে যেন করা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের অ্যামিনজাতীয় পদার্থের (Biogenic amines) সঙ্গে হিপনোজেনের নিবিড় সম্পর্ক আছে। এই ধরনের প্রধান তিনটি অ্যামিন হলো—Serotonin, Noradrenalin এবং Dopamine। বিড়ালের মস্তিষ্কে সরাসরি সেরোটোনিन ইন্জেকশন দিলে বীর-তরঙ্গের নিষ্কার বেড়ে যায়। বিড়ালকে Reserpine ইন্জেকশন দিলে 12 ঘণ্টার জন্তে বীর-তরঙ্গের নিষ্কার এবং 24 ঘণ্টার জন্তে স্বপ্নের নিষ্কার বন্ধ হয়ে যায়। এই অবস্থার প্রাণীকে Serotonin ইন্জেকশন দিলে কোন পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায় না; কারণ এই পদার্থটি রক্ত ও মস্তিষ্কের মধ্যবর্তী বাধা অতিক্রমে অক্ষর। কিন্তু 5-hydroxy tryptophan ইন্জেকশন দিলে পদার্থটি সহজেই মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয় এবং বীর-তরঙ্গের নিষ্কার পুনরাবৃত্তি ঘটে। অপর পক্ষে, ডোপা ইন্জেকশন দিলে স্বপ্নের নিষ্কার আবির্ভাব হয়। ডোপা মস্তিষ্কে গিয়ে ডোপামিনে রূপান্তরিত হয়। এই পরীকা থেকে যেন হয় যে, বীর-তরঙ্গের নিষ্কার কারণ সেরোটোনিন এবং স্বপ্নের নিষ্কার কারণ হলো ডোপামিন।

Nialamide, Iproniazid ইত্যাদি ওষুধগুলি মস্তিষ্কের এমন কয়েকটি রাসায়নিক বিক্রিয়া বন্ধ করে দেয়, যেগুলি অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলিকে তেজে কলে। কলে উপরিউক্ত ওষুধগুলি ইন্জেকশন দিলে মস্তিষ্কে অ্যামিনের পরিমাণ বেড়ে যায়। এতে বীর-তরঙ্গের নিষ্কার কোন কতি হয় না, কিন্তু স্বপ্নের নিষ্কার ব্যাহত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, মস্তিষ্কের

অ্যামিনজাতীয় পদার্থগুলি রাসায়নিক বিক্রিয়ার তেজে যাবার সময় এমন সব পদার্থ তৈরি করে, যাদের সঙ্গে স্বপ্নের নিষ্কার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে।

প্রাণীকে প্যারাক্লোরোফেনাইল-অ্যালানিন (p-chlorophenylalanine) ইন্জেকশন দিলে নিষ্কার একেবারে লুপ্ত হয়। দেখা গেছে যে, এই ওষুধের কাজ হলো মস্তিষ্কের সেরোটোনিন তৈরি একেবারে বন্ধ করে দেওয়া। এই অবস্থার 5-hydroxy tryptophan ইন্জেকশন দিলে উভয় প্রকার নিষ্কারই কমে আসে। শেষোক্ত ওষুধটি মস্তিষ্কে গিয়ে সেরোটোনিনে রূপান্তরিত হয়। সুতরাং বলা যেতে পারে যে, বীর-তরঙ্গের-নিষ্কার একমাত্র কারণ সেরোটোনিন হলেও স্বপ্নকালীন নিষ্কার কারণ একাধিক। ডোপামিনজাতীয় পদার্থ ছাড়াও সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত এক বা একাধিক রাসায়নিক পদার্থ এই বিশেষ ধরনের নিষ্কার জন্তে দারী। তবে সেরোটোনিন থেকে উদ্ভূত পদার্থগুলির স্বরূপ এখনও অনাবিষ্কৃত।

### নিষ্কার প্রাকৃতিক স্বরূপ ও প্রয়োজনীয়তা

নিষ্কার প্রকৃতি এবং শরীরের উপর প্রভাব সম্পর্কে অনেক মতপার্থক্য আছে। জাগ্রতাবস্থার মত নিষ্কার প্রাণীদের অল্প এক অবস্থা, যখন দেহের বিভিন্ন অংশের ক্রিয়া বিভিন্নভাবে চলতে থাকে। হৃৎপিণ্ডের স্পন্দন, শরীরের তাপমাত্রা ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের জন্তে শরীরের বিশেষ বিশেষ অংশের প্রয়োজন হয়, কিন্তু নিষ্কার বেলার সমস্ত প্রাণীটাই ঘুমায়ে। নিষ্কার ক্রান্তি দূর করবার কষমতা সম্পর্কে সন্দেহ করবার অবকাশ নেই, কিন্তু জীব-কোষ কিতাবে একাজ সমাধা করে, তা আজও অজানা রয়ে গেছে।

বর্তমানে অনেকেই যেন করেন যে, মস্তিষ্কের গ্লিওকোবের রাসায়নিক ক্রিয়ার উপর গ্লিয়া কোষের (Glial cell) প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ প্রভাব বর্তমান।

Hyden ও Lange দেখিয়েছেন যে, নিজার সময় জাহ্নুকোষের সাক্সিনোজিডেজ (Succinoxidase) নামক এন্জাইমটির কার্যক্ষমতা জাহ্নুকোষের ভুলনায় তিন তরু বৈধী। অপর পক্ষে গ্রান্না কোষের বেলায় ট্রিক বিপরীত অবস্থা পরিলক্ষিত হয়। অবশ্য জাহ্নুকোষ ও গ্রান্না কোষের পারস্পরিক সম্পর্কের সন্ধে নিজা ও জাগরণের সঠিক কি সম্পর্ক, তা জানা নেই।

প্রাণীকে দীর্ঘ সময় ঘুমোতে না দিলে শারীরিক ও মানসিক অবস্থার প্রভূত পরিবর্তন হয়। শুধু হাতি যথেষ্ট নিজা বন্ধ করে দিলেও মানসিক অবস্থা, তথা ব্যক্তিত্বের পরিবর্তন হয়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, নিজা—এমন কি, যন্ত্রণা ও আত্মবিকারের জন্তে অপরিহার্য।

অনেকে মনে করেন যে, নিজা বত গাঢ় হয়, তার স্মৃতি দূর করার ক্ষমতাও তত বৈধী হয়ে থাকে। কিন্তু এমন লোকও আছে, যারা অনেকক্ষণ গাঢ় নিজার পরেও স্মৃতি বোধ করে না। আবার ইতিহাসখ্যাত নেপোলিয়ান নাকি ৫ মিনিট ঘুমিয়েই আত্মবিকারভাবে কাজ করে যেতে পারতেন। এসব থেকে শুধু এটুকুই বলা যেতে পারে যে, নিজার প্রকৃত রহস্য থেকে বিজ্ঞান বা বিজ্ঞানী এখনও অনেক দূরে।

## নিজা ও আগামী দিনের মানুষ

নিজার রহস্যতত্ত্ব শুধু তত্ত্বগত দিক থেকেই এক বিরাট আবিষ্কার নয়, এর ব্যবহারিক দিকটাও উল্লেখযোগ্য। বিভিন্ন মানসিক ব্যাধিতে নিজার প্রকৃতি ও পরিমাণের যথেষ্ট পরিবর্তন হয়। বহু মানসিক ব্যাধির বাহ্যিক লক্ষণ প্রকাশ পাওয়ার অনেক আগেই নিজার বিশৃঙ্খলা দেখা দেয়। সুতরাং নিজার প্রকৃত বরপ জানা গেলে এই সব মানসিক ব্যাধিকে আমরা আরও ভালভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারবো বলে আশা করা যায়। আমরা জীবনের এক অতি মূল্যবান অংশ নিজার কাটাচ্ছি। শারীরিক বা মানসিক অবস্থার কোন পরিবর্তন না করে নিজার সময়কে কমিয়ে আনা নিশ্চয়ই আগামী দিনের বিজ্ঞানীদের অন্ততম কাজ হবে।

নিজা ও নিজা-নিয়ন্ত্রণকারী মস্তিষ্কের রহস্য-তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানীর সামনে এক মোহময় লক্ষ্য। এর জন্তে প্রয়োজন, বিজ্ঞানের প্রতিটি শাখার সম্মিলিত প্রচেষ্টা। তাই ব্যাতনামা বিজ্ঞানী Walter Rosenblith-এর ভাবায় বলতে গেলে—মানুষের মস্তিষ্ক আজ পর্যন্ত যতগুলি বিজ্ঞানের সৃষ্টি করেছে, আজ তারা সকলে সেই মস্তিষ্কের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্তে এগিয়ে আসুক।

“.....বিজ্ঞান যাহাতে দেশের সর্বসাধারণের নিকট স্পষ্ট হয় সে উপায় অবলম্বন করিতে হইলে একেবারে মাতৃভাষায় বিজ্ঞানচর্চার গোড়াপত্তন করিয়া দিতে হয়।.....যাহারা বিজ্ঞানের মর্যাদা বোঝে না তাহারা বিজ্ঞানের জন্ত টাকা দিবে, এমন অলৌকিক সম্ভাবনার পথ চাহিয়া বসিয়া থাকা নিফল। আপাততঃ মাতৃভাষায় সাহায্যে সমস্ত বাংলা দেশকে বিজ্ঞানচর্চার দীক্ষিত করা আবশ্যিক। তাহা হইলেই বিজ্ঞান সত্য সার্থক হইবে।”

## পুস্তক পরিচয়

প্রাথমিক ভৌত রসায়ন—প্রীতিনাথ কুণ্ড, এম. এস-সি প্রণীত। পৃ: 741; চিত্র সংখ্যা-128; সারণী সংখ্যা—89; প্রকাশক—মডার্ন বুক একেডেমী প্রাইভেট লিমিটেড; 10 বক্স চ্যাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-12। মূল্য-15 টাকা।

বইখানি মাত্রক শ্রেণীর পাস ও অনার্সের পাঠ্য হিসাবে লিখিত। বিষয়বস্তুর নির্বাচন, বিজ্ঞাস, উপস্থাপন এবং আলোচনা গ্রন্থকারের রসায়ন-বিজ্ঞানের অধ্যাপনার সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতার পরিচায়ক। প্রত্যেক অধ্যায়ের গোড়ায় ঐ অধ্যায়ে ব্যবহৃত যাবতীয় বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলী ও তাদের আন্তর্জাতিক ইংরেজী সংজ্ঞার সন্নিবেশ এই গ্রন্থের একটি বিশেষ সহায়ক অঙ্গ। এসব বাংলা পারিভাষিক শব্দাবলীর সংগ্রহ, নির্বাচন ও উদ্ভাবনে গ্রন্থকার তাঁর গভীর অহুসঙ্কিৎসা প্রযুক্তি ও বিচার-বুদ্ধির নিদর্শন দিয়েছেন, সন্দেহ নেই। কিন্তু একথাও অস্বীকার করা চলে না যে, বহু উদ্ভাবিত

পারিভাষিক বাংলা শব্দের যথাযথ অর্থবোধের তাগিদে ও ব্যবহারের সুবিধার জন্তে সংশোধন ও সংস্কৃতির আবশ্যক হতে পারে। বাংলার বিজ্ঞানের পরিভাষার স্থিতি ও ব্যবহারের প্রথম চেষ্টায় এটা কিছুই অস্বাভাবিক নয়। কালক্রমে এসব পরিভাষা বহু সূত্রলেখকের সহযোগিতায় পরিচালিত হয়ে সর্বসম্মতি অঙ্গসারে গৃহীত হবে। এটাই সকল দেশে বিজ্ঞানের অগ্রগতির অভিজ্ঞতার ইতিহাস।

অবশেষে, আন্তর্জাতিক ইংরেজী পরিভাষা গোড়া থেকেই বাতে শিক্ষার্থীদের আরম্ভ হয়, এই সম্পর্কে বিজ্ঞানের সকল অধ্যাপক ও পুস্তক-প্রণেতার সজাগ ধাকা উচিত। উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞান-চর্চা ও বৈজ্ঞানিক গবেষণার পক্ষে এই বিষয়ে সম্যক সতর্কতা অপরিহার্য। বর্তমান গ্রন্থখানিতে এর কোন ত্রুটি ঘটে নি। এটি এর একটি সন্তোষজনক বিস্তার বলতে হবে।

কলেজ-পাঠ্য হিসাবে পুস্তকখানির সমুচিত সমাদর বাঞ্ছনীয়।

প্রীতিনাথ কুণ্ড।

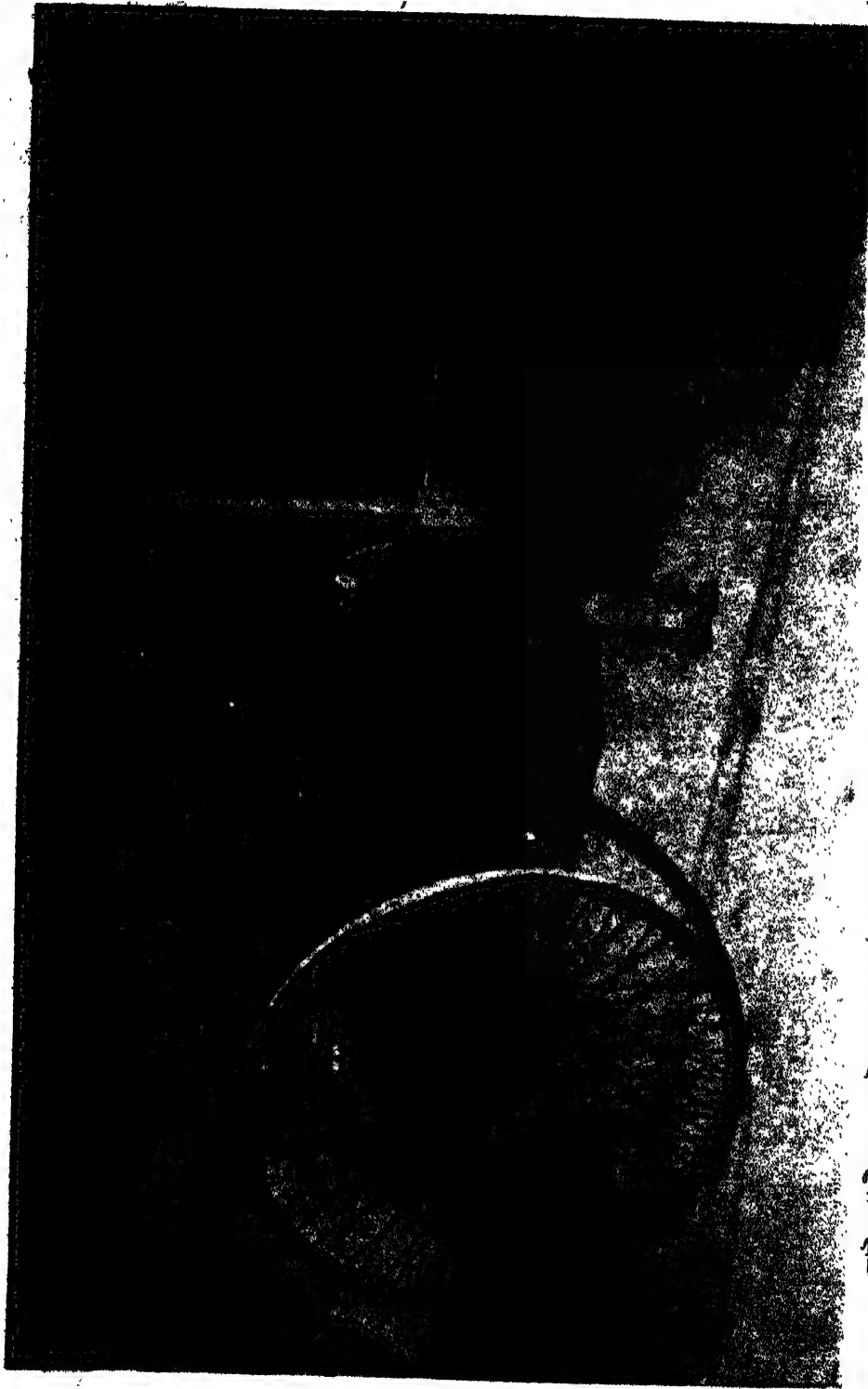
# କିଶୋର ବିଜ୍ଞାନୀର ଦମ୍ଭର

## ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ

ଅଗଷ୍ଟ — 1970

ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବର୍ଷ — ଇଷ୍ଟମ ସଂଖ୍ୟା





মোটির গাভীৰ প্ৰথম উদ্ভাবক কাল বেঙ্গোজের স্বৰ্ণে ক'ল'ম্বুচৰ ( প. ভাৰ্বেনী ) টাংকি মিউজিয়ায়ে 1886 সালে  
বেঙ্গোজের কাৰণনাৰ তৈৰী প্ৰথম মোটিৰ গাভীৰ মাডল । গাভীটিৰ সাৰ্বাচ্চ গতি ছিল ঘণ্টায় 15 কিলোমিটাৰ ।  
বেঙ্গোজের সমসাময়িক মোটিব গাভী নিৰ্মাতা হজেন ডেয়লাৰ । পূৰ্ব পূৰ্ব ত-জন একটি মোৰ প্ৰতিষ্ঠান স্থাপন  
কৰে ছিলেন — য়াৰ গাভী, টাক ও দাস আজ পৃথিবীৰ সৰ্বত্ৰ চলাইছে ।

## শুপার ট্যাঙ্কার

সভ্যতা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছিল, কেবলমাত্র দৈহিক শক্তিকে মূলধন করে সব কাজ আর করে ওঠা সম্ভব হচ্ছে না। প্রয়োজনই উদ্ভাবনের উৎস। এ থেকে শুরু হয় যন্ত্রের আবিষ্কার। যন্ত্র চালাবার জন্যে যে শক্তির প্রয়োজন, প্রথম যুগে তার চাহিদা মিটতো কেবলমাত্র কয়লা থেকে। কয়লার পর এলো আলানী তেল। সভ্যতার আধুনিকতম শক্তির উৎস পারমাণবিক শক্তি; যদিও এখন পর্যন্ত এই শক্তিকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগানো সম্ভব হয়ে ওঠে নি। হিসেব করলে দেখা যাবে, পৃথিবীর মোট শক্তি উৎপাদনের ক্ষেত্রে আলানী তেল একটা বড় অংশ জুড়ে রয়েছে। আলানী তেল সব দেশেরই প্রয়োজন। কিন্তু উৎপাদনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে নাম করা যেতে পারে মাত্র কয়েকটি দেশের—মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, সোভিয়েট রাশিয়া এবং কয়েকটি আরব রাষ্ট্রের। চাহিদা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে এক দেশে থেকে অন্য দেশে তেল নিয়ে যাবার ব্যবস্থারও অনেক উন্নতি হয়েছে। কলকাতার কাছেই বঙ্গবন্ধু এবং হলদিয়াতে তেলের জাহাজ ডিঙা-বার জন্যে অরেল খোঁচা হয়েছে।

অনেক কম খরচ হয় বলে সমুদ্রপথেই এই ব্যাপারে বেছে নেওয়া হয়েছে। এক বারে বেশী তেল নিয়ে যেতে পারলে খরচ অনেক কম হয়। সেই কারণে তেলবাহী জাহাজগুলির আয়তন বাড়ানো হয়েছে এবং হচ্ছে। এই সব বিরাট বিরাট তেলের জাহাজগুলিকে বলে সুপার ট্যাঙ্কার। হু-লফ টনেরও বেশী বহনক্ষমতাবূক্ত জাহাজও এই কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে।

জাহাজে তেল পরিবহনের সময় অনেক বিপদের সম্ভাবনা থাকে। সবগুলির কথা এক সঙ্গে আলোচনা করা সম্ভব নয়। এর মধ্যে প্রধানত: যেটি সারা বিশ্বের তেল ব্যবসায়ীদের ভাবিয়ে তুলছে, তা হচ্ছে জাহাজ ডুবি অথবা অগ্নি কারণে জাহাজ থেকে উপচে পড়া তেলে সমুদ্রের জল দূষিত হওয়ার দরুণ যে ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি হয়, তার মোকাবিলা করার উপায় উদ্ভাবন। তেল জলে ভেসে ভেসে সমুদ্রের উপকূলের শহরগুলিতে পৌঁছলে সেখানে অব্যাহত পরিবেশের সৃষ্টি হয়। অনেক সময় এমনও দেখা যায় যে, সমুদ্রের বিরাট এলাকা জুড়ে উপচে পড়া তেলে আগুন লেগে গেছে।

অনেক সময় তেলের জাহাজ ডুবির সম্ভাবজনক কারণও খুঁজে পাওয়া যায় না। হু-লফ সাত হাজার টনের তেলবাহী জাহাজ মারপেসার (Marpessa) প্রথম যাত্রাতেই তেল নামিয়ে কেবলর সময় পশ্চিম আফ্রিকার উপকূল থেকে আশা মাইল দূরে 1969 সালের 15ই ডিসেম্বর ডুবে যায়। জাহাজে তেল ভর্তি থাকলে এই জাহাজ ডুবির কলাকল আরও ভয়াবহ হতে পারতো। তাই ক্ষতির পরিমাণ কেবল জাহাজের কয়েক কোটি টাকা দামের উপর দিয়েই গেল। ডিসেম্বর মাসে আফ্রিকার উপকূলে পর পর যে তিনটি

সুপার ট্যাঙ্কার ডুবে যায়, এটিই তার প্রথম। এর কয়েক দিনের মধ্যেই, 29-শে ডিসেম্বর দু-লক্ষ পাঁচ হাজার টনের জাহাজ ম্যাকট্রা (Mactra) মোকাস্বিক চ্যানেলে ডুবে যায়। পরদিনই লাইবেরিয়ার উপকূলের কাছে এক লক্ষ দশ হাজার টনের নরওয়ের জাহাজ কং-হাকনের (Kong-haakon) বিক্ষোভ রহস্যজনক।

ডুবে যাবার আগে সুপার ট্যাঙ্কার মারপেসা রটারডামে তেল খালাস করে ফিরে যাচ্ছিল। তা সত্ত্বেও এই ভয়াবহ দুর্ঘটনা তেল-ব্যবসায়ীদের মধ্যে একটা ভীতির সৃষ্টি করেছে। তাঁরা এখন গভীর ভাবে চিন্তা করছেন, কেমন করে এই ধরনের দুর্ঘটনা এড়ানো যায়, যাতে তেলের অপচয় রোধ করা যাবে আর সেই সঙ্গে সমুদ্রের জলে তেল ছড়িয়ে পড়ে যে দূষিত আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়, তাও বন্ধ হবে।

1967 সালের টরি ক্যানিয়নের ঘটনার পর থেকে সবাই নড়েচড়ে বসেছেন। এই জাহাজ ডুবিতে তিন কোটি গ্যালন তেল সমুদ্রের জলে ভাসতে ভাসতে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের এক-শ' মাইল তটরেখাকে বিবাক্ত করে তোলে। জাহাজের মালিকদের ক্ষতি-পূরণ বাবদ এই দুটি দেশকে সাড়ে পাঁচ কোটি টাকা দিতে হয়েছে। এর উপর তেল ও জাহাজের দাম সমেত আরও বেশ কয়েক কোটি টাকা ক্ষতি তো আছেই।

এই ঘটনার পর, কয়েক দিন আগে আমেরিকার একজন বিশেষজ্ঞ বলেছেন—টরি ক্যানিয়নের দুর্ঘটনার পর তিন বছর কেটে গেল, কিন্তু পৃথিবীর কোন দেশই এই ধরনের ঘটনা এড়াবার কোন উপায় বাংলাতে পারলেন না।

হিসেব করে দেখা গেছে, বছরে প্রায় 1000 কোটি টন তেল জাহাজে সমুদ্র পাড়ি দেয়। এর মধ্যে শতকরা দশ ভাগ—প্রায় দশ কোটি টন তেল জাহাজ-ডুবি বা অস্তিত্ব কারণে সমুদ্রের জলে পড়ে গিয়ে নষ্ট হয়। জাহাজ যত বড় হবে, প্রতিটি দুর্ঘটনার তেলের ক্ষতিও সেই পরিমাণ বাড়বে।

আমেরিকান ব্যুরো অফ শিপিং-এর প্রকাশিত তথ্য থেকে জানা যায় যে, বর্তমানে এক লক্ষ টনের উপর বহনক্ষমতায়ুক্ত তেলের জাহাজের সংখ্যা 180টি। 1968 সালে এই সংখ্যা ছিল মোটে 55টি। বর্তমানে তৈরি হচ্ছে, এমন সুপার ট্যাঙ্কারের সংখ্যা 310। এর মধ্যে বেশ কিছু জাহাজ আছে, যাদের বহনক্ষমতা দু-লক্ষ—এমন কি, তিন লক্ষ টনেরও উপরে।

বিশেষজ্ঞেরা আশঙ্কা করছেন—তেলের জাহাজের আরও বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে তেল থেকে সমুদ্রের জল এবং সমুদ্রের উপকূলের আবহাওয়া দূষিত হবার সম্ভাবনা বাড়বে। তাই ভবিষ্যতে এই পরিস্থিতির হাত থেকে রেহাই পাবার জন্যে বিজ্ঞানীদের সর্বাঙ্গিক চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে। বিদেশে এই বিষয়ে নানা রকমের গবেষণা চলছে। মাহুকের অস্তিত্ব সমস্তার মত এরও একদিন নিশ্চয়ই সমাধান হবে।

## উকা-গহ্বর

রাত্রির অন্ধকারে খসে-পড়া যে সব তারা মুহূর্তের জন্তে আকাশের গারে আলোর রেখা এঁকে দিয়ে যায়, আজ সবাই তাদের পরিচয় জানে; অর্থাৎ ওগুলি তারা নয়—উকা। উকাপাতে অমল্লের আলোকর অনেকই আতঙ্কিত হয়ে ওঠে। অবশ্য সময়ে সময়ে উকাপাত ভয়াবহ ধ্বংসের কারণও হয়ে থাকে। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গিতে বিচার করলে দেখা যায় যে, এই উকাই পৃথিবীর বাইরের মহাশূণ্যের একমাত্র আগন্তুক, জ্যোতির্পদার্থ-বিজ্ঞানীরা যাদের পরীক্ষাগারে বিশ্লেষণ করে মহাশূণ্যের জ্যোতির্ভাঙ্গি সম্বন্ধে অনেক কথা জানতে পারেন।

প্রচণ্ডবেগে ধাবমান উকাপিণ্ডের গতি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল অতি সামান্যই প্রতিরোধ করতে পারে। বিরাট দেহ নিয়ে যখন উকাপিণ্ড বিপুল বেগে পৃথিবীর বৃকে আছড়ে পড়ে, তখন পৃথিবী নিজের একটা স্পৃষ্ট ব্রেকের মত কাজ করে। মুহূর্তের মধ্যেই উকাপিণ্ডের এই বিপুল গতিশক্তি পৃথিবীর বৃকে ক্ষত সৃষ্টি করে সেখানে কেন্দ্রীভূত হয়ে তাপশক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যায়। এই প্রচণ্ড তাপশক্তি অংশতঃ বা সমগ্র উকাপিণ্ডের দেহ এবং তার চতুর্দিকের সবকিছুকে বাষ্পীভূত করে ফেলে। এই বিস্ফোরণের প্রচণ্ডতা এমন এক কম্পন-ভরঙ্গের সৃষ্টি করে, বার ফলে ভূপৃষ্ঠের শিলাস্তর চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অনেকখানি জায়গা জুড়ে ছড়িয়ে পড়ে এবং উকা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

যেখানে উকা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়, সেখানে অল্পসঙ্কানের ফলে দেখা গেছে—মূল গহ্বরের চেয়ে বহুগুণ বেশী গভীরতা পর্যন্ত শিলাস্তর বিপর্যস্ত ও বিক্ষিপ্ত হয়েছে এবং উকার সংঘর্ষ-বিন্দুর বহু নীচের শিলাস্তরে ভগ্ন-শঙ্খ এবং কোয়েসাইট প্রভৃতি দেখা গেছে।

1947 সালের 12ই ফেব্রুয়ারী পৃথিবীর বৃকে মোট প্রায় 150 টন ওজনের উকা-বর্ষণ হয়েছিল, যার বড় বড় খণ্ডগুলি Sikhote-Alin পর্বতমালার শিলাপৃষ্ঠে প্রায় 110টি উকা-গহ্বরের সৃষ্টি করে।

বৃহৎ আকৃতির উকার ধ্বংস-শক্তি এতই প্রচণ্ড যে, হয়তো তা বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরকের সাহায্যে করা যেতে পারে। উকার সংঘর্ষই উকা-গহ্বরের সৃষ্টি করে। কাজেই যখন এর আঘাতের প্রচণ্ডতা কম, তখন ভূপৃষ্ঠে ছোট গর্তের সৃষ্টি হয়। গহ্বরের আকার নির্ভর করে উকার আসন্ন গতিপথের কৌণিক অবস্থান, উকা-বর্ষণের প্রকৃতি আর পিণ্ডটির মূল আকৃতি ও আয়তনের উপর। এমনও হতে পারে যে, মূল উকাটি খণ্ডাংশের বহুগুণ বড় বা এর আবিষ্কারের বিলম্ব সত্ত্বেও পূর্বে একই আকারের ছিল। আবার প্রচণ্ড গতিবেগসম্পন্ন উকাপিণ্ড বিপুল বিস্ফোরণের স্বাক্ষর রেখে যায় উকা-গহ্বরের সৃষ্টি

করে। চেহারায় গহ্বরগুলি খনি বা বোমার বিস্ফোরণে সৃষ্ট গহ্বরগুলির চেয়ে পৃথক। সাধারণতঃ বিস্ফোরণের ফলে উদ্ভূত গহ্বরের চেয়ে উঁকা-গহ্বর অনেক বড়। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির পরিমাণে উঁকা-গহ্বর সৃষ্টির শক্তির প্রচণ্ডতা নির্ণয় করা যেতে পারে।

অ্যারিজোনার নিকটবর্তী কোয়েনিয়ের উঁকা-গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল বিরাট আকৃতির একটি উঁকাপাতের ফলে, যার নাম Conon Diablo। তাছাড়া একে ব্যারিংয়ের গহ্বর বা অ্যারিজোনার বৃহৎ উঁকা-গহ্বর নামেও অভিহিত করা হয়। বিজ্ঞানীদের ধারণা, কনন ডায়াব্লোর বয়স প্রায় 5000 বছর। এর আসল গভীরতা প্রায় সাত-শ' ফুট ছিল এবং বিস্তৃতি ছিল প্রায় তিন-চতুর্থাংশ মাইল। মুহূর্তের মধ্যে এরূপ একটি বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করবার জেদে প্রয়োজন কয়েক হাজার মেগাটন বিস্ফোরকের; অর্থাৎ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ব্যবহৃত এমন কোন বোমার কথা জানা নেই, যা এই উঁকা-গহ্বরের মত বিরাট গহ্বর সৃষ্টি করতে সক্ষম।

উত্তর আমেরিকার এই সকলের অনেক গহ্বর উঁকাপাতের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। এর মধ্যে কিছু কিছু প্রাচীন গহ্বর এমনভাবে প্রচ্ছন্ন আছে যে, ভূপৃষ্ঠের উপর থেকে তার অস্তিত্ব নির্ধারণ করা সহজ ব্যাপার নয়। কিন্তু বিমান থেকে গ্রহীত আলোকচিত্রে এগুলি ধরা পড়ে। এ থেকে মনে হয়, এখনও অনেক 'ফসিল গহ্বর' আবিষ্কৃত ও চিহ্নিত হবার অপেক্ষা রাখে।

আজ পর্যন্ত যত বিস্ফোরণ ঘটেছে, তার মধ্যে বৃহত্তম চিহ্ন আর আবিষ্কৃত ফসিল-গহ্বরগুলির মধ্যে সর্ববৃহৎ উঁকা-গহ্বরটি রয়েছে জোহানেসবার্গের কাছে দক্ষিণ আফ্রিকার ভ্রেন্ডেফোর্ট শহরে। প্রায় এক-শ' চল্লিশ মাইল ব্যাসবিশিষ্ট এলাকায় ভূপৃষ্ঠের পাথরের স্তর নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে, বিরাট ওলট-পালট হয়েছে স্তরগুলিতে। প্রায় তিরিশ মাইল চওড়া আয়র্শশিলাস্তরের গ্র্যানিট পাথরের অংশ নিক্ষিপ্ত হয়েছে উপরের দিকে—এই উঁকা-গহ্বরের কেন্দ্রস্থলে। আমাদের জানা শিলাস্তরের ধারণা থেকে বোঝা যায় যে, মূল গহ্বরটি নিশ্চয়ই ছিল প্রায় দশ মাইল গভীর। বর্তমানে এটি যে স্তরীভূত শিলাস্তরে অংশতঃ ঢাকা পড়েছে, তা বিশ্লেষণ থেকেই বোঝা যায়। কম পক্ষে এই উঁকা-গহ্বরের বয়স পঞ্চাশ কোটি বছর। হাইড্রোজেন বোমার ধ্বংসাত্মক শক্তির তুলনা দিয়েও এর শক্তির পরিমাপ করা যায় না। কারণ, এরূপ বিরাট ধ্বংস ঘটাতে পারে 15 লক্ষ মেগাটন বিস্ফোরকের শক্তি—একথা বললেও অত্যাশ্চর্য হবে না।

পৃথিবীকে ঠিক কত সংখ্যক বড় বড় উঁকানিও আঘাত করে, তা নির্ণয় করা নিঃসন্দেহে কঠিন ব্যাপার। অধিকাংশ উঁকাই ভূপৃষ্ঠের বৃহত্তর অংশ—সাগর বা মহাসাগরে এসে পড়ে বলে চিহ্ন রাখতে পারে না। তাছাড়া যে স্থানে এখনও মানুষের পদক্ষেপ হয়

নি, সে সব জারগাতেও নিশ্চয়ই অনেক উদ্ভাপাত হয়েছে। উদ্ভাপাতের এই আকস্মিক প্রকৃতির জন্তেই কেউ কেউ মনে করেন কোন বড় শহর বৃহৎ উদ্ভাপাতের লক্ষ্য হতে পারে। কিন্তু সঠিক মূল্যায়ন একথাই বলে যে, এই ধরনের বিধ্বংসী উদ্ভাপাতের সংখ্যা খেকে দেখা যায় যে, এরূপ বিপদের সম্ভাবনা অনেক দূরবর্তী—হয়তো প্রতি আড়াই লক্ষ বছরে একবার ঘটতে পারে। সাধারণতঃ পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রতি সেকেন্ডে প্রায় ১৪ মাইল বেগে উদ্ভাপিও আঘাত করে এবং মাত্র শতকরা ১০ ভাগ উদ্ভাপিও ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছায়।

কিন্তু আমরা আজও উদ্ভাপিওর প্রকৃতির বিষয় সম্পূর্ণরূপে জানতে পারি নি। উদ্ভা-বিশেষজ্ঞেরা বলেন—পৃথিবীর বর্তমান আকার ধারণে এবং প্রাগৈতিহাসিক জীব নিশ্চিহ্ন হবার পিছনে উদ্ভাপাতের হয়তো বিশেষ কোন ভূমিকা আছে। উদ্ভাহরণ-স্বরূপ ড্রেংকোর্টের উদ্ভা-গহ্বরের কথাই ধরা যেতে পারে। এটা যদি স্থলভাগে গহ্বরের সৃষ্টি না করে কোনও মহাসাগরে পতিত হতো, তবে এর ধ্বংসকারী শক্তির পরিমাণ আরও অধিক হতে পারতো। এই উদ্ভাপাত যদি আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যভাগে ঘটতো, তবে সৃষ্টি হতো কুড়ি হাজার ফুট উঁচু বৃত্তাকার এক জোয়ারের তরঙ্গ, যা প্রচণ্ড শক্তিতে ছড়িয়ে পড়ে ইউরোপ, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা এবং আফ্রিকার বিরাট অংশে আনতো এক ভয়াবহ বিধ্বংসী প্রাণন।

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঙ্গ

## এ. এম. ও পি. এম.

এ. এম. ও পি. এম. কথা দুটি তোমরা প্রায়ই শুনে থাক এবং নিজেরাও বলে থাক—Eight A.M. বা Nine-thirty P.M. অর্থাৎ দিন বারোটায় আগের বেলা আটটা বা দিন বারোটায় পরের রাত্রি সাড়ে-নয়টা। কিন্তু কখনো ভেবে দেখেছ কি—এ কথা-দুটির অর্থ কি? প্রথমেই দেখা যাক—কথা দুটিই বা কি? A.M. আর P.M. তো এর সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। কথা দুটি হলো Anti-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের আগে আর Post-Maridian অর্থাৎ মেরিডিয়ানের পরে বা মেরিডিয়ান-অতিক্রান্ত।

আমাদের দিন হচ্ছে ২৪ ঘণ্টা, অর্থাৎ দিন ও রাত্রি মিলে একটি সম্পূর্ণ দিন। এই কাল বিভাগটি করেছিলেন আমাদের স্মরণাত্মক পূর্বপুরুষেরা আর তখনই তা বৃহত্তর পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছিল। কে বা কোন্ জাতি বা কোন্ দেশ, কবে, কোথায় প্রথম এই কাল-বিভাগটির প্রচলন করেছিল, আজ আর তার কোন হদিশ মেলে না, কিন্তু একথা জানা যায় যে, প্রাচীন মিশরীয়েরাও এই কাল-বিভাগই পালন করতো।

এখন দিনের এই চব্বিশ ঘণ্টার আরম্ভটা হবে কোথা থেকে? বর্তমানে আমরা এটা জানি রাত্রি 12টা থেকে, কারণ সেখান থেকেই আমাদের তারিখ পাল্টায়। এই হিসাবটা আমাদের দিয়েছে ইউরোপের মানুষ অর্থাৎ ইংরেজরা। আমাদের দেশের মানুষ এবং গণংকারেরা দিনের হিসাব করতেন উষাকাল থেকে দিনের আরম্ভ ধরে নিয়ে।

রাত্রি 12টা যেই শেষ হয়ে গেল, তারিখটি পাল্টে গেল—আরম্ভ হলো আর একটা দিন; অর্থাৎ শেষ হলো রাত্রি 12টা থেকে রাত্রি 12 টার একটা দিন, একটা সম্পূর্ণ দিন আর দুটি রাত্রির অর্ধেক করে। বর্তমানে আমাদের না হয় ষড়্ভি আছে, রাত্রি 12টা আমরা টের পাই—কিন্তু সেই সুদূর প্রাচীন কালেও ওই হিসাবটি তখনকার মানুষেরা করেছিলেন। তাঁরা করেছিলেন কেমন করে? ষড়্ভি তো মাত্র পাঁচ-শ' বছরের ব্যাপার। তাঁরা ষড়্ভি দেখেও করেন নি, ষড়্ভি দেখেও করেন নি—তাঁরা করেছিলেন সূর্যের গতিবিধি দেখে। কিন্তু রাত্রিতে সূর্য কোথায়?

রাত্রি দেখে তাঁরা করেন নি, তাঁরা করেছিলেন দিন দেখেই। সকালবেলার সূর্য ওঠে, ক্রমে সূর্য ধীরে ধীরে উপরে উঠতে থাকে। এক সময় সূর্য ঠিক মাথার উপরে উঠে আসে, তারপরে চলে যায় পশ্চিম দিকে। এই যে পূর্ব থেকে পশ্চিমে চলে যাওয়া—এটাই হলো আসল কথা। পৃথিবীর বেখানেই দাঁড়িয়ে থাকো না কেন, সূর্য মাথার উপরে উঠে পূর্ব থেকে পশ্চিমে সরে যাবেই। সূর্য যখন ঠিক মাথার উপর উঠে এলো, তখন হলো বেলা 12টা। এই বেলা 12টা হলো দিনের অর্ধেক। তারপর সেখান থেকে হিসাব করলেই রাত 12টা পাওয়া যায়, বা হলো কিনা দিনের শেষ। বর্তমান কালের কালের ষড়্ভি তখনকার দিনের মানুষদের ছিল না—এটা ঠিক, কিন্তু তাঁদেরও ছিল ঘণ্টা মাপবার নানা রকম কার্যদা। প্রয়োজনের ভাগিদেই ষড়্ভির উদ্ভব হয়েছে।

পৃথিবীর সমস্ত অংশকেই জানী মানুষেরা ভাগ করেছেন কতকগুলি রেখা দিয়ে। বিষুব রেখার সঙ্গে সমান্তরাল রেখাগুলিকে বলা হয় Latitude, আর রেখাগুলি উত্তর মেরু থেকে দক্ষিণ মেরু পর্যন্ত বিস্তৃত, সেগুলি হলো Longitude। এই Longitude-গুলিকে সূর্য কেবলই কেটে কেটে যাচ্ছে। Longitude-এর সমান্তরাল এই কাল্পনিক যে কোন রেখাকেই বলা হয় মেরিডিয়ান। তাই সূর্য যখন এই রেখার পূর্বদিকে থাকে, তখন তাকে বলা হয় Anti-Maridian বা এ. এম, আর পশ্চিম দিকে গেলেই বলা হয় Post-Maridian বা পি. এম.।

তাহলে বেলা 12টাকে কি বলা হবে—A. M. ? 12 A. M. ? না, ঠিক বেলা 12টা পূবেও নয় পশ্চিমেও নয়, ওটা ঠিক মাথার উপর। ওকে বলা হয় noon বা দুপুর 12টা। ডেমনি রাত 12টাকে বলা হয় midnight বা রাত 12টা। না বললেও চলতো, 12 night-ই যথেষ্ট হতো, কিন্তু প্রকাশভঙ্গীটি চলে এসেছে এবং

চালু হয়ে গেছে। দিন বারোটোর পর এক সেকেন্ড হয়ে গেলেই সেটা পি. এম. আবার ডেমনি রাত বারোটোর পর এক সেকেন্ড হয়ে গেলেই সেটা এ. এম. এবং নতুন আর একটা দিন।

সূর্য মাথার উপরে থাকে একটা রেখাতেই। ধরা যাক, কলকাতা শহর। কলকাতার উপরে ঐ রেখা ধরে উত্তর ও দক্ষিণে আগাগোড়া সবই ওই বেলা ১২টা থাকবে। কিন্তু বোম্বাইতে তখন হবে সাড়ে এগারোটা, যেহেতু বোম্বাই কলকাতা থেকে হাজার মাইল পশ্চিমে—সেখানে noon আসতে আধ ঘণ্টা দেরী হবে। কলকাতার সময় আর বোম্বাইয়ের সময়ে হবে তফাৎ। এমনি তফাৎ সর্বদাই হচ্ছে সারা পৃথিবীর সময়ে।

এর পরও আবার আছে Local time বা স্থানীয় সময় ও Standard time বা সাধারণ সময়। সেটা এই রকম—কলকাতার আছে একটা স্থানীয় সময়, আর বোম্বাইয়ের আছে একটা স্থানীয় সময়। এই দুটিতে আছে আধ ঘণ্টার মত তফাৎ। এখন কোন লোক যদি কলকাতা থেকে রেলগাড়ীতে বোম্বাইয়ের পথে রওনা দেয় আর সে গাড়ী যদি ঘণ্টায় চল্লিশ মাইল করে চলে, তাহলে সে গাড়ী প্রতি এক-শ' মাইলে আড়াই মিনিট করে এগিয়ে যাবে। অথচ গাড়ীর চলবার কোন একটা ঠেগনে নাম-বার আবার সেখান থেকে ছাড়বার একটা নির্দিষ্ট সময় আছে, যেটা দেওয়া থাকে Time-table বা সময় নির্দেশিকা বইয়ে। সেই বই দেখে আর কলকাতার সময়-ওয়ালো ঘড়ি দেখে কেউ যদি স্থান এবং সময় বিচার করতে যায়, তাহলে তার সবই গোলমাল হয়ে যাবে। সেই জন্তে রেলওয়ে, জাহাজ, স্টেন—এসবের কাজে ব্যবহার করা হয় একটা সাধারণ সময়। এটা নেওয়া হয় এক একটা দেশ ধরে, তার মাঝ-খানের কোন একটা জায়গার সময় নিয়ে। ভারতবর্ষের সেই standard বা সাধারণ সময় হচ্ছে এলাহাবাদের সময়ের সঙ্গে মেলানো।

বিশারদ সেনগুপ্ত



## শব্দ-সঞ্চয়

গ্রামোফোনের সাহায্যে বহুদিন আগেকার শিল্পী ও বক্তাদের কণ্ঠে গান, আবৃত্তি ও বক্তৃতা শোনা আজও অনেক লোকের কাছে বিশ্বস্তের বস্তু। সামান্য একটা কাঠের বাজ থেকে একটা সরু সূচের সাহায্যে কি করে যে গান বা সুরের সৃষ্টি হয়—অনেকের কাছেই সেটা কৌতূহলের বিষয়। কিন্তু এই কৌতূহল মেটাতে গেলে শব্দ-তরঙ্গ জিনিষটা যে কি, সেটা আগে বোঝা দরকার। আমি কথা বললাম, আর আমার সামনে আর একজন সে কথা শুনলো—এর অর্থ এই নয় যে, আমার কথাগুলি ছাপার অক্ষরের মত দল বেঁধে জ্যোতার কানে গিয়ে প্রবেশ করলো। আসলে যে কোন শব্দ সৃষ্টির সময় চারপাশের বায়ুস্তর বিশেষভাবে কম্পিত হয়ে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করে। আর সেই শব্দ-তরঙ্গ যখন জ্যোতার কানের মধ্যে গিয়ে আঘাত করে, তখনই জ্যোতা সেই শব্দ শুনেতে পার।

এই ব্যাপার থেকে স্থির করা হলো যে, আমরা যদি মুখের বদলে কোন যন্ত্রের সাহায্যে ঠিক এইভাবে শব্দ-তরঙ্গের সৃষ্টি করতে পারি, তাহলে সেটা ঠিক মানুষের কণ্ঠ-স্বরের মতই শোনা যাবে। গ্রামোফোন ঠিক এই ধরনেরই এক প্রকার যন্ত্র, যে কোন নির্দিষ্ট শব্দ, রেকর্ড নামে এক বিশেষ ধরনের জিনিষের উপর সঞ্চয় করে রেখে তাৎক্ষণিকই পরে এই যন্ত্রের সাহায্যে সেই শব্দের পুনরুৎপাদন করা হয়। কিভাবে সেই সঞ্চিত শব্দকে পুনরায় উৎপাদন করা হয়, সে সম্বন্ধে পরে আলোচনা করছি।

এই গ্রামোফোন বা ফোনোগ্রাফ যন্ত্রটির আবিষ্কারক হলেন জগদ্বিখ্যাত বিজ্ঞানী টমাস আলভা এডিসন। 1877 সালে এই বিজ্ঞানী গ্রাহাম বেলের আবিষ্কৃত টেলিফোন দেখে ভাবলেন—মানুষের কণ্ঠস্বর থেকে উৎপন্ন শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে যদি একটা সরু সূচকে কাঁপিয়ে সেই শব্দের অক্ষরলিপি কোন যাতুখণ্ডে গ্রহণ করা যায়, তাহলে সেই অক্ষরলিপি থেকে আবার কম্পন জাগিয়ে আগেকার নেওয়া সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা কি সম্ভব নয়? এডিসনের এই কল্পনা একদিন বাস্তবে রূপায়িত হলো।

এডিসন তাঁর মিস্ত্রি ফ্রুয়েসীকে ডেকে একটা নক্সা দিলেন, তাতে ছিল একটা সিলিণ্ডারের উপর পাতলা টিনের একটা চাদর বসানো। মিস্ত্রীকে তিনি বললেন—এই চাদরের সংস্পর্শে রাখা একটা সরু সূচকে স্প্রিং দিয়ে সামনে রাখা পাতলা ডায়াক্রামের সঙ্গে জুড়ে দিতে হবে। তাঁর মত বিচক্ষণ মিস্ত্রীর পক্ষে এটা তৈরি করতে মোটেই বেশী সময় লাগলো না। ফ্রুয়েসীর কৌতূহলের জবাবে এডিসন বললেন—এই যন্ত্রের সাহায্যে আমি মানুষের কথা ধরে রাখবো এবং তার পুনরাবৃত্তি করবো। টিনের চাদর বন্ধাবস্থানে রেখে, ডায়াক্রামের সামনে দাঁড়িয়ে এডিসন খুব জোরে চীৎকার করে তাঁর

প্রিয় কবিতা আবৃত্তি করলেন—Mary had a little lamb...ইত্যাদি। তারপর সেই যন্ত্রের সাহায্যেই কবিতাটির পুনরাবৃত্তি করে সেই ঘরের সকলকে তাঁর নিজের কণ্ঠস্বর শোনালেন। সকলে বিস্ময়ে হতবাক—এমন কি, এডিসন নিজেও। মানুষের কণ্ঠস্বরকে যান্ত্রিক পদ্ধতিতে সঞ্চয় করে তার পুনরাবৃত্তি করার এই প্রথম প্রচেষ্টার সাক্ষ্যে সকলের মধ্যে ধস্ত ধস্ত পড়ে গেল। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে এডিসনের কাছে প্রয়োগপত্র আসতে লাগলো। বিজ্ঞানের এই নবতম আবিষ্কারকে সারা পৃথিবীর লোক সাধরে গ্রহণ করলো। এই হলো প্রথম শব্দ-সকলের ছোট কাহিনী।

এখন প্রশ্ন জাগতে পারে—শব্দকে এভাবে সঞ্চয় করা হলো কিভাবে? এডিসনের আবিষ্কৃত পদ্ধতির অবশ্য এখন অনেক উন্নতি ও পরিবর্তন হয়েছে। তবে শব্দ-সকলের মূল যান্ত্রিক পদ্ধতি অবশ্য সকল ক্ষেত্রেই এক। এডিসন যে যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে প্রথম ধরে রাখেন, তার মূল তত্ত্ব হলো—সেই যন্ত্রের পাতলা টিনের চাদরের গায়ে একটা সরু সূচের প্রান্তভাগ ঠেকিয়ে রাখা ছিল। এই সূচটির অপর প্রান্ত আবার একটা স্প্রিং-এর সাহায্যে একটা ডায়াক্রামের সঙ্গে লাগানো। এই ডায়াক্রামের সামনে কোন কিছু আবৃত্তি করলে স্বভাবতঃই বায়ুস্তর কম্পিত হয়। বায়ুর এই কম্পনের কলে ঠিক অনুরূপভাবেই ডায়াক্রামটিও কম্পিত হয়। ডায়াক্রামের এই কম্পন, তার সঙ্গে সংলগ্ন সরু সূচটিকেও কাঁপিয়ে তুলে। সেই সময়ে টিনের চাদরে মোড়া সিলিণ্ডারটিকে আন্তে আন্তে ঘোরানো হতে থাকে। সূচের অগ্রভাগের এই কম্পন ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর খুব সরু সরু রেখার সৃষ্টি করে। অবশ্য এই রেখাগুলির গভীরতা খুবই কম—এক ইঞ্চির হাজার ভাগের এক ভাগের মত। বাহ্যিক ঘূর্ণায়মান টিনের চাদরের উপর এই রেখার আকৃতি কিন্তু সম্পূর্ণ নির্ভর করে সূচটির কম্পনের উপর, যেটা আবার নির্ভর করে ডায়াক্রামের কম্পনের উপর। সুতরাং স্পষ্টতঃই বোঝা যাচ্ছে যে, ডায়াক্রামের সামনে কি ধরনের শব্দের উৎপত্তি হলো, তার উপর নির্ভর করছে টিনের চাদরের উপর রেখার আকৃতি। এখন টিনের চাদরের এই রেখাগুলির উপর দিয়ে ঐ সূচটিকে আবার যদি ঠিকভাবে চালিয়ে নেওয়া হয়, তাহলে ডায়াক্রামটি আগের মতই কাঁপতে থাকবে। কলে তার সামনের বাতাসও কাঁপবে এবং শব্দের পুনরুৎপত্তি হবে। এক্ষেত্রে যেহেতু সূচটি টিনের উপর তার নিজেরই করা রেখার উপর দিয়ে যাচ্ছে, সেহেতু শব্দ সকলের সমর ডায়াক্রামটি যেমনভাবে কঁপেছিল, পুনরাবৃত্তির সময়ে সেটা ঠিক একইভাবে কাঁপবে অর্থাৎ এবারও ঠিক একই ধরনের শব্দের উৎপত্তি হবে। এডিসনের পরীক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর সেই টিনের চাদরের উপর ধরে রাখা শব্দকে আমরা রেকর্ড বলতে পারি। এই ব্যবস্থার নানা অনুবিধার জন্মে এর পরে টিনের চাদরের পরিবর্তে মোমের সিলিণ্ডার ব্যবহার করা হয়। এই হলো শব্দ-সকলের মোটামুটি পদ্ধতি। আজকাল আমরা যে সব

গ্রামোফোনের রেকর্ড দেখতে পাই, সেগুলি অবশ্য এই পদ্ধতিরই আরো উন্নত ব্যবস্থা। আজকাল মোমের উপর প্রথমে রেকর্ড তোলা হয় এবং মোমের রেকর্ড থেকে পিতল বা ব্রঞ্জের ছাঁচ তুলে নেওয়া হয়। আমরা যে সব রেকর্ড ব্যবহার করি, সেগুলি এই ছাঁচ থেকে এককম শক্ত গন্ধক মিশ্রিত রাবার ও অক্সাফ পদার্থের সাহায্যে তৈরি করা হয়।

এইভাবে শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার পদ্ধতি ছাড়াও আধুনিক যুগে আরো এক রকম উন্নত পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয়েছে। টেপ রেকর্ডারের নাম আজকাল সবাই জানে। এই যন্ত্রটিকেও শব্দ সঞ্চয় করে রাখবার জন্তে এবং তা থেকে সেই শব্দের পুনরাবৃত্তির জন্তে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। আসলে এই যন্ত্রটি শব্দকে সঞ্চয় করে রাখবার এক প্রকার বৈজ্ঞানিক-চৌম্বক পদ্ধতি মাত্র। চুম্বক এবং বিজ্যোতের সংমিশ্রণ ঘটিয়ে এই যন্ত্রের সাহায্যে শব্দকে সঞ্চয় করে রেখে তা থেকে বড়বার ইচ্ছা শব্দের পুনরাবৃত্তি করা চলে। এই পদ্ধতির যান্ত্রিক কৌশল অবশ্য কিছুটা জটিল, তবে এই পদ্ধতির সবচেয়ে সুবিধা হলো—শব্দ সঞ্চয় করবার পরমুহূর্তেই সেই শব্দের পুনরাবৃত্তি করা এর দ্বারা সম্ভব। আধুনিক যুগে পৃথিবীর প্রায় সমস্ত বেতার কেন্দ্রেই এই যন্ত্রের ব্যাপক প্রচলন হয়েছে।

সমীরকুমার ঘোষ \*

\* পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়, শান্তিনিকেতন।

## প্রশ্ন ও উত্তর

### 1. অ্যান্টিবায়োটিক্স কি ?

বারীদ দাস,

নিমতা

উঃ—1. অ্যান্টিবায়োটিক্স বলতে সাধারণত: জীবাণুনাশক পদার্থকেই বোঝায়। বিভিন্ন প্রকার রোগের প্রতিবেধক হিসাবেই এদের ব্যবহার। ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবদেহ থেকে নিঃসৃত বিপাকীয় পদার্থ অনেক সময় অক্সাফ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জীবের সক্রিয়তাকে বাধা দেয়। এই জাতীয় পদার্থকে অ্যান্টিবায়োটিক্স বলা হয়। অ্যান্টিবায়োটিক্স প্রধানত: ব্যাক্টেরিয়া, অ্যাক্টিনোমাইসেটিস ছত্রাক ইত্যাদি থেকে পাওয়া যায়। অ্যান্টিবায়োটিক্সের বেশীর ভাগই জৈব সংশ্লেষণে প্রস্তুত করা হয়। চিকিৎসা-বিজ্ঞানে রোগ-প্রতিবেধকরূপে যে সব অ্যান্টিবায়োটিক্স ব্যবহার করা হয়, তাদের মধ্যে পেনিসিলিন, ট্রেপ্টোমাইসিন, ওলিগোমাইসিন, টেরামাইসিন, ক্লোরোমাইসেটিন প্রভৃতির নাম খুবই পরিচিত। বিভিন্ন প্রকার রোগ-জীবাণুর উপর এদের ক্রিয়াও বিভিন্ন। ছোটখাটো রোগ

থেকে আরম্ভ করে সকল প্রকার রোগের চিকিৎসাতেই আজ অ্যান্টিবায়োটিক ব্যবহার করা হয়। টাইফয়েড, ম্যালেরিয়া, কলেরা, টি. বি. প্রভৃতি সংক্রামক রোগ অ্যান্টিবায়োটিকের সাহায্যে চিকিৎসকেরা আরম্ভের মধ্যে এনেছেন। রোগের বিভিন্ন অবস্থা বজায় থাকা সত্ত্বেও অ্যান্টিবায়োটিকের ক্রিয়া হ্রাস পায় না। সাধারণ ওষুধের তুলনায় এটাই হচ্ছে অ্যান্টিবায়োটিকের প্রধান ধর্ম।

অ্যান্টিবায়োটিক প্রয়োগের ফলে রোগীর দেহে অনেক সময় কম-বেশী বিবক্রিয়া দেখা দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য এদের উপকারিতা এতই বেশী যে, বিবক্রিয়ার প্রভাব সেখানে খুবই কম। এই বিবক্রিয়া দূর করার জন্যে বিজ্ঞানীরা খুবই সচেতন। পরিপূরক হিসাবে বিভিন্ন অ্যান্টিবায়োটিকের বেলায় বিভিন্ন রকমের বিবক্রিয়া নিবারক ওষুধও বেরিয়েছে, যেমন—পেনিসিলিনের ক্ষেত্রে এন্জাইম পেনিসিলিনেজ ব্যবহার করা হয়।

রোগের প্রতিবেধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক নির্ধাচন করাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর ভুল প্রয়োগে অনেক উপসর্গ দেখা দেয়। উন্নত চিকিৎসাশাস্ত্রে অ্যান্টিবায়োটিকের ব্যবহার অপরিহার্য। এগুলি খুব দ্রুতভাবে রোগ-প্রতিবেধকের কাজ করে। অ্যান্টিবায়োটিক নিয়ে এখন বহু গবেষণা চলছে এবং আশা করা যায়, ভবিষ্যতে যাবতীয় রোগের প্রতিরোধক হিসাবে অ্যান্টিবায়োটিক প্রস্তুত করা সম্ভব হবে।

ডাক্তার শ্রীমতী দেবী

\* ইনস্টিটিউট অব রেডিও কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

## বিবিধ

পরমাণু প্রযুক্তিবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের  
অগ্রগতি

নয়া দিল্লী থেকে 20শে জুলাই পি. টি. আই. এবং ইউ. এন. আই. কর্তৃক প্রচারিত সংবাদে জানা যায়—বৃহৎকারের পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লী নির্মাণ এবং পরমাণু-আলানীর ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার এক বৃহৎ কর্মসূচী নিয়ে ভারতবর্ষ '70 দশকের দিকে এগিয়ে চলছে। বাক্সারের কাছে কালাপাকানে সম্পূর্ণ ভারতীয় প্রচেষ্টায় এখন পরমাণু-বিদ্যুৎ

কারখানা গড়ে উঠছে এবং হায়দরাবাদের পরমাণু-চুল্লীর আলানী তৈরির আয়োজন শুরু হয়েছে।

ভারতীয় পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাভাই সাংবাদিকদের বলেছেন—আমরা 'ইউরেনিয়াম-থোরিয়াম বৃত্ত' সম্পূর্ণ করতে চাই, অর্থাৎ অস্ত্রের উপর কিছুমাত্র নির্ভর না করে দেশে যে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তার উপরেই আমাদের পরমাণু-কর্মসূচী গড়ে তুলতে হবে।

ডক্টর সরাস্বতাই পরিষ্কারভাবে বলেন, পরমাণু-প্রযুক্তিবিভার ভারত কারও পিছনে পড়ে থাকবে না। পরমাণু-বিজ্ঞানীরা বলেন, পরমাণু-বিজ্ঞান ও পরমাণু-প্রযুক্তিবিভার ক্ষেত্রে গত 25 বছরে ভারতের যে বিস্ময়কর অগ্রগতি ঘটেছে, তার সঙ্গে তাল রেখে ভারত পরমাণু-প্রয়োগবিভার ক্ষেত্রে এমন এক কঠিন পরীক্ষার নেমেছে, যা এবাবৎ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও সোভিয়েট রাশিয়াও পারে নি। পৃথিবীর মাত্র তিনটি দেশ এই নতুন প্রয়োগবিভা সম্পর্কে ওরাকোবহাল, কিন্তু তারা তাদের এই পদ্ধতিটিকে গোপন রেখেছে। পরমাণু-চুল্লীতে ব্যবহারের জন্তে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-235 আলাদা করার জন্তে ভারতে একটি গ্যাস সেন্ট্রিফিউজ প্রাক্টে তৈরি করার প্রস্তুতি চলছে।

পরমাণু-বোমা বা পরমাণু-বিদ্যুৎ, যা-ই উৎপাদন করা হোক না কেন, ইউরেনিয়াম-235-এর উপযোগিতাই বেশী।

পৃথিবীর প্রথম সেন্ট্রিফিউজ কারখানাটি বুটেন, পশ্চিম জার্মেনী ও হল্যান্ড যুক্তভাবে গোপনে তৈরি করেছে। ভারতের পরমাণু-শক্তি কমিশনের চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাস্বতাই বলেছেন—ভারতের বিপুল সংখ্যক বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ার এই বৃহৎ কর্মকাণ্ডে নিযুক্ত রয়েছেন। পরমাণু-বিজ্ঞানের সর্বাধুনিক ও সর্বাঙ্গীণ জটিল পরিকল্পনা নিয়ে তাঁরা এগিয়ে যাচ্ছেন।

ভারতবর্ষ যদি কোন সময়ে পরমাণু-বোমা তৈরি করতে ইচ্ছুক হয়, তবে এই পরিকল্পিত কারখানা হাতের কাছেই থাকবে। নিখাদ ইউরেনিয়াম-235-এর জন্তে তাকে অপরের সুখাপেক্ষী হতে হবে না। অল্প ব্যয়ে পরমাণু-বিদ্যুৎ উৎপাদন করাও তখন সম্ভব হবে।

ব্যয় হ্রাসের কথা চিন্তা করেই ভারতবর্ষ সেন্ট্রিফিউজ কারখানা স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছে।

এখান থেকে যে নিখাদ ইউরেনিয়াম তৈরি হবে, তা পরমাণু-বিদ্যুৎ চুল্লীর ব্যয়ও অনেকটা কমিয়ে দেবে।

ভারতের প্রথম পরমাণু-চুল্লীর জন্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে নিখাদ ইউরেনিয়াম আবদানী করতে হয়েছিল, কিন্তু রাজস্থানে রাণা প্রতাপ সাগর বা তামিলনাড়ুর কালাপাঙ্কাবে প্রাকৃতিক ইউরেনিয়াম ব্যবহারের পরিকল্পনা রয়েছে।

ভারতের কেরল উপকূলে বিপুল পরিমাণ থোরিয়াম রয়েছে, তা পরমাণু-চুল্লীতে আলাদা হিসাবে ব্যবহারের জন্তে কার্ট ব্রীডার প্রাক্টে তৈরি করা হচ্ছে।

পরমাণু-চুল্লীতে নিউট্রন কণিকার সাহায্যে ইউরেনিয়াম-235 কণিকার প্রোটন-ইলেকট্রনের বন্ধন ছিন্ন হবার কালে বেরিয়ে আসে প্রচণ্ড তাপ। পরমাণু-চুল্লীতে ইউরেনিয়াম-238 থেকে প্লুটোনিয়াম-239 পাওয়া যাবে। প্লুটোনিয়াম-239 বিতাজনবোধ্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ।

### 1974 সালে ভারতের প্রথম কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা

নয়া দিল্লী থেকে ইউ. এন. আই কতৃক প্রচারিত সংবাদে প্রকাশ—ভারতীয় মহাকাশ গবেষণা সংস্থার চেয়ারম্যান ডক্টর বিক্রম সরাস্বতাই সাংবাদিকদের বলেছেন যে, 1974 সালের মাঝামাঝি ভারতের নিজস্ব চৌর্য তৈরি ত্রিশ কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে উৎক্ষেপণের সম্ভাবনা আছে।

চার শত কিলোগ্রামের ওজনে প্রায় বৃত্তাকার কক্ষপথে সেটি পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা শুরু করবে। হায়দরাবাদের ঐহরিকোট্টা রকেট থ্রাষ্ট থেকে এই কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশের দিকে উৎক্ষিপ্ত হবে।

1980 সাল নাগাদ ভারতের এক হাজার কিলোগ্রাম ওজনের কৃত্রিম উপগ্রহ মহাকাশে

উৎকৃষ্ট হবে—মহাকাশে ৪০ হাজার কিলোমিটার উল্লে এই উপগ্রহটি বিদ্যুৎসেবার উপর দিয়ে পৃথিবী প্রদক্ষিণ করতে থাকবে।

একটি ক্ষুদ্র কৃত্রিম উপগ্রহ দিয়ে ভারতের মহাকাশ পরিকল্পনার সূচনা হচ্ছে। ত্রিবাঙ্গমের কাছে মহাকাশ-গবেষণা ও প্রযুক্তিবিজ্ঞান-কেন্দ্রের ভারতীয় বিজ্ঞানীরা এই উপগ্রহের নকশা তৈরি করেছেন।

দেশব্যাপী টেলিভিশন প্রচারের জন্তে ভারত যখন তার নিজস্ব বোণাবোণ ব্যবহার মহাকাশে উপগ্রহ পাঠাবে, তখন সে আন্তর্জাতিক ক্যেপস্পার নির্মাণের পদ্ধতিও আয়ত্ত করতে পারবে বলে মনে হয়।

১৯৭৪ সালে যে কৃত্রিম উপগ্রহটি মহাকাশে পাঠানো হবে, সেটিকে বয়ে নিয়ে যাবে চার পর্যায়ের ২০ টন ওজনের একটি রকেট। এতে কঠিন জ্বালানী ব্যবহৃত হবে। এই ধরনের রকেট উৎক্ষেপণের অভিজ্ঞতা অর্জন করার পর শ্রীহরিকোটা থেকে শক্তিশালী দূরপাল্লার রকেট আত্মায়ান দ্বীপপুঞ্জের উপর দিয়ে ভারত মহাসাগরে অস্ট্রেলিয়ার দুই হাজার কিলোমিটার দূরে ছুঁড়ে দেবার চেষ্টা করা হবে।

এসব রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার জন্তে আত্মায়ান দ্বীপপুঞ্জে শক্তিশালী রেডার স্থাপন করা হবে। থুবা থেকে আবহাওয়া রকেট উৎক্ষেপণ করে ভারতীয় ইঞ্জিনীয়ার ও বিজ্ঞানীরা রকেট প্রযুক্তি-বিজ্ঞান আয়ত্ত করেছেন।

কৃত্রিম উপগ্রহবাহী রকেট ব্যবহারের উপযোগী কঠিন জ্বালানী তৈরির একটি বিরাট কারখানা শ্রীহরিকোটায় কাছেই গড়ে তোলা হচ্ছে। রকেট ও কৃত্রিম উপগ্রহের গতিবিধির উপর লক্ষ্য রাখবার উপযোগী অতি শক্তিশালী রেডার নির্মাণ কারখানা স্থাপনের পরিকল্পনাও রয়েছে।

## শিব্‌কো এবং স্যাগ উল

কিছুকাল আগে দুর্গাপুরের কাছে শিব্‌কো নামে একটি অভিনব শিল্প প্রতিষ্ঠান দেখবার সুযোগ আমাদের হয়েছিল। এই কারখানার ভারতের মধ্যে প্রথম স্যাগ উল প্রস্তুত হচ্ছে। আমরা জানি, লোহা বা তামা নিষ্কাশন করার সময় প্রচুর পরিমাণ স্যাগ বা ধাতুযল নির্গত হয়। এই ধাতুযল থেকে যে পদার্থগুলি বস্তু প্রস্তুত হয়, তাই হচ্ছে স্যাগ উল।

এই শিব্‌কো কারখানার প্রায় সমস্ত বস্তুপাতিই তৈরি করেছেন এদেশের যন্ত্রকর্মীরা। বস্তুপাতি তৈরির কাঁচামালও সংগৃহীত হয়েছে এদেশে। বনিয়াদিত পদ্ধতিতে এখানকার সমস্ত কাজ চলে। প্রয়োজনীয় স্যাগ পাওয়া যায় দুর্গাপুর ইল্পাত প্রকল্প থেকে। স্যাগ উল তৈরির জন্তে এর সঙ্গে মেশানো হয় ফ্লুরোপ্লাস্ট, চুন, কোক এবং অন্যান্য কয়েকটি সামগ্রী। চুল্লীর মধ্যে এই সমস্ত সামগ্রী প্রায় ৬০০° কারেনহাইট তাপমাত্রায় গরম করা হয়। তারপর সূক্ষ্ম সূতার মত সামগ্রী একটি কনভেরারের সাহায্যে আর একটি চুল্লীতে প্রবেষ্ট করানো হয়। এখানে সেই সূতার সঙ্গে মেশানো হয় রেজিন। চুল্লীর অপর প্রান্ত থেকে মাপমত কেটে স্যাগ উলের গালিচা বেরিয়ে আসে। এই গালিচা দেখতে অনেকটা ডানলোশিলো রবারের প্যাডের মত, বেশ নরম ও হালকা।

আগে লোহা ও তামার কারখানার ধাতুযল রাস্তা তৈরির কাজে ও সিমেন্টের কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হতো। শিব্‌কো কারখানার তার একটা নতুন উপযোগিতার ক্ষেত্র উন্মুক্ত হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, শব্দরোধক ঘরবাড়ী ও বরফ তৈরির কারখানায় আজ স্যাগ উলের মধ্যেই প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছে। এছাড়া চুল্লী বা বিভিন্ন ধরনের বার্মারের প্রলেপ তৈরির কাজে হাত দিয়েছে শিব্‌কো। এই প্রলেপ উচ্চ তাপ প্রতি-

রোদে সাহায্য করেন। 1969 সালের সেপ্টেম্বরে এই কারখানাটি চালু হয়েছে। প্রাথমিক ধরনের জন্মে যে অর্ধ ব্যর হয়েছে, তার মধ্যে 40 লক্ষ টাকা পাওয়া গেছে মার্কিন পি-এল 480-র অন্তর্ভুক্ত একটি তহবিল থেকে।

#### করিয়া রজু-পথের 25 বছর

করলা ধনির আঙন নেবানোর কাছে বালির একান্ত প্রয়োজন। করিয়া করলাধনি অকলে এই বালি সরবরাহ করা হয়ে থাকে রজু-পথের মাধ্যমে। করিয়া থেকে প্রায় 13 মাইল দূরে সীওতালভিহি অকলে দামোদর নদ থেকে ড্রেজারের সাহায্যে এই বালি সংগৃহীত হয়। প্রথমে নদীর গহ্বর থেকে সংগৃহীত বালি শুকিয়ে নেওয়া হয় এবং পরে বিশেষ এক ধরনের বাজের মত লোহার আধারে শুকনো বালি রজুপথ দিয়ে করিয়ার নিচে বাওয়া হয়। মোট আধার সমানে এই বালি বহনের কাজ

করে যাচ্ছে এবং এদের প্রত্যেকটির দক্ষিণেই বিনিটে 600 ফুট। এক একটি বাজের বহনক্ষমতা তিন টনের মত। ভারতের কোল বোর্ড এবং মার্কিন সরকারের যুগ্ম প্রচেষ্টায় 25 বছর আগে 1945 সালে এই পথটি স্থাপিত হয়। এই প্রকল্পে মার্কিন সরকার ব্যয়বহন দিয়েছেন 5 কোটি 78 লক্ষ টাকা। এই রজু-পথ স্থাপিত হবার কলে করিয়া অকলে করলার উৎপাদন বছরে প্রায় দেড় কোটি টনের মত বেড়ে গেছে।

#### বিজ্ঞাপ্তি

সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর '70 মাসের 'জান ও বিজ্ঞান' একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে সেপ্টেম্বর মাসের (1970) চতুর্থ সপ্তাহে প্রকাশিত হবে। সুতরাং শারদীয় 'জান ও বিজ্ঞান' অক্টোবর মাসের (1970) প্রথম সপ্তাহে সত্য ও প্রাণীদের নিকট প্রেরিত হবে।

—দ—

শারদীয়

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, 1970

নবম-দশম সংখ্যা

## নিবেদন

অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক বিভিন্ন রকমের গুরুতর সমস্যার সম্মুখীন হইবার ফলে আমাদের দেশের জনসাধারণ আজ বিপন্ন ও বিভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছে। ষাট ও নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যাদির অস্বাভাবিক মূল্যবৃদ্ধি, ক্রমবর্ধমান বেকারী এবং সর্বোপরি নিরাপত্তার অভাব আজ দেশের জনগণকে উদ্ভ্রান্ত করিয়া তুলিয়াছে। ইহার স্রষ্টা সমাধান তো দূরের কথা, সঙ্কটের তীব্রতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধির দিকেই চলিয়াছে। ইহার ফলে জনসাধারণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক দুর্গতির চরম সীমার উপনীত হইয়াছে, অপর দিকে তেমনই আবার শিল্প, বিজ্ঞান, নিকা ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে অগ্রগতিও ব্যাহত হইতেছে। জনসাধারণকে বিজ্ঞান-চেতনার উদ্বুদ্ধ করিবার উদ্দেশ্যে প্রায় তেইশ বৎসর পূর্বে বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। বর্তমানে দেশের সঙ্কটজনক পরিস্থিতির ফলে এই সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানটিও আজ গুরুতর আর্থিক সঙ্কটের সম্মুখীন হইয়াছে। তাহাপি ‘জ্ঞান ও বিজ্ঞানের বিপুল পারদর্শী সংখ্যাগুলি জনসাধারণ

কর্তৃক সাধারণে পৃষ্ঠিত হইবার ফলে অর্থকষ্টতা সত্ত্বেও এবারও আমরা গুরুতর আর্থিক দারিদ্রের স্রষ্টা নইয়া সরকার ও জনসাধারণের সাহায্য ও সহায়কৃতি লাভের তরঙ্গা করিয়াই সেপ্টেম্বর ও অক্টোবর সংখ্যা দুইটিকে একত্রে শারদীয় সংখ্যারূপে প্রকাশ করিতে অগ্রসর হইয়াছি।

এই সংখ্যাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে বিশেষজ্ঞদের দ্বারা সরল ভাষায় নিখিত কতকগুলি রচনা সন্নিবেশিত হইয়াছে। অল্পকিছু পার্থক্য-পাঠিকারা এইগুলি পাঠ করিয়া তাঁহাদের কৌতূহল মিটাইতে সক্ষম হইবেন বলিয়াই আশা করি। এতদ্ব্যতীত বৈজ্ঞানিকাবরণের প্রতি ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকতর আকৃষ্ট করিবার উদ্দেশ্যে কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তরে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক বিষয়ের সংক্ষিপ্ত আলোচনা, খাঁধা প্রভৃতি নানা বিষয় সন্নিবেশিত হইয়াছে।

অত্যন্ত ব্যয়ের বত এই ব্যয়ের পারদর্শী সংখ্যাটিও সকলের নিকট সমাদর লাভ করিলে আমাদের প্রম সার্থক বলিয়া মনে করিব।



# উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক পরিস্থিতি

সতীশরঞ্জন খাতিরী\*

## সূচনা

বিনামেঘে বজ্র বা বিদ্যুৎপাত হয় না। কিন্তু আকাশে বধন মেঘের কোনও ঘনঘটা থাকে না, অর্থাৎ ভূপৃষ্ঠের উপর আবহাওয়া বধন বেশ শান্ত ও স্থির থাকে, তখনও যে ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়, বহু বছর আগেই বিজ্ঞানীরা তা জানতেন। ইং 1752 সনে ক্রাসী বিজ্ঞানী Lemonnier সর্বপ্রথম উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের সম্ভাবন পেরেছিলেন। নানাবিধ পরীক্ষার ফলে একথা আজ সর্বজনস্বীকৃত যে, উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর এক উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বল কাজ করে থাকে। একেই পজিটিভ বা ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বলা হয়। উত্তম আবহাওয়ার এই ধনবাচক বৈদ্যুতিক বল বর্তমান থাকার অর্থ এই যে, এই অবস্থার বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে কিছু পরিমাণ ধন-বিদ্যুৎ সঞ্চিত থাকে এবং একই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎ ভূপৃষ্ঠে আবিষ্ট থাকে। এই ধনবাচক উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ধন-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা উপর থেকে নীচে নেমে আসে, আবার বায়ুমণ্ডলে যদি কোনও ঋণ-বিদ্যুতের কণা থাকে, তবে তা নীচ থেকে উপরে উঠে যায়।

## ভূপৃষ্ঠের উপর বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ

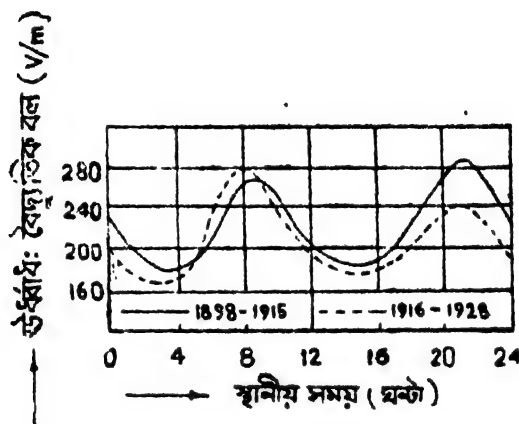
তাল আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ নানাতাবে করা যায়। এই সব বিভিন্ন পরীক্ষাবিধির বিবরণ ও আলোচনা এখানে সম্ভব নয়—তবু পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ বা নির্ণীত হয়েছে,

তারাই কিছু কিছু এখানে উল্লেখ করা যাবে। ইংল্যান্ডের কিউ মানমন্দিরে ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গঃ বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 317 ভোল্ট। সুইটজারল্যান্ডের ভাতোস-এর উপর উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের গড়পড়তা পরিমাণ প্রতি মিটারে 64 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ গড়ে 126 ভোল্ট। সমুদ্রের উপর যে কোনও ভৌগোলিক অবস্থানে উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রায় সমানই দেখা যায়। উত্তম আবহাওয়ার সমগ্র পৃথিবীর পৃষ্ঠে এই বৈদ্যুতিক বলের পরিমাণ প্রতি মিটারে প্রায় 120 ভোল্ট।

## উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক, বার্ষিক ও অস্থায়ী পরিবর্তন

তাল আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠে স্থলভূমির উপর উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বল দিন-রাত্রি মিলে 24 ঘণ্টার ক্রিতে পরিবর্তিত হয়, তা 1 নং চিত্রে প্রদর্শিত হলো। কিউ মানমন্দিরে দ্বিটি পর্বের (1898-1915 এবং 1916-1928) ঐশ্বর্যকালে নির্ণীত এই বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন এই চিত্রে দেখানো হয়েছে। চিত্রে স্পষ্টই দেখা যায় যে, সকাল ও রাত্রি আটটা-নটাের উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে বেশী, আর বেলা দুটা-তিনটাের ও তোর রাতে ঐ একই সময়ে উৎসর্গঃ বৈদ্যুতিক বল সবচেয়ে কম। 1921-1928 এই ক'বছরের ঐশ্বর্যকালে প্রতি ঘনমিটার বাতালে করলার ভাঁড়া, ঘোঁরা, ধূলা-বালি প্রভৃতির জতে বায়ুমণ্ডলে

অবিস্কৃততার গড়গড়তা পরিমাপ দিনে-রাত্রে পূর্বে পরিমপিত হয়েছে। স্ততরাং বলা যেতে পারে, কিভাবে—বাক্য ও কবে, ইংরেজ বিজ্ঞানী Whipple তা নির্ধারণ করেছিলেন। অবিস্কৃততার এই দৈনিক পরিবর্তনের সঙ্গে তুণ্ডের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের দৃষ্টি সম্পর্ক আছে। 2নং চিত্রে সাফোর্ড নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের বৈদিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে, তাকে কিছু মানদন্ডিরে নির্ণীত উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের অঙ্কন। সাফোর্ডের অধি-বাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতঃরাশের



1নং চিত্র

কিউ (Kcw) মানদন্ডিরে নির্ণীত তুণ্ডের উপর  
উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন।

.....1898—1915

.....1916—1928

আবার রাত্রি আটটা-নটার রাশির আহারের সময় এই একই কারণে বাতাসে অবিস্কৃততার পরিমাপ অধিক হবারই সম্ভাবনা। 1 নং চিত্রে আরও একটি বিশেষ লক্ষ্য করবার বিষয়। অনেকই জানেন গ্রেট ব্রিটেনে গ্রীষ্মকালে সব বড়ির কাটা দিনের আলো বেশী পাবার জন্তে এক বড়ী এগিয়ে দেওয়া হয়। 1916 সন থেকে এভাবে বড়ির কাটা এগিয়ে দেবার ব্যবস্থা প্রচলিত হয়। 1 নং চিত্রে দেখা যাচ্ছে, উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের সর্বাধিক পরিমাপ 1916-'28 পর্ব (1898-1915 পর্বের তুলনায়) সকালে ও রাত্রে এক বড়ী

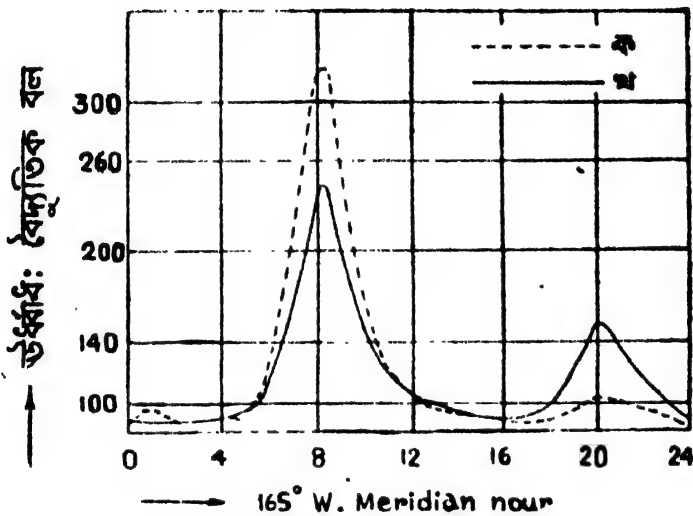
সময় বিশেষ ঘট করে আগুন জালাবার প্রথা আছে। এই কারণেই ক-চিহ্নিত গ্রাফে 40টি রবিবারে তুণ্ডের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের পরিমাপ সকাল আটটা-নটার রাত্রে তুলনায় তিন গুণেরও বেশী দেখা যায়। ক-চিহ্নিত গ্রাফে রবিবার থেকে শনিবার পর্যন্ত 264 দিনের উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের গড়গড়তা পরিমাপ সকাল আটটা-নটার অপেক্ষাকৃত অনেক কম।

বায়ুর অবিস্কৃততার সঙ্গে তুণ্ডের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের সম্পর্ক কি, তা পরে আলোচিত হবে। উত্তম আবহাওয়ার তুণ্ডের উপর উৎসর্গ:

বলের দৈনিক পরিবর্তনের তাৎপর্য কি, তার তাত্ত্বিক ব্যাখ্যাও পরে দেওয়া হবে।

স্থানীয় সময়ের পরিবর্তে যদি Greenwich Mean Time (G.M.T.) অর্থাৎ গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়, তবে যে কোনও দেশে স্থলভূমি বা সমুদ্রের উপর

কিভাবে বাড়ে ও কমে, 1929 সনে Whipple তা দেখিয়েছিলেন। বৈদ্যুতিক বড়ের সংখ্যা গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে যেভাবে পরিবর্তিত হয়, সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তনের মিল দেখা যায়। 3নং চিত্রে লক্ষ্য করবার বিষয় এই যে, সমুদ্রের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল 04



2নং চিত্র

সাধারণ নামক স্থানে Sapsford (1937) কর্তৃক নির্ণীত ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন। ক...40টি রবিবারের গড়পড়তা মূল্যায়ন, খ—রবিবার থেকে পরের শনিবার 264 দিনের গড়পড়তা মূল্যায়ন।

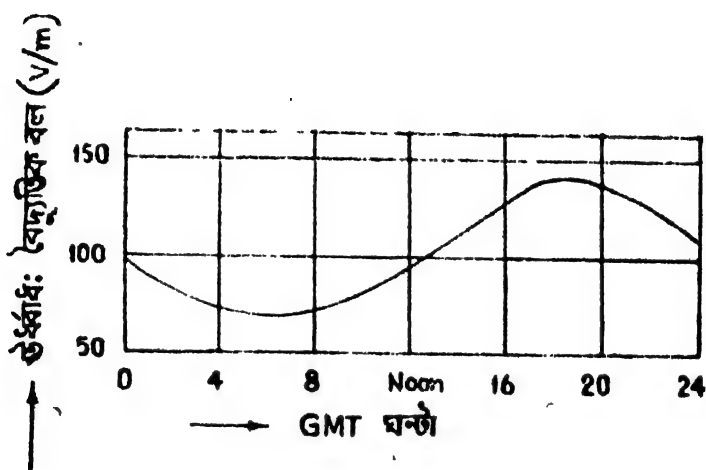
এখানে বলা প্রয়োজন যে, সাধারণের অধিবাসীদের মধ্যে প্রতি রবিবার সকালে প্রাতঃরাশের সময় বিশেষ ঘটনা করে আশুন আলবার প্রথা আছে।

উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল ঘোটাছুটি একই ভাবে পর্যায়ক্রমে বাড়ে ও কমে। 3নং চিত্রে গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমুদ্রের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন প্রদর্শিত হলো। গ্রীনউইচের গড়পড়তা সময়ের সঙ্গে সমগ্র পৃথিবীপৃষ্ঠে বৈদ্যুতিক বড়ের সংখ্যা

GMT-ঘড়ীর সবচেয়ে কম এবং প্রায় 20 GMT-ঘড়ীর সবচেয়ে বেশী থাকে। পৃথিবীপৃষ্ঠে অভ্য-বিক বাজ ও বিদ্যুতের তিনটি অঞ্চল দেখা যায়; বথা—(1) ওলন্দাজ অধিকৃত ইন্ড ইন্ডিজ (Dutch East Indies), (2) দক্ষিণ আফ্রিকা ও (3) দক্ষিণ আমেরিকা। সাধারণত: পৃথিবীর সর্বত্রই বিকাল

চারটার (স্থানীয় সময়) বিজলি-ঝড়ের সংখ্যা সর্বাপেক্ষা বেশী দেখা যায়। স্থানীয় সময় চার ঘটিকা এই ভিতর অঞ্চলে 04 থেকে প্রায় 20 GMT-ঘটকার মধ্যেই পড়ে। সুতরাং 04 GMT-ঘটকা থেকে তৃপ্তের উপর উৎসর্গ: বল বাড়তে থাকবে এবং প্রায় 20 GMT-ঘটকার তা সবচেয়ে বেশী হবে।

তবে দেখিয়েছিলেন যে, বাকি ধনাত্মক ও ঋণাত্মক আয়ন বলা হয়, এই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বিদ্যুৎসম্পন্ন কথাই বিদ্যুতের বাহকরূপে বায়ুমণ্ডলে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার সৃষ্টি করে। কি শক্তির প্রয়োগে তৃপ্তের উপর বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেন ও নাইট্রোজেন আয়নিত হয়—এই বিষয়ের আলোচনার তৃপ্তবহিত তেজস্ক্রিয় পদার্থের কথা কিছু বলতে হয়। তেজস্ক্রিয়



3নং চিত্র

GMT—ঘটকার সঙ্গে সূর্যের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের পরিবর্তন।

উত্তম আবহাওয়ার তৃপ্তের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল উত্তর ও দক্ষিণ উত্তর গোলাপেই শীতকালে সবচেয়ে বেশী ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে কম দেখা যায়। দক্ষিণ বেল-অঞ্চলে এর ব্যতিক্রম লক্ষিত হয়। ঐ অঞ্চলে উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল শীতকালে সবচেয়ে কম ও গ্রীষ্মকালে সবচেয়ে বেশী।

### বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা

বাতাসের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা 1887 সনে বিজ্ঞানী Linns সর্বপ্রথম প্রমাণ করেন। 1899 সনে Elster ও Geitel এবং তার এক বছর পরেই বিখ্যাত পদার্থবিদ C. T. R. Wilson স্থানীয়-

পদার্থ থেকে যে ধনাত্মক আল্ফা-কণা নির্গত হয়—তা হিলিয়াম পরমাণুর কোর বলে প্রমাণিত হয়েছে। পৃথিবীর পিলামণ্ডল তেজ করে তৃপ্তের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে আল্ফা কণাগুলি তৃপ্তের উপর আসতে না আসতেই প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়। দেখা গেছে, আল্ফা-কণা তৃপ্তের কাছাকাছি করেক সেটিমিটার উচ্চ পর্যন্ত বায়ুমণ্ডলকে আয়নিত করতে পারে মাত্র। তৃপ্তের তেজস্ক্রিয় পদার্থগুলি থেকে বিটা-কণা (বা ক্রভ-গামী ইলেকট্রন) এবং গামা-রশ্মি বায়ুমণ্ডলের উপাদানগুলিকে তৃপ্ত থেকে প্রায় দুই কিলো-মিটার উচ্চ পর্যন্ত আয়নিত করে থাকে।

বায়ুমণ্ডলের অপেক্ষাকৃত নিম্নতরে যে সব

আয়ন দেখা যায়—তাদের আয়তন খুবই ছোট, কিন্তু তুপুর্কের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে এদের গতিবেগ অপেক্ষাকৃত অধিক। এদের ‘সুহ্র’ ও ‘ক্রত’ আয়ন বলা হয়। এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় দেড় সেন্টিমিটার। বায়ুমণ্ডলের নিয়ন্ত্রণে কখনও কখনও আঙুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার শুঁড়া, ধূলা-বালি ও জলকণা ভাসমান থাকে। বায়ুমণ্ডল বধন আয়নিত হয়, তখন বিদ্যুৎসম্পন্ন ‘সুহ্র’ ও ‘ক্রত’ আয়নগুলি বিদ্যুৎবিহীন এই সব অপেক্ষাকৃত বড় বড় বস্তু-কণার সঙ্গে সংযুক্ত হয়। কলে ‘বৃহৎ’ ও ‘মহর’ আয়নের পৃষ্টি হয়। প্রতি সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট বিভবে এদের গতিবেগ 0.003-0.005 সেন্টিমিটার। পর্ববেষ্টিত কলে জানা গেছে যে, তুপুর্কে স্থলভূমির উপরিস্থিত বায়ুমণ্ডলে ‘বৃহৎ’ ও ‘মহর’ আয়ন, ‘সুহ্র’ ও ‘ক্রত’ আয়নের তুলনায় অনেক গুণ বেশী। এর কারণ এই যে, তুপুর্কে স্থলভূমির উপর আঙুনে পোড়া বস্তুর ধোঁয়া, কয়লার শুঁড়া, ধূলা-বালি ইত্যাদি বস্তুবত:ই সমুদ্রের উপরের তুলনায় অনেক বেশী হয়ে থাকে। ‘বৃহৎ’ ও ‘মহর’ এবং ‘সুহ্র’ ও ‘ক্রত’ আয়ন ছাড়াও বায়ুমণ্ডলে মধ্যম শ্রেণীর আয়নের সন্ধানও পাওয়া গেছে। এদের গতিবেগ এক সেন্টিমিটারে এক ভোল্ট প্রয়োগে 0.1-0.01 সেন্টিমিটার। বিভিন্ন গতিবেগসম্পন্ন আয়নের জৈবীবিভাগও আজ সম্ভব হয়েছে।

এখানে বলা প্রয়োজন—যেখানেই ‘সুহ্র’ ও ‘ক্রত’ আয়নের আধিক্য দেখা যায়, সেখানেই আয়নের ক্রত গতিবেগের জন্তে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী, আর যেখানেই ‘বৃহৎ’ ও ‘মহর’ আয়নের প্রাচুর্য, সেখানেই আয়নের মহর গতির জন্তে বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যদি বেশী হয়, তবে তুপুর্কের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল কমে যায়; আবার বিদ্যুৎ-

পরিবাহিতা খুব কম হলে উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল বৃদ্ধি পায়। পরে এই বিষয়টি আলোচিত হবে।

বায়ুমণ্ডলের বিভিন্ন উচ্চতার তুপুর্কের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা একই সঙ্গে পরিমাপ করে দেখা গেছে যে, বায়ুমণ্ডলের বত উৎসর্গ: ওঠা যায়, ততই বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা যায় বেড়ে এবং সেই অল্পপাতে তুপুর্কের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলও যায় কমে। নীচের তালিকায় তুপুর্কের উপর বিভিন্ন উচ্চতার উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল ও বিদ্যুৎ-পরিবাহিতার পরিমাপ জার্মান বিজ্ঞানী Wigand-এর 1925 সনের পরীক্ষার ফল থেকে আংশিকভাবে উদ্ধৃত করা গেল।

উচ্চতা উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বল বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা  
(metre) (volts/cm) (e. s. u.)

0	136	$1.1 \times 10^{-4}$
2500	72	$4.3 \times 10^{-4}$
4400	18	$8.2 \times 10^{-4}$
6500	8.8	$12.6 \times 10^{-4}$

তালিকা থেকে স্পষ্টই দেখা যায়, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে বৃদ্ধি পায় এবং উত্তম আবহাওয়ার তুপুর্কের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলও সেই সঙ্গে অনেক কম হয়। বলা বাহুল্য, যদি ভূগর্ভস্থিত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে নির্গত কণা ও বিকিরণ বায়ুমণ্ডলের আয়নিত অবস্থার একমাত্র কারণ হতো, তবে উচ্চতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ক্রমশ: হ্রাস পেত, সন্দেহ নেই। কিন্তু উপরের তালিকায় দেখা যায় যে, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা উচ্চতার সঙ্গে ক্রমশ:ই বৃদ্ধি পায়। এই বৃদ্ধির কারণ মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)। একথা আজ নিঃসন্দেহে প্রমাণিত হয়েছে যে, পৃথিবীর বাইরে নানা দিক থেকে মহাজাগতিক রশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে এবং এই তেজস্ক্রিয় রশ্মির প্রভাবে বায়ুমণ্ডল আয়নিত অবস্থা প্রাপ্ত হয়।

ইংল্যান্ডের বিজ্ঞানী Chalmers-এর সিদ্ধান্ত অনুসারে আয়নায়িত 50 কিলোমিটার উর্ধ্ব-বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা এত অধিক যে, লেখানকার বায়ুস্তরকে সম-বিভবসম্পন্ন (Equipotential) বলা যেতে পারে। এই সম-বিভবসম্পন্ন স্তরটির নাম দেওয়া হয়েছে—তড়িৎমণ্ডল (Electrosphere)। এই স্তরটির বৈদ্যুতিক বিভব প্রায়  $3 \times 10^5$  ভোল্ট। বাকি আয়নায়িত আয়নমণ্ডল (Ionosphere) বলি—তা তড়িৎমণ্ডল থেকে আরও উর্ধ্ব অবস্থিত। 80 থেকে 350 কিলোমিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত বিভিন্ন স্তরে এই মণ্ডলটি বিস্তৃত। এখানে বলা দরকার যে, ভূপৃষ্ঠের উপর উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বল আয়নমণ্ডলের উপর নির্ভর করে না। আয়নমণ্ডলের অনেক নীচে যে তড়িৎমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা হলো—তার বৈদ্যুতিক বিভব এবং ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতাই ভূপৃষ্ঠের উপর অপেক্ষাকৃত নিম্ন বায়ুস্তরে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বলকে নিয়ন্ত্রিত করে।

**ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বলের তাত্ত্বিক মূল্যায়ন**

পৃথিবীর বৈদ্যুতিক বিভব শূন্য ধরা হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে তড়িৎমণ্ডলের বৈদ্যুতিক বিভব যদি  $V$  ভোল্ট হয় এবং ভূতলের এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের উপর তড়িৎমণ্ডল পর্যন্ত উর্ধ্বাধি বায়ুস্তরের রোধ যদি হয়  $R$  ওহম (Ohm), তবে তড়িৎমণ্ডল ও ভূতলের মধ্যে প্রতি বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদে বিদ্যুৎ-প্রবাহ হবে—

$$i = \frac{V}{R} \text{ ampere} \dots (1)$$

এবার ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরের কথা ধরা যাক। ভূতল থেকে এক মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তরের রোধ যদি হয়  $r$  ওহম, তাহলে ভূতল থেকে এক মিটার উর্ধ্ব

পর্যন্ত বায়ুস্তরে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বল হবে—

$$E = ir \text{ ভোল্ট/মিটার} \dots (2)$$

সুতরাং 1নং স্তর থেকে আয়নায়িত—

$$E = \frac{Vr}{R} \text{ ভোল্ট/মিটার} \dots (3)$$

এক মিটার উর্ধ্ব পর্যন্ত এক বর্গমিটার প্রস্থচ্ছেদের বায়ুস্তরের রোধ ( $r$ ) এবং এই নিম্ন অঞ্চলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ( $\lambda$ )—এই দু'য়ের পারস্পরিক সম্বন্ধ নিম্নলিখিত সংজ্ঞা থেকে পাওয়া যায়, যথা—

$$\lambda = \frac{1}{r} \dots (4)$$

3 ও 4 নং স্তরের সাহায্যে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বল নিম্নলিখিতভাবে লেখা যেতে পারে—

$$E = \frac{V}{R\lambda} \text{ ভোল্ট/মিটার} \dots (5)$$

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, উত্তম আবহাওয়ার  $V$  ও  $R$ -এর প্রত্যেকটির পরিমাপ ষোড়শটিভাবে সমান ধরা যেতে পারে। সুতরাং যখনই ভূতলের সন্নিকটস্থ বায়ুস্তরের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা ( $\lambda$ ) বাড়ে বা কমে, 5নং স্তর অনুসারে ভূতলের সন্নিহিত অঞ্চলে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বল কমে বা বাড়ে।

1নং চিত্রে কিছু মানবন্ধিরে নির্ণীত উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠে হলকৃষির উপর বৈদ্যুতিক বলের দৈনিক পরিবর্তন প্রদর্শিত হয়েছে। চিত্রে দেখা যায় যে, সকাল ও রাতি আটটা-ন'টার এই বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা বেশী এবং বেলা দুটা-তিনটার ও তোর রাতে ঐ একই সময়ে উর্ধ্বাধি বৈদ্যুতিক বল সর্বাপেক্ষা কম হয়। কেন এমন হয়, তার ব্যাখ্যা 5নং স্তর থেকে সহজেই পাওয়া যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে যে, সকাল ও রাতি আটটা-ন'টার রাত্রাঘরের ধোঁয়া, কয়লার গুঁড়া প্রভৃতি বেশী থাকে বলে এই সময়ে নিম্ন বায়ুস্তরে 'বৃহৎ' ও 'মহৎ' আয়নের সংখ্যা হয় অপেক্ষাকৃত

অধিক। আবার অপরাহ্নে ও শেষ রাতে বায়ুমণ্ডলে অবিচ্ছিন্নতার পরিমাণ কম থাকার সেই সময়ে ‘সূর্য’ ও ‘ক্রান্ত’ আয়ন-সংখ্যা অপেক্ষাকৃত বেশী দেখা যায়। একথাও পূর্বে বলা হয়েছে যে, যেখানেই ‘ক্রান্ত’ আয়নের আধিক্য, সেখানেই আয়নের দ্রুতগতির জন্তে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। আবার যখনই ‘মহর’ আয়নের প্রাচুর্য, তখনই আয়নের মহর গতির জন্তে বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় কম। কাজে কাজেই প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়, যখন বায়ুমণ্ডলে বৌঁষা, করলার গুঁড়া প্রকৃতি বেশী এবং ‘মহর’ আয়নের সংখ্যাই অধিক হবার সম্ভাবনা, তখন বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হ্রাস পায়। কলে 5নং সূত্র অনুসারে প্রাতরাশ ও রাত্রির আহারের সময়ে উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের বৃদ্ধি লক্ষিত হয়। আবার অপরাহ্নে ও শেষ রাতে বায়ুমণ্ডলে ‘ক্রান্ত’ আয়নের আধিক্য থাকার, বায়ুমণ্ডলের বিদ্যুৎ-পরিবাহিতা হয় বেশী। সুতরাং 5নং সূত্র অনুযায়ী অপরাহ্নে ও শেষরাতে উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের হ্রাস দেখা যায়।

**উত্তম আবহাওয়ার বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহ এবং উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের প্রপঞ্জির সম্ভাবনা।**

উত্তম আবহাওয়ার উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের প্রভাবে বায়ুমণ্ডলের ধনাত্মক আয়নগুলি উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে নেমে আসে এবং ঋণাত্মক আয়নগুলি ভূতল থেকে উপরের দিকে উঠতে থাকে। এই আয়ন-চলাচলের কলে বায়ুমণ্ডলের উপর থেকে নীচে ভূতলের দিকে বৈদ্যুতিক কারেন্ট বা বিদ্যুৎ-প্রবাহের সৃষ্টি হয়। পরীক্ষার কলে জানা গেছে যে, এই বিদ্যুতের পরিমাণ এক সোল্টমিটার চৌকোর প্রায়  $3 \times 10^{-10}$  অ্যাম্পিয়ার। পৃথিবীর ব্যাসার্ধ প্রায়  $6 \times 10^3$  কি.

মি.; সুতরাং সমগ্রভাবে ভূতলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 1500 অ্যাম্পিয়ার। এখানে কল্প দরকার যে, জলবিদ্যুৎ শিলা প্রকৃতির অধঃক্ষেপের কলে বিদ্যুৎ-প্রবাহের পরিমাণ প্রায় 300 অ্যাম্পিয়ার। এই অতিরিক্ত বিদ্যুৎ-প্রবাহ বহি বোঁগ করা যায়, তবে সমগ্র ভূপৃষ্ঠে বিদ্যুৎ-প্রবাহের মোট পরিমাণ 1800 অ্যাম্পিয়ার। এই পরিমাণ বিদ্যুৎ-প্রবাহ ভূপৃষ্ঠে এসে পৌঁছবার অনতিকাল পরেই বায়ুমণ্ডলের উচ্চস্তরে লক্ষিত ধন-বিদ্যুৎ ও সমগ্র ভূতলে একই পরিমাণের ঋণ-বিদ্যুৎ মিলে হয়ে যাবার কথা; অর্থাৎ খুব অল্প সময়ের মধ্যেই উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের বিলুপ্তি হবার সম্ভাবনা। মোটামুটি পাঁচ মিনিটের মধ্যে ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের যে অবসান হবে, তা সহজেই হিসাব করা যায়। কিন্তু আমরা জানি, উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের বিলোপ লক্ষিত হয় না। এর কারণ কি—এবার তারই সংক্ষিপ্ত আলোচনা করে প্রবন্ধটি শেষ করবো।

**উত্তম আবহাওয়ার ভূপৃষ্ঠের উপর উৎসর্গ: বৈদ্যুতিক বলের সংরক্ষণ**

1925 সনে Brookes-এর গণনা অনুসারে সমগ্র পৃথিবীতে বজ্র ও বিদ্যুৎসহ ঝড়ের সংখ্যা চল্লিশ হাজার প্রায় 44,000। যদি ধরা যায়, একরকম প্রতিটি বৈদ্যুতিক ঝড় গড়পড়তা এক ঘণ্টা ধরে চলে, তবে যে কোনও সূহ্মতে পৃথিবীর সর্বত্র বৈদ্যুতিক ঝড়ের সংখ্যা হবে মোটামুটি আঠারো লাখ। এখন যদি মনে করা যায় যে, এক-একটি বিদ্যুৎ বলকে 20 কুলম্ব (Coulomb) ঋণ-বিদ্যুতের কারণ হয় এবং যদি ধরা যায় যে, এক মিনিটে তিনটি বলক দেখা যায়, তবে পৃথিবীর পৃষ্ঠে ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ হবে  $\frac{1800 \times 20 \times 3}{60}$  অর্থাৎ 1800 অ্যাম্পিয়ার। সুতরাং বলা যেতে

পারে যে, পৃথিবীর অভ্যন্তর স্থানে বিদ্যুৎপাতের কলে প্রায় ১৮০০ অ্যাম্পিয়ারের ঋণ-বিদ্যুতের প্রবাহ সমগ্রভাবে পৃথিবীপৃষ্ঠে নেমে আসে। সমগ্র তুণুর্থে এই পরিমাণ ঋণ-বিদ্যুৎপাতের জট্টাই, পৃথিবীর যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া দেখা যায়, সেই সকল স্থানে উৎসর্গ: বৈজ্ঞানিক বল বোটারুটভাবে সংরক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানে বিদ্যুৎপাতের কলে যদি সমগ্রভাবে তুণুর্থে ঋণ-বিদ্যুতের সমাবেশ না হতো, তবে যে সকল স্থানে উত্তম আবহাওয়া, সেই সকল স্থানে উৎসর্গ: বৈজ্ঞানিক বল বাহু-মণ্ডলের উচ্চ স্তর থেকে তুণুর্থে বিদ্যুৎ-প্রবাহের কলে যে অতি অল্প সময়ের মধ্যেই নিঃশেষিত হয়ে যেত, তাতে কোন সম্ভব নেই।

“সর্বদা শুনিতে পাওয়া যায় যে, আমাদের দেশে বর্ধোচিত উপকরণবিশিষ্ট পরীক্ষাগারের অভাবে অল্পমান অসম্ভব। এই কথা যদিও অনেক পরিমাণে সত্য, কিন্তু ইহা সম্পূর্ণ সত্য নহে। যদি ইহাই সত্য হইত তাহা হইলে অল্প দেশে, যেখানে পরীক্ষাগার নির্মাণে কোটি মুদ্রা ব্যয়িত হইয়াছে, সেই স্থান হইতে প্রতিদিন নূতন তত্ত্ব আবিষ্কৃত হইত। কিন্তু সেদুপ সংবাদ শুনা বাইতেছে না। আমাদের অনেক অহুবিধা আছে, অনেক প্রতিবন্ধক আছে সত্য, কিন্তু পরের ঐশ্বর্যে আমাদের ঈর্ষা করিয়া কি লাভ? অবসাদ খুচাও। দুর্জলতা পরিত্যাগ কর। মনে কর আমরা যে অবস্থাতে পড়ি না কেন, সেই আমাদের প্রকৃষ্ট অবস্থা। তারতই আমাদের কর্তৃত্ব, এখানেই আমাদের কর্তব্য সমাধা করিতে হইবে। যে পৌরুষ হারাইয়াছে, সে-ই বুঝা পরিচাপ করে।

পরীক্ষাসাধনে পরীক্ষাগারের অভাব ব্যতীত আরও বিষ আছে। আমরা অনেক সময় তুলিয়া বাই যে, প্রকৃত পরীক্ষাগার আমাদের অভাবে। সেই অন্তরতম দেশেই অনেক পরীক্ষা পরীক্ষিত হইতেছে। অন্তরদৃষ্টিকে উজ্জল রাখিতে সাধনার প্রয়োজন হয়। তাহা অল্পেই গ্লান হইয়া যায়। নিরাসক্ত একাগ্রতা যেখানে নাই, সেখানে বাহিরের আয়োজনও কোন কাজে লাগে না। কেবলই বাহিরের দিকে বাহাদের মন ছুটিয়া যায়, সত্যকে লাভ করিবার চেয়ে দশজনের কাছে প্রতিষ্ঠা লাভের জন্ত বাহারা লালারিত হইয়া উঠে, তাহারা সত্যের দর্শন পায় না। সত্যের প্রতি বাহাদের পরিপূর্ণ প্রজ্ঞা নাই, বৈশ্বের সহিত তাহারা সমস্ত দুঃখ বহন করিতে পারে না; ক্রতবেগে ব্যাতিলাভ করিবার লালসার তাহারা লক্ষ্যজ্ঞে হইয়া যায়। এইরূপ চকলতা বাহাদের আছে, সিদ্ধির পথ তাহাদের জ্ঞাত নহে। কিন্তু সত্যকে বাহারা বর্ধা চায়, উপকরণের অভাব তাহাদের পক্ষে প্রধান অভাব নহে। কারণ দেবী সর্বস্বতীর যে নির্মল যেতনয়, তাহা সোনার পন্ন নহে, তাহা হৃদয়-পন্ন।”



# প্লাজমা ও বিপরীত জগৎ

সূর্যেন্দুবিকাশ কর\*

## সাধারণ ও বিপরীত পদার্থ

পৃথিবীর পদার্থসমূহের মোটামুটি গঠন-  
বিজ্ঞান আমাদের অজানা নয়। অণু, পরমাণু,  
নিউক্লিয়াস কিতাবে গড়ে উঠেছে, আবার কোটি  
কোটি আলোক-বহর পরিবিবিন্ধি বিখ-হারাপথ  
(Meta-galaxy), বা বহু হারাপথের সমবায়  
গঠিত এবং আমাদের হারাপথ, ছোট-বড় নক্ষত্র,  
গ্রহ-উপগ্রহ সবই পৃথিবীর পদার্থ দিয়ে গড়া—  
এই হলো বিজ্ঞানীদের ধারণা। এই ধারণা নিয়েই  
কৃত্রিমতার বনিয়াদ গড়ে উঠেছে—বিখ-রহস্তের  
সমাধান করবার চেষ্টা চলেছে। সোজামুজি এই  
সব চিন্তা-ভাবনার বিপরীত পদার্থকণা (Anti-  
matter) পজিট্রন, বিপরীত প্রোটন (Anti-  
proton), বিপরীত নিউট্রন (Anti-neutron)  
উড়ে এসে জুড়ে বসলো—কলে সবই তো নতুন  
করে তাবতে হচ্ছে। অবশ্য এগুলির আবিষ্কার  
হবার পর পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রতিসাম্যের প্রত্যাশিত  
নিয়মটি দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত হলো। ধন ও ঋণ আধানের  
মধ্যে যখন প্রতিসাম্য রয়েছে, তখন ঋণ আধানের  
তুখু হাফা ইলেকট্রন অথবা ধন আধানের তুখু  
তারী প্রোটন হবে কেন? পজিট্রন ও বিপরীত  
প্রোটন পদার্থ-জগতের এই অশাশ্বত হুর করলো।  
প্রতিসাম্যের ঝাতিরে তাহলে বিপরীত পদার্থও  
তো থাকে উচিত। Goldhaber-এর বিপরীত  
ডায়টেরন আবিষ্কারের পর এই ধারণা দৃঢ়তর হয়েছে।  
বিপরীত প্রোটন ও বিপরীত নিউট্রনের সমবায়  
তৈরি হয়েছে বিপরীত ডায়টেরন। এগুলি সবই  
আবিষ্কৃত হয়েছে আমাদের পৃথিবীতে, যেখানে  
সব কিছুই সাধারণ পদার্থ (Koinomatter)  
দিয়ে গড়া। আমাদের পদার্থ-জগতে যতাবতঃই

এই সব বিপরীত পদার্থ অদ্বারী আগন্তুক।  
সাধারণ পদার্থের বিলুপ্তি সংঘাতে এই সব  
বিপরীত পদার্থকণা মিলিয়ে গিয়ে শক্তিতে  
রূপান্তরিত হয়। নানা কলার্কৌশলের মাধ্যমে  
এদের কিছুটা পরিচয় পাওয়া গেছে। আর একটু  
এগিয়ে আদর তাবতে আরম্ভ করেছি—বিপরীত  
প্রোটন ও পজিট্রনের সমবায় বিপরীত হাইড্রোজেন  
পরমাণু—এমন কি, বিপরীত নিউট্রন সহযোগে  
আরো তারী তারী সব বিপরীত মৌলিক পদার্থ  
তৈরি হতে পারে। এখনই তৈরি করা সম্ভব না  
হলেও প্রতিসাম্যের ঝাতিরে এই রকম বিপরীত  
পদার্থের সৃষ্টি সম্ভব। এরকম বিপরীত পদার্থের বিপ-  
রীত জগৎ (Anti-world) বিশ্বের কোথায়ও  
থাকতে পারে। আমাদের বর্তমান বিজ্ঞানের  
কলার্কৌশলে তা ধরা পড়বার কোন সম্ভাবনা আছে  
কি? ধরা থাক, নক্ষত্র-জগতের অর্ধেক বাসিন্দাই  
বিপরীত পদার্থে তৈরী। অনেক নক্ষত্রই চুম্বকধর্মী—  
কলে সেই সব নক্ষত্রের বর্ণালীরেখা জিহ্মান-জিহ্মার  
(Zeeman effect) কলে বিতক্ত হয়। এখন  
কোন নক্ষত্রের জিহ্মান বর্ণালীর দিক নির্ণয় করে  
নক্ষত্রটি বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া হলে তার  
দক্ষিণ ঘের পৃথিবীর দিকে থাকবে, বলা যেতে  
পারে। কারণ এই বর্ণালী ইলেকট্রন ও পজিট্রনের  
বেলায় হবে পরস্পর বিপরীতমুখী। কিন্তু কোন  
নক্ষত্র পৃথিবীর দিকে তার উত্তর ঘের অথবা দক্ষিণ  
ঘের প্রসারিত করে রেখেছে, তা যাণবার কোন  
উপায় নেই। যদি নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী মহাকাশ  
শূন্য হয়, তবু সাধারণ ও বিপরীত নক্ষত্রের

\* সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,

কলিকাতা—9

আলোতে কোন পার্থক্যই আমরা দেখতে পাব না।

কলে বিপুল বিপরীতজগতের কিছুটা যে বিপরীত জগৎ হবে না, একথা আমরা হালক করে বলতে পারি না। অবশ্য আমাদের পৃথিবী যে সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই; কেবল অল্পমাত্রার আমরা কিছু এই সব অপর্যাবিক বিপরীত পদার্থ তৈরি করেছি মাত্র। তাছাড়া আরও কিছু কিছু বিপরীত বৈশিষ্ট্য কণার সন্ধানও আমরা পেয়েছি। না—চাঁদেও বিপরীত পদার্থ নেই, তার প্রমাণ তো চন্দ্র-অতিবায়ীরা হাতে হাতে দিয়েছেন। সূর্যও সাধারণ পদার্থ দিয়ে গড়া। তা না হলে সূর্য থেকে বিচ্ছুরিত প্লাজমা থেকে আমরা যে অরোরা বোরিয়ালিস দেখতে পাই, তার জ্যোতি আরও হাজার গুণ বেড়ে যেত—বিপরীত প্লাজমা ও পার্থিব বস্তুর সংঘাতে। এই সৌর প্লাজমা বুধ, শুক্র, মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেও পৌঁছয়। সেখানে কোন অঘটন ঘটে না—তা থেকে সূর্য যে বিপরীত পদার্থ দিয়ে গড়া নয়, তা প্রমাণিত হয়। আর যে সূর্য থেকে গ্রহগুলির সৃষ্টি হয়েছে—সেই গ্রহগুলিও যে বিপরীত জগৎ নয়, তা সহজেই ধরা যায়।

এখন পর্বত যে সব উদ্ভাপিত পাওয়া গেছে, তার কোনটাই বিপরীত জগতের টুকরা নয়। কলে বিপরীত জগতের সম্ভাবনার এসদ, যেন হবে রূপকথার বত। তবে Libby অন্বেষণ করেছিলেন, 1908 সালে সাইবেরিয়ার যে উদ্ভাটি পড়েছিল, সেটি ঘোষ হয় বিপরীত পদার্থের টুকরা। এই অন্বেষণ যেমন ব্যতিল করা হয় নি, তেমনি প্রমাণিতও হয় নি। কলে বিপরীত জগৎ বনিকার অন্তরানেই রয়ে গেছে। তবু বিজ্ঞানীরা প্রতিসাহ্যের পরিপ্রেক্ষিতে বিপরীত জগতের সম্ভাবনা খতিয়ে দেখছেন। সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগৎ দু'খোদুই থাকতে হলে তার সীমারেখা অথবা প্রান্তিক জগৎ কি রকম হবে, তা ভেবে দেখছেন।

ধরা থাক—নক্ষত্র-জগতের মধ্যবর্তী স্থান শূন্য নয়, সেখানে ছড়িয়ে আছে প্লাজমা অর্থাৎ প্রোটন ও ইলেকট্রনের মুক্ত অঙ্গল। প্লাজমা হলো পদার্থের বারব, তরল ও কঠিন—এই তিন অবস্থার বাইরে তার চতুর্থ অবস্থা। সাধারণ জগতের প্রান্তে যেমন সাধারণ প্লাজমা (Koino-plasma) থাকবে, তেমনি বিপরীত জগতের কাছাকাছি আরম্ভেরও থাকবে বিপরীত প্লাজমা (Anti-plasma)। এতে মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রনের মেলা। তাহলে সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী স্থানে সাধারণ প্লাজমা ও বিপরীত প্লাজমার সংঘাতে কি অবস্থার সৃষ্টি হবে? এই প্রশ্নের উত্তর দিতে গিয়ে বিপরীত জগতের অস্তিত্ব সম্পর্কে উজ্জল সম্ভাবনার আভাস দিয়েছেন Alfven ও Klein প্রমুখ বিজ্ঞানীরা।

### মহাকাশ ও প্লাজমা

সম্পূর্ণ আরনিত পদার্থ, যাতে ইলেকট্রন-প্রোটনের সমষ্টি ছাড়া নিরপেক্ষ পদার্থ থাকে না—কিছুটা ঐ রকম পদার্থ থাকলে তাকে আংশিক প্লাজমা বলে। কোন বারবীর পদার্থ উত্তপ্ত হলে আরনিত হয় উত্তাপ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে—কোন কোন অবস্থায় 5000°—10,000° ডিঃ সেন্টিগ্রেড তাপ-মাত্রার আবার কখনো আরো বেশী তাপমাত্রার সম্পূর্ণ আরনিত বারবীর প্লাজমার রূপ নেয়। আরননের সঙ্গে সঙ্গে অবশ্য আরন ও ইলেকট্রনের পুনর্মিলনের সম্ভাবনা থাকে। প্লাজমার সাধারণতা হলো তখন, যখন আরন ও পুনর্মিলনের মাত্রা সমান সমান দাঁড়ায়।

বিপরীতজগতে নক্ষত্রগুলির তাপমাত্রা যথেষ্ট, তাই সম্পূর্ণ না হলেও নক্ষত্রপৃষ্ঠ আংশিক প্লাজমা সন্দেহ নেই। তাদের অভ্যন্তর ভাগ অবশ্যই পূর্ণাঙ্গ প্লাজমা, কারণ সেখানে তাপমাত্রা আরো বেশী। ছায়াপথে মধ্যবর্তী শূন্য স্থানগুলিও

কিন্তু আংশিক প্রাক্‌জ্যার তত্ত্ব, অবশ্য যনয় নক্ষত্র-দেহ থেকে অনেক কম—এক ঘনমিটারে প্রায় একটি পরমাণু। এই হাডা ঘনত্বের প্রাক্‌জ্য, বা মহাকাশকে আবৃত করে রেখেছে, বিপরীত জগতের চাবিকাঠি কিন্তু তাতেই রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাই মনে করেন। মহাকাশে ব্যাপ্ত রয়েছে অতি কীণ চৌম্বক কেন্দ্র। তার পরিমাণ  $10^{-8}$  বা  $10^{-6}$  গউসের মত অর্থাৎ পৃথিবীর নিজস্ব চৌম্বক কেন্দ্রের এক হাজার ভাগের এক ভাগ মাত্র। কিন্তু এই কীণ চৌম্বক ক্ষেত্রই মহাকাশের হাডা প্রাক্‌জ্যার ধর্ম অর্থাৎ তার গতিবিধি বহুলাংশে নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাক্‌জ্য হলো আহিত কণিকার সমষ্টি চুম্বকীয় শক্তিতে এই কণিকাগুলি কুণ্ডলী পাকিয়ে চলে। এই কুণ্ডলীর পরিধি যেমন ইলেকট্রন আর প্রোটনের বেলায় তর্কাৎ—আবার কণার শক্তির উপরও নির্ভরশীল—চুম্বকীয় শক্তির উপরও বটে। আবার প্রোটন ও ইলেকট্রনের ক্ষেত্রে এই গতিবিধির দিকও বিপরীত-মুখী। মহাকাশে সর্বত্রই যে স্থান চৌম্বক কেন্দ্র থাকতে পারে, তাও সম্ভব নয়। কলে এই কুণ্ডলীর পরিধি কখনো বিদ্যুততর আবার কখনো সঙ্গী হওয়াই সম্ভব। আবার বিভিন্ন চৌম্বক কেন্দ্রগুলির দিকও বিরাট মহাকাশে একমুখী না হয়ে বিভিন্ন দিকে ছড়িয়ে থাকবার সম্ভাবনাই বেশী। কলে কোন প্রাক্‌জ্য-কণাই মহাকাশে চৌম্বক বলরেখার সমান্তরাল নয়—তাই তাদের কুণ্ডলী পাকিয়েই চলতে হবে। সোজাজুজি না গিয়ে কুণ্ডলী পাকিয়ে চলবার কলে একটি নক্ষত্রদেহ থেকে আর একটি নক্ষত্রদেহে কোন কণিকার স্থানান্তর সম্ভব নয়। অবশ্য কণিকার শক্তি যদি খুব বেশী হয়, বার কলে মহাকাশে তার কুণ্ডলীর ব্যাস নক্ষত্র দুটির দূরত্ব থেকেও বেশী, তবেই এই স্থানান্তর সম্ভব। কিন্তু সেই শক্তির (প্রায়  $10^{14}$  ইলেকট্রন ভোল্ট) কণিকা থাকবার সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। কোন বৃহৎকারের মহাকাশবান মহাকাশের এই

কীণ চৌম্বক কেন্দ্র ও হাডা প্রাক্‌জ্যার কোন অহ-ত্বিই পেতে পারে না, অথচ এই দুইয়ে বিলে আন্তর্নাক্ষত্রিক কণা চলাচলের পক্ষে এক হুল্লল প্রাচীর সৃষ্টি করে রেখেছে। এক হারাপথ থেকে অল্প হারাপথের বেলায়ও ঠিক একই নিয়ম বাটে।

### বিপরীত প্রাক্‌জ্য ও উত্তপ্রাক্‌জ্য

এখন দেখা যাক, দুটি নক্ষত্রের বেলায় কি ঘটে? ধরা যাক, একটি নক্ষত্র সাধারণ ও আর একটি নক্ষত্র বিপরীত পদার্থ দিয়ে গঠিত। কলে সাধারণ নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে সাধারণ প্রাক্‌জ্য আর বিপরীত নক্ষত্রের চারদিকে থাকবে বিপরীত প্রাক্‌জ্য অর্থাৎ মুক্ত বিপরীত প্রোটন ও পজিট্রন। ক্রমশঃ এই সাধারণ ও বিপরীত প্রাক্‌জ্যার ঘনত্ব ক্রমশঃ দ্রুত বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসবে। তার পর এক জায়গায় নিশ্চয়ই সাধারণ ও বিপরীত প্রাক্‌জ্য বিলে যাবে। কিন্তু মিলবে কি করে? প্রোটন ও বিপরীত প্রোটন মিললেই তো তাদের ধ্বংস অনিবার্য। তার কলে হবে কতকগুলি যেসনের সৃষ্টি, বাদের পরিণতি হলো গামা-রশ্মি, নিউট্রিনো আর ইলেকট্রন-পজিট্রনে। প্রাক্‌জ্যার নিজস্ব ইলেকট্রন, পজিট্রনও তো রয়েছে। বাহোক, সাধারণ ও বিপরীত প্রাক্‌জ্য অর্থাৎ যেখানে সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের মিলনস্থল—বিজ্ঞানীরা তার নাম দিয়েছেন উত্ত-প্রাক্‌জ্য (Ambiplasma)। এই উত্তপ্রাক্‌জ্যই হলো সাধারণ জগৎ ও বিপরীত জগতের সেতুবন্ধ। সে এসঙ্গে আসবার আগে উনবিংশ শতাব্দীতে Leidenfrost নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানীর একটি গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের কথা বলা প্রয়োজন। আবিষ্কারের বিষয়টি জানবার আগে অবশ্য একটি সাধারণ পরীক্ষা রাসায়নিক করা যেতে পারে। একটি গরম ধাতুপাত্র নিয়ে তাতে এক কৌটা জল রাখুন। প্রায়  $100^\circ$  সে: তাপমাত্রার উষ্ণে এই বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে হিস্‌হিস্‌ শব্দ করে উবে যাবে। আরো একটু তাপমাত্রা বাড়ালে দেখা যাবে,

জলবিন্দুটি উবে বাবার সঙ্গে সঙ্গে যেন একই বিস্ফোরণের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এখন যদি কয়েক শত ডিগ্রীতে তুলে ঐ লালচে পাতটির উপর জল-বিন্দু কেলা যায়, তাহলে দেখা যাবে বিন্দুটি সঙ্গে সঙ্গে উবে যাচ্ছে না। পাঁচ মিনিটের উপরও এই বিন্দুটিকে টিকিয়ে রাখা যেতে পারবে—যদিও তা একই এবিক-ওদিক আলোড়িত হবে মাত্র। ক্রমশঃ বিন্দুটির আয়তন কমেতে কমেতে এক সময় উবে যাবে। অবশ্য হঠাৎ যদি পাতটির তাপমাত্রা কবিয়ে কেলা যায়, তাহলে বিস্ফোরণের সঙ্গে সঙ্গেই বিন্দুটির বিলুপ্তি ঘটবে। লীডেনক্রষ্টের আবিষ্কার হলো এই জলবিন্দুর উবে যাওয়া নিয়ে। তাঁর মতে, বিন্দুটি উবে বাবার আগে একটি বাষ্পের স্তর পাত ও বিন্দুটির মধ্যে একটি অপরিবাহী স্তরের সৃষ্টি করে। কলে পাতের তাপ বিন্দুটির উপর ধীরে ধীরে সঞ্চারিত হয়। পাতের উচ্চ তাপমাত্রা অস্থায়ী আরো পুরু বাষ্পস্তরই শুধু জলবিন্দুর উবে যাওয়া বিলম্বিত করতে পারে।  $100^\circ$  সে: তাপমাত্রার সাহায্যে উল্লেখ্য এই বাষ্পস্তর এতই পাতলা যে, খুব তাড়াতাড়ি তাপ সঞ্চারিত হয়ে জলবিন্দুটি তাড়াতাড়ি উবে যায়।

ঠিক একই রকম ব্যাপার ঘটতে পারে সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্মার বেলায়। এদের মিলনস্থলে লিডেনক্রষ্ট-স্তরের অল্পরূপ একটি স্তর সাধারণ ও বিপরীত পদার্থের বিলুপ্তিকে বিলম্বিত করবে। প্রথম দিকে এই বিলোপজনিত শক্তিই, সীমান্ত স্তরগুলিকে অতি উচ্চ মাত্রায় উত্তপ্ত করে তুলবে। তখন সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্মার বিলোপ সাধন আরো বিলম্বিত হবে। ক্রমশঃ একটি হারী লিডেনক্রষ্ট-স্তর সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্মার প্রান্তরেখার একটি বাবার প্রোটন তৈরি করে এদের মিলন, তথা বিলুপ্তিকে আটকে রাখবে। হিসাবে দেখা যায় যে, এরকম স্তরের বিকৃতি হবে  $10^8$  আলোক-বছর।

#### লিডেনক্রষ্ট-স্তর ও বেতার-তরঙ্গ

এখন উত্তপ্তপ্লাজ্মার কথাই আসা যাক। উত্তপ্তপ্লাজ্মাতেই তো লিডেনক্রষ্ট-স্তরের অস্তিত্ব!

আগেই বলা হয়েছে—বিপরীত প্রোটন ও প্রোটন থেকে শেষ পর্যন্ত ইলেকট্রন-পজিট্রন তৈরি হয়। গামা বা নিউট্রিনো চৌম্বক ক্ষেত্রের বাধা না যেনে মহাকাশে ছড়িয়ে পড়ে। কিন্তু যে ইলেকট্রন-পজিট্রন থেকে যায়, তাদের শক্তি প্রায়  $10^{12}$  ডি: তাপমাত্রার সমতুল্য। এত তাপমাত্রার কোন বায়বীয় বা প্লাজ্মা উত্তেজিত হলে তার চাপ বেড়ে যায় ও প্রসারিত হয়ে পড়ে। এখন উত্তপ্ত প্লাজ্মার সাধারণ ও বিপরীত প্লাজ্মার প্রাথমিক বিলোপজনিত শক্তিতে উত্তপ্ত প্লাজ্মার প্রসারণের কলে একে অপরকে বিকর্ষণ করে। কলে এরা আর পরস্পরের সংস্পর্শে আসতে পারে না। উত্তপ্তপ্লাজ্মার এই ভাবে তৈরি হয় একটি বাধার স্তর, যাকে আমরা লিডেনক্রষ্ট-আবৃত্ত অপরিস্রব বাষ্পস্তরের সঙ্গে তুলনা করতে পারি।

উত্তপ্তপ্লাজ্মা যে শুধু গামা ও নিউট্রিনোর উৎস, তা নয়, কিছুটা শক্তি হ্রাস বেতার-তরঙ্গের আকারেও দেখানো স্ট্র হবে। সাধারণ ও বিপরীত জগতের সীমারেখার অস্তিত্ব ঘরতে হলে আমাদের এই বেতার-তরঙ্গের সাহায্য নিতে হবে। তার কারণ, নিউট্রিনোর কোন যন্ত্রে ধরা পড়বার কথা নয়। আবার গামা-রশ্মি ধরবার চেয়ে এই সব বেতার-তরঙ্গ ধরবার সুবিধা বেশী। কলে সাধারণ ও বিপরীত জগতের মধ্যবর্তী এই বিভিন্ন স্তরটির বেতার-তরঙ্গ যন্ত্রের সাহায্যে ধরা পড়লে তবেই বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আমরা খুঁজে পাব। অনেক বেতার-নক্ষত্র (Radio star) ধরা পড়েছে, যারা এই সব বেতার-তরঙ্গ অনবরত পাঠিয়ে চলেছে। দুই বিপরীত জগতের প্রান্তদেশ যে এরকম একটি বেতার-নক্ষত্র নয়, তাই-ই বা কে বলতে পারে? বিপরীত জগতের অস্তিত্ব আজও আমাদের অজানা—পদার্থের চতুর্থ অবস্থা প্লাজ্মাই বুঝি এই জগতের চাবিকাঠি লুকিয়ে রেখেছে। কে জানে—হয়তো ভবিষ্যতে এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে।

## বাংলা দেশে মাছের চাষ

ঐখগেন্দ্রনাথ দাস

সে আজ অনেক দিনের কথা—কয়েক জন নিৰ্মাণ করিতে ছোট-বড় অনেক পুকুরিণী, বিত্তশালী ব্যক্তি বাংলা দেশে জমিদারীর ব্যবস্থা ভোবা ও জনশয়ের সৃষ্টি হয়। বর্ষাকালে নদীর প্রবাহ করিলেন এবং বিভিন্ন স্থান হইতে মনোহর জল বৃদ্ধি পাইলে ছোট নদী বা নালা দিয়া জল ব্যক্তিদের আহ্বান করিয়া তাঁহাদের জমিতে এই সকল পুকুরিণীতে প্রবেশ করিত এবং সঙ্গে সঙ্গে মাছের চাষও আসিয়া বড় হইতে স্থাপন করিলেন। এই সকল প্রকার স্থপ- থাকিত। ইহার ফলে প্রজাদের পরে অনেক সুবিধার প্রতি জমিদারদের বিশেষ লক্ষ্য ছিল। লাভ হইত। সেই জন্য অনেক স্থানে বর্ষার তাঁহারা প্রজাদের ধর্ম্যহুঁচানের জন্য মন্দির ও পূর্বে মাছের লোভে পুকুরের পাড় কাটিয়া জল মসজিদ প্রতিষ্ঠা, পথ চলিবার জন্য প্রশস্ত রাস্তা



১৯৭ চিত্র

মাগারী ট্যাঙ্কের দৃশ্য। সম্মুখে হাণ্ডার চাষা মাছ।

নিৰ্মাণ ও পানীয় জল সরবরাহের জন্য স্থানে স্থানে পুকুরিণী খনন করিয়া জনহিতকর কার্য করিতেন। ক্রমে বসতি বিস্তারের সঙ্গে সঙ্গে পুকুরিণীর সংখ্যাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। এতদ্ব্যতীত নীচু জমি ভরাট করিবার জন্য ও পল্লীকে বস্তার কবল হইতে রক্ষা করিবার প্রয়োজনে বাঁধ

আসিবার পথ তৈয়ার করা হইত। নদীবহল পূর্ববঙ্গে (পূর্ব পাকিস্তানে) কোন কোন স্থানে এইরূপ ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে।

মাছ খাওয়া বা মাছের চাষ করা পূর্বে সবাজের নিয় প্রচীর লোকের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত হইল যে,

আমাদের বাড়ির একটা প্রধান উপাদান প্রোটিন বাছের মধ্যে। প্রচুর পরিমাণে রহিয়াছে এবং নবন চিকিৎসকগণ রোগীদের পথ্য হিসাবে বাছ খাওয়া সুপারিশ করিলেন, তখন লোক দলে দলে বাছ খাইতে ও বাছের চাষ করিতে লাগিল। কবে বাছের চাষ বিশেষ লাভজনক শিল্প বলিয়া প্রমাণিত হইলে অভিজাত সম্প্রদায়েরও অনেকে মৎস্ত-চাষে প্রবৃত্ত হন। মৎস্ত-চাষ ও মৎস্ত-ব্যবসায় তখন আর অনস্বাদজনক শিল্প বলিয়া বিবেচিত

—(১) মৎস্ত-চাষের বিজ্ঞানসম্মত জ্ঞানের অভাব, (২) সংস্কারের অভাব প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব এবং (৩) বৌধ অধিকারীদের পরাম্পরের মধ্যে মতানৈক্য। উপর্যুক্ত মৎস্ত-বীজের অভাবও অনেক সময় লাভজনক মৎস্ত-চাষের অন্তরায় হইয়া থাকে।

আমরা অনেক রকম মিঠাকুলের বাছ খাইয়া থাকি, তাহাদের সবগুলিই লাভজনক বাছের চাষের উপযোগী নয়। যে বাছ তাড়াতাড়ি বাড়ে,



২নং চিত্র

রেলগাড়ীতে খোলা হাঁড়ির মধ্যে করিয়া চাষা বাছের চালায়।

হইত না। পরে বিজ্ঞানের সহায়তায় শহর প্রতিষ্ঠিত হইবার পর জমিদার ও বিত্তশালী ব্যক্তিরা পল্লীগাম ত্যাগ করিলে এবং পানীর জলের অভাব পল্লীগামে টিউব ওয়েল স্থাপিত হইলে পুকুরি ও অভাঙ জলাশয়গুলি বর ও সংস্কারের অভাবে ব্যবহারের অযোগ্য হইয়া পড়ে। এখনও অনেক পুকুরি ও জলাশয় অনাবাদী হইয়া পড়িয়া আছে। পুকুরি ও অভাঙ জলাশয়গুলি অনাবাদী থাকিবার প্রধান কারণ

দেখিতে সুশ্রী ও খাইতে সুস্বাদু, যে সকল বাছ মৎস্তরূপ নয় এবং মৎস্ত-শিকারীদের পক্ষে আনন্দদায়ক, সেই সকল বাছের চাষই লাভজনক। কই, কাংলা, মৃগেল ও কালবোস প্রভৃতি বাছ এই সকল শ্রেণীর অধিকারী। কিন্তু কুচি বাটা, বড়কে বাটা, তাম্বন বাটা, সরল পুটি, ঘোঁরা প্রভৃতি পুকুরের বাছ অনেকের কাছে সোভনীয় হইলেও সেগুলি ব্যবসায়ের পক্ষে তেমন লাভজনক নয়। কই, মাগুর, শোল, শাল প্রভৃতি বাছ অনেকের

প্রিয় হইলেও ইহারা বৎসভূক মাছ বলিয়া ব্যবসায়ের উপযোগী নয়। এই সকল মাছের দুই রকমের বাসস্থান থাকিবার কালে ইহারা জলের বাহিরে অনেকদূর বাঁচিয়া থাকিতে পারে। এইগুলি জাওলা মাছ নামে পরিচিত। ইহারা বিস্তীর্ণ অগভীর জলাভূমি ও বিল এলাকার বিচরণ করে। ইহাদের পুঙ্খের মাথিয়া পানন করিলে বর্ষার সময় মাটির উপর দিয়া এক পুঙ্খ হইতে অল্প পুঙ্খের চলিয়া বাইতে পারে। ইলিশ মাছও

ইংরেজীতে বলা হয় Indian major carp, বাংলার আদরা পোনা মাছ বলিয়া থাকি। কিন্তু কয়েক বৎসর হইল পোনা মাছের বড় বেবিতে Common carp নামে এক প্রকার বিদেশী মাছকে বাংলা দেশে আনা হইয়াছে। এই মাছগুলি বাংলার জলাশয়গুলিতে হিড়িনাভ করিয়াছে এবং কলিকাতার বাজারে আমেরিকান কই নামে বিক্রীত হইতেছে। আসলে ইহারা মালয় দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী। এই মাছগুলির বিশেষত্ব



৩নং চিত্র  
পেনে চারা পোনার টিন বোঝাই।

অনেকের প্রিয় বাস্ত, কিন্তু আসলে ইহারা অগভীর নদনুজের মাছ। বর্ষাকালে ডিম ছাড়িবার সময় মিঠাজলের নদীতে প্রবেশ করিবার কালে এবং সমুদ্রে কিরিয়া বাইবার পথেও কতকগুলি মাছ জালে ধরা পড়ে। ইলিশ মাছ খুবই স্পর্শকাতর, জল হইতে ছুলিলেই ইহারা মরিয়া যায়। ইলিশের চারা সতর্কভাবে আনিয়া পুঙ্খিণীতে রাখিলেও অধিকাংশই মরিয়া যায় এবং অবশিষ্টগুলি বড় হইলেও বাইতে ভেদন সুখার হয় না।

কই, কাংলা নুপেল ও কালবোস মাছকে

হইল—ইহারা বড় পুঙ্খিণীতেও বৎসরে দুই-তিন বার ডিম ছাড়ে। ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইবার পর পুঙ্খিণীতে সামান্ত জলজ উদ্ভিদের প্রয়োজন হয়। আদরা এই মাছকে কাণিও বলিব। কারণ ইহার আসল নাম Cyprinus carpio—আমেরিকান কই নামটি গৌরবান্বিত। ঐকুণ Tilapia নামে আফ্রিকার একজাতীয় মাছকে কলিকাতার বাজারে আমেরিকান কই বলিয়া আখ্যা দেওয়া হয়। এমন একদিন ছিল, যখন বাহা কিছু ভাল তাহার মাথকল্প গৌরবে 'বিলাতি' শব্দ বোলে করা

হইত, বধা—বিলাতি আমড়া, বিলাতি বেগুন ইত্যাদি—বদিক এই আমড়া ও বেগুন বিলাত হইতে আনানী করা হয়।

ভারতীয় পোনামাছ বড় জলাশয়ে ডিম ছাড়ে না। জী-মাছ পূর্ণ পরিণত হইবার পর বর্ষাকালে উপযুক্ত নদীর অগভীর কিনারায় ডিম ছাড়ে এবং পূর্ণ পরিণত পুরুষ সেখানে গিয়া ডিমগুলিকে নিষিক্ত করে। নিষিক্ত ডিমের মধ্যে মৎস্ত-জ্ঞান বড় হইয়া কতকটা মাছের আকার ধারণ

হানে আলস্য না পাইলে লোনা থাকির অনেক সংস্পর্শে আসিয়া মরিয়া যায়।

আর এক উপায়ে পোনামাছের ডিমপোনা পাওয়া যায়। মেদিনীপুর ও বাঁকুড়া জেলার বড় বড় খেয়া পুড়িগি (বেঙলিকে বাঁধ বলা হয়) মৎস্ত প্রজননের প্রসিদ্ধ স্থান। এই বাঁধগুলিকে অবিক্রিয় উপায়ে নদীর পরিবেশে পরিণত করা হয় এবং পরিণত জী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে উত্তেজিত করা হয়। পরে



৪নং চিত্র

টিনে অক্সিজেন দিয়া চারামাছ বোকাই করা হইতেছে।

করে এবং ডিম হইতে বাহির হইয়া আসে। এইগুলিকে ডিমপোনা (Spawn) বলা হয়। ইহার উত্তরের দিকিতে সঞ্চিত খাত্ত (Yolk) গ্রহণ করিয়া ডিম দিন পর্যন্ত বাঁচিয়া থাকিতে পারে। ডিমপোনা বস্তার মোতে নীচের দিকে আসিয়া ডিমধরা বেহুদী জালে (Spawn collecting or shooting net) ধরা পড়ে। ডিমপোনা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৪'৬ মি: হইতে ৬'২ মি: হইয়া থাকে এবং ডিমপোনার বাজারে আসে। ডিমপোনা জালে ধরা না পড়িলে বা নদীর মধ্যে নিরাপদ

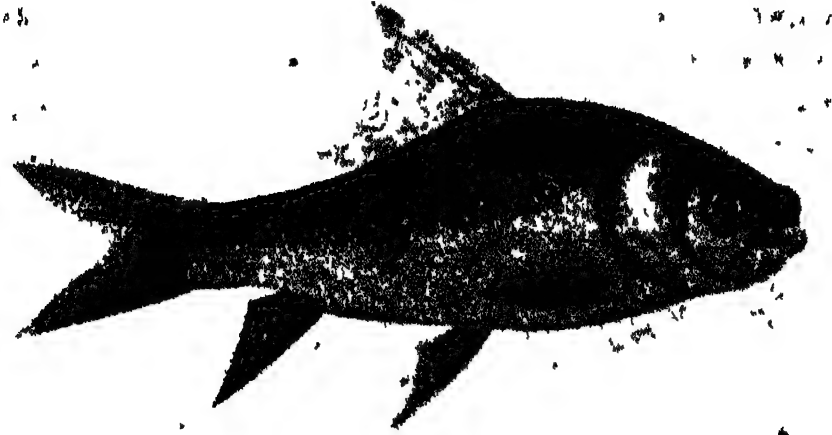
নিষিক্ত ডিমকে আপাতে (Hatchery) রাখিয়া ডিমপোনা পাইতে হয়।

আর এক কৃত্রিম উপায়ে পোনামাছের ডিম পাওয়া যায়। ইহার নাম প্ররোচিত প্রজনন (Induced breeding)। ইহাতে পরিণত পোনামাছকে পিটুইটারি গ্র্যাণ্ডের রস ইন্জেকশন করিয়া জী-মাছকে ডিম ছাড়িতে ও পুরুষ মাছকে ডিম নিষিক্ত করিতে বাধ্য করা হয়। শেখোক্ত উপায়টি সম্পূর্ণ কার্যকরী করিতে পারিলে বাংলা দেশের মৎস্ত-চাষের ক্ষয় প্রয়োজনীয় মৎস্ত-বীজের



কোন অর্থাৎ থাকিবে না। এই ব্যাপারে এখনও বড় মাপে উৎপাদন করিতে হয়। এই সকল গবেষণা চলিতেছে।

পোনামাছের ডিমপোনা লইয়া মাছের চাষ পুষ্করীতে উপযুক্ত সার প্রয়োগ করিলে প্রয়ো-  
করিতে তিন রকম পুষ্করের প্রয়োজন হয়; যথা— জনীর মৎস্ত-বাড় উপর হইয়া থাকে। পুষ্করী-



5নং চিত্র  
কাতলা মাছ (Catla catla)

নার্শারি ট্যাঙ্ক (Nursery tank), রিয়ারিং ট্যাঙ্ক (Rearing tank) এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্ক (Stocking tank)। তৈয়ারী নার্শারিতে ডিমপোনা দিয়া চালাপোনা (Fry) উৎপাদন করিতে হয়। রিয়ারিং  
গুলিকে, বিশেষতঃ নার্শারি ও রিয়ারিং ট্যাঙ্ক-  
গুলিকে কয়েক বৎসর অন্তর শুষ্ক করিয়া দিলে  
তাহাদের উৎপাদন-ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়।  
মৎস্ত-চাষের সাফল্য নির্ভর করে পুষ্করীর

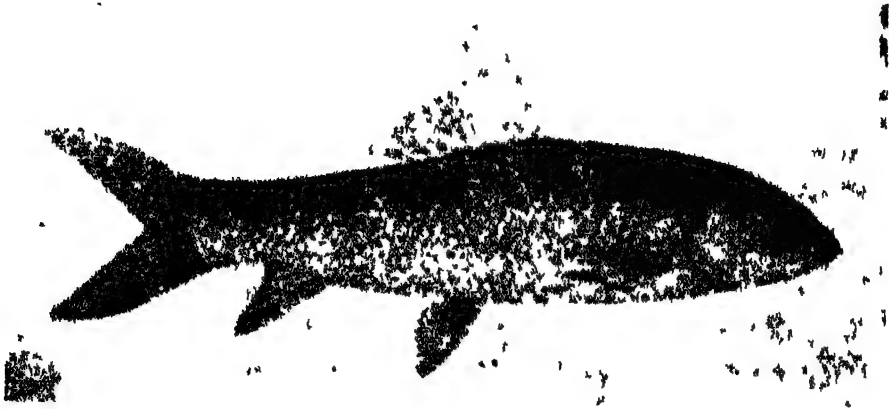


6নং চিত্র  
রুই মাছ (Labeo rohita)

ট্যাঙ্কে চালাপোনা দিয়া চালাপোনা (Fingerling) বোপাতা বিবেচনা করিয়া তাহার অন্ত উপযুক্ত  
এবং ষ্টকিং ট্যাঙ্কে চালাপোনা দিয়া বিক্রয়যোগ্য মৎস্ত-বীজ সংগ্রহ করা। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়

যে, গভীর পুকুরি বাহার পাড়গুলি বেশ বাড়াই, কিনারায় কম গভীর বিচরণ ক্ষেত্রের অভাব, এরূপ পুকুরি সাধারণতঃ কই বাছের পক্ষেই উপযুক্ত, কিন্তু ইহাতে কাতলায় চাষাপোনা দিলে খুব বেশী ভাল ফল পাওয়া যায় না। মৎস্ত-বীজ পরিবহনের ব্যর্থতাও অনেক সময় মৎস্ত-চাষের উৎসাহ কুণ্ণ করিয়া দেয়। অনেক জায়গায় খোলা হাঁড়িতে করিয়া মাছের চাষা সরবরাহ করা হয় এবং হাঁড়ির সঙ্গে লোক থাকিবার

তিন প্রকারে মৎস্ত-চাষ হইতে পারে; যথা— (1) ব্যক্তিগত মৎস্ত-চাষ (Private Fish-farming), (2) সমবায় পদ্ধতিতে মৎস্ত-চাষ (Co-operative Fish-farming) ও (3) রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্ত-চাষ (State Fish-farming)। নিজস্ব পদ্ধতিতে কোন কোন মৎস্ত-চাষী সীমাবদ্ধ সম্বলিত ও চিরায়ত জ্ঞানের সাহায্যে মাছের চাষ করিয়া থাকে। চাষীরা সহজে কোন নূতন জিনিস গ্রহণ করিতে চায় না, তবে সর্বদা একপ্রকার



7নং চিত্র

মৃগেল মাছ (Cirrhina mrigala)

প্রয়োজন হয়, কিন্তু দূরের পথে লইয়া যাইবার সময় অনেক মাছের চাষা মরিয়া যায়। এখন মৎস্ত-পরিবহনের এক অভিনব উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, বাহাতে মৎস্ত-বীজ বহু অবস্থায় কম পক্ষে 40 ঘণ্টার পৰ্যন্ত জীবন্ত অবস্থায় পৌঁছান সম্ভব। এই ব্যবস্থার আর একটি সুবিধা এই যে, টিনের বাস্তবের মধ্যে অ্যালকাবিন ব্যাগের ভিতর জল, বাহ ও অক্সিজেন দিয়া সম্পূর্ণরূপে বহু করিবার পর পার্শ্বের মত (কোন লোকের উপস্থিতি ছাড়াই) এক সঙ্গে অনেকগুলি টিন রেল বা প্লেনযোগে চালান দেওয়া যায়। বলা বাহুল্য জীবন্ত মৎস্ত-বীজ চালান দিবার ব্যাপারে এই ব্যবস্থা আজ সারা দেশে অল্পমত হইতেছে।

সহিত কিসারির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া লাভবান হয়। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ সরকারের সহিত বোণাবোণ রাখিয়া আধুনিক পদ্ধতিতে মাছের চাষ করিতে চায়। তাহারা অবশেষে কিসারির উন্নতি সাধন করিয়া লাভবান হয়।

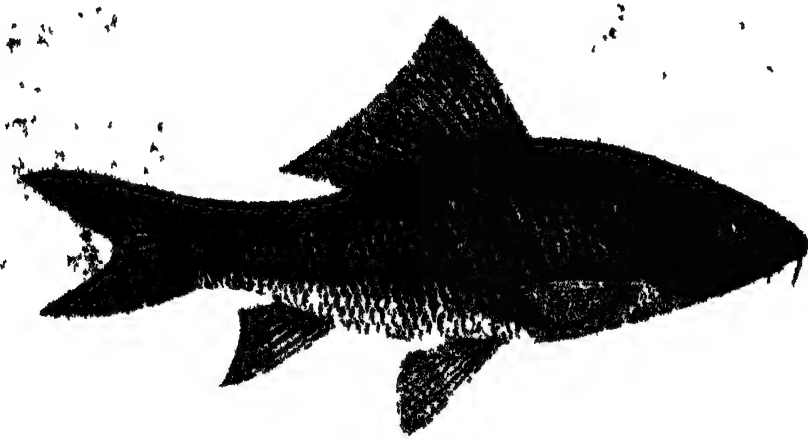
সমবায় পদ্ধতিতে একদল মৎস্ত-চাষী সরকারের সমবায় বিভাগের পরিচালনার মৎস্ত-চাষ করিয়া থাকে। এই সমবায় সমিতি সরকারের অর্থসাহায্য ও উপদেশ পাটয়া বিশেষ লাভবান হইতে পারে। কিন্তু অনেক সময় দেখা যায় যে, সমিতির দক্ষ সত্যোত্তর সমবায় পদ্ধতির কার্যত্যাগ ও নিষ্ঠা তুলিয়া সরকারী অকিসারির স্থান দখল করিয়া বসে এবং কিসারির কাজে উত্তরোত্তর

উন্নতির পরিবর্তে অবনতি ঘটাইতে থাকে। সম্ভাব্য সমিতির সভ্যদের একাগ্রতা ও নিষ্ঠার সাহায্যে মৎস্ত-চাষের উন্নতি হওয়া অস্বাভাবিক নয়।

রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্ত-চাষের বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক জ্ঞান এবং সরকারী বিভাগের আর্থিক ব্যবস্থার অভাব নাই; তথাপি লক্ষ্য করা যায় যে, ব্যবসায়ের কেহে রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা আশাহীনরূপে বলপ্রয় হয় না এবং অভাব প্রচেষ্টার তুলনায় অত্যন্ত কম লাভ-

কানার দ্বারা কার্ফকরী করিবার জন্য উৎসাহ দিলে পশ্চিম বঙ্গের মৎস্ত-শিল্পের উন্নতি হইবে ও মৎস্তোৎপাদন বৃদ্ধি পাইবে।

পশ্চিম বঙ্গে মোট 15 লক্ষ একর বহু জলাশয়ের মধ্যে প্রায় 10 লক্ষ একরে মাছের চাষ করা হয়। তাহার মধ্যে আছে হাজার হাজার পার্শ্বারি ট্যাক, যেগুলি মাছের চাষে চারাপোনা তৈয়ারি করিয়া সাহায্য করিলেও খাতোপযোগী মাছের কোন সংস্থান করে না, আর সেই রকম হাজার



৪নং চিত্র

কালবোস মাছ (Labeo calbasu)

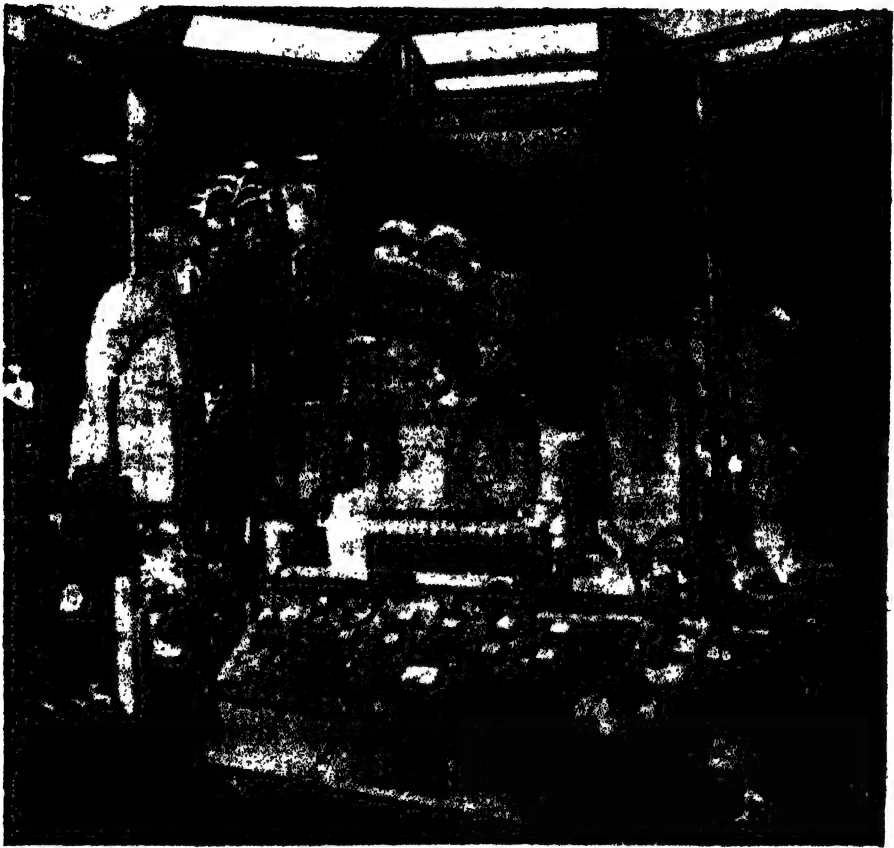
জনক হইয়া থাকে। ইহার ফলে কোন কোন ক্ষেত্রে কর্মীদের মনে হতাশার সৃষ্টি হয়। তবে লক্ষ্য করা গিয়াছে যে, স্বল্পকালীন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা অনেক সময় লাভজনক ও বিশেষ উৎসাহবাজক হইয়াছে। সেগুলি মৎস্ত-চাষীদের আদর্শ হিসাবে মৎস্ত-চাষে অনুপ্রেরণা দেয়।

উপরোক্ত বিষয়গুলি বিবেচনা করিয়া মনে হয়—হাজার হাজার পুকুরী ও জলাশয়ের মধ্যে যেগুলি আজও অনাবাদী পড়িয়া রহিয়াছে, সেগুলিকে রাষ্ট্রীয় পদ্ধতিতে মৎস্ত-চাষোপযোগী করিয়া উপযুক্ত সম্ভাব্য সমিতি বা নিজস্ব মালি-

হাজার বাঁধা আছে, বাহা হইতে বর্ষার সময় কোটি কোটি ভিমপোনা সরবরাহ হয়, কিন্তু তাহা হইতে বৎসরে এক কেজি মাছও বাইবার জন্য পাওয়া যায় না। 1963 সালের শুভ কমিশনের বিবরণীতে দেখা যায় যে, বাংলা দেশে বৎসরে মোট 51 লক্ষ মণ খাতোপযোগী মাছ পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে আছে অল্প প্রদেশ হইতে আমদানী করা প্রায় 18 লক্ষ মণ আর বাংলা দেশে বহু জলাশয়ে উৎপন্ন প্রায় 24.5 লক্ষ মণ মাছ। এই মাছ-বাংলার চাহিদার তুলনায় পর্যাপ্ত নয়। গত লোকগণনার হিসাবে বাংলার লোক-

সংখ্যা প্রায় ৩৭০ লক্ষ, তাহার মধ্যে মৎস্তভোজীর সংখ্যা ৩০৩ লক্ষ ধরা বাইতে পারে। প্রত্যেকটি বাহুবকে দৈনিক দুই আউল করিয়া বাইবার জন্য মৎস্ত সরবরাহ করিতে বৎসরে প্রায় ১৬৬ লক্ষ বণ বাহের প্রয়োজন। এই হিসাবে বাংলা দেশে বাহের অভাব দেখা যায় প্রায় ১১৫ লক্ষ মণের। এই বিরাট অভাব অত্যন্ত আংশিক দূর করিতে

আমরা ভারতের অন্তঃপ্রদেশ হইতে এবং সমুদ্রের উদ্ভুক্ত পরিবেশ হইতে মৎস্ত সংগ্রহ করিতে উদ্যোগী হইয়াছি। এতদ্ব্যতীত বাংলা দেশে যে পাঁচ লক্ষ একর বহু জলাশয় পরিত্যক্ত অবস্থায় এখনও পড়িয়া আছে, সেগুলিকে সংস্কার করিয়া মৎস্ত-চাষের জন্য উৎসাহ দান করিলে বাংলা দেশে মৎস্তের অভাব দূর হইতে পারে।



### হার্ট-লাং মেশিন

কোন রোগীর হৃৎপিণ্ডে অস্ত্রোপচার করবার সময় রক্ত-সঞ্চালন ও রক্তে অক্সিজেন সরবরাহ অক্ষুণ্ণ রাখবার জন্যে এই হার্ট-লাং মেশিনটি (সম্মুখে দেখা যাচ্ছে) ব্যবহার করা হয়। যান্ত্রিক অবস্থায় হৃৎপিণ্ড ও ফুসফুস যে কাজ করে—এই যন্ত্রটিও অস্ত্রোপচারের সময় ঠিক একই কাজ করে। এই যন্ত্র উদ্ভাবিত হবার কালে হৃৎপিণ্ডে যে ধরনের অস্ত্রোপচার করা পূর্বে অসম্ভব ছিল, এখন তা অনায়াসেই করা যাচ্ছে। এর কালে অনেক রোগীর জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয়েছে।

## ভূমিকম্প কেন ?

দিলীপকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়।

৯০শে মে, ১৯৭০। পেরুর রাজধানী লিমার প্রধান টেলিগ্রাফ কেন্দ্রে খবর বেজে চলছে—টরে টকা... টরে টকা...। আমার পায়ের তলায় মাটি কাঁপছে... আমার হাত থরথর করে কাঁপছে... সবকিছু তেড়ে চুরমার হয়ে গেল... বাঁচাও... বাঁচাও...। এর পরেই নাটকীয়ভাবে টেলিগ্রাফের লাইন স্তম্ভ মাছের মত নীরব-নিখর হয়ে গেল। লিমার অপারেটর প্রাণপণ চেষ্টা করেও ইয়ুকে শহরের লাইনকে আর সজীব করে তুলতে পারলো না। কপালের বিম্বু বিম্বু ঘাম বৃষ্টি অপারেটর বললো—দি লাইন ইজ ডেড। শুধুমাত্র টেলিগ্রাফের লাইন নয়, সমস্ত পশ্চিম পেরু জুড়ে তখন স্তম্ভার বিভীষিকা। সেই তরফর ভূমিকম্পে অ্যাণ্ডিজ পর্বতমালার বৃকে গড়ে ওঠা দুটি বলয়ল শহর—হুয়ানাক ও কারাক পৃথিবীর মানচিত্র থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। তাছাড়া চিমবোটে ও ট্রুজিরো শহর দুটিও তীব্রভাবে ক্ষতিগ্রস্ত। অস্তিত্ব শহর ও গ্রামের ক্ষতিও নগণ্য নয়। বেসরকারীভাবে রয়টারের মারকণ্ড যেসব খবর পৌঁচেছে, তাতে জানা যায়, পেরুর এই এলায়কর ভূমিকম্পে নিহতের সংখ্যা পঞ্চাশ হাজারের কম নয়।

পৃথিবীর বৃকে একত্রিত এই নির্মম, নিষ্ঠুর খেলা আজ নতুন নয়। ভূমিকম্পের এই ধ্বংস-লীলার পৃথিবীর বৃকে থনিরে এসেছে সর্বনাশের করাল ছায়া, বিলুপ্তি ঘটেছে শান্ত, শ্রদ্ধ জনপদের। ভীত, স্তম্ভ মাছ মনপ্রাণ হারিয়েছে নিষিচারে, তবু একত্রিত লোপুপ রসনার তুষ্টি ঘটে নি। বেশী দিনের কথা নয়, ১৯৬৭ সালের ১১ই ডিসেম্বর। শীতের সকালে তখনো সবাই গভীর নিদ্রায় মগ্ন। এমন সময় হঠাৎ ঘোরালী একত্রিত এসে তাড়বে

থরথর করে কাঁপতে লাগলো পশ্চিম মহারাষ্ট্রের এক বিরাট অঞ্চল। সম্পূর্ণ বিক্ষত হলো করনানগর (চিত্র নং ১)। শুধু তাই নয়, আশেপাশের অস্তিত্ব অঞ্চল—সাতারা, সাংলি, কোলাপুর ও রত্নগিরি জেলার কম করেও হাজারটি গ্রামের মাসিক জীবনযাত্রা সম্পূর্ণ অচল হয়ে পড়লো। আড়াই লক্ষের বেশী নরনারী গৃহহীন হয়ে আশ্রয় নিল উল্লু প্রান্তরে। স্তম্ভের সংখ্যা প্রায় দু-শ'-এর কাছাকাছি এবং আহতের সংখ্যাও কম নয়—প্রায় আড়াই হাজারের মত। অস্তিত্ব কম-কতির পরিমাণ নেহাৎ কম উল্লেখযোগ্য নয়। হেলতু-ঘাকের কাছে করনার উপর কারাক-চিপলান রাস্তার ব্রীজের তিনটি বিলান তেড়ে চুরমার। অবস্ত করনা-ব্রীজ ও শিলঙয়ে গেট অস্তিত্বভাবে এই তীব্র কম্পন সহ করেছিল। কিন্তু ব্রীজের উপরের হয়েই টাওয়ার, শিলঙয়ে ব্রীজ এবং কন্ট্রোল রুমটি খুবই ক্ষতিগ্রস্ত। ভূমিকম্পের এই তাড়বে শুধু পশ্চিম মহারাষ্ট্রের উপরেই আঘাত হানে নি, কাটল ধরিয়েছে তৃতাত্ত্বিকদের চির-কালের বিশ্বাসের ভিত্তে। প্রমাণ করেছে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলকে বতবানি অনড় বলে মনে করা হতো, ততবানি অনড় সে নয়।

পূর্ব ইতিহাস ঘাঁটলে দেখা যায়, ভারতের বৃকে করনা ভূমিকম্পই প্রথম নয়। এর আগেও ভারতের মাটিতে ভূমিকম্পের পদধ্বনি শোনা গেছে। ১৮৯৭ সালের ১২ই জুন এসেও ভূকম্পনের স্রষ্টা হলো উত্তর পূর্ব ভারতের আসাম রাজ্যে। শিলং শহরের চারপাশে প্রায় দেড় লক্ষ বর্গবাইল

এলাকা জুড়ে এই প্রবল ভূমিকম্পে অসংখ্য প্রাণ-হানি ও অপূরণীয় ধনসম্পত্তির ক্ষতি হয়েছিল। এর পর আসাম নয়, ভূমিকম্পের ঘোর পড়ে বিহারের উপর। ১৯৩৪ সালের ১৫ই জানুয়ারী, বেলা প্রায় তিনটা। এমনি সময়ে হঠাৎ বিহারের উত্তরাংশ ও নেপালের দক্ষিণ ভাগ এক প্রবল ভূকম্পনে কেঁপে উঠলো। এই ভূমিকম্পে যতিহারী, কাঠমাণ্ডু ও মুন্সের জেলার অধিকাংশ ক্ষতি হয়। বিত্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিরাট বিরাট কাটনের সৃষ্টি হয়

বেলুচিস্তানের কোয়েটা ও কালাট শহর ভূমিকম্পের প্রচণ্ড ভাঙবে কেঁপে উঠলো। মুল্লানবখাভীঘের আর্ড টিংকারে অন্ধকার রাজির আকাশ-বাতাস যথিত হয়ে উঠলো। মুন্সের সংখ্যা বিন হাজার ছাড়িয়ে গেল। এর পর বছর পনেরো নির্বিঘ্নেই কাটলো—অন্ততঃ ভারতবর্ষে, কিন্তু ধরিমুখী আবার ধোলাই হয়ে উঠলো। ১৯৫০ সালের ১৫ই আগস্ট আসাম-চীন সীমান্তে আর এক প্রবল ভূকম্পনে রিমা নগরীর আশেপাশে এক বিত্তীর্ণ অঞ্চল বিরাট



১নং চিত্র

এবং সেই সব কাটল থেকে উপচে-পড়া জল বভার জলের বড় সমস্ত অঞ্চলটিকে প্রাণিত করে বেলে। কম করেও সেবার প্রায় বারো হাজার মানুষ ভূমিকম্পের করাল প্রাণে প্রাণ হারায়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, পলিমাটির নীচে শক্ত পাথরের বিচ্যুতি ঘটবার কালেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়েছিল। বিহারের এই ভয়াবহ ভূমিকম্পের পর বছর বেড়েও কাটলো না। ১৯৩৫ সালের ৩১শে মে। নিকর কালো অন্ধকারের বুক চিরে

অসংখ্যপে পরিণত হলো। ধন-প্রাণের যে অপূরণীয় ক্ষতি হলো, তা ভাবায় প্রকাশ করা কঠিন। ইরানীং কালের ১৯৬৪ সালের ১৫ই এপ্রিল, কলকাতার বৃহৎ ভূকম্পনের কথা অনেকেই নিশ্চয়ই মনে আছে। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, এই বৃহৎ ভূকম্পনই যদি আরও মিনিট কয়েক স্থায়ী হতো, তবে হয়তো সমগ্র কলকাতা নগরী একটি বিরাট শব্দাগারে পরিণত হতো।

মাছের মূগ মূগ ধরে প্রকৃতির এই নির্দয়

যেহালাকে দেবতার অভিধাপ বলেই মনে করে এসেছে। কিন্তু সভ্যতার উন্নয়নের সঙ্গে সঙ্গে মানুষ বুঝতে শিখেছে, প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে দেবতার রোষের কোন সম্পর্ক নেই—আসলে এর মূলে রয়েছে কতকগুলি প্রাকৃতিক শক্তির কার্য-কারণের সম্পর্ক।

মনীষী অ্যারিস্টটল (384-322 খৃঃ পূঃ) বিশ্বাস করতেন, ভূপৃষ্ঠের তলদেশে সঞ্চিত গ্যাস মুক্তির প্রয়াসে শিলাস্তরের নীচে ক্রমাগত আঘাত করে ভূকম্পনের সৃষ্টি করে। আরেক গ্রীক মনীষী লুক্রেটিয়াস বললেন, ভূগর্ভস্থ শুষ্কাকন্দের যখন কোন কারণে ভেঙে পড়ে, তখনই ভূত্বকের বুকে জেগে ওঠে কম্পন, সৃষ্টি হয় ভূমিকম্পের। বিগত কয়েক শতাব্দী ধরে বিভিন্ন ভূবিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার মাধ্যমে জানতে পেরেছে প্রকৃতির এই হুজুর্গ রহস্যের প্রকৃত কারণ, বুঝতে পেরেছে পৃথিবীর বুকে ক্রমে ক্রমে কেন যেন অজানা আশঙ্কার কৈশোরে ওঠে। যে সকল বিজ্ঞানীর নিরলস সাধনার ভূমিকম্পের গতি-প্রকৃতি সম্বন্ধে যথেষ্ট ওয়াকিবহাল হয়েছিল, তাঁদের মধ্যে ম্যালেল, মিলনে, রীড, ইমানুয়েল এবং ওমরীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

সাধারণভাবে তিনটি প্রধান কারণে পৃথিবীর বুকে ভূমিকম্পের উৎপত্তি হয়; যথা—(1) ভূপৃষ্ঠ-জনিত, (2) আগ্নেয়গিরিজনিত এবং (3) শিলা-চ্যুতিজনিত।

(1) ভূপৃষ্ঠজনিত কারণ: পাহাড়ী অঞ্চলে ধস্নাঘাতের কালে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। একটি তথ্য থেকে জানা যায়, 1911 সালে সুর্কাতানের ভূমিকম্পে পাহাড়ী উপত্যকা অঞ্চলে 50,000 কোটি টন ওজনের বিশাল ধস্ন (Land slide) পর্বতশীর্ষ থেকে নেমে এসেছিল। বিশেষজ্ঞ-দের মতে, এই ঘিরাট ধস্নাঘাতের কালেই এই ভূমিকম্প হয়েছিল। যদিও প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ওল্ফহাইমার অভিজ্ঞতা থেকে বলেছেন, অধিকাংশ

কেন্দ্রে ভূকম্পনের কালেই পাহাড়ী আয়তায় ধস্না-নাশা হুস্তের মত বিরাটকার ধস্না ঘটেছে শুরু করে। কিন্তু ধস্না আগে, না ভূমিকম্প আগে? এই প্রশ্নের সহজতর পাওয়া হয়। এছাড়াও নানা কারণে মহাদেশের উপকূল ভাগে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভারতের পূর্ব উপকূলে সমুদ্র-তরঙ্গের আঘাতে যে ভূকম্পনের সৃষ্টি হয়, তা ক্ষীণবল হলেও কলকাতার আলিপুরের আবহাওয়া অফিসের ঘরে প্রায়ই ধরা পড়ে।

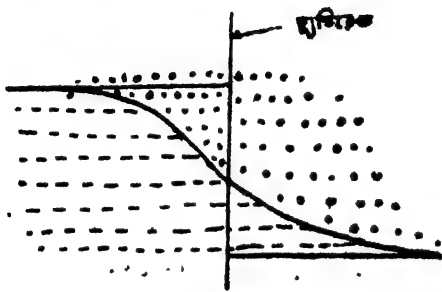
(2) আগ্নেয়গিরিজনিত কারণ—বৈজ্ঞানিক তথ্য থেকে জানা যায়, অনেক সময় বিস্ফোরণ ও গলিত লাভা উৎক্ষিপ্ত হবার কালে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হতে পারে। ভূগর্ভ থেকে গলিত লাভা যখন বেরিয়ে আসবার জন্তে প্রচণ্ড শক্তিতে আগ্নেয়গিরির অভ্যন্তরে উত্তরে আঘাত করতে থাকে, সেই প্রচণ্ড সংঘর্ষে তখন ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়। 1888 সালের সুমাত্রার ক্রাকাতোরার আগ্নেয়গিরির বিস্ফোরণে ও গলিত লাভা নির্গমনের সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্পের সৃষ্টি হয়েছিল। একই বছরে জাপানের বন্দরসানে আগ্নেয়গিরির গলিত লাভাস্রোত নির্গত হবার সঙ্গে সঙ্গে ভূমিকম্প অল্পভূত হয়েছিল।

(3) শিলাচ্যুতিজনিত কারণ—আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীদের মতামতসারে ভূগর্ভের অভ্যন্তরে শিলাচ্যুতিক্রমেই ভূমিকম্পের মূল কারণ বলে মনে করা হয়। 1906 সালের সানফ্রানসিসকো ভূমিকম্প ও সান অ্যান্ট্রিয়াস শিলাচ্যুতির (Fault) কার্যকারণ সম্বন্ধে সুদীর্ঘকাল গবেষণা করে অধ্যাপক এইচ. এক. রীড ভূমিকম্পের কারণ সম্বন্ধে একটি বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের উপস্থাপনা করেন। এই বিস্তারিত প্রতিঘাত তত্ত্বের (Elastic Rebound Theory) সাহায্যেই তিনি ভূমিকম্প ও শিলাচ্যুতির মধ্যে কার্যকারণ সম্বন্ধ বিশ্লেষণ করেন। সম্ভাবিত শিলাচ্যুত তলের দু-পাশে

মানা কারণে কখনো টান পড়তে থাকে। কলে শিলাস্তরটি ঝাঁকতে ঝাঁকতে এমন একটি পর্বায়ে পৌঁছে যায়, যখন শিলাস্তরটির পকে আর শক্ত ও স্থির অবস্থার থাকা সম্ভব হয় না। স্থিতিস্থাপকতার সীমা অতিক্রম করলেই শিলাস্তরের আচ্ছাদ্য বিচ্যুতি ঘটে (চিত্র নং ২—ক, খ)। মনে হয়, কে যেন প্রচণ্ড শক্তিতে শিলাস্তর দুটিকে পরস্পর থেকে আলাদা করে দিয়েছে। এই বিরাট শিলাচ্যুতির কলে ঝাঁকতে থাকে

এশিয়া বাইনার হয়ে আরম্ভ পর্বতশ্রেণী পর্বত পৌঁছেছে। পৃথিবীর প্রায় নব্বই শতাংশ ভূমিকম্পই এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে সীমাবদ্ধ।

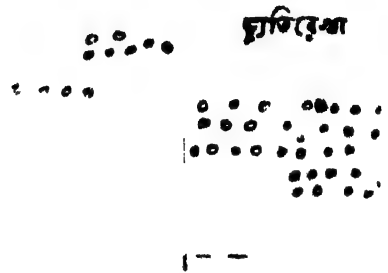
অবশ্য এই বিচারে দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল উল্লিখিত ভূমিকম্প-প্রধান অঞ্চলের বাইরে। এতকাল ধরে ভূতত্ত্ববিদদের ধারণা ছিল যে, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চল ভূতাত্ত্বিক দিক থেকে অনড়। তবে কেন কয়নানগরের এই ভূমিকম্প? এই প্রশ্নের চিত্তর হুঁকতে গেলে



২নং চিত্র (ক)

সবচেয়ে শিলাস্তর এবং উৎপত্তি হয় ভূমিকম্পের। শিলার চ্যুতি-বিচ্যুতি ভঙ্গ পর্বতমালায় মধ্যে প্রচণ্ড শক্তির ভূমিকম্পের আবির্ভাব এসব অঞ্চলেই সবচেয়ে বেশী। ১৮৭৭ সালের আগস্টের ভূমিকম্পে চিহ্নঃ শিলাচ্যুতির কলে একটি ভূতর প্রায় ৩৫ ফুট নীচে নেমে গিয়েছিল। পেরুর সাম্প্রতিক ভূমিকম্পের কারণও অল্প কিছু নয়। বিশেষজ্ঞদের ধারণা, শিলাচ্যুতির কলেই এই ভূমিকম্পের উৎপত্তি ঘটেছিল।

গত দেড়-শ'-দু-শ' বছরের ভূমিকম্পের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে, বেশীর ভাগ ভূমিকম্পের উৎপত্তি বিশেষ কয়েকটি পর্বতমালায় অঞ্চলেই সীমাবদ্ধ। এর মধ্যে প্রধানতম এশীয় মহাসাগরীয় পরিবর্তন, বা এশীয় মহাসাগরকে চারদিক থেকে বেষ্টিত মত মতের মধ্যে আছে। অতীত ভূমধ্যসাগরীয় পরিবর্তন, যার পরিধি পূর্ব ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ থেকে শুরু করে হিমালয় ও



২নং চিত্র (খ)

কয়নানগর অঞ্চলের পূর্ব ইতিহাস আলোচনা প্রয়োজন।

১৯৬২ সালে মহারাষ্ট্রের কয়না ধাঁধের জলাধার তত্ত্বি হবার শুরু থেকেই কখনো কখনো মৃদু ভূকম্পন অহুত হতে থাকে। কিন্তু পরের বছর বর্ষাকালে ধাঁধের জল আরো বৃদ্ধি পেলে ভূকম্পনের তীব্রতা ও সংখ্যার বৃদ্ধি লক্ষ্য করে কতৃপক্ষ কয়নানগর জলবিদ্যুৎ-কেন্দ্রের ভবিষ্যৎ ভেবে চিন্তিত হয়ে পড়েন।

কারণ এই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকেই মহারাষ্ট্রের শতকরা ৪০ ভাগ বিদ্যুৎ-শক্তি সরবরাহ করা হয়। এর পর ভূকম্পনের কারণ অঙ্গনস্থানের তার পড়ে কেন্দ্রীয় জল ও বিদ্যুৎ গবেষণা বস্তুর উপর। এই বস্তুর অভিমত, আনন্দ-রিকার বোম্বার জায়ের মত কয়নানগর জলাধারের চাপে কম্পনের সৃষ্টি হচ্ছে। কিন্তু তখন তখন কিছু নেই, বছর কয়েকের মধ্যে



ভূমকে ভারসাম্য করে এলেই এই কম্পন থেমে যাবে।

কিন্তু ভূ-বিজ্ঞানীদের ধারণাকে নতুন করে 1967 সালের 13ই সেপ্টেম্বর কয়নানগর কেঁপে উঠলো। বেশ খানিকটা দূরের শহর পুণাতেও ভূমিকম্পের কাঁপুনি বোঝা গেল। কম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণীত হলো 6 থেকে 10 কিলো-মিটারের মত। এই ভূমিকম্পের কালে কয়নানগরের কিছু বাড়ী বিধ্বস্ত হলো, বেশ কিছু অধিবাসী আহত হলো। অপ্রত্যাশিত এই ভূকম্পনে বিশেষ-জ্ঞেরা কিছুটা নিশ্চিত হলেও এবার কিন্তু বললেন— এই শেষ, এর পর ভবিষ্যতে জোরালো কোন ভূমিকম্পের সম্ভাবনা নেই। অথচ তারপর তিন মাসও কাটলো না—11ই ডিসেম্বর বিজ্ঞানীদের সব ভবিষ্যদ্বাণীকে মিথ্যা প্রমাণ করে কয়নানগর ও আশেপাশের অঞ্চলগুলি এচও ভূমিকম্পে কেঁপে উঠলো—একথা আগেই বলা হয়েছে। কয়নার এই ভূমিকম্পে কিন্তু বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। তীব্র ভূ-কম্পনের পরে সাধারণতঃ ভূমিখলন, ভূমির অধো-গমন, কাটলের সৃষ্টি, জলশীঠের পরিবর্তন ইত্যাদি দেখা যায়। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয়, কয়নার বড় রকমের কোন ভূতাত্ত্বিক পরিবর্তন চোখে পড়ে নি। যদিও স্থানে স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে ব্যাসার্ধ পাথর এছি বরে ভেঙ্গে পড়েছে এবং কেবলমাত্র কয়না বাঁধের কাছে নানেল থেকে দক্ষিণের ডার্পা উপত্যকা পর্যন্ত উত্তর-দক্ষিণে প্রসারিত মাটির উপর প্রায় পাঁচ কিলোমিটার লম্বা করেকটি কাটল দেখা গেছে এবং বঙ্গ এলাকার প্রস্তরগুলির তাপমাত্রা কিছুটা বৃদ্ধি পেয়েছে।

কয়না ভূমিকম্পের তথ্যাদি পর্যালোচনা করে বিজ্ঞানীরা বলেছেন, এই ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধ থেকে 5 কিলোমিটার দক্ষিণে। কিন্তু আরেক দল বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের উপকেন্দ্র কয়না বাঁধের কিছু উত্তরে।

কয়না ভূমিকম্পের তীব্রতার পরিমাপ ও কেন্দ্রের গভীরতা নির্ণয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে বেশ মতভেদ রয়েছে। সাধারণভাবে তীব্রতার পরি-মাপ রিচটার স্কেলে 6.5 থেকে 7.5 এবং কম্পন-কেন্দ্রের গভীরতা 16 কিঃ মিঃ থেকে 30 কিঃ মিঃ পর্যন্ত বলে বলা পড়েছে। অধ্যাপক সত্যেন্দ্র কুমার রায় বলেছেন, এই ভূকম্পনের পরিমাপ 7.5 এবং বহুদূর পর্যন্ত কম্পনের বিস্তৃতি ভূকম্পন-কেন্দ্রের গভীরতারই ইঙ্গিত প্রদান করে।

কিন্তু ভূমিকম্পের কেন্দ্র গভীরে হলে ভূপৃষ্ঠে কম-কমের পরিমাপ খুব বেশী হয় না—এই কারণে অনেক ভূ-বিজ্ঞানীর মতে, কয়না ভূমিকম্পের কেন্দ্র অগভীরে। কিন্তু অগভীর কেন্দ্র সত্ত্বেও এই ভূমিকম্প যে বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল, তার কারণ হিসাবে তিনটি বিষয় দেখানো হয়েছে। প্রথমতঃ, Lg তরঙ্গ ভূমকের উপরের স্তর (Sial) নিয়ে বহুদূর পর্যন্ত চলে গেছে। দ্বিতীয়তঃ, খুব কম সময়ের ব্যবধানে পরস্পর ছুটি কম্পন—প্রথমটির কেন্দ্র অগভীরে থাকার বিধ্বস্ত এলাকার কম-কমি এচও হয়েছে এবং দ্বিতীয়টির কেন্দ্র গভীরে হওয়ার বহু দূর পর্যন্ত কম্পন অনুভূত হয়েছিল। তৃতীয়তঃ, যে চূড়ির জন্তে এই ভূমিকম্পের সৃষ্টি, তা 15-20 কিঃ মিঃ থেকে 25-30 কিঃ মিঃ গভীরতা পর্যন্ত প্রসারিত ছিল।

ভূকম্পবিদদের মতপার্থক্য থেকে বলা চলে— কম্পনের সঠিক কারণ নির্ণয়ের জন্তে অনেক তথ্যই এখনো অজ্ঞানীর অধিকারে। অথচ কয়না বাঁধ অকলকে সম্ভাব্য ভূমিকম্প থেকে বাঁচাতে হলে ভূমিকম্পের সঠিক কারণ নির্ণয় করা প্রয়ো-জন। বিভিন্ন ভূতত্ত্ববিদদের মতবাদগুলি সংক্ষেপে এই রকম—

(1) বাঁধের অগ্ন্যধারে সংরক্ষিত জলের এচও চাপে ভিত্তিপ্রস্তরের কম্পন।

(২) অসাধারণ থেকে চৌরানো জলে ইয়ানের মধ্যবর্তী চূর্ণাধারের প্রবীতন। উপরে বর্ণিত কারণ দুটি সম্পর্কে সাম্প্রতিক কালে অবিকাংশ বিজ্ঞানীই গভীরভাবে সন্নিহান।

(৩) শিলাচ্যুতির কলে ভূকম্পন।

কয়নানগরের ভূমিকম্প প্রচুর পরিমাণে শক্তির মুক্তি এবং কেন্দ্রের গভীরতা থেকে অনেকের অল্পমান, কোন বড় রকমের চ্যুতির জন্মেই কয়নার মাটি এত জোরে কেঁপে উঠেছিল। খুব সম্ভব এই ভূমিকম্পে কোন পুরনো চ্যুতির কথা অথবা নতুন কোন কাটল বরাবর আন্দোলনের কলে সৃষ্টি হয়েছে। পশ্চিম মহাদ্বীপে এই রকম ভিনটি চ্যুতির কারণ অবস্থিতি সংক্ষেপে অনেকে

অল্পমান করেন, যদিও এদের উপস্থিতি ভূতাত্ত্বিক সমীকার পুরাপুরি প্রমাণিত হয় নি।

(৪) ভূপৃষ্ঠের গভীরে গলিত শিলার (ম্যাগমা) অবস্থা পরিবর্তনে উৎপন্ন শক্তির কলে কম্পন। দাক্ষিণাত্যের মালভূমি অঞ্চলে টাণিয়ারী যুগের লাভা-প্রবাহের (Deccan trap) অস্তিত্ব থেকে বর্তমান যুগের লাভা-প্রবাহের কথা চিন্তা করা হয়েছে, যদিও এর সমর্থনে বিশেষ কোন জোরালো মুক্তি পাওয়া যায় নি।

যাহোক, কয়না ভূমিকম্প যে কারণেই ঘটে থাকুক না কেন, দাক্ষিণাত্যের মালভূমি যে যুগের মত নিখর, অনড় নয়, একথা নতুন করে প্রমাণিত হয়েছে।

“বঙ্গ জননীকে উচ্চ সিংহাসনে অধিষ্ঠিত দেখিবার ইচ্ছা সকলেরই আছে; কিন্তু তাহার উপায় উদ্ভাবন সবদিকে বরং কষ্ট স্বীকার না করিয়া পরস্পরকে কেবলমাত্র ভাঙনা করিলে কোন কল পাইব না, একথা বাহ্যিক। এই উদ্দেশ্যে প্রধানতঃ বঙ্গসন্তানদের বিবিধ ক্ষেত্রে কৃতিত্ব ও তাহাদের আত্মসম্মান-বোধ জাগরণ আবশ্যিক; কিন্তু একথা অনেক সময় ভুলিয়া বাই। কর্মক্ষেত্রে অপরে কি পথ অবলম্বন করিবে তাহা লইয়াই কেবল আলোচনা করি। কেহ কেহ হুঃস করিয়াছেন যে, বঙ্গের দুই একটি কৃতী-সন্তান তুচ্ছ বশের যারাজে প্রকট পথ ত্যাগ করিয়াছেন।…… যদি (তাহাদের আবিষ্কৃত) এই তত্ত্ব কেবল বাঙ্গলা ভাষার প্রকাশিত হইত তাহা হইলে বিদেশীরা অবশ্য সত্যের আকর্ষণে এদেশে আসিয়া বাঙ্গলা ভাষা শিখিতে বাধ্য হইত এবং প্রাচ্যের নিকট প্রতীচ্য মঞ্চক অবনত করিত।

ইংরেজী ভাষার বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশ সংক্ষেপে ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, আমার বাহ্যিক কিছু আবিষ্কার সম্প্রতি বিদেশে প্রতিষ্ঠানভুক্ত করিয়াছে, তাহা সর্বত্রই বাস্তবতার প্রকাশিত হইয়াছিল এবং তাহার প্রমাণার্থ পরীক্ষা এদেশে সাধারণ সমক্ষে প্রদর্শিত হইয়াছিল। কিন্তু আমার একান্ত দুর্ভাগ্যবশতঃ এদেশের সুবীজ্ঞ-দিগের নিকট তাহা বহুদিন প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে সক্ষম হয় নাই। আমাদের স্বদেশী বিশ্ববিদ্যালয়ও বিদেশের হল-মার্কা না দেখিতে পাইলে কোন সত্যের মূল্য সংক্ষেপে একান্ত সন্নিহান হইয়া থাকেন। বাঙ্গলা দেশে আবিষ্কৃত, বাঙ্গলা ভাষায় লিখিত তত্ত্বগুলি যখন বাঙ্গলার পণ্ডিতদিগের নিকট উপেক্ষিত হইয়াছিল তখন বিদেশী ভূরূপগণ এদেশে আসিয়া যে নদীগর্ভে পরিত্যক্ত আবিষ্কারের মধ্যে রত উদ্ধার করিতে প্রয়াসী হইবেন, ইহা দুঃখের কথা।”

## অক্ষয়কুমার দত্ত ও বাংলার বিজ্ঞান-চর্চা

বুদ্ধদেব চৌধুরী

গড়া পথ দিয়ে হাঁটা, আর পথ গড়ে হাঁটা এক জিনিষ নয়। পথ গড়ে নিয়ে যারা হাঁটেন, তাঁরা হাঁটার সময়টুকু তো বটেই, গড়বার ক্লেশ-টুকুও স্বীকার করতে বাধ্য হন। অক্ষয়কুমার দত্ত এই দ্বিতীয় দলের পথিক। তিনি গড়তে গড়তে পথ চলছেন। চলতে চলতে পথ করেছেন।

অক্ষয়কুমার সম্পর্কে এই দ্বিমুখী কৃতিত্বের প্রশ্ন উঠতে না, যদি দেখতাম বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের চর্চায় আত্মনিয়োগ করবার সময় সাহিত্য-রচনার উল্লেখযোগ্য কোন আদর্শকে তিনি সামনে পেয়েছেন। রচনাাদর্শ সাধারণ বাংলা গল্প সৃষ্টির ক্ষেত্রে বা-ও বা তিনি পেয়েছিলেন, বিজ্ঞানের প্রবন্ধের বেলায় তাও পান নি। কারণ, তাঁর পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের প্রায় সকলেই লিখেছেন কৃত্রিম ও আড়ষ্ট ভাষায়।

অবশ্য স্বীকার করা চলে না যে, এরূপ লেখার সঙ্গত কিছু কারণ আছে। অক্ষয়কুমারের পূর্বসূরী বিজ্ঞান-লেখকদের অবিকাংশই ছিলেন ইউরোপীয়। তাঁরা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানকে প্রাচ্য বাঙালার উপযোগী করে পরিবেশন করতে পারেন নি—বিজ্ঞানের ভাষাকে বাণ বাঙরাতে পারেন নি বাংলা ভাষার সঙ্গে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, উইলিয়াম কেরীর ছেলে কেলিক্স কেরী ‘বিজ্ঞানসাহিত্য’ (1820) নামে যে অহি ও শারীরবিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থটি লিখেছিলেন অথবা ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তের অধ্যাপক জন ম্যাক লিখেছিলেন ‘কিম্বদন্তিভাষ্যের সার’ (1834) নামক যে রসায়ন বিজ্ঞানটি, বাংলা ভাষার প্রকৃতি ও বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে তাদের কোনটিই ঠিক বাপ

খায় নি; অর্থাৎ বাঙালীমানুষ চেয়ে সাহেবী-মানুষই প্রকট হয়ে উঠেছে সে সব গ্রন্থে।

এইখানে রামমোহন রায় ও রাধাকান্ত দেবের কথা এবং বিশেষ করে প্রথমোক্ত মনীষীর কথা উঠতে পারে। কেন না, বাংলার পাশ্চাত্য বিজ্ঞানের প্রসারে তাঁর অবদান কোন মতেই উপেক্ষণীয় নয়। 1823 খ্রীষ্টাব্দের শেষের দিকে গভর্নর জেনারেল লর্ড আমহার্শটের কাছে লেখা এক চিঠিতে রামমোহন অল্পরোধ জানিয়েছিলেন এদেশে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান-চর্চার প্রসারের জন্তে। তাছাড়া নিজেকে তিনি কয়েকটি বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনা করেন। গ্রন্থগুলি হলো ইংরেজী ও বাংলার রচিত ভূগোল—জ্যোতিষাঙ্গী, জ্যোতিষবিজ্ঞান বা বঙ্গোল এবং একটি জ্যামিতি।

উল্লিখিত তিনটি গ্রন্থই দীর্ঘকাল বাবৎ পাওয়া যায় না। এমন কি, রামমোহনের জীবনীকার নগেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় আজ থেকে প্রায় 90 বছর আগে প্রকাশিত ‘মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জীবনচরিতে’র প্রথম সংস্করণে (1287) পর্যন্ত এদের সম্পর্কে একই কথা বলেছেন। অতএব, যেহেতু রামমোহনের ওই গ্রন্থগুলির কোনটিই আমরা দেখি নি, সেহেতু ওদের ভাষা সম্পর্কে আজ কোন মন্তব্য করবার উপায় নেই। আজ এটুকুই তবু বলা যায় যে, রামমোহনের বিজ্ঞানগ্রন্থগুলি কোনটিই তাঁর সমসাময়িক জন-সমাজে উল্লেখযোগ্য কোন সমাদর লাভ করে নি। কেন না, সমাদর লাভ করলে সে যুগের অস্বাভাবিক বিজ্ঞানগ্রন্থের মধ্যে হয় এদের সঙ্গত উল্লেখ থাকতো, নয় তো বুকে পাওয়া যেত সে যুগের রিপোর্ট, ক্যাটালগ বা সংগ্রহশালার। রাধাকান্ত দেবের

বিজ্ঞানালোচনা আদরা অবতরণে। তাঁর বিভাগীয় রচনা বাঙালি শিক্ষার্থীদের (১৮২১) কুশল এবং গণিত-বিষয়ক এসকলগুলিকে একে-বারেই প্রাথমিক প্রকৃতির মনে হয়েছে আদরের। তাই সব দিক মিলিয়ে বিচার করলে আজ বলা যায়, অক্ষয়কুমারের পূর্ববর্তী বাংলা বিজ্ঞান-সাহিত্যের বেশীর ভাগই হয় দুর্বোধ্য ও কৃত্রিম, না হয় অজ্ঞাত ও অবহেলিত অথবা একেবারেই অপরিণত।

হয়তো বা তুল বললান, বিজ্ঞানসাহিত্য বলা বোধ হয় ঠিক হলো না। বিজ্ঞাননিষ্ঠের পাঠ্যপুস্তক বা বিজ্ঞানগম্ভী টুকিটাকি রচনা বললেই এদের পরিচয়টা সঠিক হয়।

বিজ্ঞান-বিষয়ক বাংলা ভাষাকে সাহিত্যের পর্দায় প্রথম উন্নীত করলেন অক্ষয়কুমার দত্ত। ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে সর্বজনবোধ্য বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তিনিই প্রথম লিখলেন। তাঁর রচনারীতির প্রধান বৈশিষ্ট্য ভাষার প্রসাদগুণ। বর্ণাসুন্দর সহজ ও সরল ভাষার বিজ্ঞানের বিষয় লিপিবদ্ধ করেছেন তিনি। সাধারণ পাঠক—এমন কি, ক্ষুদ্রাঙ্গরমিতি কিশোর-কিশোরীরাও যাতে তাঁর লেখা বুঝতে পারে, সেদিকে বরাবরই তিনি লক্ষ্য রেখেছেন। অবশ্য সন্দেহ নেই যে, সাময়িক-পত্র সম্পাদনার অভিজ্ঞতা এই ব্যাপারে তাঁকে সাহায্য করেছিল অনেকখানি।

তিনি বিজ্ঞানদর্পণ পত্রিকার (প্রথম প্রকাশ—জুন, ১৮৪২) অন্ততম পরিচালক ছিলেন। তাহাড়া এই পত্রিকার প্রকাশিত অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ তাঁরই রচনা বলে মনে হয়। বিজ্ঞানদর্পণের প্রবন্ধগুলির বৈশিষ্ট্য প্রকাশনীতির স্বচ্ছতার ও বর্ণাবলম্বিত্য সমাবেশে। এতে রচনা টেকনিক্যাল হয়ে ওঠে নি কোথাও—বিজ্ঞানে অবজ্ঞিত পাঠকদের কাছেও রচনা জটিল বা দুর্বোধ্য হয় নি।

ধারাবাহিকভাবে উচ্চতর স্তরীক বৈজ্ঞানিক

প্রবন্ধ প্রকাশিত হতে বিজ্ঞানদর্পণেই প্রথম দেখা গেল। কিন্তু খুব দ্রুতস্রী হবার কালে এই পত্রিকা বাংলা ভাষার বিজ্ঞান-চর্চার ক্ষেত্রে দ্রুতই কোন আদর্শ স্থাপন করে যেতে পারে নি। এই আদর্শ স্থাপনের কৃতিত্ব দাবী করতে পারে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এবং তার কর্তব্যর অক্ষয়কুমার দত্ত। দীর্ঘবারো বছর (১৮৪৩-১৮৫৫) অক্ষয়কুমার এই পত্রিকাটির সম্পাদনা করেছিলেন এবং বিজ্ঞান-বিষয়ক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ নিরমিতভাবে এতে প্রকাশ করে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের কল্যাণসাধন করেছিলেন।

বিদ্যদর্পণ, সমাচার দর্পণ ইত্যাদি পূর্ববর্তী পত্র-পত্রিকাগুলির বিজ্ঞান-বিষয়ক আলোচনার সঙ্গে তত্ত্ববোধিনীর বিজ্ঞান-এসকলগুলির কোন তুলনাই চলে না—কেন না, ঐ সব পত্র-পত্রিকার বিজ্ঞানালোচনার অধিকাংশই ছিল বিজ্ঞান-সংবাদ, আর না হয় বিজ্ঞান-প্রস্তাব। তাহাড়া ঐগুলির ভাষা ছিল কৃত্রিম।

ভাষার কৃত্রিমতা দূর করে পূর্ণাঙ্গ বিজ্ঞান-প্রবন্ধ রচনার সূচনা হয়েছিল বিজ্ঞানদর্পণে। আর বিজ্ঞানদর্পণে বার সূচনা হয়েছিল, তারই পরিণতি দেখা গেল তত্ত্ববোধিনীতে। তত্ত্ববোধিনীর প্রবন্ধগুলি প্রাক্কল, সুনির্দিষ্ট ও সারগর্ভ। বিজ্ঞানের বিভিন্ন দিক নিয়ে বহু মনোজ্ঞ বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এতে প্রকাশিত হয়েছিল। তাহাড়া এই পত্রিকার দীর্ঘদিন ধরে ধারাবাহিকভাবে এক-একটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হবার কালে বিজ্ঞানসাহিত্যের প্রতি জনসাধারণের আগ্রহও আগের তুলনার অনেক বেড়ে গিয়েছিল।

১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে অক্ষয়কুমার তত্ত্ববোধিনীর সম্পাদনা ত্যাগ করলে এই পত্রিকার জনপ্রিয়তা অনেকখানি হ্রাস গেল। অক্ষয়কুমারের বিজ্ঞান-লোচনার অধিকাংশই আগে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার প্রকাশিত হতো, তারপর প্রকাশিত হতো প্রচাচারে।

তবে তাঁর প্রথম বিজ্ঞানগ্রন্থ তুগোল প্রকাশিত হয় এই পত্রিকাটির জন্মের বছর দুইকে আগে 1841 খৃষ্টাব্দে। তত্ত্ববোধিনী সভার অল্পবয়স্ককালে একটি ছাপা হয়েছিল। এর বিবরণের বিভিন্ন ইংরেজী গ্রন্থ ও গেজেটের থেকে সংগৃহীত। পৃথিবীর দার্শনিক ও বাণিজ্যিক তুগোল দ্বিধা সামাজিক আলোচনার প্রয়াস এতে আছে। তবে এর প্রধান ক্রটি, অল্প জায়গার অধিক তথ্যের সমাবেশ।

অক্ষরকুমার দত্তের 'বাহুবল্লভ সহিত মানব প্রকৃতির সন্ধি বিচার' (প্রথম ভাগ—প্রথম প্রকাশ পৌষ, 1773 শক; দ্বিতীয় ভাগ—প্রথম প্রকাশ মাঘ, 1774 শক) নামক গ্রন্থের স্থানে স্থানে মূল্য-বান বৈজ্ঞানিক তথ্যাদি রয়েছে। ধর্ম, বিজ্ঞান ও মর্শনে লেখকের পাণ্ডিত্যের পরিচয় এই গ্রন্থের প্রায় সর্বত্রই জ্বলন্ত। ব্রাহ্মধর্মকে আশ্রয় করলে শরীর, বুদ্ধি ও ধর্মতাবের কিতাবে উৎকর্ষ সাধিত হতে পারে, এই গ্রন্থে অক্ষরকুমার তা বোঝাতে চেয়েছিলেন। তবে ধর্মবিশ্বাসেরই শুধু নয়, বিজ্ঞান-বুদ্ধিরও উল্লেখযোগ্য স্থান আছে এই গ্রন্থে। 1770 শকাব্দের মাঘ সংখ্যা থেকে এটি গ্রন্থটি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়। অর্জ কৃষ্ণ-এর 'Constitution of Man' নামক গ্রন্থ অবলম্বনে এটি লেখা। তবে কৃষ্ণ-এর গ্রন্থটির আক্ষরিক অনুবাদ করেন নি অক্ষরকুমার, তাবানুবাদ করেছেন এবং অনুবাদের সময় তিনি লক্ষ্য রেখেছেন, দেশীয় জনসাধারণের কচি ও প্রয়োজনের দিকে। 'বাহুবল্লভ সহিত মানব প্রকৃতির সন্ধি বিচার' সে যুগের বাংলা দেশে বথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছিল। তাছাড়া 'চাকপাঠ' 1ম, 2য় ও 3য় ভাগ (প্রথম প্রকাশ বধাক্রমে 1775, 1776 ও 1781 শক) সমাদৃত হয়েছিল সেকালের ছেলেদেরদের মধ্যে।

চাকপাঠ-এর প্রায় সব রচনাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। এর বিবরণের বিভিন্ন

ইংরেজী গ্রন্থ থেকে সংকলিত। এতে প্রাণী ও উদ্ভিদবিজ্ঞান থেকে শুরু করে তুগোল, পদার্থ-বিজ্ঞান, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন এসব নিয়ে রচনা আছে। তবে প্রাণিবিজ্ঞান বিষয়ক রচনারই প্রাধান্য।

চাকপাঠে অক্ষরকুমার তথ্যের উপর ততটা জোর দেন নি, বরং জোর দিয়েছেন রচনাকে মনোমগ্ন ও ছন্দময়গ্রাহী করে তোলাবার দিকে। তথ্যের দিক থেকে চাকপাঠের অবিকাংশ রচনাই দুর্বল, সন্দেহ নেই; কিন্তু সরল ভাষা ও স্বল্প প্রকাশভঙ্গী রচনাগুলিকে গল্পের মত স্বপ্নাশ্রিত করেছে। অক্ষরকুমারের অপর একটি বিজ্ঞানগ্রন্থ পদার্থবিজ্ঞান (1856) বাংলার জনপ্রিয়কল্পিতভাবে লেখা প্রথম পদার্থবিজ্ঞান।

বাংলার পদার্থবিজ্ঞান নাম দিয়ে এর আগেও গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল বটে। ইয়েটস্-এর 'পদার্থবিজ্ঞান' (1824) এবং পূর্ণচন্দ্র দ্বিবেদীর 'পদার্থবিজ্ঞান' (1847) অনেককেই কৌতূহলী করেছিল। কিন্তু পূর্ণাঙ্গ পদার্থবিজ্ঞান এদের একটিও নয়। প্রাকৃতিক বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগ—জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূ ও তুগোলবিজ্ঞান, প্রাণিবিজ্ঞান ইত্যাদি অনেক কিছুই এদের মধ্যে আছে। তাছাড়া, পরিভাষার ব্যবহারেও এদের মধ্যে সুনির্দিষ্ট কোন রীতি অনুবৃত্ত হয় নি।

পদার্থবিজ্ঞান অক্ষরকুমার ইংরেজী বৈজ্ঞানিক শব্দগুলির বাংলা নাম ব্যবহার করেছেন, অর্থাৎ পরিভাষা সৃষ্টি করেছেন তিনি। অনেক ক্ষেত্রেই তাঁকে নতুন শব্দ গ্রহণ করতে হয়েছে। বিশেষ-ভাবে উল্লেখযোগ্য, অক্ষরকুমারের পরবর্তী বিজ্ঞান-লেখকদের অনেকেই পরিভাষার ব্যবহারে তাঁকে অনুকরণ করেছিলেন; যেমন—Inertia-র বাংলা অক্ষরকুমার লিখলেন জড়ত্ব। পরবর্তী পদার্থবিজ্ঞান-লেখক মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, বোলেশচন্দ্র রায় ও স্বর্নকুমার অধিকারীও Inertia অর্থে এই জড়ত্ব শব্দটিই ব্যবহার করেছেন।

এইভাবে অকস্মিকতার 'বাহ্যবস্তুর সহিত মানব প্রকৃতির সম্বন্ধ বিচার' ও 'চাকপার্টের' মধ্য দিয়ে এক দিকে যেমন বাংলা বিজ্ঞানসাহিত্যকে শরম ও জনপ্রিয় করে তুললেন, অপর দিকে তেমনি ভূগোল ও পদার্থবিজ্ঞানের পথ দেখালেন

প্রাক্তন, সুপরিচরিত ও তথ্যনিষ্ঠ বিজ্ঞানগ্রন্থ রচনার।

কালক্রমে বাংলা ভাষার অনেক উচ্চাঙ্গের বিজ্ঞানগ্রন্থ হরতো রচিত হয়ে, কিন্তু বাংলার বিজ্ঞান-চর্চার অন্ততম পন্থিক অকস্মিকতার দৃষ্টের দাবি মুছে যাবে না কোন দিনই।

"একাদশ বা দ্বাদশবর্ষীয় বালকবিশেষের প্ৰাথমিককরণের জন্য যে সকল বিজ্ঞানপাঠ প্রচারিত হইয়াছে, তাহার প্রকৃত প্রস্তাবে দেশের ইষ্ট কি অনিষ্ট সাধিত হইতেছে তাহা সঠিক বলা যায় না। আসল কথা এই, আমাদের দেশ হইতে প্রকৃত জ্ঞানস্পৃহা চলিয়া গিয়াছে। জ্ঞানের প্রতি একটা আন্তরিক টান না থাকিলে কেবল বিশ্ববিদ্যালয়ের ২৩টি পরীক্ষার উত্তীর্ণ হওয়ার বিশেষ ফললাভ হয় না। এই জ্ঞানস্পৃহার অভাবেই বহিঃ বিশ্ববিদ্যালয়ের অসীম বিদ্যালয়সমূহে বহুকালা হইতে বিজ্ঞান অধ্যাপনার ব্যবস্থা হইয়াছে, তথাপি বিজ্ঞানের প্রতি আন্তরিক অগ্রসরণসম্পন্ন যুৎসব হাজি আদৌ দেখিতে পাওয়া যায় না। কেন না বোড়াকে জলাপের নিকটে আনিতে কি হইবে? উহার যে তৃষ্ণা নাই। একজামিন পাশই যেথানকার হাজিীবনের মুখ্য উদ্দেশ্য, সেথানকার যুবকগণের দ্বারা অধীত বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞান শাখা-প্রশাখাদির উন্নতি হইবে এরূপ প্রত্যাশা করা নিতান্তই বুঝা। সেই সকল যুতকর, বাহ্যবিহীন যুবকগণের বৃত্তে জাতীয় ভাষার উন্নতি-বিধান, কিবা যে কোনও প্রকার দুরূহ ও অধ্যাবসায়মূলক কার্যের সাফল্য সম্পাদনের আশা নিতান্তই দূর পরাহত। বস্তুতঃ একজামিন পাশ করিবার নিমিত্ত এরূপ হাতোস্তীপক উদ্বৃত্ততা পৃথিবীর অন্ত কুত্রাপি দেখা যায় না। পাশ করিয়া সরস্বতীর নিকট চির-বিদায় গ্রহণ—শিক্ষিতের এরূপ জঘন্য প্রবৃত্তি আর কোন দেশেই নাই। আমরা এদেশে যখন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা শেষ করিয়া জানী ও-স্ত্রী হইয়াছি বলিয়া আত্মদমে ক্ষীণ হই, অপরূপ দেশে সেই সময়েই প্রকৃত জ্ঞানচর্চার কাল আরম্ভ হয়; কারণ সে সকল দেশের লোকের জ্ঞানের প্রতি বর্ষা অগ্রসরণ আছে, তাঁহারা একথা সম্যক উপলব্ধি করিয়াছেন যে, বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বার হইতে বাহির হইয়াই জ্ঞান-সমুদ্র যখন প্রাপ্ত সময়। আমরা দ্বারকেই গৃহ বলিয়া মনে করিয়াছি, সুতরাং জ্ঞান-সন্ধির দ্বারেই অবস্থান করি, অত্যন্তরূপ রহস্যময়ী ভূমিগোচর না করিয়াই ক্ষমণে প্রত্যাঘর্জন করি।"

# বিজ্ঞানের ভাষা

নীলা সজুমকার

আমাদের সঙ্গে আবার নিগূঢ় সন্ধি। কি বলা হবে, তার উপরেই নির্ভর করছে, কিভাবে বলা হবে। দুইয়ের মধ্যে কিন্তু বক্তব্যই প্রেরণ। বিশেষ করে বিজ্ঞানের বিষয়ে একথা আরো বেশী করে পাঠে।

বিজ্ঞানের হলো তথ্য এবং নির্ভুল তথ্য নিয়ে কারবার। এমন কি, একবার যে তথ্যকে বৈজ্ঞানিক সত্য বলে মেনে নেওয়া হয়েছে, পরবর্তী গবেষণার যদি তার মধ্যে তুল বা খুঁৎ বেরোয়, বৈজ্ঞানিকেরা তৎক্ষণাৎ তাকে হয় বর্জন করেন, নয় তো নব আবিষ্কৃত তত্ত্বের সঙ্গে মিলিয়ে নেন। বিজ্ঞান-জগতে কখনো শেব কথা বলা যায় না।

বিজ্ঞানের ভাষাকেও তাই এর-ই উপযুক্ত হতে হয়। সব আবার মতই এরও একমাত্র উদ্দেশ্য সত্যকে প্রকাশ করা, তবে অস্তিত্ব বিষয় থেকে এর একটুখানি তফাৎ আছে। বৈজ্ঞানিক সত্যের ধর্ম অনেকটা গণিতের ধর্মের মত। একটি তথ্য প্রতিষ্ঠিত হলে তাকে ভিত্তি করে পর পর ক্রমাগত নতুন নতুন তথ্য প্রতিষ্ঠা করা হয়, একই সঙ্গে পাশাপাশি অনেকগুলি চিত্তকে বসিয়ে তার কাজ হয় না। অবশ্য তার যানে এই নয় যে, নানান বৈজ্ঞানিক তথ্যের পরস্পরের সঙ্গে কোন সন্ধি নেই, বরং ঠিক তার উল্টো। ধৌলিক তথ্যগুলি সব কেন্দ্রেই প্রযোজ্য। তফাৎ এইখানে যে, সাহিত্যের কেন্দ্রে পাশাপাশি সাজানো তথ্য বা তত্ত্বের মধ্যে যদি তুল বেরোয়, তাহলে অনারাসে শুধু সেই ভ্রাতৃ অংশটুকু উৎপাটন করা যায়, অথচ অংশগুলির তাতে হয়তো কোন কতিই হয় না।

এই সব কথা মনে রেখে বিশেষ দৃষ্টি করে বিজ্ঞানের ভাষা চয়ন করতে হয়। রস জ্ঞানো তার

উদ্দেশ্য নয়, প্রসঙ্গ ভূমির তার কাছে গুরুত্ব নেই। সবচেয়ে সহজ ভাবে, সবচেয়ে স্পষ্ট করে বৈজ্ঞানিক তথ্য পরিবেষণ করতে হয়, যাতে কোন তুল বোঝবার সজাবনা না থাকে এবং কখনো একটি ছেড়ে ছুটি বানে করা না যায়।

বিজ্ঞানের লেখক নিজেকে সর্বদা রচনার বাইরে রাখবেন, কারণ বৈজ্ঞানিক সত্য সর্বকালের সর্ব-জনের এবং নৈর্যাত্তিক। একবার বৈজ্ঞানিকের কোন ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার কথা বিস্তারিত ভাবে বলবার সময় বা বৈজ্ঞানিক গবেষণার বর্ণনা দেবার সময় লেখকের ব্যক্তিগত মন্তব্যের অভ্যস্ত বেশী করেই মূল্য থাকে। কিন্তু সে মন্তব্যও নির্ভর করে তার আবিষ্কৃত সত্যগুলির উপর, ব্যক্তিগত মত-সাধ বা পছন্দ-অপছন্দের উপরে নয়। এমন কি, অপরাধীকৃত আন্দাজ বা হাইপোথিসিসগুলিকেও হুক্তি দিয়ে ঠাঁড় করাতে হয়। সেখানেও রচনার উল্লেখ বোঝার লাগাম ছেড়ে দিলে চলে না। নব-রসের স্থান নেই বৈজ্ঞানিক রচনার। অস্তিত্ব ভূমি নিয়ে বৈজ্ঞানিকেরা মানস-সরোবরের নীল জল পর্ববেষণ করেন, ঠিক তাই দিয়েই তাঁরা মৃতদেহের ক্রমাবনতিও দেখেন—সমান বয়স, সমান প্রজাতি নিয়ে। আবেগ বলে কিছুই স্থান নেই। কারণ আবেগ বিচার-বুদ্ধিকে ধ্বংস করে দেয়। বিজ্ঞানের কেন্দ্রে তাই ভাষাকেও হতে হয় শান্ত, সংযত ও স্কটিকের মত সঙ্কট।

বৈজ্ঞানিক তথ্যকে সর্বকালের ও সর্বজনের বলে বর্ণিত করা হয়েছে, কোন বিশেষ মেনে সে আবদ্ধ থাকতে পারে না। যে কোন বৈজ্ঞানিক সত্য প্রতিষ্ঠিত হবার অনেক আগে থেকেই হয়তো দেশ-বিদেশের গবেষণাগারে তাই নিয়ে



অনুমান চলতে থাকে আর একবার প্রতিষ্ঠিত হবে গেলে ভো কথাই নেই—অমনি সেই মুহূর্ত ঘরে জ্ঞানের নব নব দিগন্ত প্রসারিত হতে থাকে। কাজেই যেন হয় বৈজ্ঞানিক শব্দগুলি, অর্থাৎ Scientific terms সব দেশবাসীর কাছে বড় সহজবোধ্য হয়, ততই বঙ্গল। বৈজ্ঞানিক সত্য অন্বেষণের কাজে তারা যদি বাধার সৃষ্টি করে, তাহলে অনেক সময় ও শ্রম বুঝা নষ্ট করতে হয়। একই অর্থে একই শব্দ যদি সব দেশে প্রচলিত হয়, তাহলেই সবচেয়ে সুবিধা হয়।

এই নিয়ে সম্ভবতঃ বৈজ্ঞানিক আর ভাষা-বিদেরা একমত হবেন না। দেশাভিমান বলে একটা জিনিষ আছে। তারই বশ হয়ে ভাষাবিদেরা এরোপ্লেনকে বলেন আকাশযান এবং লেসার-এর প্রতিশব্দ নিয়ে স্কবিলে পড়েন। কোথায় আবিষ্কৃত হলো, কে আবিষ্কার করলো তাই নিয়ে নব-আবিষ্কৃত তথ্যের নামকরণ হতে পারে, কিন্তু ছুনিয়ার সব বিজ্ঞানীরা সেই নামটি যেনে নিলে নিজেদেরই সুবিধা হবে।

নতুন আবিষ্কার ছাড়াও বৈজ্ঞানিক রচনার আরেকটা বড় দিক আছে। সেটি হলো পুরনো তথ্য আর ব্যক্তিগত নানান ছোটখাটো অভিজ্ঞতার প্রচার। আজকাল ছোটদের সাধারণ জ্ঞান দেবার জন্তে কত যে বৈজ্ঞানিক বই লেখা হচ্ছে তার ইয়ত্তা নেই। সে সব বইয়ে কি রকম ভাষা ব্যবহার করা হবে, তা নিয়েই হলো স্কবিল। নীরস পাঠ্য-পুস্তকের মত হলোও চলবে না, আবার নিছক পরীক্ষার গল্প কাঁদলেও হবে না। সখ করে কেউ নীরস পাঠ্যপুস্তক পড়বে না; আবার পরীক্ষার গল্পের মত করে বিজ্ঞান শেখাতে গেলে তার কতখানি নিছক করুণা আর কতখানিক বৈজ্ঞানিক সত্য বলে গ্রহণ করা যেতে পারে, তাই নিয়ে সাধারণ পাঠকের লাগে ধাঁধা।

যেন হয় বৈজ্ঞানিক রচনাতে কোন রকম সৌন্দর্য ভেজাল না দেওয়াই উচিত। সত্যকে

আকর্ষিত করে ভোলবার জন্তে তার গায়ে ছাঁড়া ছড়াবার দরকার করে না। বৈজ্ঞানিক লেখাতে কোন কৃত্রিম বা মকল জিনিষ থাকা ঘাটনীয় নয়। অল্প বৈজ্ঞানিক তথ্যের সঙ্গে ভুলনা ছাড়া কোন উপমা, অলঙ্কারও যেমানান। আবার তেমনি নীরস ব্যাখ্যা হলোও তার উদ্দেশ্য বিফল হবে, কারণ কেউ পড়বে না।

জন-বিজ্ঞান বা Popular science-এর জন্তে কি রকম ভাষা সবচেয়ে ভাল হয়, তার কুরি কুরি দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় জগতের অনেক বিখ্যাত ভ্রমণকারী, কৃত্তকৃষি, প্রাণিকৃষি ও গবেষকদের লেখা সত্যাকার অভিজ্ঞতার বই থেকে। তার মধ্যেও অবশ্য ভাল-বন্দ আছে। কেউ কেউ পদে পদে ব্যক্তিগত মন্তব্য বা ছোটখাটো বক্তৃতা না করে পারেন না। বিজ্ঞানের দিক থেকে সে সব বাতিল। কিন্তু কেউ কেউ আছেন, যেমন শেন হেডিন বা অরেল-ষ্টাইন, যাঁরা পৃথিবীর নানান দুর্গম অঞ্চল জয়-গামি নতুন নতুন তথ্য আবিষ্কারের জন্তে প্রাণ হাতে করে দীর্ঘ দিন ধরে ভ্রমণ করেছেন। তাঁরা সেখানে যেভাবে গিয়ে যা-যা যেমন-যেমন দেখেছেন, তাই দেখে বা কিছু বুঝেছেন, ঠিক সেভাবেই লিখে গেছেন। এই হলো বৈজ্ঞানিকের আসল পন্থা।

এর আলাদা এক রকম রস। সত্যের অধিকল প্রতিচ্ছবির নিজের একটা বিস্তৃত সৌন্দর্য আছে, তার একটা প্রচণ্ড শক্তি থাকে। তাকে বখাষ খাবে প্রকাশ করবার উপযুক্ত ভাষাকেও নিরাতরণ ও নির্ভীক হতে হয়। রচনা যদি ছোটদের জন্তে হয়ে থাকে, তবে ভাষা খুব সহজ ও সরল হবে; কিন্তু বোকাধি বা ডাকাধি থাকবে না। এই বিষয়ে এক রকম পবিত্রতা রক্ষা করে চলতে হয়।

বাগান করতে ওড়ার বলে আপানীরা ব্যাভ। তবোহি তাঁরা বা কিছুকে অন্যায়তক ও অবাস্তব বলে মনে করেন, অমনি সেটাকে কাঁচি দিয়ে নির্ভয়ভাবে ছেঁটে কেলেদ। শেষ পর্যন্ত বাকী থাকে



কয়েকটি অপূর্ণ ভাষার ভালপালা, কয়েকটি অপূর্ণ বিজ্ঞানের ভাষাকেও ঐরকম হতে হয়—  
মুন্সের পাতার গুহি আর দু-একটি নির্মূল ফুল। অবাস্তব একটি কথাও থাকবে না। বা নইলে  
এদের মধ্যে একটিকেও ছিঁড়ে ফেললে বাগানটি বিভাঙই চলে না, তবু সেইটুকুই নিজের বহির্ভা-  
গাড়া দেখাবে, কারণ তারা সকলেই অত্যন্ত এতও শক্তি নিয়ে বিরাজ করবে। সবজি হবে  
প্রয়োজনীয়, কাকেও বাদ দিলে চলে না। পরিচ্ছন্ন, একবার পড়লেই মানে বোঝা যাবে,  
সমস্তটি পরিচ্ছন্ন, একটুও সপ্রকাশ। কোন কিছু প্রচ্ছন্ন থাকবে না।

“গত কয় বৎসর বাঙলা ভাষায় যে সকল বিজ্ঞান বিষয়ক পুস্তক প্রকাশিত  
হইয়াছে, তাহার প্রায় সমস্তগুলিই পাঠ্যপুস্তক শ্রেণীভুক্ত। দুই একখানি বাহ  
সাধারণ পাঠোপযোগী। ইহা আলোচনা করিলে আমরা দেখিতে পাই যে,  
আমাদের বর্তমান সাহিত্য হইতে বিজ্ঞান জ্ঞানচ্যুত হইয়াছে। বিজ্ঞানের অধিষ্ঠাত্রী  
দেবী ভারতবর্ষ হইতে নির্মূলিত হইয়া ইউরোপ গতে ও এশিয়ার পূর্ব প্রান্তে  
আজয় লইয়াছেন। বাস্তবিক ১৯১০ বৎসর পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যের এ প্রকার  
দুর্গতি হয় নাই। বাঙলা সাপ্তাহিক পত্রিকার তখন বিজ্ঞান বীর জ্ঞান অধিকার  
করিয়াছিল। অক্ষরকুমার “ভদ্রবোধিনী পত্রিকা” পদার্থবিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল  
প্রবন্ধ প্রকাশিত করিয়াছিলেন, রাজেন্দ্রলাল ‘বিবিধার্থ-সংগ্রহে’ ভূতত্ত্ব, আদিবিজ্ঞান  
ও প্রাকৃতিক বিজ্ঞান বিষয়ক যে সকল প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহা বাঙলা সাহিত্যের  
অস্থিমজ্জাগত হইয়া থাকিবে। বাঙলা সাহিত্যে বিজ্ঞানের বাহা কিছু সমাবেশ  
হইয়াছে তজ্জন্ত এই দুই মহাশয়ার বিকট আঘাত চিরবধী থাকিব। ইহাদের কিছু  
পূর্বে হৃদযোহন বন্দ্যোপাধ্যায় ‘Lord Hardinge’ এর আত্মকৃত্যে ‘Encyclo-  
paedia Bengalensis’ অথবা “বিভাকরকর্ম” আখ্যা দিয়া কয়েক বৎসর পুস্তক  
প্রণয়ন ও প্রকাশ করেন। ইহাতে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও দর্শনতত্ত্ব সকল প্রকাশিত  
হইত। রাজেন্দ্রলাল ও হৃদযোহন উভয়েই অশেষশ্রমবিৎ ও নানা ভাষাভিজ্ঞ  
ছিলেন। যদিও তাঁহাদের রচনা অক্ষরকুমারের রচনার ভাষা প্রচলিত সাহিত্যের  
(Classics) মধ্যে গণ্য হইবে না, তথাপি তাঁহারা বঙ্গসাহিত্যের অতিনব পথ-  
প্রদর্শক বলিয়া চিরকাল যাত হইবেন। কিন্তু ইহাদের পূর্বেও বাঙলা সাহিত্যের  
উন্নতি ও প্রসারের জন্ত বিজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধ হইয়াছিল। ঐশ্বর্যপূরের  
বিশনারীগণকে বর্তমান বাঙলা গদ্য সাহিত্যের জন্মদাতা বলিলেও অত্যাতি হয় না;  
তাঁহারা আবার বাঙলা ভাষায় বিজ্ঞান প্রচারেরও প্রথম প্রবর্তক। আমাদের  
জাতীয় অভিযান আঘাতপ্রাপ্ত হয় বলিয়া একথা আমাদের তুলিয়া যাইলে,  
‘খটাবী বাঙলা’ বলিয়া তাঁহাদের হৃদকার্যকে উড়াইয়া দিলে চলিবে না। ঐতিহাসিক  
ভারের ও সত্যের জুলাদও হতে করিয়া বাহার যে সম্মান প্রাপ্য, তাহাকে তাহা প্রদান  
করিবেন।”

# বিভাসাগরের গ্রন্থাগার

রাসবিহারী রায়

দাবী দাবী বই। বর্ণাঢ্য বলাট। সোনার  
জলে নাম লেখা এবং মূল্যবান আধারে রক্ষিত।  
কিন্তু তাহলে কি হয়, বার বই তার পড়ার কোন  
স্পৃহা নেই, বিখের জানতাতার থেকে সে রসান্বাদন  
করে না। দাবী আসিবাবপত্রের বা মূল্য তার কাছে  
বইয়েরও তাই মূল্য, এর বেশী কিছু নয়। বই  
সাজিয়ে রাখে গৃহের শোভাবর্ধন করতে, আভি-  
জাত্যের প্রমাণ দিতে। রবীন্দ্রনাথ এই প্রণীত  
বিত্তবান গ্রন্থ-সংগ্রাহকদের প্রতি কটাক্ষপাত  
করেছেন কয়েকটি অনবত্ত হুজুর :

পাখাণ-গাঁধা প্রাসাদ পরে  
আছেন ভাগ্যবন্ত,  
মেহাগিনির বক জুড়ি  
পক্ষ হাজার গ্রন্থ;  
সোনার জলে দাগ পড়ে না  
ঝোলে না কেউ পাতা;  
অ-স্বাদিত মধু যেমন  
হুণী অনাজাতা।

কিন্তু বীর ভাগ্যবন্ত নয়, বীরের অর্থকোষিত  
নেই, তারাত তো বই সংগ্রহ করে মূল্যবান  
গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন। তাঁদের আর্থিক সজ্জিত  
নীতি, কিন্তু অধ্যয়নস্পৃহা ও জ্ঞানভূকা অসাধারণ,  
এঁরা জ্ঞানভগবী বলেই গ্রন্থপ্রেমিক। তিল তিল  
করে এঁরা তিলোত্তমার সৃষ্টি করেন, সঞ্চয় করেন  
অমূল্য ভাণ্ডার। অ্যাক্সিটল থেকে আভ্যন্তর  
এই প্রণীত গ্রন্থপ্রেমিক বনীবী। আনাদের দেশে  
যেমন বনীবী তাঁদের ব্যক্তিগত চৌর্য ও অর্থে  
নিজস্ব গ্রন্থাগার গড়ে তোলেন, তাঁদের মধ্যে  
পুণ্যলোক বিভাসাগর অগ্রগণ্য। গ্রন্থ সংগ্রহ ও

ও সংরক্ষণে যেমন ছিল তাঁর সখর প্রয়াস, জ্ঞান  
আহরণেও ছিল তাঁর তেমন গভীর অগ্রসার।

বিভাসাগর দীর্ঘদিন ভাঙার বাড়িতে বাস  
করেন। বাড়ি পরিবর্তনের সময় তাঁকে অনেক  
অসুবিধা ভোগ করতে হয়। তাঁর মূল্যবান বই-  
গুলির ক্ষতি হয়। তাছাড়া ভাঙার বাড়িতে  
ইচ্ছামত বইগুলি সাজিয়েওহিয়ে পড়াশোনার  
আদর্শ পরিবেশও সৃষ্টি করা সম্ভব ছিল না। তাই  
তিনি পরিণত বয়সে কলিকাতার নিজস্ব বাড়ি  
তৈরির ইচ্ছা করেন। পিতৃভক্ত সন্তান পিতা  
ঠাকুরদাসের অসুখতি নিয়ে বাহুবলগানে একটি  
বাড়ি তৈরি করান। গ্রন্থপ্রেমিক বনীবীর ইচ্ছা  
পূর্ণ হয়। বাহুবলগানের বাড়িতে 1283 সালের  
শ্রীতকালে সপরিবারে তিনি প্রবেশ করেন। চতীচরণ  
বন্দ্যোপাধ্যায় এই প্রসঙ্গে বলেছেন, “তিনি 1283  
সালের শেষভাগে বাহুবলগানে বহুত মজুন  
বাটীতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়া নিজের পরম প্রিয়  
পুত্রকালয়টি স্থাপন করিয়া সাজাইয়া যদের দীর্ঘ-  
কালস্থায়ী হুঃখ দূর করিলেন। পুণ্যলোক পরি-  
শোধিত নির্জন ক্ষুদ্র বাটীতে বিভাসাগর মহাশয়ের  
বিশেষ আনন্দ এই ছিল যে, একাকী বসিয়া লেখা  
পড়া করিবার বিস্তর অবসর পাইতেন এবং দিবা-  
রাত্রি কোন না কোন একখানি পুস্তক লইয়া জ্ঞান-  
চর্চা বা শাস্ত্রপাঠ করিতে ভালবাসিতেন।”

বিভাসাগর ছিলেন সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত, সংস্কৃত  
শাস্ত্র ও সাহিত্যে তাঁর পাণ্ডিত্য ছিল অসাধারণ।  
বহু অর্থ ব্যয় করে তিনি সংস্কৃত ভাষা ও  
সাহিত্যের বহু গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ  
করেন। তদুপাংগ্রহ নয়, সবচেয়ে রক্ষাও করেন।  
চতীচরণ এই সংগ্রহ সবচেয়ে লিখেছেন, “সংস্কৃত

শাস্ত্র ও সাহিত্য এই তাঁহার পুস্তকালয়ে বেকশ সংগৃহীত ও বহু রক্ষিত সেরূপ আর কোথাও হইয়াছে বলিয়া বোধ হয় না।

ইংরেজী সাহিত্যের প্রতিও বিভাগগরের বিলম্ব অস্বাভাবিক ছিল। তিনি নিজের চোঁর ইংরেজী ভালভাবেই জানেছিলেন, তাঁর সরকারী ও ব্যক্তিগত চিঠিগত্রে ইংরেজী জানের পরিচয় সুস্পষ্ট। বিখ্যাত ইংরেজ গ্রন্থকারদের বহু গ্রন্থের বই তাঁর গ্রন্থাগারের জন্তে তিনি সংগ্রহ করেন। বিভাগগর 'বিবলিওকাইল' ছিলেন না, সংগ্রহ করার আনন্দের জন্তেই বই সংগ্রহ করতেন না। তাঁর আলমারীতে বই কীটদষ্ট বা ধূলিধূসরিত হতো না, অথহেলার হতসৌন্দর্য হতো না। তাঁর কারণ তিনি সবসময়েই বইয়ের বহু নিভেন এবং সবচেয়ে বড় কথা, তিনি যে বই ক্রয় করতেন, তা পাঠ করতেন। এই এসঙ্গে চতুর্ভাষা লিখেছেন, "যে কোন বিষয়ে বখনই কেহ কোন কথা বলিয়াছেন, তাহার উত্তরে তৎক্ষণাৎ কোন সুপ্রবীণ লেখকের অতিমত উল্লেখ করিয়া তবীর গ্রহ হইতে তাঁহাকে তাহা দেখাইয়া দিতে দেখিয়াছি—কট, সেক্সপিয়ার, মিল্টন, হাঙ্গলি, টিওল, মিল, স্পেলার প্রভৃতি ইংরেজ কবি, উপভাসকার, বৈজ্ঞানিক এবং দার্শনিক পণ্ডিতগণের গ্রন্থগত বিবরের উল্লেখ করিতে দেখিয়াছি।"

সংস্কৃত ও ইংরেজী ছাড়া বাংলা, হিন্দী এমন কি, ফ্রেঞ্চ ও জার্মান ভাষার বইও তাঁর লাইব্রেরীতে রক্ষিত ছিল। বিভাগগরের সময় গ্রন্থের ভিত্তিই প্রবর্তিত প্রণীতিভাস ছিল না, কিন্তু তিনি নিজেরই গ্রন্থগুলি সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন প্রভৃতি প্রণীতে বিভক্ত করে লাইব্রেরীতে সাজিয়ে রাখতেন। তবু সাজানো মোহানো বহু, সবচেয়ে চিত্তাকর্ষক ছিল বইগুলির বাঁধাই-সৌন্দর্য। এর জন্তে তাঁকে কি পরিমাণ অর্থ ব্যয় করতে হতো, তা অহমান করাও দুঃসাধ্য।

এর সমস্ত বই-ই সুন্দর ও সুচারুরূপে বাঁধাই করা হতো। অনেক গ্রন্থই ইংল্যান্ড ও জার্মেনী থেকে বাঁধাই হয়ে আসতো। এতে গ্রন্থের আঁক-সোঁটব বনোবদ হতো। শনিত্বরণ বহু বলেন— "বিভাগগর মহাশয় বলিলেন, বিলাতে পুস্তক-বিক্রেতাদের নিকট এইরূপ বলা আছে যে, নূতন ভাল পুস্তক বাহির হইলে তাহারা একরূপ বাঁধাই করিয়া আবার এখানে পাঠাইবেন। যেবিলাস আরতিতের ফেচবুক এই সান্যাত দরের পুস্তকখানিও অত্যন্ত দাবী পুস্তকের মত বাঁধান হইয়াছে। বইখানি কিনিতে যে বরফ পড়িয়াছে তাহা অপেক্ষা বাঁধাইয়ের মূল্য অধিক।" বই-বাঁধানোর এই সব বিভাগগরের গ্রন্থপ্রীতিরই স্বাক্ষর বহন করে।

এখানে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার উপর বিভাগগরের কোন আস্থা ছিল না, কিন্তু পরে এই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রতি বিশেষ আস্থা হন। হোমিওপ্যাথিক পুস্তক পাঠ করে—এমন কি, সুকিয়া স্ট্রিটের প্রসিদ্ধ ডাক্তার চন্ড্রমোহন ঘোষের কাছে কিছুকাল অ্যানাটমি শিখা করে হোমিওপ্যাথি চিকিৎসার মনোনিবেশ করেন। এই প্রসঙ্গে বিহারীলাল সরকার বলেন— "এই সময় তিনি বহু সংখ্যক হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলেন। এই সব পুস্তক তাঁহার লাইব্রেরীতে আছে। এই লাইব্রেরীতে হোমিওপ্যাথিক পুস্তক ব্যতীত আর দকারিক টাকার অল্প পুস্তক আছে।" বিভাগগরের সহোদর শচীন্দ্র বলেছেন— "বিভাগ-গর মহাশয় প্রতি বৎসর ব্যাকার কোম্পানীর দ্বারা অর্ডার দিয়া বিলাত হইতে অনেক টাকার হোমিওপ্যাথিক পুস্তক আনাইয়া এতাদের জন্ত অনেককে বিনামূল্যে বিতরণ করেন। যু: ১৮২২ সাল হইতে প্রতি বৎসর আর দুই শত টাকার ঔষধ ও পুস্তক বিতরণ করিতেন।.....হোমিও-প্যাথিক পুস্তক বিভাগগর মহাশয়ের লাইব্রেরীতে বেকশ দৃষ্ট হয় একরূপ অপরের পুস্তকালয়ে দৃষ্ট হয় না।"

বিভাগসাগরের এই বহু-প্রশংসিত গ্রন্থাগারটির সম্বন্ধে বেশ কয়েকটি কাহিনী প্রচলিত আছে। এই সব কাহিনীতে বিভাগসাগরী গ্রন্থাগারিক বিভাগসাগরের পরিচয় পাওয়া যায়।

এক সম্রাট ব্যক্তি একদিন বিভাগসাগরের সঙ্গে দেখা করতে এলেন। তাঁর মূল্যবান গ্রন্থসংগ্রহটি দেখে বললেন, এত অর্থ ব্যয় করে বইগুলি রাখিয়েছেন কেন? টাকাগুলি তো ব্যয়ে খরচ হয়ে গেছে। বিভাগসাগর বিন্মিত হলেন। প্রশ্ন করলেন—কেন, এতে কি দোষ হয়েছে? তত্ত্বলোক সহজভাবেই বললেন, যে টাকা খরচ করে বই রাখিয়েছেন, সেই টাকার তো অনেকের উপকার করতে পারতেন।

বিভাগসাগর তখনই তত্ত্বলোকের কথার কোন উত্তর দিলেন না। একথা সে কথার পর জিজ্ঞাস করলেন, আপনার শাল জোড়াটা তো বেশ চমৎকার দেখছি। কত টাকার কিনেছেন?

তত্ত্বলোক উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন, শালের শুণ বর্ণনার পঞ্চমুখ হয়ে উঠলেন। শালজোড়াটা যে ‘পাঁচ-শ’ টাকার কিনেছেন, তাও সগর্বে জানানলেন।

এবার বিভাগসাগরের উত্তর দেবার পালা। তিনি বললেন, সে কি মশায় এত টাকা খরচ করে শাল কিনলেন? পাঁচ সিকার একটা মোটা কথলেই তো বেশ মীত কাটে। ঐ টাকার তো অনেকের উপকার হতো। আমি তো মোটা চাহুর পায়ে দিয়েই থাকি।

তত্ত্বলোক বিভাগসাগরের ইজিতটা বুঝতে পারলেন। সঙ্গে সঙ্গে ঐকি স্বীকার করে নিলেন।

লাইব্রেরী থাকলেই বহুবাহুবেরা পড়বার ক্ষেত্রে বই নিয়ে বাবে—পড়া হলেই কেবল দিয়ে বাবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে। এটাই স্বাভাবিক রীতি। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় বই আর কেবল আসে না। এমনি করেই ব্যক্তিগত

সংগ্রহের অনেক মূল্যবান বই-ই হত্যাভ্যস্ত হয়ে যায়। এই প্রসঙ্গে বিভাগসাগরের একটি স্মিত অভিজ্ঞতার কাহিনী বলা থাক।

বিভাগসাগরের এক বন্ধু একদিন তাঁর গ্রন্থাগার থেকে একটা মূল্যবান গ্রন্থ নিয়ে যান, অবশেষে মজাই কেবল যেবেন এই কথা বলে। কিন্তু বেশ কিছু দিন বাবার পর বিভাগসাগর বইটাই কখনো তাঁকে প্রদান করিয়ে দেন—বইটা কেবল দিতে অস্বরোধ করেন। বইটার কথা শোনাযাত্র তত্ত্বলোক সহজভাবেই উত্তর দেন, সে কি কথা ও বইটা তো কেবল দিয়ে গেছি।

বিভাগসাগর অবাক হলেন। তাঁর একটা মূল্যবান বই হাতছাড়া হয়ে গেল। বইজন্তু গ্রন্থ বিভাগসাগর ব্যবিত হলেন।

বিভাগসাগর ভাগ্যবান, তাই বইখানা তিনি কিনে পেলেন। কিন্তু কেমন করে বইটা পেলেন, সেও এক কাহিনী।

বিভাগসাগরের বিশেষ পরিচিত এক পুরাতন পুস্তক বিক্রেতা একদিন তাঁর বাড়ীতে উপস্থিত। হাতে একটা দামী বাঁধানো বই। বিক্রি করতে এসেছে সে বিভাগসাগরের কাছে।

বইখানা দেখাযাত্র বিভাগসাগর চমকে উঠলেন, বললেন আরে এই বইতো আমার, কোথায় গেলে তুমি? প্রশ্নের উত্তরে পুস্তক বিক্রেতা বা বললো, তা হলো এই—যে বন্ধু তাঁর কাছ থেকে বইটা পড়তে নিয়ে গিয়েছিল সেই তাকে পুরাতন বইয়ের দানে বিক্রি করে দিয়েছিল।

বন্ধুর এই হীন ব্যবহারে বিভাগসাগর তত্ত্বিত হলেন। সেই মুহূর্তেই বইটা তাঁর কাছ থেকে কিনে নিলেন।

বিভাগসাগরের মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁর এই প্রাণময় স্মরণ বহুমূল্য গ্রন্থাগারটি লালগোলাপ রাকার নিকট বন্ধক দেওয়া হয়। ১৯১৪ সালে এই বিভাগসাগরী রাকার বন্ধকী পত্রটি রেজেষ্ট্রি করে গ্রন্থাগারটিকে বন্ধীর সাহিত্য পরিবদে দান করেন।

এই গ্রন্থাগারে রক্ষিত বাংলা, সংস্কৃত ও হিন্দী পুস্তকের মুদ্রিত তালিকার পাঁচ শতেরও অধিক গ্রন্থ আছে। বলা বাহুল্য এই সংগ্রহটিতে সমাজ, সাহিত্য, ইতিহাস, দর্শন, ভূগোল ধর্ম, ভাষা, কবি, জীবন কাহিনী, জাতিতত্ত্ব প্রভৃতি বহু বিষয়ের বই তো আছেই—এমন কি, কয়েকটি অতি ক্ষুদ্র পুস্তিকাও স্থান লাভ করেছে। যেমন—জোন্সন পাইলট কোম্পানীর অর্জটান পত্র, পৃ. 31, ভাষাকের উপর দাভল হওয়া বিহিত কিনা (1862), পৃ. 17, স্কুল বুক সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত দ্বাষাপাত 1862,

পৃ. 19 এবং পৌরীক গ্রন্থাগার 1857, পৃ. 29। ক্ষুদ্র পুস্তিকাগুলিও বিভাগাগরের কাছে গ্রন্থাগারে রক্ষণযোগ্য ছিল। সংস্কৃত ও হিন্দী গ্রন্থ-সংগ্রহে বহু মূল্যবান গ্রন্থ আছে, তাদের মধ্যে অনেকগুলি দুপ্রাপ্য ও দুর্লভ। কোনক্রক সম্পাদিত অমর কোষ (1808) এবং গোতকটুকায়কৃত সংস্কৃত সাহিত্যে পানিনির স্থান (বাণিন সংস্করণ) গ্রন্থ দুটির নাম দৃষ্টান্তস্বরূপ উল্লেখ করা যেতে পারে। বিভাগাগর সংগ্রহের অত্যন্ত গ্রন্থের তালিকা আজও মুদ্রিত হয় নি।

“দেশের এই মনকে বাহুর করা কোনমতেই পরের ভাষার সম্ভবপর নহে। আমরা লাভ করিব, কিন্তু সে লাভ আমাদের ভাষাকে পূর্ণ করিবে না; আমরা চিন্তা করিব, কিন্তু সে চিন্তার বাহিরে আমাদের ভাষা পড়িয়া থাকিবে; আমাদের মন বাড়িয়া চলিবে, সঙ্গে সঙ্গে আমাদের ভাষা বাড়িতে থাকিবে না—সমস্ত শিকাকে অকৃতার্থ করিবার এমন উপায় আর কি হইতে পারে।

তার বল হইয়াছে, উচ্চ অঙ্গের শিক্ষা যদি-বা আমরা পাই, উচ্চ-অঙ্গের চিন্তা আমরা করি না। কারণ, চিন্তার বাহ্যিক বাহন আমাদের ভাষা। বিভাগয়ের বাহিরে আসিয়া পোশাকী ভাষাটা আমরা ছাড়িয়া কেলি, সেই সঙ্গে তার পকেটে বা কিছু সন্ধান থাকে তা আলনার কোলানো থাকে; তার পরে আমাদের চিরদিনের আটপোরে ভাষার আমরা গল্প করি, শুজব করি, রাজা-উজির বারি, তর্জনা করি, চুরি করি এবং ধবরের কাগজে অশ্রাব্য কাপুরুষতার বিস্তার করিয়া থাকি। এসক্লেও আমাদের দেশে বাংলার সাহিত্যের উন্নতি হইতেছে না এমন কথা বলি না, কিন্তু এই সাহিত্যে উপবাসের লক্ষণ যথেষ্ট বেধিতে পাই।

সকলেই জানেন, আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে তৈরি। ঐ বিভাগটি পরীক্ষার পাশ করা ডিগ্রীধারীদের নামের উপর মার্ক দাখিবার একটা বক্তৃৎসোহের শিলমোহর। যাহাকে তৈরি করা নয়, যাহাকে চিত্রিত করা তার কাজ। যাহাকে হাটের মাল করিয়া তার বাজার-দর দাখিয়া দিয়া ব্যবসায়িক সহায়তা সে করিয়াছে।”

## প্রজনন নিয়ন্ত্রণ

অরুণকুমার রায়চৌধুরী\*

‘জন্ম নিয়ন্ত্রণ’ কথাটির মত ‘প্রজনন নিয়ন্ত্রণ’ কথাটি ভুলে আসা এখনও অত্যন্ত হই নি। জন্ম নিয়ন্ত্রণের পরবর্তী ধাপ হচ্ছে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ। জন্ম নিয়ন্ত্রণের প্রচলিত পদ্ধতি অবলম্বন করে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা সীমিত রাখা সম্ভব, কিন্তু সন্তানের লিঙ্গ বা বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব নয়। পরিবারের তাবী সন্তানটি পুত্র না কন্যা হবে, কপী না কালো হবে, লম্বা না বেঁটে হবে, তা কোন দম্পতির ইচ্ছার উপর নির্ভর করে না। সন্তানের লিঙ্গ ও বংশগত বৈশিষ্ট্যের ইচ্ছামত পরিবর্তন বা পরিচালন করাকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণ বলে।

বর্তমান জনবিস্ফোরণের যুগে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি কেউই প্রত্যাশা করেন না, কিন্তু বাঞ্ছিত সন্তানের বৃদ্ধি সকলেই কামনা করেন। কিন্তু সমাজে বিভিন্ন শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত ব্যক্তিদের সন্তানোৎপাদন ক্ষমতার তারতম্যে প্রকৃত সন্তানের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। ধনী, শিক্ষিত ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা জন্ম নিয়ন্ত্রণ পদ্ধতির সাহায্যে পরিবারের সন্তান-সংখ্যা বেধন নিয়ন্ত্রিত করেন, দরিদ্র, অশিক্ষিত ও অবুদ্ধিমান ব্যক্তিরা তেমন করেন না। কলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির সঙ্গে সমাজে অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি হবার সম্ভাবনা থাকে। বুদ্ধ, মহানারী অথবা হুঁতিকে যদি জনসংখ্যা হ্রাস না পায়, তাহলে ভবিষ্যৎ পৃথিবীতে বসবাস করবার জন্তে প্রতিটি ব্যক্তিকে সন্তান উৎপাদন করবার পূর্বে তার প্রজনন মূল্যায়ন করা হবে কি না, তা কে বলতে পারে।

প্রজনন-বিজ্ঞানের লব্ধি জ্ঞানের সাহায্যে গাছ-পালা ও পশু-পক্ষীর প্রজনন উন্নতি করা যদি

সমীচীন বলে গণ্য করা হয়, তাহলে এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করা অসমীচীন বলে গণ্য করা সুক্লিষ্ট হইবে না। প্রজনন-বিজ্ঞানীদের, মতে বাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা বৃদ্ধি ও অবাঞ্ছিত সন্তানের সংখ্যা হ্রাস করাই হবে ভবিষ্যৎ মানব জাতির প্রজনন উন্নতির সহায়ক। অর্থাৎ সমাজে যদি বুদ্ধ ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিরা বেশী সংখ্যক এবং বিকলাঙ্গ, বিকৃতমস্তিষ্ক ও বংশগত রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা কম সংখ্যক সন্তান উৎপাদন করেন, তাহলে কালক্রমে মানব জাতির প্রজনন-চক্র পরিবর্তিত হতে পারে। কিন্তু মানুষের বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যকে চিরতরে বিলুপ্ত করা সময়সাপেক্ষ। সুতরাং জন্ম ও বুদ্ধিমান সন্তান যদি বেশী সংখ্যায় বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে উন্নত জাতির মানুষ সৃষ্টি করবার কাজ দ্রুততরভাবে সম্পন্ন হবে।

কৃত্রিম শুক্র-সন্ধাননের (Artificial insemination) সাহায্যে মানব জাতিকে উন্নত করবার পরিকল্পনা অনেকে করে থাকেন। সমাজে ষাঁড়া শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক দিক দিয়ে উন্নত, তাঁদের স্পার্ম নারীদেহে অঙ্গপ্রক্ষেপ করিয়ে প্রয়োজনীয় শুক্রসম্পন্ন সন্তানের সৃষ্টি করা যেতে পারে। অনির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত স্পার্ম সংরক্ষণ করা সম্ভব হলে, যে কোন পুরুষ তার বৃদ্ধার পরেও যেমন তাবী সন্তানের জনক হতে পারবেন, তেমন যে কোন নারী পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তের কোঠ পুরুষের স্পার্ম ব্যবহার করে কোঠ কন্যোপলিটান পরিবার গঠন করতে পারবেন। তবে এই পরিকল্পনা বাস্তবে

সম্পাদিত করতে বহু সামাজিক, ধর্মীয় ও আইনগত বাধার সম্মুখীন হতে হবে, একথা নিশ্চিতভাবে বলা যেতে পারে।

সম্প্রতি কেবল বিখ্যাত বিজ্ঞানীদের ডক্টর আর. জি. এডওয়ার্ডস ও তাঁর সহকর্মীরা জীলোকের ডিম্বাশয় থেকে ডিম্বাণু বের করে নিয়ে সেটিকে টেস্ট-টিউবে পুরুষের শুক্রাণু সাহায্যে নিষিক্ত করে মানব-জগৎ সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন। এই জগৎ যে কোন জীলোকের জন্মদাতা প্রতিনিধিত্ব করে সন্তানের জন্ম ঘটানো যেতে পারে। নারীদেহের বাইরে জগৎ উৎপাদনের পদ্ধতি বর্ণন উন্নতি লাভ করবে, তখন নির্বাচিত শুক্রাণু ও ডিম্বাণু মিলন ঘটবে সন্তানের লিঙ্গ, আকৃতি, প্রকৃতি ও বুদ্ধি-বৃত্তিকে নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হবে। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, এই পদ্ধতির সাহায্যে নানাবিধ বংশগত ব্যাধির আবির্ভাব রোধ করা যেতে পারে। উদাহরণস্বরূপ তাঁরা উল্লেখ করেছেন যে, বংশগত হিমোফিলিয়া (রক্ত জমাট না বাঁধবার রোগ) রোগগ্রস্ত পুরুষের সব কন্যা হিমোফিলিয়া রোগের প্রাথমিক বাহক হয়ে জন্মগ্রহণ করে এবং তাদের অর্ধেক সংখ্যক পুত্রসন্তানের ঐ রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা থাকে। কিন্তু বাহক জীলোকেরা যদি পুং-জগৎকে গর্ভে ধারণ না করেন, তাহলে তাঁরা রোগাক্রান্ত পুত্রসন্তানের সন্তান হবার আশঙ্কা থেকে মুক্ত থাকতে পারবেন। বিজ্ঞানের কিটোলজি শাখার উন্নতি হলে জগৎ জন্মগত বিকৃতি বা রোগের বীজকে নিরূপণ করা সহজ হবে। জগৎ কোবে মানুষের সাতাষিক কোমো-সোম সংখ্যা 46টির পরিবর্তে যদি 47টি দেখা যায়, তাহলে সেই জগৎ থেকে জড়বুদ্ধি সন্তানের জন্ম হবার সম্ভাবনা থাকে। এরূপ ক্ষেত্রে জগৎ কোমোলিটি কন্ট্রোল করা অবশ্যকীয় হয়ে পড়বে। কোন জগৎ কোমোসোম ক্রিয়াকলাপ অস্তিত্ব যদি ধরা পড়ে, তাহলে তাঁকে পৃথিবীতে আনবার হাড়পন সেওয়া হবে না।

টেক্সট-টিউব মানব সন্তান সৃষ্টিতে সম্ভব হলে যে কোন সম্প্রতি যেমন ইচ্ছামত পুত্র বা কন্যা সন্তান লাভ করবেন, অনেক বড়ো নারীও তেমনি অপত্য লাভের সুযোগ পাবেন। সন্তানের প্রকৃত সন্তান না হলেও অনেক জীলোক গর্ভ-ধারিণী সন্তান হবার গৌরব অর্জন করবেন। নার্সারি দোকান থেকে বিভিন্ন জাতের ফুলের বীজ কেনবার মত অল্প তবিততে যে কোন জীলোক দু-চার দিন বরষের বিভিন্ন গুণের সেবেল-আটা মানব-জগৎ কিনে নিজের ইচ্ছামত সন্তান বংশ উৎপাদন করতে সক্ষম হবেন। তখন হয়তো ঘরের কাগজে 'Own your own flat'-এর মত 'Own your own child'-এর বিজ্ঞাপন দেখা যাবে। অল্পদান করা যেতে পারে, তখন হয়তো দেশের প্রজননতত্ত্ববিদদের একটি বোর্ড গঠন করা হবে, তাদের কাছে প্রতি পরিবারের বংশলতিকা থাকবে এবং তাঁরাই তিথিতে পুরুষের শুক্রাণু ও জীলোকের ডিম্বাণু নির্বাচন করে মানব-জগৎ সৃষ্টি করা হবে। এইভাবে প্রজনন নিয়ন্ত্রিত হলে মানবজাতির পরিণাম শুভ হবে কি অশুভ হবে, তা বলা শক্ত। নোবেল পুরস্কার বিজয়ী স্যার সি. ডি. হার্ডিন মন্তব্য করেছেন যে, 'যে কেহ লক্ষ লক্ষ অবাঞ্ছিত শিশুর জন্মরোধ করা সম্ভব', সে কেহ টেক্সট-টিউবে কৃত্রিম প্রাণ সৃষ্টি করা দারিদ্রহীনতার পরিচায়ক।

ডক্টর হরগোবিন্দ খোরানার কৃত্রিম ডি-এন-এ আবিষ্কারের পর থেকে প্রজনন নিয়ন্ত্রণের এক নতুন দার খুলে গেছে। এটা আজ বৈজ্ঞানিক ভাবে স্বীকৃত যে, মানুষের বাবড়ীর বংশগত বৈশিষ্ট্যের মূল তার কোষের কেন্দ্রে ডি-এন-এ (ডিঅক্সিরিবো নিউক্লিক অ্যাসিড) নামক জৈব-রাসায়নিক পদার্থে নিহিত থাকে এবং তা শিশু-সন্তান থেকে বংশপরম্পরায় সন্তান-সন্ততির মধ্যে সঞ্চারিত হয়ে থাকে। তার প্রকার নিউক্লিও-টাইডের কৃত্রিম সন্তান শিকলের মত গড়ে ওঠে



ডি-এন-এ-র একটি অধিকার অণু। এর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশকে জিন বলে এবং তারাই বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যকে নিয়ন্ত্রিত করে। ডি-এন-এ অণুর ক্রটি-বিচ্যুতিতে মানবদেহ বংশগত ব্যাধি ও অপ্রীতিকর বৈশিষ্ট্যের আবির্ভাব ঘটে। সুতরাং এই অধিকার অণুর বিভিন্ন অংশের সঙ্গে বিভিন্ন বংশগত বৈশিষ্ট্যের পারস্পরিক সম্বন্ধটা বধন পরিষ্কারভাবে জানা বাবে, তখন তাইরাসের মাধ্যমে এরোজেনীয় কৃত্রিম ডি-এন-এ বাহুরের পরীচেষ্টা দ্বারা তার ক্রটিপূর্ণ ডি-এন-এ-র অংশবিশেষকে সংশোধন করে বংশগত বৈশিষ্ট্যের পরিবর্তন করা সম্ভব হবে। ডি-এন-এ অণুর অংশবিশেষের পরিবর্তন করাকে জেনেটিক সার্জারি এবং সামগ্রিকভাবে নিউক্লিওটাইডের সম্ভাব্যতার বদল করাকে জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং বলে। এই পদ্ধতির উন্নতি ঘটলে বাহুরের বংশগত ব্যাধির মূলকে চিরন্তনে উৎপাদন করা ছাড়া ও অর্ডার-মাসিক বংশগত বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি করা সম্ভব হবে।

বোন-প্রক্রিয়া ব্যতিরেকে কাটিং বা কলম তৈরি করে একটা গাছ থেকে যেমন অঙ্কুরণ অনেক গাছ সৃষ্টি করা যায়, তেমনই অঙ্গুর তথ্যভিত্তিক বাহুরের দেহকোষের নিউক্লিয়াস অঙ্গ কোষে প্রতিস্থাপন করে একই ধরনের অসংখ্য বাহুর সৃষ্টি করা বাবে বলে অনেক আশা করেন। এই পদ্ধতিকে ক্লোনিং বলে। গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, ব্যাঙাটির দেহকোষ থেকে নিউক্লিয়াস বের করে নিয়ে নিউক্লিয়াসবিহীন আর একটি ব্যাঙাটির কোষে যদি প্রতিস্থাপন করা যায়, তাহলে কোষের বিভাজন শুরু হতে থাকে এবং কালক্রমে এক নতুন ব্যাঙাটির দেহ ধারণ করে। এই নতুন ব্যাঙাটি গঠনে, প্রকৃতিতে ও অঙ্গভূতিতে প্রথম ব্যাঙাটির দ্বিতীয় সংকরণ বলা যেতে পারে। এই ক্লোনিং পদ্ধতি বধন উন্নতি লাভ করবে, তখন বাহুরের দেহকোষের বহাচিত্রিত নিউক্লিয়াস একটি ভিত্তিকোষে বসিয়ে এবং সেটিকে স্ট্রোমারের জরায়ুতে প্রতিস্থাপন করে যে সন্তান সৃষ্টি করা হবে, তার আকৃতি, প্রকৃতি প্রকৃতি প্রত্যেক ব্যক্তির অঙ্কুরণ হবে। এভাবে যে অসংখ্য

বহু সন্তানের সৃষ্টি হবে, তাদের চেহারা একে অঙ্কুর অধিকল অঙ্কুরণ হবে।

যাঁরা অসংখ্য বহু সন্তান সৃষ্টি করার কথা চিন্তা করেন, তাঁরা বলেন যে, ডি-এন-এ অণুর নিউক্লিওটাইডের সম্ভাব্যতাকে ইচ্ছাযত নিয়ন্ত্রণ করা অপেক্ষা ক্লোনিং পদ্ধতিতে সহজে ও দ্রুতভাবে বাহিত সন্তান উৎপাদন করা সম্ভব। তাছাড়া তাঁরা বলেন যে, জগতে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের সংখ্যা বিরল। হাজার হাজার জিনের এক বিশেষ সম্মেলনের ফলে প্রতিভাবান ব্যক্তিদের আবির্ভাব ঘটে। বর্তমান পর্যন্ত তাঁদের জিন সমষ্টির সম্বন্ধ না জানা যাচ্ছে, ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃতির উপর নির্ভর না করে ক্লোনিং পদ্ধতির সাহায্যে অঙ্কুরণ প্রতিভাবানদের সংখ্যা সহজে বৃদ্ধি করা যেতে পারে। তখন হয়তো হাজার নিউটন, আইনস্টাইন, মেক্সগীয়ার, রবীন্দ্রনাথ, বোজাট, বিঠোকেন সৃষ্টি করা অসম্ভব হবে না। তখন কোন দেশে যেন জেনের সমস্ত আর থাকবে না। ধোঁরাবা, চন্দ্রশেখর ও নারসিংকারের সঙ্গে আশাদের আর আশাশ্রয় করতে হবে না। কিন্তু দেবতা গড়তে গিয়ে অসংখ্য দানব যে সৃষ্টি করা হবে না, তার নিশ্চয়তা কে দেবে?

মানবজাতির উন্নতিতে কোন বৈশিষ্ট্যগুলি বাহিত এবং কোনগুলি অবাহিত, তা বিতর্কিত। যে বৈশিষ্ট্য আজ বাহিত বলে স্বীকৃত, আগামীকাল তা বাহিত বলে গণ্য নাও হতে পারে। তাছাড়া বাহুরের বাহিত বৈশিষ্ট্য (যেমন—বুদ্ধিবৃত্তি) কতটা বংশগত এবং কতটা পরিবেশগত প্রভাবের উপর নির্ভর করে, সে সম্বন্ধে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ আছে। বংশাঙ্কুরণ ও পরিবেশের সমষ্টিগত প্রভাবে মানব-বৈশিষ্ট্য গঠিত হয়। শুধু যদি বংশাঙ্কুরণকে উন্নত করে পরিবেশের কোন পরিবর্তন না করা হয়, তাহলে মানবজাতি উন্নতির পথে অগ্রসর হবে কি না সন্দেহ। তবে তথ্যসম্মত সমাজে, বাহুর যে বৈশিষ্ট্যকে বেশী মর্যাদা দেবে, প্রকৃতি নিয়ন্ত্রণ করে সেই বৈশিষ্ট্যের বেশী সংখ্যক সন্তান সৃষ্টি করা হবে। সুতরাং এটা আশা করা যৌথ হয় খুব বাড়াবাড়ি হবে না যে, অঙ্গুর তথ্যভিত্তিক বাহুর নিজেই নিজের বিবর্তনধারাকে নিয়ন্ত্রণ করবে।



# ভারতের কন্দ ও খাদ্য হিসাবে তাদের ব্যবহার

বলাইচাঁদ কুণ্ডু \*

জমাগত লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কালে খাদ্য-সমস্যার যে ভয়াবহ রূপ দেখা যাচ্ছে, তাতে সকলেই বিশেষ উদ্বিগ্ন হচ্ছেন। ধান, গম, জুট। প্রভৃতি শস্তের অধিকতর ফলনকে ঘেঁষে যে চেষ্টা চলছে, তা অনেকটা সকল হয়েছে। কিন্তু লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কালে মাথাপিছু খাদ্যশস্ত্রের পরিমাণ প্রায় আগের মতই রয়ে গেছে, অর্থাৎ শস্ত্রের উৎপাদন কিছু বৃদ্ধি হলেও সাধারণ লোকের খাদ্যভাব পূরণ হচ্ছে না। খাদ্যের জন্তে সাধারণতঃ আমরা ধান, গম, জুট। প্রভৃতি শস্ত্রের উপর নির্ভর করি। কিন্তু বট, ধর ও কীট-পতঙ্গের আক্রমণের কালে শস্ত্রহানি হলে দুর্ভিক্ষ বা সেই রকম অবস্থার উদ্ভব হয়। সেই সময় দরিদ্র জনগণ মহার্ঘতা, তথা অপ্রচলিততার জন্তে এই সব শস্ত্রের উপর সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করতে পারে না। দেখা গেছে, তখন তারা সহজলভ্য কন্দমূলজাতীয় খাদ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভর করে।

‘চলজিকা’র কন্দ শব্দের অর্থ: ফলাকার উদ্ভিদমূল, tuber, (যথা—আলু, কচু)। আলু, কচু ব্যতীত আরো অনেক প্রকার কন্দ আছে, যেমন—লাল আলু, শিমুল আলু, ওল ইত্যাদি এবং এগুলি সবই মূল নয়, কতকগুলি যেমন—আলু, কচু, ওল আদ্য, শীত প্রভৃতি কাণ্ডের পরিবর্তিত আকার বিশেষ। কিন্তু লাল আলু, শিমুল আলু, শাঁখ আলু প্রভৃতি মূলস্বরূপে রূপান্তর। খাদ্য সঞ্চিত হবার কালে ক্ষীভাকার ব্যক্তিকানিরোগ মূল বা কাণ্ডকে বাংলা ভাষায় কন্দ বলা হয়।

ভারতের প্রায় সকলে এই সব কন্দজাতীয় অনেক প্রকার ফলন যতঃই উৎপন্ন হয়ে থাকে। অবশ্য কোন কোন জায়গায় কোন কোন জাতীয় কন্দসের

সাযাভ চাষ করা হয়। তবে খাদ্যজাতীয় শস্ত্র বা বহু ব্যবহৃত আলুর মত এদের ব্যাপক চাষ কোথাও হয় না। দেশের বর্তমান অবস্থায়, বিশেষতঃ ভবিষ্যৎ খাদ্যভাবের দিকে লক্ষ্য রেখে এই সব কন্দজাতীয় কন্দসের চাষের প্রসার ও তাদের উৎকর্ষ সাধনের প্রতি দৃষ্টি দেওয়া একান্ত আবশ্যিক।

ইন্দোনীং পৃথিবীর উন্নতিকামী দেশসমূহে বিভিন্ন জাতের কন্দ সম্বন্ধে বহুটি আগ্রহ দেখা যাচ্ছে। 1967 সালে ওরেন্ট ইন্ডিজের ট্রিনিডাড সহরে এই সম্বন্ধে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। সেখানে ভারতীয় কন্দ সম্বন্ধে প্রবন্ধ প্রেরণের জন্তে অগ্রদূত হয়ে লেখক ভারতের বিভিন্ন স্থানে যে সব কন্দজাতীয় কন্দ জন্মায়, সেগুলি পর্ববেক্ষণ করে অনেক তথ্য লিপিবদ্ধ করেছিলেন (Edible rhizomatous and tuberous crops of India (other than potato)—Proceedings International Symposium on Tropical Root . Crops. Trinidad, 1967)। দেখা গেছে যে, সেখানে প্রচলিত অধিকাংশ কন্দ আবার দেশজ কন্দের তুলনায় পৃথক।

দক্ষিণ আমেরিকা, উত্তর আমেরিকা, মালয় প্রভৃতি দেশ থেকে বহুদিন আগে এই সব কন্দ এদেশে আসা হয়েছিল এবং সেগুলি এখন এদেশে সর্বত্র স্বতঃই উৎপন্ন হচ্ছে বা কোন কোন স্থানে চাষও হচ্ছে।

\* বঙ্গ বিজ্ঞান মন্ডির, 93/1, আচার্য প্রহ্লাদজি রোড, কলিকাতা-৭

‘ভারতের বাত্ৰ-সম্ভারি সম্ভাবন সম্বন্ধে কয়েকটি কথা’ শীর্ষক প্রবন্ধে (জান ও বিজ্ঞান, April, 1969) লেখক তিন প্রকার কন্দমূলের উপযোগিতার বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছিলেন। বর্তমান প্রবন্ধে এই জাতীয় কতকগুলি কসলের সংক্ষিপ্ত বিবরণ দেওয়া হলো। অবন্ত আলু, বাট, শালগম, গাজর ও মূলা প্রভৃতি যেগুলি সাধারণতঃ খুবই পরিচিত, তা এই তালিকার নৈই। কন্দজাতীয় কসলগুলি পণ্ডিত বা অপেক্ষাকৃত নিরপেক্ষের জমিতে অথবা অস্তান্ত প্রধান কসলের সঙ্গে একই জমিতে চাষ করা যেতে পারে।

ক্যাসাভা অথবা ট্যাপিওকা বা শিমূল আলু (*Manihot esculenta* Crantz)—এটি ভারত জাতীয় দক্ষিণ আমেরিকার এক প্রকার বোপ-জাতীয় গাছ। এর মূলগুলি শুষ্কাকারে থাকে এবং লাল আলুর মত লম্বা ও মোটা হয়। এদের পাতা অনেকটা শিমূল গাছের পাতার মত বলে অনেক জায়গায় একে শিমূল আলু বলা হয়। বহুদিন আগে পটুগীজদের দ্বারা এটা ব্রিজিল থেকে দক্ষিণ ভারতে আনীত হয়েছিল। ভারতবর্ষে এই আলু প্রধানতঃ কেরালা ও মাদ্রাজ প্রদেশে প্রায় 500,000 একর জমিতে চাষ হয়। আলু হাড়ী অস্তান্ত কন্দজাতীয় কসলের মধ্যে গুরুত্ব হিসাবে এর স্থান দ্বিতীয়, লাল আলু প্রথম।

দ্বিতীয় মহাবুদ্ধের সময় যখন বর্মাদেশ থেকে চাউলের আমদানী বন্ধ হয়ে যায়, তখন বাত্ৰ হিসাবে ক্যাসাভার গুরুত্ব খুবই বৃদ্ধি পায় এবং মাদ্রাজ ও কেরালা ব্যতীত অস্তান্ত দেশেও এর চাষের চেষ্টা হয়। সেই সময় ছাঁতকে যখন বাংলা দেশের সহস্র সহস্র লোক অস্বাভাব্যে মৃত্যুবরণ করছিল, তখন কেরালার বাত্ৰের অবস্থা অধিকতর শোচনীয় হলেও ক্যাসাভার জন্মে বাত্ৰাতাবে সেখানে মৃত্যুর সংখ্যা খুবই কম হয়েছিল।

এই আলুতে Hydrocyanic acid আছে। একত্রে খাবার পূর্বে জলে ভাল করে ধুয়ে নিতে

হয়। এতে প্রোটিনের অংশ খুবই কম। একত্রে কেরালা প্রদেশে, বেবানে প্রচুর সাহুয়িক বাহ পাওয়া যায়, সেখানকার দরিদ্র লোকেরা তৎ বাত্ৰের সঙ্গে এগুলি বেয়ে থাকেন। এতে তাঁদের বাত্ৰমূলের সমতা রক্ষিত হয়। বর্তমানে অধিক প্রোটিনযুক্ত শিমূল আলু উৎপাদনের চেষ্টা চলছে।

মহীশূরে অবস্থিত কেন্দ্রীয় বাত্ৰ গবেষণাগারে কয়েক বছর ধরে চেষ্টা করে 60 ভাগ ক্যাসাভা চূর্ণ, 15 ভাগ চীনাবাদ্যের ঝেল চূর্ণ ও 25 ভাগ গমজাত মুজি মিশিয়ে এক প্রকার পুষ্টিকর বাত্ৰ (ট্যাপিওকা ব্যাকারোনি) তৈরি করা হয়েছে। এই বাত্ৰ প্রকৃতিজাত চাউল অপেক্ষা অধিকতর পুষ্টিকর এবং এতে অধিক পরিমাণে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন আছে।

ধান বা গম যে সব জমিতে চাষ করা যাবে না, সেই সব অরুহর জমিতে অবিমিশ্র কসল হিসাবে অথবা কলা বা লাল আলুর সঙ্গে একই জমিতে শিমূল আলুর চাষ করা যেতে পারে। ব্রিজিলে উচ্চ জমির ধানের সঙ্গে একই জমিতে এর চাষ হয়। ধান কেটে নেবার কিছুদিন পরে আলুগুলি তোলা হয়। এই আলুর কলন সাধারণতঃ বেশ ভালই হয়। সাধারণতঃ একর-প্রতি 3 থেকে 12 টন পর্যন্ত মূল পাওয়া যায়। কেরালার কোন কোন স্থানে 20-22 টন পর্যন্ত মূল উৎপন্ন হয়।

লাল আলু (*Ipomoea batatas*)—আলু ব্যতীত অস্তান্ত কন্দমূলের মধ্যে লাল আলুই প্রধান। এটা কল্মি শাকের মত এক প্রকার লতানে গাছ। এর প্রধান কাণ্ডের নিরতাগে মাটির নীচে যে সব শিকড় উৎপন্ন হয়, তাদের অধিকাংশ লম্বাকৃতির কন্দমূলরূপে শুষ্কাকারে থাকে। লতানে কাণ্ডের গাঁট থেকে যে সব আনানিক মূল বের হয়, সেগুলিও স্বীত হয়ে কন্দাকৃতি

ধারণ করে। ভারতে প্রায় চার লক্ষ একর জমিতে লাল আলুর চাষ হয় এবং 13 লক্ষ টন আলু উৎপাদিত হয়। পশ্চিম বঙ্গে যাত্র 6000 একর জমিতে এই আলুর চাষ হয়।

পটুগীজেরা দক্ষিণ আমেরিকা থেকে লাল আলু নিয়ে এসে এদেশে চাষের প্রবর্তন করে। সাধারণতঃ দুটি বিভিন্ন জাতের আলুর চাষ হয়—একটির ছাল লাল, অন্যটির ছাল সাধা। এই উভয় জাতীয় আলুর ভিতরের শাঁস সাধা। কিছুকাল আগে যুক্তরাষ্ট্রে থেকে এক প্রকার উন্নত জাতের লাল আলু এনে এদেশে কোথাও কোথাও চাষ করা হচ্ছে। এগুলির ছাল হালকা বাদামী বা হলুদে রঙের এবং শাঁস হলুদে বা কমলা রঙের। সিদ্ধ করলে বা আগুনে সঁকা হলে এই জাতীয় আলুর শাঁস গাজরের রঙের মত হয়। এগুলি বেতেও খুব সুস্বাদু।

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় যখন দেশে নিদারুণ খাদ্যভাব হয়, তখন অবহেলিত লাল আলুর উপর সরকারের দৃষ্টি পড়ে। কয়েকটি প্রগতিশীল দেশ থেকে অধিকতর কলনশীল আলুর আমদানী করে এদেশের জলহাওয়ার উপযোগী করবার ব্যবস্থা হয়। খাদ্য হিসাবে লাল আলু বখেটে পুষ্টিকর।

লাল আলু কাঁচা কিংবা সিদ্ধ করে, ভেজে বা আগুনে সঁকে খাওয়া যায়। রাঁধা করলে এর মিষ্টত্ব অনেক বেড়ে যায়। এতে বখেটে প্রোটিন ও ভিটামিন থাকে। লাল আলুর শাঁস শুকিয়ে শুঁড়া করে তা ঘরবা বা আটার সঙ্গে মিশিয়ে চাপাটি বা কুটি তৈরি করা যায় এবং বিভিন্ন মিষ্টদ্রব্য প্রস্তুত করতেও তা ব্যবহার করা যেতে পারে।

চীন, জাপান ও আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে খাদ্য হিসাবে লাল আলুর প্রচলন বখেটে আছে। আমাদের মত দরিদ্র দেশে লাল আলুর প্রচলন অনেক বেশী হওয়া আবশ্যিক।

খাম আলু বা চূপড়ি আলু (*Dioscorea spp*)—এটা এক প্রকার একবীজপত্রী লতানে গাছ। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে প্রাদুর্ভাব বা বনে-জঙ্গলে জন্মায়। বহু জাতীয় খাম আলু আছে, তার মধ্যে 7-8টি প্রজাতি খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে, তবে তিনটি প্রজাতির প্রচলন খুবই বেশী। এদের মধ্যে মুলের আরতন ও আকৃতিগত পার্থক্য আছে। কোন কোন প্রজাতিতে একটি যাত্র বড় গোলাকার মূল হয়, আবার কোন কোন প্রজাতিতে লাল আলুর মত লম্বাকৃতির অনেকগুলি গুচ্ছাকার মূল থাকে। যেখানে একটি যাত্র কন্ড জন্মে, সে ক্ষেত্রে কখনো কখনো এক-একটি কন্ড 15-20 কিলোগ্রাম ওজনেরও হয়ে থাকে। উঁচু জমিতে আগা, বেগুন, লাল আলু ও তুটোর সঙ্গে খাম আলুর চাষ করা যেতে পারে। 7-8 মাসের মধ্যে কন্ডগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়।

খাম আলুর খাদ্য অনেকটা গোল আলুর মত এবং এগুলি খুবই পুষ্টিকর। এদের একটা বিশেষ খাদ্য আছে, এজতে অনেক সজী বা তরকারী হিসাবে এগুলি খুব পছন্দ করেন।

ভারতের বিভিন্ন পার্বত্য অঞ্চল ও দণ্ড-কারগেয়ার আদিবাসিনীর প্রাচীনতম অজন্মায় সময় বনে-জঙ্গলে উৎপন্ন খাম আলুর উপর খুবই নির্ভর করে।

খাদ্য ব্যতীত কোন কোন জাতের খাম আলু নানাবিধ প্রয়োজনীয় ওষুধের কাঁচামাল হিসাবে আজকাল প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হচ্ছে।

আর্টিচোক (*Helianthus tuberosus*)—এটা সূর্যমুখীমূলজাতীয় উদ্ভব আমেরিকার এক প্রকার গাছ। মাটির নীচে কাণ্ডের তলদেশে আলুর মত এদের অনেকগুলি কন্ড হয়। ভারতবর্ষে পাহাড়ী অঞ্চলে এদের চাষ হয়। যেখানে অভ্যস্ত কিছু জন্মানো যায় না, সেখানে আর্টিচোক সহজে জন্মানো যেতে পারে। কন্ডগুলি অনেকটা আলুর

যত। তবে এদের চৌকালি খুব কম বড়।  
কাঁচা অথবা সিদ্ধ করে বা তেঁকে এই কন্দ  
খাওয়া যায়।

খাদ্য হিসাবে আর্টিচোক আলুর মত  
উপকারী। যদিও পাহাড়ী অঞ্চলে এরা কমায়,  
তথাপি চেষ্টা করলে সমস্ত ভূমিতে এদের জন্মানো  
যেতে পারে। যদি ভালভাবে তৈরি করে  
ঠিক আলুর মত একটি পুষ্টি আর্টিচোক অথবা  
2-1টি চৌকালিষ্ট টুকরা পাহাড়ী অঞ্চলে কেত-  
রারী থেকে এপ্রিল মাসের মধ্যে বা সমস্ত ভূমিতে  
আরো কিছু পরে লাগাতে হয়। গোড়ার দিকে  
সেচের ব্যবস্থা একান্ত আবশ্যিক। চার থেকে  
সাত মাসের মধ্যে কন্দগুলি পরিণতি লাভ করে  
এবং একর প্রতি পাঁচ থেকে দশ টন ফলন হয়।

কচু (*Colocasia esculentus*)—এরা Ara-  
ceae গোত্রের *Colocasia* জাতের অন্তর্গত এক  
প্রকার একবীজপত্রী উদ্ভিদ। *Colocasia* জাতের  
13-14টি প্রজাতি আছে। ভারতে কিত্তি মাত্র  
5-6টি পাওয়া যায়। এদের মধ্যে *C. escu-*  
*lentus*-এর চাষ ভারতের প্রায় সর্বত্রই  
অল্প পরিমাণে হয়। এর আবার নানাবিধ  
রকমের (Variety) আছে। কন্দগুলির আকৃতি  
নানা প্রকারের হয়ে থাকে। পাতার আকৃতিতেও  
কিছু কিছু পার্থক্য থাকে। সাধারণতঃ কন্দের  
আকার বা আঁদের সঙ্গে সাধারণতঃ যেনে এদের  
নানাবিধ প্রচলিত নাম হয়েছেঃ বেনন—মুচী  
কচু, ঘট কচু, ভোট কচু, জল কচু, বাঁধন কচু,  
সর কচু, শোলা কচু ইত্যাদি। এই সব কচুর  
পাতাও সজী হিসাবে বর্ষে ব্যবহৃত হয়।

খাদ্য হিসাবে কচু আলুর মত ব্যবহৃত হতে  
পারে। আলু অপেক্ষা এগুলি অধিকতর পুষ্টিকর,  
কার্বন এতে প্রোটিনের অংশ অনেক বেশী  
থাকে। তাছাড়া এতে ক্যালসিয়াম ও কন্-  
করাস বর্ষে পরিমাণে থাকে। তরকারী হাফা

এগুলি স্ট্রেকে বা অল্প পুষ্টিতে চাটুর্নী সহযোগে  
যেতে খুঁই সুবরোচক। পাতাও, উত্তর প্রদেশ ও  
বিহারের লোকেরা এভাবে এগুলি খুব খেয়ে থাকে।  
অল্প অনেক প্রকার খাদ্য তৈরি করাও সম্ভব।  
লেখক সুকুমারের হাওয়াই দ্বীপের আদিব অধি-  
বাসীগণ কর্তৃক বিভিন্ন প্রকার কচু থেকে নানাবিধ  
সুবরোচক খাদ্য প্রস্তুত করতে দেখেছেন। একটু  
রকমের করে সেই সব খাদ্য আঁদের বেনের  
লোকের খাদ্যোপযোগী করা যেতে পারে।

মানকচু (*Alocasia spp*)—এরা কচুজাতীয়  
এবং *Alocasia* জাতের অন্তর্গত একবীজপত্রী  
উদ্ভিদ। এশিয়া মহাদেশে প্রায় 60 রকমের  
*Alocasia*-এর প্রজাতি পাওয়া যায়।  
এদের মধ্যে *A. cucullata* Schott,  
*A. indica* (Roxb) Schott এবং *A. macrorr-*  
*hiza* Schott—এই তিনটি প্রজাতির চাষ সাধা-  
রণতঃ হয়ে থাকে। এদের কন্দগুলি লম্বাটে  
ও বাঁকা হয়ে থাকে—এক-একটির ওজন  
1 কিলো থেকে 10 কিলো বা ততোধিক  
হয়ে থাকে। কচুগুলি দেখতে প্রায় এক  
রকম এবং বিভিন্ন প্রজাতির হলেও সবগুলিকেই  
মানকচু বলা হয়। এদের মধ্যে আবার *A.*  
*indica*-র চাষ সবচেয়ে বেশী হয়। এদের  
কন্দগুলি 30 থেকে 60 সেন্টিমিটার বা কখনও  
আরও বেশী লম্বা হয় এবং ব্যাস 10 থেকে 20  
সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয়ে থাকে। ভারতের অনেক  
অংশে, বিশেষতঃ আসাম ও বাংলা দেশে এর  
চাষ অল্প পরিমাণে হয়।

সাধারণতঃ সজী বা তরকারী হিসাবে এগুলি  
ব্যবহৃত হলেও এথেকে বিভিন্ন খেতসার  
তৈরি হতে পারে। মানকচুর ময়লা হালুকা ও  
পুষ্টিকর এবং রোগীর পথ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে  
পারে।

40-50 বছর আগে আমরা গ্রাম্যকণে  
অত্যন্ত পুষ্টিবহু বাগির আকৃতির কোন বা

কোন প্রকারের মানকচু লাগাতে দেখেছি। পাঁচ বছর আগে বর্তমান পর্যবেক্ষণের (Survey) সময় সেই সব প্রাচীর গিয়ে মানকচুর গাছ আর তেমন দেখতে পাই নি। অথচ পুষ্টিকর তরকারী হিসাবে মানকচু এখনও সমানভাবেই আদৃত। এই গাছ লাগানো খুব সহজ।

মানকচু (*Xanthosoma sagittifolium*)—এই প্রকার কচু কোন কোন স্থানে দেখতে পাওয়া যায়। এর উৎপত্তি স্থল দক্ষিণ আমেরিকার উষ্ণ অঞ্চলসমূহে। কলিমাইন ও হালয়ে এদের চাষ হয়। এই কচু অনেকটা মানকচুর মত, তবে এতে আরো ছিদ্রা থাকে না। একত্রে সিদ্ধ করলে খুব যোগায়েন ও খেতে খুব সুস্বাদু হয়।

ওল—ওল কচুর মত *Araceae* গোত্রের *Amorphophallus* জাতের এক প্রকার উদ্ভিদ। *Amorphophallus* জাতের প্রায় 90টি প্রজাতি আছে, তার মধ্যে 14টি ভারতে পাওয়া যায়। এগুলি এখানে-ওখানে, বনে-জঙ্গলে জন্মে এবং সবগুলির প্রায় একই রকমের কন্দ হয়। এর মধ্যে *Amorphophallus campulatus blume*—এই প্রজাতিটির কন্দ খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। বাকীগুলিকে বুনো ওল বলা হয়। এগুলি বিষাক্ত ও অস্বাদু। ওল সাধারণতঃ অর্ধগোলাকার হয়, তবে কখনো কখনো কিছুটা লম্বাকৃতিরও হয়ে থাকে। এদের ওজন এক থেকে দুই কিলো পর্যন্ত হয়। বোম্বাই, পুনা প্রভৃতি অঞ্চলে 4 থেকে 20 কিলোগ্রাম ওজনের ওল দেখতে পাওয়া যায়।

ওলের চাষ খুব সহজেই হয়। হাঙ্গা জমিতে বৈশাখ-চৈত্রি মাসে একবার ওল লাগালে আর বিশেষ কোন যত্নের আবশ্যক হয় না। 10 থেকে 12 মাসের মধ্যে সেগুলি পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। কলকাতার কাছে

সাঁতলাগাছি ও নিকটবর্তী অঞ্চল এবং বসির-হাটের চাষীরা ওল জাতের ওল চাষ করে বরোঁ লাভবান হয়ে থাকে।

ওলের একটি বিশেষ বাদ আছে। সে জন্মে ওলসিদ্ধ অনেকেরই খুব প্রিয়। আগুর মত তরকারী বা চাইনী করেও ওল খাওয়া যায়।

শাঁখ আলু (*Pachyrhizus erosus*)—শাঁখ আলু এক প্রকার শীত জাতীয় লতানে গাছ। এর আদি নিবাস মেক্সিকো ও দক্ষিণ আমেরিকার অত্রান্ত উষ্ণপ্রধান দেশে। ভারতের অনেক অঞ্চলেই সুস্বাদু কন্দগুলির জন্মে শাঁখ আলুর চাষ কিছু কিছু হয়। তবে থেকে শাঁখ আলুর চাষ আমাধের দেশে হচ্ছে, তা ঠিক জানা নেই। তবে অনেক দিন থেকে যে এর ব্যবহার আমাধের দেশে হচ্ছে, তার প্রমাণ এই যে—প্রাচীনপন্থী নিষ্ঠাবর্তী হিন্দু মহিলারা পূজা-পার্বণে সাধারণতঃ তথাকথিত বিলাতী জিনিষ বর্জন করলেও শাঁখ আলু বিভিন্ন পূজার ব্যবহার করেন।

কন্দগুলির রং সাদা, আকৃতি গোল বা লম্বাটে ধরণের। এক-একটির ওজন সাধারণতঃ 200 গ্রাম থেকে এক কিলোগ্রাম পর্যন্ত হয়ে থাকে। তারমণ্ডহারবারের নিকটবর্তী হুইগ্লেস হাটে আমি অনেক দিন আগে খুব বড় শাঁখ আলু (40×20 সেন্টিমিটার) দেখেছিলাম—এক-একটির ওজন 5 থেকে 10 কিলোগ্রাম পর্যন্ত ছিল। তারপর বহু আরগাব ঘুরেও এত বড় শাঁখ আলু আর কখনও দেখি নি।

সাধারণতঃ দোআঁশ হাঙ্গা জমিতে বীজ থেকে শাঁখ আলুর চাষ হয়। একপ্রতি 18-20 কিলো বীজ লাগে। জুন-জুলাই মাসে মাটি ভালভাবে ঠেকরি করে 30-40 সেন্টিমিটার পর পর সারিতে বীজ লাগাতে হয়। দুই সারির মধ্যে ব্যয়ধান 60-70 সেন্টিমিটার বাকি দরকার। 6-7 মাসের মধ্যে আলুগুলি

পরিণত অবস্থায় উপনীত হয়। ভাল আলুর কলনের জন্মে মধ্যে মধ্যে গাছের ডালপালা হেঁটে দিতে হয়। একরপ্রতি কলনের পরিমাণ 3000 থেকে 4000 কিলোগ্রাম। ইকোনেদিয়া ও কিলিপাইন দীপে কলন অনেক বেশী—প্রতি হেক্টরে প্রায় 90-25 টন পাওয়া যায়।

শাঁস আলু কাঁচা খাওয়া যায় এবং অভ্যস্ত সুস্বাদু ও স্নিগ্ধকর। এতে খেতসার, বিভিন্ন শর্করা, প্রোটিন, তৈল, নানাধর্ম বনিক পদার্থ ও নানাপ্রকার ভিটামিন যথেষ্ট পরিমাণে থাকে। এছাড়া খাদ্য হিসাবে এটি খুবই পুষ্টিকর; অথচ হৃদয়ের বিপর্যয় এই যে, আবারের বেশে এই সুস্বাদু কন্দুলের সমন্বিত স্বাদবর্জিত হয় নি।

কেতুর (*Scirpus keysoor*)—এটি সুখা জাতীয় উদ্ভিদ। সাধারণত: ভিজা জমিতে বা জলের ধারে এগুলি জন্মায়। প্রত্যেকটি কাণ্ডের নিম্নে মাটির নীচে 1 থেকে 3 সেন্টিমিটার পরিমাণ অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ জন্মায়। কেতুর খেতে খুবই সুস্বাদু। ভারতে অনেক জায়গায় অল্পবিস্তর কেতুর পাওয়া যায়; তবে উত্তর ভারতের গাছের উপভোক্তার এর কিছু কিছু চাষ হয়। কলকাতার হুগলী বার্কটে অল্প সময়ের জন্মে এর কিছু চালান আসে এবং তখন বেশ ভাল দামে রসিকজনের নিকট তা বিক্রীত হয়।

ইলিওক্যারিস (*Eliocharis dulcis* Trin.)—ইলিওক্যারিস কেতুরের বড় সুখা জাতীয় একপ্রকার পত্রহীন উদ্ভিদ। সাধারণত: জলা জমিতে বা জলের

ধারে জন্মায়। এদের কাণ্ডের নীচে একটি কন্দ থাকে এবং তাখেকে অনেকগুলি ছোট ছোট কন্দ (1 থেকে 1.5 সেন্টিমিটার ব্যাসের) জন্মায়। ভারতের বহু স্থানে এই কেতুর বহুই জন্মায়—চাষ একেবারে হয় না বললেই হয়। চীন, জাপান ও হালয়ে এর প্রকৃত চাষ হয়। চীনদেশে এক প্রকার ইলিওক্যারিসের চাষ হয়—যাদের কন্দ 4 সেন্টিমিটার পর্যন্ত হয় ও হেক্টর প্রতি প্রায় 7 টন কন্দ পাওয়া যায়।

এই কন্দ কাঁচা খাওয়া যায়, খেতে খুবই সুস্বাদু। এদের শাঁস সাধারণতের এবং এতে যথেষ্ট পরিমাণে চিনি ও প্রোটিন থাকে। ভালো ভা তরকারীতেও এর ব্যবহার প্রচলিত আছে। কলকাতার বাজারে কখনো কখনো এর চালান আসে।

উল্লিখিত কন্দগুলি ব্যতীত খেতসারের জন্মে আরও কয়েক প্রকার কন্দের প্রকৃত পরিমাণে চাষ হয়; যেমন—শর্টা (*Curceema zedsaria*)—হলুদ জাতীয় এক প্রকার গাছ। শর্টা রোগীর পথ্য হিসাবে বহুল ব্যবহৃত হয়। *Maranta arundinacea* ও *Curceema angustifolia* নামক গাছের কন্দ (*Rhizome*) থেকে অ্যারোকট প্রস্তুত হয়। *Canna edulis*—এটি দক্ষিণ আমেরিকা থেকে আনীত ক্যাগ ফুলজাতীয় গাছ। এর রাইজোম থেকেও আর এক প্রকার অ্যারোকট প্রস্তুত হয়। সকল প্রকার অ্যারোকটই শিঙার ও রোগীর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

## খাদ্য-সমস্যা ও রসায়ন

ঐশ্বরদারজল দাস

সত্যতার কর্মোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে জনসংখ্যা এবং খাদ্যের চাহিদা ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে। খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ ও জনসংখ্যার বৃদ্ধি—এই দুয়ের মধ্যে হয়েছে প্রতিযোগিতার সৃষ্টি। বর্তমানে পৃথিবীতে লোকসংখ্যা হচ্ছে আর 355 কোটি (1969 সালের গণনা মতে)। পৃথিবীর বার্ষিক খাদ্যশক্তি ও বিবিধ আয়ির খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এই বিপুল লোকসংখ্যার জীবনধারণের পক্ষে মোটেই পর্যাপ্ত নয়। হিসাবে দেখা যায়, গত 30-40 বছরে খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ বেড়েছে মাত্র শতকরা 13-14, কিন্তু লোকসংখ্যা বেড়েছে আর শতকরা 40। খাদ্য থেকে মানুষ যে শক্তি পায়, তাকে বিজ্ঞানীরা—তাপশক্তির এককের (ক্যালোরি) সাহায্যে প্রকাশ করেন। একটি সুষম মধ্যবয়স্ক ব্যক্তির যে পরিমাণ দৈনিক খাদ্যের প্রয়োজন, তাপশক্তির এককে তার পরিমাণ হয় 2800 ক্যালোরি। বর্তমানে পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের (১/৩ ভাগ) এই পরিমাণ খাদ্য কোটে না। অবশ্য খুব অল্প করেকটি দেশে (যেমন—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র, হল্যান্ড, ডেনমার্ক, ক্যানাডা ও অস্ট্রেলিয়া) খাদ্যোৎপত্তির প্রাচুর্য দেখা যায়। মোটামুটি বলা যায়, পৃথিবীর তিন ভাগের এক ভাগ অধিবাসী ক্ষুধার্ত অবস্থায় প্রতি রাতে ঘুমাতে যায়। বর্তমানে যে হারে পৃথিবীর লোকসংখ্যা বেড়ে চলেছে, তাতে আর 30-40 বছর পরে তা বাবে বিগত হয়ে অর্থাৎ আর 700 কোটি হবে। খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ এর সঙ্গে প্রতিযোগিতার বাড়িয়ে তুলতে না পারলে মানুষের জীবন সঙ্কটাপন্ন হয়ে উঠবে। চুক্তিকে অনশনে ও অর্ধাশনে লোককর হবে

অনিবার্য ও ভয়াবহ। বিজ্ঞানীরা, বিশেষতঃ রসায়ন-বিজ্ঞানীরা এই সমস্যার সমাধানের জন্যে কাজ করে উঠেছেন। প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তির যে সব বৈজ্ঞানিক প্রচেষ্টা চলছে, সংক্ষেপে তারই আলোচনা হচ্ছে বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য।

গোড়াতো এই বলা যায়, মানুষের সকল খাদ্যের মূল উৎপত্তিস্থান হলো উদ্ভিদ-রাজ্য। সকল প্রকার আয়ির খাদ্যেরও মূলে আছে উদ্ভিদ। উদ্ভিদের সঙ্গে জীবের এই প্রাণের বাঁধন সৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। সুতরাং প্রচুর পরিমাণে খাদ্যোৎপত্তি করতে হলে মানুষকে উদ্ভিদ-রাজ্যের উন্নতি ও বিস্তার বাড়িয়ে তুলতে হবে; অথবা খাদ্যের জন্তে উদ্ভিদের উপর একান্ত নির্ভরতা থেকে আপনাকে মুক্ত করতে হবে। এই উত্তর জাতীয় প্রচেষ্টার বিজ্ঞানীরা তাঁদের উদ্ভাবনী শক্তির প্রয়োগে মনোনিবেশ করেছেন।

প্রথমতঃ রসায়ন বিজ্ঞানের সাহায্যে উদ্ভিদ-রাজ্য থেকে মানুষের খাদ্যোৎপত্তির পরিমাণ কি উপায়ে বাড়ানো হচ্ছে, তারই আলোচনা করা হবে। উদ্ভিদ ও জীবদেহ গঠিত হয়েছে অত্যন্ত 26টি রাসায়নিক মৌলিক পদার্থের সংযোগে। এদের মধ্যে যেগুলির অধিক পরিমাণে অস্তিত্ব দেখা যায়, তাদের নাম হলো: কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, ক্যালসিয়াম, কস্টরাস, পটাশিয়াম, সালফার, সোডিয়াম, ক্লোরিন, ম্যাগনেসিয়াম এবং আরসেন। বাকীগুলি থাকে সূচ্যে পরিমাণে। ইংরেজীতে এই কারণে এদের বলা হয় Trace element (সন্ধানমাত্রিক মৌল)। ম্যাগনেসিয়াম, কপার, আরোডিন, ক্রিয়ন, কোবাল্ট, নিক, বোরন, মলিবডিনাম, ভেনেডিয়াম, অ্যান্টিমনিয়াম ও



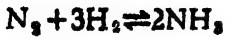
যেহায্য হলো এর উদাহরণ। জীব ও উদ্ভিদ দেহে এদের অস্তিত্বের ব্যাড়া অতি সাধারণ বা নগণ্য হলেও দেহের স্বাস্থ্য ও বৃদ্ধির জন্তে এদের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। জীব ও উদ্ভিদ-জীবনের উপর এদের প্রচণ্ড প্রভাব দেখা যায়।

জমিতে অতি সাধারণ ব্যাড়া (50 লক্ষ ভাগের 1 ভাগ) ধোরনের অভাব ঘটলে ঐ জমিতে উৎপন্ন বিনের (শিলজাতীয় উদ্ভিদ) চারা গাছ শুকিয়ে যাবে। কোন জমিতে যদি নিকেলের পরিমাণ 40 হাজার ভাগের 1 ভাগেরও কম হয়, সে জমিতে কমলালেবুর গাছ বেড়ে উঠতে পারে না। জমিতে খুব অল্প পরিমাণে ম্যাঙ্গানিজের অস্তিত্বে ঐ জমিতে উৎপন্ন টমেটোতে তিটামিন. সি-এর পরিমাণ বেড়ে যায়। পরীক্ষার দেখা গেছে যে, বাতাসের উৎপাদন করবার জমিতে বায়ু থেকে নাইট্রোজেন সংগ্রাহী জীবাত্মক বৃদ্ধির জন্তে অতি অল্প মাত্রার মলিবিভিনামের প্রয়োজন হয়।

অধিকাংশ উদ্ভিদই তাদের বাতাসের উৎপাদন সংগ্রহ করে বায়ু, জল ও জমির লবণজাতীয় পদার্থ বা সার থেকে। কিন্তু একই জমিতে বছরের পর বছর বাতাসের উৎপাদনের কলে জমিতে নাইট্রোজেন, কস্করাস ও পটাশিয়াম-যুক্ত উদ্ভিদবাতাসের অভাব ঘটে। এর প্রতিকার-কলে জমিতে সার প্রয়োগের ব্যবস্থা হয়েছে। উদ্ভিদের বাতাসের জলে দ্রবীভূত অবস্থায় পাতার ভিতর দিয়ে, বিশেষতঃ মূলের ক্ষুদ্র তন্তুর সাহায্যে অতিস্রবণ (Osmosis) প্রক্রিয়ার উদ্ভিদদেহে প্রবেশ লাভ করে। সত্যতার আদিযুগ থেকে মানুষ তার বাতাসের উৎপাদন বাড়ানোর জন্তে জমিতে সার প্রয়োগের প্রথা অবলম্বন করে আসছে। বহুকাল ধাবৎ এবং এখনো কিয়ৎ পরিমাণে নানাবিধ পরিত্যক্ত জৈব পদার্থ সার হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু এক শতাব্দীর কিছু বেশী হলো বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ লিবিগ জলে দ্রবীয় নাইট্রোজেন, পটাশিয়াম ও কস্করাসযুক্ত জৈব

পদার্থসমূহের চাষের জমিতে সার হিসাবে ব্যবহারের বিশেষ উপযোগিতা বহু পরীক্ষার কলে প্রথম প্রমাণ করেন। সেই থেকে এসব জৈব সারের ব্যবহার ক্রমশঃ বেড়ে চলছে। চাষের জমি থেকে বছরে লক্ষলক্ষ টন নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ বাতাসের কসল উৎপাদনের জন্তে ব্যয়িত হয়। এর প্রায় অর্ধেক পরিমাণ নাইট্রোজেন প্রাকৃতিক বিধানে এবং জৈব সার ব্যবহারের কলে পুনরায় জমিতে ফিরে আসে। বাকী অর্ধেক নাইট্রোজেনের অভাব মিটে জৈব নাইট্রোজেন-যুক্ত সারের প্রয়োগে। দক্ষিণ আমেরিকার চিলি রাষ্ট্রের আন্ডিজ পর্বত ও প্রশান্ত মহাসাগরের মধ্যবর্তী এদেশে সোডিয়াম নাইট্রেটের (নাইট্রোজেনযুক্ত একটি জৈব লবণজাতীয় পদার্থ) একটি বিরাট ক্ষর আছে। একে কেলিসে (Caliche) বলা হয়। উদ্ভিদের সার হিসাবে ব্যবহারের জন্তে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে, ইরোরোপের বহু রাষ্ট্রে এবং অন্তর বছর বছর প্রচুর পরিমাণে এর রপ্তানী হয়। কিন্তু প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় যখন জার্মান রাষ্ট্রে এর রপ্তানী বন্ধ করা হয়, জার্মান সম্রাট জার্মান বিজ্ঞানী হাবেরকে (Haber) রাসায়নিক সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার নাইট্রোজেনযুক্ত উদ্ভিদবাতাস বা সার প্রস্তুতের উপায় উদ্ভাবনের জন্তে আহ্বান করেন। নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাস ভাপ ও চাপের প্রভাবে পরস্পরের রাসায়নিক সংযোগে অ্যামোনিয়া গ্যাসে পরিণত হয়, এই তথ্য অজানা ছিল না। এই দুটি মৌলিক পদার্থ যে কোন দেশে অপর্বাণ্ড পরিমাণে তৈরি করা যেতে পারে। বায়ুতে অক্সিজেন নাইট্রোজেন এবং জলে আছে অক্সিজেন হাইড্রোজেন। বায়ু থেকে নাইট্রোজেন ও জল থেকে হাইড্রোজেন তৈরি করা খুবই সহজ। এ উভয়ের রাসায়নিক সংযোগে হয় অ্যামোনিয়া গ্যাসের সৃষ্টি। পরের পৃষ্ঠায় সমীকরণের সাহায্যে এই সংযোগবিধি দেখানো গেল।





কিন্তু মুকিল হচ্ছে সাধারণতঃ শতকরা দু-তাগের বেশী অ্যামোনিয়া এতে প্রস্তুত করা যায় না। কেন না, যে উষ্ণতার এই সংযোগ ঘটে, সে উষ্ণতাই আবার অ্যামোনিয়া গ্যাস তেজে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসে পরিণত হয়। কলে নাইট্রোজেন, হাইড্রোজেন ও অ্যামোনিয়ার অধুৰ মধ্যে একটি সাম্যাবস্থার সৃষ্টি হয়। বিজ্ঞানী হাবের এই সমস্যার সমাধানে সিদ্ধিলাভ করেন। একটি নির্দিষ্ট উষ্ণতার ও নির্দিষ্ট চাপে নাইট্রোজেন ও হাইড্রোজেন গ্যাসের মিশ্রণকে তিনি একটি বিশিষ্ট সহায়ক পদার্থের (আয়রন—Iron) উপর পরিচালিত করে এবং তাহের রাসায়নিক সংযোগে উৎপন্ন অ্যামোনিয়া গ্যাসকে অনতিবিলম্বে গ্যাস মিশ্রণ থেকে অপসারিত করে শতকরা ত্রিশ ভাগ অ্যামোনিয়া গ্যাস প্রস্তুত করতে সক্ষম হন। অ্যামোনিয়া সংশ্লেষণের এই বিধি রসায়ন-বিজ্ঞানে হাবেরের পদ্ধতি নামে খ্যাতি লাভ করেছে। সালফিউরিক অ্যাসিডের সংযোগে অ্যামোনিয়া অ্যামোনিয়াম সালফেট নামক লবণজাতীয় পদার্থে পরিণত হয়। অ্যামোনিয়াম সালফেট একটি উত্তম নাইট্রোজেন-যুক্ত উদ্ভিদখাদ্য বা সার। আমাদের দেশে সিল্কিতে (বিহার অঞ্চলে) এই পদ্ধতিতে অ্যামোনিয়াম সালফেট তৈরি হচ্ছে। রাসায়নিক সংশ্লেষণে নাইট্রোজেনযুক্ত অষ্টজন উদ্ভিদখাদ্যের উৎপাদন খাতিদমস্তা সমাধানে রসায়নের একটি বিশিষ্ট অবদান বলা যায়।

উপযুক্ত পরিমাণে উপযোগী সার প্রয়োগে জমির উৎপাদিকা শক্তি বহু গুণ বেড়ে যায়। আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে দেখা গেছে যে, সার প্রয়োগে একই জমি থেকে উৎপন্ন খাদ্যশস্যের পরিমাণ প্রায় 30% (শতকরা 30 ভাগ) বেশী হয়। অবশ্য এই প্রকার ফল পেতে হলে বীজবপন ও অঙ্কুরোদগম থেকে শুরু করে পাকা কসল সংগ্রহ

ও সক্ষম অবধি উদ্ভিদ এবং তাহেকে উৎপন্ন শস্যকে সকল প্রকার বহিঃশত্রুর আক্রমণ, অপচয় ও বিনষ্ট থেকে রক্ষা করবার উপায় অবলম্বন করা প্রয়োজন হয়। বাহুবের মত উদ্ভিদ-জীবনেরও বহু শত্রু আছে। উদ্ভিদদেহে নানাবিধ রোগোৎপাদক জীবাণু, পরভূৎ, অসংখ্য কীট-পতঙ্গ, পোকা-মাকড় ইত্যাদি উদ্ভিদ রাজ্যের সঙ্গে অহরহ সংগ্রাম পরিচালনার নিযুক্ত রয়েছে। ইঁদুর, কাঠবিড়ালী, পাখী, পতঙ্গ এদের সঙ্গে যোগ দিতে ক্রটি করে না। এর কলে বহুল পরিমাণে উৎপন্ন শস্য বিনষ্ট হয়। একেবারেও রসায়ন হয়েছে বাহুবের পক্ষে মুকিল আসান। কীট-পতঙ্গাদির আক্রমণ থেকে উদ্ভিদদের সংরক্ষণের জন্তে রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বহু শক্তিশালী কৈবদ সংশ্লেষিত পদার্থ আবিষ্কার করেছেন। এদের মধ্যে সবচেয়ে অধিক শক্তিশালী কীটনাশক পদার্থ হচ্ছে D-D-T। এর রাসায়নিক নাম হলো ডাইক্লোরো ডাইকিনাইল ট্রাইক্লোরো ইথেন। গত কয়েকবছরব্যাপী কৃষিকার্ষের জন্তে পৃথিবীর সর্বত্র এই কীটনাশক পদার্থটির ব্যবহার অবাধে প্রচলিত ছিল। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে থেকে বছরে কোটি কোটি টন D-D-T-এর রপ্তানী হয়েছে ইরোরোপ, আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন রাষ্ট্রে। কিন্তু দীর্ঘ অভিজ্ঞতার কলে সস্ত্রুতি দেখা গেছে যে, পুনঃ পুনঃ D-D-T-এর ব্যবহারে জমির উর্বরতা শক্তি নষ্ট হয়ে যায়। পরিণামে উদ্ভিদ, পাখী, পতঙ্গ—এমন কি, বাহুবের জীবনের পক্ষেও এর ব্যবহার নিরাপদ নয়। তাই বিজ্ঞানীরা এখন অধিক নিরাপদ ও সুদীর্ঘ কাল ব্যবহারেও সমান হিতকর কীট-পতঙ্গ নিবারক পদার্থের উদ্ভাবনের চেষ্টায় আছেন। রসায়নের আর একটি উন্নয়নযোগ্য অবদান হচ্ছে আগাছা বিনাশক পদার্থ। জমিতে আগাছা উঠে অনেক সময় খাদ্যোৎপাদক উদ্ভিদসমূহকে বিনষ্ট করে বা তাহের অঙ্কুরিত হতে দেয় না। এর প্রতিকার

করেছেন রসায়ন-বিজ্ঞানীরা। ডাইক্লোরো-কিনলি অ্যাসিটিক অ্যাসিডের আবিষ্কারে। এর বাজার নাম হলো 2'4-D। এই পদার্থটি উদ্ভিদের পক্ষে হরমোনের কাজ করে। অতি অল্প মাত্রায় ব্যবহার করলে এতে উদ্ভিদের খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি হয়। অধিক মাত্রায় ব্যবহারে আবার উদ্ভিদের অনাধারে মৃত্যু ঘটে। কিন্তু খাদ্যশস্যবাহী উদ্ভিদের উপর এর কোন ক্রিয়া দেখা যায় না। এর সোডিয়ামথিওল লবণকে জলে গুলে জমির উপর পিচকারী দিয়ে স্তম্ভ ধারায় ছড়িয়ে দেওয়া হয়। এই পদার্থটিরই একটি নিকট আত্মীয় ইাইক্লোরো কিনলি অ্যাসিটিক অ্যাসিড (বাজার নাম 2'4'5-T)। এর ব্যবহারে বিনা পরিশ্রমে খাদ্যশস্য সংগ্রহ করা চলে। গাছ থেকে কাটবার, ছাটবার বা ঝাড়বার দরকার হয় না। আমসেট বা অ্যামোনিয়াম সালফাটে আর একটি আগাছানাশক পদার্থের আবিষ্কার ও বহুল ব্যবহার এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

খাদ্যশস্যোৎপাদনের অন্তর্বিধ সমস্ত সমাধান রসায়ন-বিজ্ঞানীরা সচেতন আছেন। হাজার হাজার জীবাণু, তাইরাস এবং ছত্রাক বা পরভুতের (Fungus) আক্রমণে উৎপন্ন ব্যাধি ইত্যাদির সঙ্গে সংগ্রাম করে উদ্ভিদকে বেঁচে থাকতে হয়। ক্লোরেনিল ও থ্যালিমাইড জাতীয় বিবিধ ছত্রাক-নাশক (Fungicide) পদার্থের আবিষ্কার ও ব্যবহারে উদ্ভিদের সংরক্ষণের ব্যবস্থা করতে বিজ্ঞানীরা হার যানেন নি।

খাদ্যশস্য সংগ্রহ করার পর সঞ্চয় করলেও তার শত্রুর অভাব ঘটে না। এই অবস্থাতেও কীট-পতঙ্গাদি, ইঁদুর ও কাঁঠবিড়ালী থেকে অপচয় নিবারণের আবশ্যক হয়। এখানেও রসায়ন-বিজ্ঞানীরা বখাযোগ্য প্রতিবিধানের ব্যবস্থা করতে ক্রটি করেন নি। সঞ্চিত খাদ্যশস্য নিরাপদে সংরক্ষণ করার উদ্দেশ্যে বহুবিধ ধূপক (Fumigants) পদার্থের প্রচলন হয়েছে। খাদ্য-

শত্রুর শুদাযবরে এসব ধূপক পদার্থের বাষ্পের পরিচালনা করে তা থেকে কীট-পতঙ্গ, ইঁদুর, কাঁঠবিড়ালী প্রভৃতি সকল অপচয়কারী জীবকে বিতাড়িত করা হয়। কাবর্ন টেট্রাক্লোরাইড, মিথাইল ব্রোমাইড, ইথিলিন ডাইব্রোমাইড সাধারণতঃ এই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হয়।

কৃষিকর্মের ক্ষেত্রে রসায়নের একটি অত্যন্ত অবদান সম্প্রতি দেখা দিয়েছে। এতে কৃষকের অনেক পরিশ্রম ও ব্যয়ের সাধন করা সম্ভব হয়েছে। কসল সংগ্রহের অব্যবহিত পূর্বে জমিতে কোন কোন বিশিষ্ট রাসায়নিক পদার্থ ছড়িয়ে দিলে 3/4 দিনের মধ্যে ঐ জমিতে উৎপন্ন সকল গাছ থেকে তাদের পাতাগুলি আপনাআপনি ঝরে পড়ে। ফলে, কসল সংগ্রহে অনেক ব্যয়, শ্রম ও সময়ের সংক্ষেপ ঘটে। ক্যালসিয়াম সায়ানে-মাইড (Calcium cyanamide) এবং ম্যাগ-নেসিয়াম ক্লোরাইড হলো এই জাতীয় পদার্থের দুইটি। এদের পত্রনাশক (Defoliator) বলা হয়। নাইট্রোজেনথিওল একটি মূল্যবান সার হিসাবে ক্যালসিয়াম সায়ানেমাইডের ব্যবহার কৃষি-বিজ্ঞানের একটি পুরাতন সুপরিচিত তথ্য।

কৃষির ক্ষেত্রে খাদ্যশস্যোৎপাদনের উদ্দেশ্যে রসায়ন-বিজ্ঞানের উপরে বর্ণিত বিবিধ অবদানের সুবিধা গ্রহণ করে আমেরিকার ফুডরাষ্টার বর্তমান কৃষকেরা তার 15/16 বছরের অগ্রবর্তী অল্পমত প্রাচীন-পহাবলম্বী কৃষিকর্মীদের চেয়ে দশ গুণ বেশী কাজ ও বিত্ত কসল উৎপাদনে সক্ষম হয়েছে।

যেসব পত্রর মাংস খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাদের স্বাস্থ্য সংরক্ষণের এবং পুষ্টির ক্ষেত্রেও রসায়নের অবদান নগণ্য নয়। স্বাভাবিক ও সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক পদার্থের (যথা—অ্যামিনো অ্যাসিড, ভিটামিন, অ্যাক্টিভারোটিক ইত্যাদি) সংমিশ্রণে পত্রর খাদ্যকে অধিকতর পুষ্টিকর করার ব্যবস্থা অবলম্বন করা হয়েছে। পণ্ডিতকিংসার সুব্যবস্থাতেও নবাবিহীন বহু সংশ্লিষ্ট রাসায়নিক

পদার্থের, বিশেষতঃ অনেক আণ্ডিথারোটিকের বহুল প্রয়োগ দেখা দিচ্ছে।

আমরা দেখেছি, মানুষের সকল প্রকার খাদ্য আসে উদ্ভিদ বা প্রাণী-রাজ্য থেকে। এসব খাদ্যকে ঘোঁটাছুটি তিন শ্রেণীতে ভাগ করা হয়।

(1) কার্বোহাইড্রেট : চাল, গম, আলু ইত্যাদি খেতসারবহুল খাদ্য। এদের মধ্যে অল্প পরিমাণে অল্প দুই শ্রেণীর পদার্থও বর্তমান থাকে। শর্করা হচ্ছে একটি পুরাপুরি কার্বোহাইড্রেটের দৃষ্টান্ত।

(2) আয়িষ : মাংস, মাছ, ডিম, ডাল, বাদাম ইত্যাদি প্রোটিনবহুল খাদ্য। মাংস, মাছ ও ডিমে অল্প বিস্তারিত প্রেহ পদার্থ, ডালে অনেক খেতসার এবং বাদামে বিস্তারিত প্রেহ পদার্থ বর্তমান থাকে।

(3) প্রেহ : তেল, ঘি, মাখন, চর্বি ইত্যাদি। দুধে তিন জাতীয় পদার্থই প্রায় সমান ভাগে বর্তমান। এই কারণে দুধকে আদর্শ খাদ্য হিসাবে গণ্য করা হয়। বাতীর খাদ্যে অতি অল্প পরিমাণে লবণজাতীয় পদার্থ ও বিভিন্ন খাদ্যপ্রাণ বা ভিটামিন থাকে। দেহের আহারকার এদেরও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

রসায়ন-বিজ্ঞানের জ্ঞান প্রয়োগে জমির উর্বরতা শক্তির বৃদ্ধি এবং কালের পরিমাণ বে অতুতপূর্বভাবে বাড়ানো যায়, উপরে তারই আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এতে খাদ্যসম্ভার সমাধানের বে কোন সম্ভাবনা নেই, একথাও গোড়ার বলা হয়েছে। কারণ পৃথিবীতে চাষের জমির পরিমাণ এবং তার উৎপাদিকা শক্তি হচ্ছে সীমাবদ্ধ ; অথচ এর ভুলনার পৃথিবীর লোকসংখ্যা বৃদ্ধির কোন সীমানা নির্দেশ করা চলে না। তাই বর্তমানে বিজ্ঞানীরা রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কৃত্রিম খাদ্য প্রস্তুতের গবেষণা শুরু করেছেন।

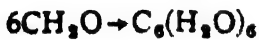
এছাড়া খাদ্যের পরিমাণ বৃদ্ধির অন্তর্বিধ উপায় উদ্ভাবনেরও পরীক্ষা চলছে।

মানুষের প্রয়োজনীয় তিন জাতীয় খাদ্যের মধ্যে পরিমাণে কার্বোহাইড্রেট খাদ্যের চাহিদা সবচেয়ে বেশী। কারণ, আমাদের শরীরের তাপ রক্ষা হয় প্রধানতঃ এই জাতীয় খাদ্যে। তাই মানুষের দৈনিক ভোজনের প্রধান উপকরণ হচ্ছে খাদ্য ক্রটি। এই দুটি খেতসারবহুল খাদ্য। রাসায়নিক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কার্বোহাইড্রেট তৈরির প্রচেষ্টা হয়েছে দুই প্রকারে। এক হলো উদ্ভিদদেহে বাতাবিক উপারে খেতসার স্থিতির পহার অঙ্করণ করে। জানা আছে যে, উদ্ভিদদেহে অকার্যার বা কার্বন ডায়োক্সাইড গ্যাসের সঙ্গে জলের অণুর সংযোগ ঘটে সূর্যালোকে গাছের পাতার সবুজ রংয়ের (ক্লোরোফিল) সংস্পর্শে। এই কারণে এই প্রক্রিয়ার নাম হয়েছে আলোকসংশ্লেষণ (Photosynthesis)। গাছের সবুজ পাতার পাতার যখন সূর্যরশ্মি পড়ে, তা থেকেই আসে এই সংযোজনক্রিয়ার শক্তি। পাতার সবুজ রং বা ক্লোরোফিল দেয় এর প্রেরণা—তাই একে অস্থগটক (Catalyst) বলা হয়। এই অবস্থার অকার্যার গ্যাস ও জল মিলে স্থিতি করে ক্রম্যান্ডিহাইড নামক পদার্থ। পরে ক্রম্যান্ডিহাইডের অণুগুলি বহুগুণিত হয়ে স্থিতি করে শর্করা ও খেতসারের অণু। পরীক্ষার দেখা গেছে যে, প্রাণীর মত উদ্ভিদদেহেও দিনরাত অহরহ নিঃশ্বাস-প্রশ্বাস প্রক্রিয়া চলতে থাকে। গাছের সবুজ পাতার তলদেশে উদ্ভিদকোষের কীকে কীকে খুব সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বহু গর্ত বা ছিদ্র থাকে। এরাই হলো উদ্ভিদদেহে বায়ুচলাচলের পথ। বায়ুর সঙ্গে এই পথে উদ্ভিদের সবুজ পাতার অকার্যার গ্যাস প্রবেশ করে। মাটি থেকে নিকড়ের সাহায্যে জল এবং বিবিধ লবণ-জাতীয় পদার্থ এসে পাতার হাজির হয়। এখানে উদ্ভিদকোষের সবুজ রং বা ক্লোরোফিলের সংস্পর্শে সূর্যকিরণের সাহায্যে ঘটে বায়ুর অকার্যার ও

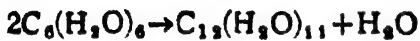
মাটি থেকে সংগ্রহীত জলের সঙ্গে রাসায়নিক সংযোজন। এর কলে প্রথমে স্ফটিক করম্যানডি-হাইড এবং অক্সিজেন বা অক্সিজেন গ্যাস বেরিয়ে যায় :  $\text{CO}_2 + \text{H}_2\text{O} \rightarrow \text{CH}_2\text{O} + \text{O}_2$

করম্যানডিহাইড

পরে করম্যানডিহাইড থেকে শর্করা এবং শর্করা থেকে অবশেষে খেতসার (Starch) ও সেলুলোজের (Cellulose) স্ফটিক হয় :



জ্রাক-শর্করা (গ্লুকোজ)



ইক্স-শর্করা

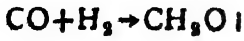


খেতসার ও সেলুলোজ

গাছের বীজের আঁশ (যেমন তুলা) এবং কাঠ সেলুলোজেরই প্রকারভেদে মাত্র। এই স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার অঙ্করণে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে ক্যালি-কোর্ণিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের রাসায়নিক পরীক্ষাগারে বিজ্ঞানীরা প্রথমে করম্যানডিহাইড তৈরি করতে সক্ষম হয়েছেন।

সরাসরি অজার বা অকারার এবং জল থেকে বিবিধ রাসায়নিক প্রক্রিয়ার করম্যানডিহাইড প্রস্তুত করা যায়। এভাবে বহুল পরিমাণ কৃত্রিম শর্করা ও খেতসার প্রস্তুতের সম্ভাবনা আছে। কারণ, একেত্রে তাপ ও চাপের তারতম্য এবং নানাবিধ বহুপাতির সাহায্যে সংযোজন প্রক্রিয়ার গতিবেগ বাড়ানোর সম্ভাবনা আছে। করম্যানডিহাইড এবং কার্বনের মধ্যে বিক্রিয়ার কলে শর্করার উৎপত্তির প্রথম নিবর্ণন পান 1851 খৃঃ অব্দে রসায়নবিদ বাটলেন্ড। 1890 খৃঃ অব্দে এই পদ্ধতি অবলম্বন করে প্রখ্যাত জার্মান বিজ্ঞানী এমিল কিনার কর-ম্যানডিহাইড থেকে জ্রাক-শর্করার পূর্ণাঙ্গ সংশ্লেষণ করেন।

অজার এবং জল থেকে জ্বল করে বর্তমানে বহুল পরিমাণে করম্যানডিহাইডের স্ফটিক রাসায়নিক সংশ্লেষণে। কিনারের পদ্ধতি মতে করম্যানডিহাইড থেকে গ্লুকোজ বা জ্রাক-শর্করা তৈরিও এখন মানুষের আয়ত্তের মধ্যে। পরীক্ষায় দেখা গেছে যে, এক-একটি খেতসারের অণুতে বিশটি করে গ্লুকোজের অণু সরাসরি শিকলের মত পরস্পরের সঙ্গে জুড়ে থাকে। অক্সিজেনে সিদ্ধ করলে খেতসারের অণু আবার গ্লুকোজের অণুতে ভেঙে যায়। এর বিপরীত প্রক্রিয়ার অঙ্কন করতে পারলেই গ্লুকোজ থেকে খেতসার প্রস্তুতের পদ্ধতি আবিষ্কার হবে। এভাবে বহুপাতিত হবার প্রশংসার দৃষ্টান্ত রসায়নের ইতিহাসে এখন অভাব নেই। কৃত্রিম রবার, কৃত্রিম রেশম এবং বিভিন্ন রকমের প্রাটিক সাবস্ট্রী এখন এভাবেই প্রস্তুত হচ্ছে। যদিও অজারবি শর্করা থেকে কৃত্রিম উপায়ে খেতসারের উৎপত্তি হয় নি, তথাপি তবিশ্বতে কৃত্রিম উপায়ে বহুল পরিমাণ খেতসার প্রস্তুতির সম্পূর্ণ সম্ভাবনা আছে। আসল সমস্যা হচ্ছে খেতসারের সংশ্লেষণ পদ্ধতির আবিষ্কার নয়, সমস্যা তার প্রস্তুতি পদ্ধতিকে ব্যয়সাধ্য করে পরি-চালিত করা—অর্থাৎ ব্যবসারে লাভ-লোকসানের হিসাব-নিকাশ। করম্যানডিহাইড প্রস্তুতের উপ-করণ অজার এবং জল, উভয়ের কোন অভাব নেই। তাপশক্তি এবং মজুরিতেই খরচ বেড়ে যায়। বিজ্ঞানীদের মতে, অদূর ভবিষ্যতে সূর্যরশ্মি এবং পরমাণুকেন্দ্র থেকে অল্প মূল্যে অপেক্ষাকৃত তাপশক্তি উৎপাদনের ব্যবস্থা পাকাপাকি হয়ে যাবে। তখন কৃত্রিম শর্করা এবং খেতসার প্রস্তুতির পথে সকল বাধা যুঁজে যাবে। সম্ভ্রুতি মাটির তলার ধনির অভ্যন্তরের করলা থেকে কার্বন মনোক্সাইড তৈরি করার কৌশল আবিষ্কৃত হয়েছে। এতে মজুরি দিয়ে ধনি থেকে করলা তোলবার আবশ্যক হয় না। কার্বন মনোক্সাইড ও জলের হাইড্রোজেন থেকে করম্যানডিহাইড সংশ্লেষণ হবে তাতে সম্ভা :



করম্যান্ডিহাইড

এভাবেও উপরে বর্ণিত আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার অল্পকরণে সত্যার ও সহজে করম্যান্ডিহাইড প্রস্তুতের যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে।

প্রোটিন বা আমিষ খাদ্য মাছের দেহের আর একটি প্রয়োজনীয় মূল্যবান উপকরণ। প্রোটিন মাজেই হচ্ছে একটি জটিল রাসায়নিক পদার্থ। নানাবিধ অ্যামিনো অ্যাসিডের বহু অণু পরস্পর শিকলের মত জুড়ে এক-একটি প্রোটিনের অণু সৃষ্টি করে। অনেকগুলি শাপের মাথা এবং লেজে পরস্পর জুড়ে দিলে যে ছবি হয়, প্রোটিনের অণু-গুলিরও আকার হয় তাই অল্পকরণ। রসায়নবিদেরা সংশ্লেষণ-প্রক্রিয়ার এশেষত কোন প্রোটিন পদার্থের সৃষ্টি করতে সক্ষম হন নি। সেলুলোজ যেমন উদ্ভিদদেহের প্রধান ভিত্তি, প্রোটিন হচ্ছে ভেমনি প্রাণীর দেহকোষের প্রধান উপকরণ। সেলুলোজের মত প্রোটিনমাজেই অতিকার অণু গঠিত পদার্থ। হাজার হাজার বিভিন্ন প্রোটিন মিলে প্রাণীর দেহকোষ গঠন করে। রসায়নের ক্ষেত্রে প্রোটিনের সংশ্লেষণ একটি খুব ছদ্মহ সমস্যা। কাজেই সহসা মাছ, মাংস, ডিম ইত্যাদির পরিবর্তে যে কোন কৃত্রিম প্রোটিন প্রচলিত হবে, তার সম্ভাবনা নেই। তবে কখনো যে হবে না, একথাও বলা যায় না। কারণ, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে বিজ্ঞানী উডওয়ার্ড কিছুকাল আগে রেশম ও মাধার চুলে যে প্রোটিন আছে, তার সংশ্লেষণ করে এই বিষয়ে আশার বাণী দিয়েছেন।

কিন্তু প্রচুর পরিমাণে ও সহজে প্রোটিনখাদ্যের অভাব দূরীকরণের অল্পবিধ উপায় রয়েছে। এতে জীবাণুর সাহায্যের প্রয়োজন হয়। এক সময়ে মাছ বনের পাতকে পোষ মানিয়ে তার কাজ হাসিল করেছে। এখন তার চেষ্টা হচ্ছে জীবাণুকে পোষ মানানোর। এতে তার জীবনযাত্রার উপযোগী বহু সামগ্রী প্রস্তুতের সুবিধা আশাতীত-

ভাবে বেড়ে গেছে। এসব পোষ মানানো জীবাণুকে দিয়ে মাছ বহুকাল ধাবং বানিয়ে আসছে তার খাবার জন্মে দই, পনির ও দুধ। ইষ্ট (Yeast) হচ্ছে এই প্রকারের এক জীবাণু। দুধ প্রস্তুতে এর ব্যবহার হয়। ইষ্ট হচ্ছে প্রোটিনবহুল জীবাণু। এদের প্রজনন-শক্তি অসাধারণ। পরিত্যক্ত বা উপহৃত পদার্থের পরিবেশে এরা প্রবল হারে বহুগুণ বেড়ে যায়। এসব পদার্থ থেকেই আসে এদের খাদ্য। গত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংল্যান্ড ও অন্তর্দেশে খাদ্য হিসাবে এর প্রচলন হয়েছিল।

প্রোটিন খাদ্যের আর একটি অমূল্য তত্ত্ব হচ্ছে প্রাকটন। এটিও এক প্রকার জীবাণু। সমুদ্রের জলে এসব জীবাণু ভেসে বেড়ায়। সকল প্রকার সামুদ্রিক মাছের—এমন কি, তিমির মত মহাকায় সামুদ্রিক জন্তুগুলিরও প্রাকটন হচ্ছে একটি বিশেষ খাদ্য। প্রাকটন থেকেও বহু উপাদানের খাদ্যনামগ্রী প্রস্তুত করা যায়। বর্তমানে বাই-ল্যাণ্ডে বছরে 5000 টন করে প্রাকটন সংগ্রহ হয়। জাপানে এবং ইস্রায়েলে খাদ্য হিসাবে ব্যবহারের জন্যে প্রাকটন সংগ্রহের পরীক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে।

প্রোটিনবহুল খাদ্যোৎপাদনের একটি মূল্য-বান ও সার্বিক উপায় হলো জ্বালাজাতীয় (Algae) এক প্রকার জীবাণুর চাষ; এর নাম হলো ক্লোরেলা (Chlorella)। এই জাতীয় জীবাণুর প্রবলভাবে বংশবৃদ্ধি করবার ক্ষমতা আছে। 24 ঘণ্টার মধ্যে এদের সংখ্যা সাত গুণ বেড়ে যায়। এর চাষের জন্যে প্রয়োজন শুধু জল, অক্সিজেন ও অ্যামোনিয়াঘটিত লবণজাতীয় পদার্থ। পাড়ারগের অনেক পুকুরের জলে সবুজ রঙের যে জ্বালা পড়ে, সেগুলি সব ক্লোরেলা। বর্তমানে প্রচুর পরিমাণে ও কম ব্যয়ে অনেক দেশে ক্লোরেলার চাষের ব্যবস্থা চলছে-বিশেষ করে আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রে। পরিবেশের তারতম্যে প্রোটিন এবং

সেই উভয় জাতীয় পদার্থের ক্রোরেলার চাষে যে কলস হয়, তাতে শতকরা প্রায় ৪৫ ভাগ সেই পদার্থ থাকে। অতএব ক্রোরেলার চাষ থেকে অবশ্যবিশেষে মাছের খাতের দুটি প্রধান উপাদান প্রোটিন এবং সেই অনায়াসে ও অল্প ব্যয়ে সংগ্রহ করার বথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। ক্রোরেলা জীবাণু চাষের ক্ষেত্রে বেশী আয়গা-ভর্যির দরকার করে না, শুধু খানিকটা জলাজমিতেই কাজ চলে। ক্রোরেলা থেকে নানারকম উপাদানের খাতদানত্রী তৈরি করা যায়।

প্রোটিন খাতের অজীব যেটার আর একটি উপায় হচ্ছে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার। আগেই বলা হয়েছে যে, অ্যামিনো অ্যাসিডের এই অণু পরস্পর জুড়ে স্থিতি করে প্রোটিনের অণু। কিন্তু মানবদেহের পাকস্থলীতে এসব প্রোটিন তেতে তাৎক্ষণিক পুনরায় অ্যামিনো অ্যাসিডে বেরিয়ে আসে। এসব অ্যামিনো অ্যাসিড থেকে আবার আমাদের দেহাত্মকত্বের স্থিতি হয় দেহের পুষ্টির উপযোগী অন্তর্বিধ প্রোটিন। সুতরাং প্রোটিনের বদলে অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করা যায়। প্রোটিনের অতিরিক্ত অণুর তুলনায় অ্যামিনো অ্যাসিডের অণু অনেক ছোট, সহজে এদের সংশ্লেষণ হয়। দাম এবং পুষ্টির দিক থেকে প্রোটিন এবং অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহারের মধ্যে বিশেষ কোন তফাৎ নেই। প্রোটিনবহুল মাছ, মাংস, ডিম বা ডালের বদলে অল্প পরিমাণ অ্যামিনো অ্যাসিড ব্যবহার করলেই দেহের প্রয়োজন মিটে যায়। কিন্তু চর্বিপূর্ণ আবাদ হয়তো মিলবে না। খাদ্য হিসাবে অ্যামিনো অ্যাসিডের ব্যবহার প্রচলিত হলে মানব-সত্যতার একটি দুরন্ত কলক কসাইখানা বিলোপ হয়ে যাবে। বর্ষের মত সত্য মাছকে আর বরা জীবজন্তু খেয়ে বাঁচতে হবে না।

মাছের বাকী প্রধান খাদ্য হচ্ছে সেইজাতীয় পদার্থ। বি, মাখন, তেল, চর্বি ইত্যাদি এর

দুইভাগ। এরা সব রিসাসারিন ও মেহোলের সংযোগ-যুক্ত সয়ল সহজ রাসায়নিক পদার্থ। বাজারে মাখনের বদলে যে অলিওমার্গেরিন বিক্রী হয়, তা হচ্ছে একটি আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। রিসাসারিনের সংশ্লেষণ এখন রাসায়নিকবিদদের অজানা নয়। প্যারাকিন ও অক্সিজেনের সংযোগে মেহোল স্থিতির পরীক্ষাতেও ভাল কল পাওয়া গেছে। এতে তবিল্যেই সেই তৈরির কারখানা প্রতিষ্ঠার সম্ভাবনা বেড়ে উঠেছে। বাজারে যে ডেজিটেবল যি বা বনস্পতি বিক্রি হয়, সেগুলি অনেকটা অলিওমার্গেরিনের মত আংশিক কৃত্রিম পদার্থ। খাদ্য হিসাবে অল্পপযোগী নানাবিধ তেলের সঙ্গে হাইড্রোজেন গ্যাসের রাসায়নিক সংযোগে এদের স্থিতি হয়। এরূপ প্রক্রিয়ার অল্পখটক হিসাবে নিকেল খাতের ব্যবহার হয়।

শর্করা, খেতসার, প্রোটিন এবং সেই পদার্থের সংশ্লেষণ প্রক্রিয়া যেদিন সহজ, তুলত ও পাকা-পাকি হবে, উদ্ভিদের দাসত্ব থেকে মাছের পুষ্টির উপায় মিলবে সেদিন। চাষের জরি তখন বেশীর ভাগ পরিণত হবে বাগের ভূমিতে। সেদিন আসবে মানব-সত্যতার সবচেয়ে বড় এবং সার্বিক বিপ্লবের বাণী বহন করে। মাছের সমাজে জীবন-সংগ্রামের উগ্রতা শান্ত হয়ে যাবে। কিন্তু এসব কৃত্রিম খাদ্য মাছের বাস্তবকার কতটা উপযোগী—এরূপ প্রশ্ন অপ্রাসঙ্গিক নয়। আগেই বলা হয়েছে যে, কার্বোহাইড্রেট, প্রোটিন ও মেহরুপে তিন জাতীয় বিনিময়ী খাদ্য ব্যতিরেকেও বাস্তবকার ক্ষেত্রে চাই বিবিধ লবণ জাতীয় পদার্থ এবং খাতের পদার্থ। কৃত্রিম খাদ্যে হবে এদের সম্পূর্ণ অভাব। উত্তরে বলা যায়, এসব পদার্থ কৃত্রিম খাদ্যে আবশ্যিক মত মিশিয়ে দেওয়া যেতে পারে। তা সত্ত্বেও রূপ, রস, গন্ধ বিবর্জিত কৃত্রিম খাদ্যে মাছের শারীরিক প্রক্রিয়ার কোন ব্যতিক্রম ঘটবে কিনা, তার অন্তঃস্রাবী গ্রহণনুহের কোন

বৈবাহিক ঘটনাকে বিনা, এসব গুরুতর প্রবন্ধের কোন সঠিক উত্তর দেওয়া বর্তমানে সম্ভব নয়। কিন্তু মানুষের মনের এবং অজ্ঞতার প্রাচুর্য এতে যে এক বিপর্যয় ঘটতে পারে, তার আশঙ্কা করা হয়তো অসম্ভব নয়। মানুষের দেহ একটি বস্তু হলেও তার বিশেষত্ব আছে। এই বস্তুটি হচ্ছে সজীব; মনের সঙ্গে রয়েছে এর অজ্ঞাত সত্ত্ব। মনের আশ্রয়ের উপর নির্ভর করে বহুলাংশে দেহের আয়তন। মনের আয়তন নষ্ট হলে সর্বল দেহ নিভেও মানুষ অকর্মণ্য হয়, সমাজে তাদের সংখ্যা যায় তাতে বেড়ে এবং সমাজ হয় ছিন্নভিন্ন। প্রকৃতির প্রাচুর্য জড়, উদ্ভিদ ও প্রাণীতে মিলে

পরস্পরের সহযোগিতায় সৃষ্টি করেছে বৈচিত্র্যের মধ্যে এক বিরাট ঐক্য। জড়ের মধ্যে যে প্রাণের স্পন্দন লুপ্ত আছে, বাস্তবপে উদ্ভিদবোলে প্রবেশ করে তার বিকাশ ঘটে। উদ্ভিদ থেকে পুষ্কার বাস্তবপে প্রাণী এবং মানুষের দেহে হয় তার পূর্ণাপূর্ণি আগমন। পরিণেবে মানুষের এর পরিণতি ঘটে বুদ্ধি এবং চেতনার। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্যের শৃঙ্খল থেকে উদ্ভিদকে বাব দিতে গেলে প্রকৃতির অন্তর্নিহিত ঐক্য বাবে ছিন্ন হয়ে। কলে প্রাকৃতিক অভিযান্ত্রিক উদ্ভাবনের একটি সোপান বাবে তেড়ে। এতে মানুষের কল্যাণের পথ পরিণামে রুদ্ধ হয়ে যেতে পারে।

“বাঙালার এমন দীনহীন কাজাল, হতাশাগ্রস্ত কে আছে তাই, যে আজ বিধাতার যজ্ঞলব্ধ আশ্রানে আহত হইয়া মাতৃভূমির ও মাতৃভাষার আরাতির জন্ত নৈবেদ্যোপচার লইয়া সমুপস্থিত না হইবে? ধনি! তুমি তোমার অর্থ লইয়া, বলি! তুমি তোমার বল লইয়া, বিদ্বান! তুমি তোমার অজিত বিজ্ঞা লইয়া, সকলে সমবেত হও!”

আজ আমরা যুগসন্ধিস্থলে দণ্ডায়মান। সমস্ত ভারত আজ আমাদের দিকে সোৎসাহনেতে চাহিয়া রহিয়াছেন, স্বর্গ হইতে পিতৃপুরুষ আমাদের কার্যাবলী লক্ষ্য করিতেছেন। আজ আমরা জাতীয় জীবনে এমন এক স্তরে দণ্ডায়মান, যেখানে আমাদের সম্মুখে দুইটি মাত্র পথ, একটি অনন্ত অমরত্বের, অপরটি অনন্ত অকীর্তির, মধ্যপথে আর কিছু নাই। আজ যদি আমরা তুচ্ছ আয়াসে মজিয়া তবিশ্রুৎ প্রেরিত এই মহাত্মার উপেক্ষা করি, তবিশ্রুৎ বংশাবলী আমাদের বিধায়িতক উপাধিতে কলঙ্কিত করিবে, ভারতাকাশের উদীয়মান রবি উষ্মার উষ্মেবেই হার, আবার অন্তিমিত হইবে।”

আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র



# কলকাতার ভূগর্ভ রেল : একটি সমীক্ষা

সাবিনচন্দ্র রায়\*

কলকাতার বাতী-পরিবহনের সমস্যা দিনের পর দিন বেতাবে বেড়ে চলেছে, তার সূহৃৎ সমাধানের অজ্ঞে চাই উন্নতমানের পরিবহন-পরিকল্পনা। এই পরিকল্পনাকে দ্রুত এবং অধিক সংখ্যক বাতী বহনের উপযোগী করে তুলতে হবে। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের সাহায্যে যদি এই সমস্যার সুরাহা করা যায়, তবে কলকাতার যত জনবহুল শহরের অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার ও উন্নয়নমূলক কাজে তাই হবে একমাত্র যুগান্তকারী ঘটনা। শহরতলীর ক্রমবর্ধমান বাতীদের মহানগরীর কেন্দ্র-স্থলে পৌঁছে দেওয়াই প্রস্তারিত ভূগর্ভ-রেলপথের উদ্দেশ্য। পৃথিবীর বহু দেশই যানবাহনহীন শহরের দ্রুত বাতীবহনের সমস্যার সমাধান ভূগর্ভস্থ করেছেন।

পরিবহন-সমস্যার সঙ্গে বৃহত্তর কলকাতার শহরের উন্নয়নকর্ম একটি অঙ্গর হয়ে বিধা। জন-সংখ্যার অস্বাভাবিক প্রাবল্য, যানবাহনের ক্রিষ্টতা, ফুটপাথের বাসিন্দা ও পথচারী অসংখ্য যাত্রীদের চাপে কলকাতার পথেঘাটে যেন সব-সময়ই অস্তহীন অবরোধ সৃষ্টি হয়ে চলেছে। তার উপর আছে বর্ষা। বর্ষা বর্ষণেই অধিকাংশ জরুরী পথেঘাট এবং মুখ্য শিল্পাঞ্চলগুলি জলমগ্ন হয়ে পড়ে। সূহৃৎ ড্রেনেজ ব্যবস্থার অভাবে জল নিষ্কাশনেরও তেমন সুবিধা নেই, অধিকাংশ আবার অকোজো। কলে জীবনযাত্রা হয় ব্যাহত। শহরের উন্নয়নমূলক কাজে সূচিত্তিত পরিকল্পনার অভাবেই যে নাগরিক জীবনযাত্রার এই দুর্বিপাক, তা সহজেই অঙ্গনের। তাছাড়া এত বড় প্রাণচকল মেট্রোপলিটান শহরের সূহৃৎ বৃহত্তর প্রান্তের মধ্যে পারাপারের একমাত্র সেতু হাওড়া ব্রীজ। দিনে

5,10,000 লোকের নিত্য যাতায়াত এর উপর নির্ভর করে। তাছাড়া আছে রকমারি গাড়ী-ঘোড়ার কোয়ার। কলত: প্রাণচকল যাত্রীদের কর্মের সূহৃৎ পড়ে তাটা। সূহৃৎ পরিবহন-ব্যবস্থা ও যাতায়াতের উপযোগী বিকল্প সাবওয়ে ব্যবস্থার প্রবর্তন ছাড়া জনসংখ্যার এই অস্বাভাবিক চাপ ও যানবাহনের তিড় কমানো সম্ভব নয়। ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের মাধ্যমে দ্রুত বাতীবহনের পরিকল্পনাকে যদি সূহৃৎ রূপ দেওয়া যায়, তবে শহর কলকাতার সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থারও জটিলতা কিছু কমবে। শহরে বাতীর তিড় কমবে, বৃহত্তর কলকাতার সমৃদ্ধি ও শিল্প-সংস্কৃতির উন্নতি উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাবে। গও করেক বছরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা গেছে যে, সরকারী পরিবহন-ব্যবস্থার অধীন যে কয়টি ইন্ড ও বাস আছে, বৃহত্তর শহরের অগণিত যাত্রীদের পক্ষে তা মোটেই পর্যাপ্ত নয়। পৃথিবীর অস্তান্ত সমৃদ্ধ শহরের যত ভূগর্ভস্থ রেলপথ ছাড়া এ-নুগের সর্বাঙ্গেক জনবহুল শহর কলকাতার বাতীর তিড় কমানো এবং যান-বাহনের চাহিদা পূরণ করা যে কোনক্রমেই সম্ভব নয়, সে বিষয়ে প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই একমত হবেন। তার ফলে দ্রুত বাতীবহনের কাজ যেমন দ্রুতগতি হবে, অস্তদিকে তেমনই প্রায় শতকরা পঞ্চাশ-তাগ বাতালী বেকার ইজিনিয়ারের কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটবে বলে আশা করা যায়।

ভূগর্ভ রেলের অজ্ঞে উত্তর-দক্ষিণে ও পূর্ব-পশ্চিমে দুটি রেলপথের প্রয়োজন হবে। উত্তর-দক্ষিণে

\*কুলজিহান কর্পোরেশন ( ই: ) লি.

কলিকাতা—16



দমদম থেকে বেহালা পর্যন্ত 13 মাইল ভূগর্ভ রেলপথ পাইকপাড়া, ভায়বাজার, চিত্তরঞ্জন আর্কিভিউ, এন-গ্রানেন্ড, ময়দান, আভতোব-ভামাঙ্গসাব সুখার্মী রোড, মসা রোড, বীরেন শাসন রোড, টালিগঞ্জ ইত্যাদি ভিণ্ডো ও বেহালা পর্যন্ত যাবে। পূর্ব-পশ্চিমে সাড়ে তিন মাইল ভূগর্ভ রেলপথ শিয়ালদহ স্টেশন থেকে বিনিময়বিহারী গাঙ্গুলী স্ট্রীট বরাবর ব্র্যাবোর্ণ রোডের মোড় পর্যন্ত অথবা আচার্য প্রফুল্লচন্দ্র রোড, ধর্মতলা স্ট্রীট, সুবোধ মল্লিক ফোরার, গণেশ আর্কিভিউ, ডালহৌসি ফোরার, ব্র্যাবোর্ণ রোড, তারপর হুগলী নদীর তলা দিয়ে হাওড়া স্টেশন পর্যন্ত যাবে। এই দুটি ভূগর্ভ রেলপথের মোট দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে সাড়ে 16 মাইল। রাজস্বসাধারণের চাপ, অত্যন্ত বান-বাহনের সুবিধা ইত্যাদি বিবেচনা করে স্টেশনগুলির স্থান নির্বাচন করা হবে। এই রেলপথে স্বয়ংক্রিয় ট্রেন চলবে 120 থেকে 150 সেকেন্ডে একখানি করে; অর্থাৎ ঘণ্টার আগ-ডাউনে প্রায় 400,000 জন রাজস্ব চলাচল করতে পারবেন।

এখন প্রশ্ন, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথের উপযুক্ত কিনা? এই বিষয়ে অনেকেই ভ্রান্ত ধারণা আছে যে, কলকাতার মাটি এই পরিবহনের পক্ষে অসুপযুক্ত। আবার যদিও প্রয়োজনের পক্ষে ও নন্দনকলার পরিপ্রেক্ষিতে ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনার কথা তাঁরা স্বীকার করেন, তথাপি তার বিপর্যয়ের কথাও তাঁদের বলতে শোনা যায়। কিন্তু এই সব ধারণা বিভ্রান্তই অজ্ঞতাগ্রস্ত। একথা বেশ জোর দিয়েই বলা যায় যে, কলকাতার মাটি ভূগর্ভ রেলপথ স্থাপনের পক্ষে বটেই উপযুক্ত। আমেরিকার কিলান্ডেলকিয়া শহরে মাত্র দু-তিন ফুট মাটি খুঁড়লেই জল বেরিয়ে পড়ে, তবু সেখানে ভূগর্ভ রেল চলছে। কলকাতার মাটি সে জলনার

অবোগ্য হবে কেন? তাই যদি হবে, তবে কলকাতা বহুতলা বাড়ীগুলির তার সহ্য করছে কেমন করে? কাজেই ভূগর্ভ রেল কলকাতা শহরে না হবার কোন বৃত্তি নেই। তবে কলকাতার মাটিতে ভূগর্ভ রেলকে বেশী নীচে নামানো যাবে না, মাত্র কুড়ি ফুট গভীরে রাখতে হবে। প্রশ্নও রাজস্বগুলির মাটির নীচে দিয়ে রেলপথ তৈরি করা যাবে, তাতে রাজস্ব পাশের বাড়ীগুলির কোন ক্ষতি হবে না—ক্ষতি হয়তো কিছুটা হবে ভূগর্ভই ড্রেনের। তবে ড্রেন ভূগর্ভই রেলের সুড়ঙ্গের দু-পাশে সরিয়ে আনা যায়। কলকাতার ড্রেনের বা অবস্থা, তাতে নতুন ড্রেনও করা দরকার। তাতে লাভ বই লোকসান নেই। 'কাট অ্যাও কিল' প্রকার মাটি কেটে নীচে থেকে সিমেন্টের কাজ আরম্ভ করা যাবে বলে রেলপথের জন্তে সাবওয়ে তৈরি করতে খরচও তেমন বেশী পড়বে না। এর জন্তে বর ব্যয়ে প্রয়োজনীয় উন্নত কারিগরী সুবিধা পাওয়া খুবই সম্ভব। সুড়ঙ্গ নির্মাণের জন্তে ব্যয় সাধারণতঃ বেশী পড়ে এবং প্রস্তাবিত সাত মাইল ভূগর্ভ রেলপথের জন্তে মাত্র অল্প এলাকাতেই তা তৈরির দরকার হবে।

চার বছরের মধ্যেই প্রথম পর্যায়ের কাজ শেষ হবে। আপাততঃ শিয়ালদহ থেকে ডালহৌসি, ডালহৌসি থেকে কালীঘাট পর্যন্ত রেলপথ স্থাপন সম্ভব। এতে মোট ব্যয় হবে 60 কোটি টাকার মত। কলকাতার রাজস্ব-পরিবহনের নিরাক্রম সমস্যার এই খাতে ব্যয়ের হিসাব বৃদ্ধিসাপেক্ষ। লক্ষ লক্ষ নগরবাসী এতে উপকৃত হবেন। তাছাড়া খরচের টাকা কালক্রমে টিকিট বিক্রীর টাকা থেকে নিশ্চয়ই উঠে আসবে। বৃহত্তর শহরের সার্বিক উন্নয়নমূলক কাজকর্মের সার্বিক স্বপায়ণ এই পথেই সম্ভব।

# ভারতের কৃষি-সমস্যা

## শ্রীমতীলকুমার মুখোপাধ্যায়\*

ভারতের জনসংখ্যার প্রায় 80% প্রত্যক্ষভাবে কৃষিজীবী, পরোক্ষভাবে আরও 10%-এর জীবিকা নির্ভর করে কৃষির উপর। এই 80 শতাংশই সমগ্র ভারতের খাদ্যোৎপাদন করে। জনসংখ্যার অল্পপাণ্ডে প্রয়োজনমত খাদ্যোৎপাদন হয় না। বাইতি পূরণের অন্তে বর্ষা, খাইল্যাও এবং বর্তমানে আমেরিকা থেকে খাদ্যদ্রব্য আমদানী করার প্রয়োজন হচ্ছে। পাশ্চ সন্দর্কে পরসুখাপেক্ষিতা অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রনৈতিক দিক থেকে হানিজ-ক তো বটেই, নীতিগতভাবেও বর্জনীয়।

কৃষি কেবলমাত্র বাতাই উৎপাদন করে না, শিল্প-বাণিজ্যের মূল বস্তুও উৎপাদন করে। খাদ্যোৎপাদনকে এগিয়ে নিতে যদি অধিকতর জমি খাদ্যশস্যের অন্তে ব্যবহার করি, তাহলে শিল্প-বাণিজ্যও সেই অল্পপাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হবে এবং দেশের সামগ্রিক অর্থনৈতিক ভারসাম্য ব্যাহত হবে। অতএব দেখা বাচ্ছে যে, কৃষি-সমস্যা সমগ্র দেশেরই সমস্যা।

শস্যোৎপাদন নির্ভর করে নানাবিধ স্রবোগ-সুবিধা ও প্রয়োজনীয় উপাদানের উপর। এদের মধ্যে জমির পরিমাণ ও গুণাগুণ, জলসেচ, বীজ, সার, কীটনাশক-দ্রব্য, কর্ষণের যন্ত্রাদি এবং সর্বশেষ বাছব কৃষক বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

শতকরের বিহুতির স্রবোগ ভারতবর্ষে কেন, অন্ততও ক্রমশঃ সীমিত হয়ে আসছে। বস্তুতঃ বিজ্ঞানীরা শস্যোৎপাদনের কেন্দ্র হিসাবে ক্রমশঃ মাটি ছেড়ে জল এবং সমুদ্রতলের কথা ভাবতে আরম্ভ করেছেন। আবাদের দেশে অনাবাদী সমস্ত জমি কৃষিযোগ্য করলেও বর্তমান উৎপাদনের হার যদি না বৃদ্ধি করা যায়, তাহলে

কোনমতেই খাদ্যের চাহিদা মেটাতে পারবে না। অতএব প্রতি একরের উৎপাদনের হার বাড়ানোই একমাত্র পথ।

উন্নত জাতের বীজ ও তৎসহ প্রয়োজনীয় সার ও জলের সাহায্যে উৎপাদন 2/3 ভাগ বৃদ্ধি করা খুবই সহজ। কিন্তু সমস্যা হলো, উপযুক্ত পরিমাণ উন্নত জাতের বীজ সংগ্রহ করা এবং সার ও কীটনাশক-দ্রব্যাদির ব্যবস্থা করা। এই সমস্যা চাই বখেট পরিমাণ সেচের জল।

বিবিধক্ষে একমাত্র গম ব্যতীত অন্ত সব শস্যের বেলায় অপেক্ষাকৃত অল্প জমিতে 'চাবের কারণ, অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় জলের অভাব। গমের বেলায় লক্ষ্যের জলবার প্রকৃত আরতম অধিকতর। এর মূলে রয়েছে উন্নত জাতের বীজের উপযুক্ত ব্যবহার। প্রধাণতঃ পাক্ষাব এই অভূত-পূর্ব সাক্ষ্যের কৃতিত্ব পেতে পারে।

চতুর্থ প্রকল্পে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহারের উপর বিশেষ জোর দেওয়া হবে। কারণ, দেখা গেছে যে, যদি খাদ্যোৎপাদনে অরৎসম্পূর্ণতা লাভ করতে হয়, তাহলে উন্নত জাতের বীজ, আত্মবলিক সার, জল ইত্যাদির ব্যবহার অসিবার্ধ।

সেচের জল বখেট পাওয়া গেলে একাধিক ফলনের পদ্ধতিও প্রসারিত করা সম্ভব হবে। বস্তুতঃ 1973-'74 সালে এই প্রকল্প অল্পসারে মোট 400 লক্ষ একর জমি চাষ করা সম্ভব হবে। বর্তমানে (1968-'69) মাত্র 150 লক্ষ একর জমি এই পদ্ধতিতে চাষ করা হচ্ছে।

সার, যন্ত্রাদি ( ট্র্যাক্টর, পাম্প ইত্যাদি ), কীটনাশক

ঔষধাদি কৃষি-উন্নয়নের অত্যন্ত উপাদান। গত 8/9 বছরে এদের ব্যবহার প্রকৃত পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। এই সমস্ত উপাদান বৃদ্ধি সত্ত্বেও উৎপন্ন বাতশস্তের পরিমাণ বেড়েছে যাত্র 11-3%। জন-প্রতি দৈনিক বাতশের পরিমাণ কিন্তু কমেছে।

### জল

কৃষি-উন্নয়নে যে বস্তুটির সর্বপ্রথম প্রয়োজন— সেটি হলো জল। এত সহজলভ্য অথচ এত মূল্যবান আর কোন কিছু আছে কিনা সন্দেহ।

জলসেচের সুযোগ পর্ষাণ্ড থাকলে শস্তোৎপাদন কত পরিমাণ বাড়ানো যায়, তা পাক্সাবের দৃষ্টান্ত থেকে বোঝা যায়। পাক্সাবে জলসেচের পরিমাণ 59% (নেট জলসেচত্বুক্ত জমি/নেট চাষত্বুক্ত জমি  $\times 100$ ), যেখানে সর্বভারতীয় পরিমাণ যাত্র 20%। একত্রে সেখানে একাবিকবার চাবের পরিমাণ সর্বভারতীয় পরিমাণের ত্রিত্বেরও বেশী, অর্থাৎ 33%। কেবল জলসেচের ব্যবহার যাত্রাই সুবিধানাতে জমির উৎপাদন-ক্ষমতা চত্বুক্তণ বাড়িয়ে দেওয়া সম্ভব হয়েছ।

সৌভাগ্যের বিষয়, আমাদের কৃষির উপযোগী জলের যে পরিমাণ মজুদ আছে (জলের উপরি ভাগে 13,600 লক্ষ একর ফুট এবং জমির নীচে 1650 লক্ষ একর ফুট), তাকে উত্তমরূপে ব্যবহার করলে আগামী 20 বছরে শস্তোৎপাদন ক্ষমত্বর্ধমান হারে 4% বাড়িয়ে দেওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, অধিক যাত্রার জল ব্যবহারের সঙ্গে যে কয়েকটি অন্ত্রবিধা রয়েছে, সেগুলির প্রতি সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। তার মধ্যে জল-নিষ্কাশন ও লবণাক্ত জলের আক্রমণ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জলের প্রকৃত পরিমাণ নির্ধারণকরে এবং ব্যবহারের কল সম্পর্কে যথেষ্ট গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

জলসেচের সঙ্গে সঙ্গে চাবের পদ্ধতির উন্নয়ন, উন্নত জাতের বীজ, সার ও কীটন্ত্র ক্রম্যাদির

ব্যবহারের যাত্রা নির্দিষ্ট কতকগুলি জারসার কৃষি-সম্পদ এত অধিক বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছ যে, জন-সাধারণের মধ্যে অভূতপূর্ব লাড়া পড়ে গেছে।

কল সম্পর্কে আরও একটু সতর্কতার কথা উল্লেখ করা উচিত। কৃষি-সমৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শিল্প-বাণিজ্যের উন্নতি অনিবার্ধ। তার জন্তেও জলের চাহিদা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাবে নিঃসন্দেহে। অতএব যে জলসম্পদ রয়েছে, তাকে উপযুক্তভাবে ব্যবহার করা বেদন দরকার হবে, তেমনি জলের নতুন উৎসের কথাও চিন্তা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে সমুদ্রজলকে লবণমুক্ত করে ব্যবহারের চেষ্টা অত্যন্ত দেশে চলছে।

### রাসায়নিক সার

প্রতি একরে উৎপাদন বাড়াতে হলে সার ব্যবহার অনিবার্ধ। বিশেষ করে উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার করতে গেলে এবং একাবিক কলন প্রকল্প সাকল্যমণ্ডিত করতে হলে সার, জল ও কীটন্ত্র ঔষধাদি ক্রমশঃ বর্ধিত হারে প্রয়োগ করতে হবে। যথেষ্ট পরিমাণ সার আমাদের দেশে তৈরি হচ্ছে না। বর্তমান চাহিদা মেটাতেই আমদানির প্রয়োজন হয়। এই সমস্তার সমাবান হলো অধিক সংখ্যক সার-উৎপাদন কারখানা তৈরি করা। কিন্তু যেটুকু সার প্রস্তুত হচ্ছে এবং বর্তমানে বা আমদানী হচ্ছে, তার সমস্তই যদি বিজ্ঞানসম্মত উপারে প্রয়োগে করা যায়, তাহলে অধিকতর সুকল লাভের সম্ভাবনা আছে। সারের দ্রুত ব্যবহারিক দিক রয়েছে—পরিমাণ ও উৎকর্ষ। পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় পরীক্ষালব তথ্যের উপর নির্ভর করে। প্রারম্ভঃ বৃত্তিকাহিত উদ্ভিদ-খাত কি পরিমাণ রয়েছে, তার হিসাব না করেই সর্বত্র একই ভাবে সার প্রয়োগ করা হয়। এতে দেবা গেছে যে, প্রয়ো-জনাত্তিরিক সার ব্যবহার করে মূল্যবান সারের অপচয় ঘটেছে। অতএব বৃত্তিকা বিশ্লেষণ করে

এখনেই জানা দরকার, কি পরিমাণ উদ্ভিদ-খাদ্যে ভাতের বন্ধন আছে এবং তার মধ্যে কতখানি গ্রহণযোগ্য ব্যবহার পাওয়া যাচ্ছে। এই তথ্যের উপর ভিত্তি করে সারের পরিমাণ নির্ধারণ করলে অপচয় এড়ানো যায়। চুংখের বিষয় সার প্রয়োগের ব্যাপারে এখনও যুক্তি বিস্তারিতের প্রতি বসেই দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে না।

সারের উৎকর্ষ সম্পর্কে বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চলছে। কোন রাসায়নিক পদার্থ সার হিসাবে অধিকতর কার্যকরী হবে, তা বিশেষভাবে নির্ভর করে শস্যের প্রকৃতির উপর এবং কোন কোন ক্ষেত্রে যুক্তিকার গুণাগুণের উপর। উদ্ভিদ নাইট্রেট হিসাবেই নাইট্রোজেনকে সহজতর উপায়ে গ্রহণ করতে পারে, কিন্তু নাইট্রেট সহজজাতীয় বলে মাটি থেকে দ্রুত নিকাশিত হয়ে যায়। তুলনার অ্যামোনিয়াম আয়ন হিসাবে ব্যবহার করলে যুক্তিকার সাময়িকভাবে আবদ্ধ অবস্থার থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণতঃ অ্যামোনিয়া নাইট্রেটে রূপান্তরিত না হলে কার্যকরী হয় না। অল্প দিকে দেখা গেছে যে, নাইট্রোজেন কস্করাস সহযোগে অধিকতর কার্যকরী। এজন্তে অ্যামোনিয়াম কস্কেট এবং নাইট্রো-কস্কেটের ব্যবহার ক্রমশঃ বৃদ্ধি পেয়েছে। সিন্ধী সার কারখানার বিজ্ঞানীরা গত পাঁচ বছরে কয়েক হাজার পরীক্ষার দ্বারা এই ফির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, নাইট্রো-কস্কেটেই অধিকতর ফলদায়ী, অথচ অপেক্ষাকৃত ব্যয়সাধ্য। এক্ষণে পরীক্ষালব্ধ নতুন নতুন তথ্যের সাহায্যে সার প্রয়োগের সার্থকতা পূর্ণমাত্রায় উপলব্ধি করা বাহনীর।

গত বোল বছরে নাইট্রোজেন, কস্করাস ও পটাসের ব্যবহার বেড়েছে বনাক্রমে 11 গুণ, 70 গুণ এবং 50 গুণ। কিন্তু আমরা বরাবর প্রায়শ্চর্ষক পরিমাণ নাইট্রোজেন এবং এক-তৃতীয়াংশ কস্করাস আবদানী করে আসছি। নিজস্ব কোন ভাল উৎস না থাকবার জন্তে সমস্ত পটাসই আম-

দানী করতে হচ্ছে। অতএব বহুদূর্য বৈদেশিক মুদ্রার বিনিময়ে যে সার পাই, তার ব্যবহার সতর্কতার সঙ্গে করতে হবে। অত্রজাতীয় বনিক পদার্থ থেকে (বিশেষভাবে অপচিৎ অংশ থেকে) সহজলভ্য উপায়ে পটাস আহরণ করতে পারলে পটাসের সমস্তার কিছুটা সমাধান হতে পারে। পরীক্ষার সাহায্যে দেখা গেছে যে, অল্প থেকে প্রত্যক্ষভাবেই উদ্ভিদাদি পটাস গ্রহণ করতে পারে। এদিকে যুক্তিকা-বিজ্ঞানীদের মনোযোগ দেওয়া উচিত।

### উন্নত জাতের বীজ

বিজ্ঞানের নতুন নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে অধিক ফলনশীল, আলোকসংবেদনহীন, অপেক্ষাকৃত কমমেরাদী অভূষারী ও ধ্বংসাত্মক-উদ্ভিদের উদ্ভব অল্প সময়ে সম্ভব হয়েছে। বহু গবেষণাগারে নতুন জাতের শস্যবীজ উৎপন্ন করবার কাজ দ্রুতগতিতে অগ্রসর হচ্ছে।

ইতিহাস শ্রেণীর ধাতুর মধ্যে তাইওয়ানে প্রথম এক চীনা বিজ্ঞানী ধ্বংসাত্মক, কমমেরাদী, অভূষারী এবং আলোকসংবেদনহীন একটি মিউট্যান্ট (Mutant) আবিষ্কার করেন। এটির নাম দেওয়া হয় ডি-জি-বুগেন। এথেকেই 1956 সালে জন্ম হয় টি-এন-1-এর। টি-এন-1-এর সঙ্গে 'পেতা'র মিলনে উৎপন্ন আই-আর-8-কে বলা হয় অভূষারী ধাতুবীজ। আই-আর-8 ধ্বংসাত্মক এবং অভূষারী হবার ফলে আলোর সাহায্যে কার্ভোহাইড্রেট জাতীয় দ্রব্য সংশ্লেষণ করতে যেমন সক্ষম, তেমনই অধিকমাত্রায় সার প্রয়োগে ফলন বৃদ্ধি করতেও অক্ষম।

হানীর দীর্ঘকাল ধাতুর সঙ্গে আই-আর-8-এর মিলনে কটকে ধাতু গবেষণা কেন্দ্রে কয়েকটি নতুন জাতের বীজ সৃষ্টি করা হয়েছে। তার মধ্যে জরা, পদ্মা, হংসা ও অরুণা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। কোন কোন ক্ষেত্রে জরা আই-

আই-৪-এর তুলনায় 5-10% অধিকতর কলন দেয় এবং হ্রস্বতর। বর্তমান বছরে ‘ককণা’ নামে একটি নতুন জাতের খাদ্যবীজ মুক্ত করা হবে।

নতুন জাতের বীজের একটি প্রধান সমস্যা হলো, এরা যেটা দানার খান দেয় এবং খেতে সুস্বাদু নয়। মিহি দানার অর্ধচ অধিক কলন-শীল বীজের চাহিদা যেটার জন্তে ‘বহুমতী’র সঙ্গে মিলনে জাত বি-সি-5 এবং বি-সি-6 নামক দুটি বীজ মুক্ত করা হবে। এই দুটিই দিল্লীর কৃষি গবেষণা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষার কল। অল্পকণ মিহি দানার খাদ্যবীজ আই-আর-20 এবং আই-আর-22 আন্তর্জাতিক খাদ্য গবেষণা প্রতিষ্ঠানের অবদান। ক্রমশঃ এই প্রকার সফর জাতীয় বীজ সৃষ্টির প্রতি দৃষ্টি দেওয়া হচ্ছে এবং সর্বভারতীয় একত্র হিঁসাবে অধিকতর উপযুক্ত ও খর্বতর সফর বীজের অঙ্গসন্ধান ও অঙ্গশীলন চলছে।

নতুন জাতের খর্বকার খাদ্যের একটি প্রধান অঙ্গবিধা হলো, রোগ প্রতিরোধের অক্ষমতা। কিন্তু বিজ্ঞানীরা এই অঙ্গবিধা দূরীকরণে বদ্ধ-পরিকর। সমস্ত বতই কঠিন হচ্ছে, বিজ্ঞানীরাও সংগ্রামী মনোবৃত্তি নিয়ে ততোধিক উৎসাহের সঙ্গে গবেষণার ত্রুটি হচ্ছেন নতুন নতুন প্রতিবেশক আবিষ্কারের জন্তে।

কীট, ছত্রাক, ইঁদুর, তাইরাস ইত্যাদির আক্রমণ প্রায় 10-30% খাদ্যশস্য ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সমরোপযোগী রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করলে এই ক্ষতির পরিমাণ হ্রাস করা খুবই সহজ। হিসাব করে দেখা গেছে যে, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থের দ্বারা খাদ্যে 9.4%, গমে 2.4%, জোয়ারে 12.1%, তুলার 40.3%, ইন্ডুতে 88% এবং আলুতে 10.8% শস্য বৃদ্ধি করা হয়েছে।

সাধারণতঃ রোগের আক্রমণের পরেই প্রতিবেশক রাসায়নিক দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়। যদি সময়মত ব্যবহার করা যায়, তাহলে রোগ

প্রতিরোধ করা সম্ভব। কিন্তু বহু ক্ষেত্রে সময়মত ঔষধাদি পেতে এবং সেজন্যিকে কান্ডভাবে শস্তে ছড়িয়ে দেবার বাস্তব এবং অনিচ্ছাকৃত অস্ত্রার আছে। অতএব অস্ত্রাভি পদ্ধতি সম্পর্কে গবেষণা চলছে; যথা—বগনের পূর্বে বীজগুলিকে রোগমুক্ত করা অথবা বীজগুলিকে প্রতিবেশক দ্রব্যে কিছু সময় ভিজিয়ে রাখা। এই পদ্ধতি অবলম্বনে আশাহুস্ত্রণ কললাত হয়েছে। অধিক মূল্যে আমদানী করা ঔষধের ব্যবহার অনেক দিন চলতে পারে না। সুতরাং অঙ্গমূল্যের ঔষধাদির সন্ধান আমাদের রসায়নবিদগণের লিঙ্গ হওয়া দরকার।

### অম্লজাত কৃষি-ব্যবস্থা

বারিপাতের উপর ভিত্তি করে সাধারণতঃ পূর্ণ আর্দ্র, অম্লজাত, মৃদু আর্দ্র ও অনার্দ্র—এই চারভাগে ভূমি বিভাগ করা হয়। রাজস্থান, উজ্জয়ী রাজ্যের মধ্যাংশ, সৌরাষ্ট্র এবং বহারাষ্ট্র ও মহীশূরের কতকংশ অম্লজাত ভাগে পড়ে। এখানকার জলের উৎস কেবল-যাত্রা বৃষ্টি। এই এলাকার কোন দৃঢ় কৃষি-ব্যবস্থা সম্ভব নয়। কিন্তু পরবর্তী মৃদু আর্দ্র এলাকার বিজ্ঞানসম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা সম্ভব। চতুর্থ প্রকল্পে মৃদু আর্দ্র এলাকার বিজ্ঞান-সম্মত উপায়ে চাষের ব্যবস্থা হচ্ছে। যুক্তিকা ও জল সংরক্ষণের সমস্ত ব্যবস্থা অবলম্বন করা হবে। জল সংরক্ষণের জন্তে পলিথিন, কাগজ অথবা অ্যানুমিনিয়াম পাতার ঢেকে দেওয়া সম্পর্কে গবেষণা হয়েছে এবং বাস্তব ক্ষেত্রেও প্রয়োগ করা হয়েছে। যে সব বীজ দ্রুত বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় এবং আলোকসংবেদনহীন, সফর প্রজনন পদ্ধতিতে সেই ধরনের বীজের উদ্ভব হয়েছে। এই সব অম্লজাত স্থানে রেড়ি, অড়হর ও জোয়ার সাফল্যের সঙ্গে চাষ করা হয়েছে। তৈল এবং তুলাবীজও ‘অম্লজাত’ এলাকার চাষ করা হয়। সুতরাং নতুন

জাতের বীজ নিয়ে এদের চাষ এবং কলন বৃদ্ধি করা কলকারী হবে। সার মাটিতে না দিয়ে পাড়ার ছড়িয়ে দিলে একই কল পাওয়া যায়, অথচ জনের প্রয়োজন হয় কম। সুতরাং অমাত্র্য এলাকার এই পদ্ধতিতে সার ব্যবহার বাছনীয়।

### খাদ্য প্রোটিন

খাদ্যশস্যের পরিমাণগত প্রয়োজনীয়তাই আমাদের সমগ্র দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে খাদ্যের গুণাগুণ নিয়ে আলোচনা খুব কমই হয়েছে। আমরা জানি যে, খাদ্যে উপযুক্ত প্রোটিনের অভাব অত্যন্ত ব্যাপক, বিশেষ করে দরিদ্র কৃষক ও মজুরদের খাদ্যে। প্রোটিনের অভাবে কেবল যে দেহবৃদ্ধি বাধা পায় তাই নয়, দেহের রোগ প্রতিরোধ-ক্ষমতাও হ্রাস প্রাপ্ত হয়। কিন্তু প্রোটিন খাদ্য সাধারণতঃ মহার্ঘ বলে অনেকেই যথেষ্ট প্রোটিন গ্রহণ করতে পারে না। অতএব অল্পমূল্যে খাদ্যে উপযুক্ত পরিমাণ প্রোটিন পরিবেশন একটি গুরুতর সমস্যা। এই সমস্যার সমাধানে সন্ধানিত অনেকখানি সাহায্য করতে পারে বলে মনে হয়। সন্ধানিত প্রায় ৪০% প্রোটিন এবং ২০% তৈলজাতীয় পদার্থ আছে। সেই তুলনার গমে যাত্রা ১৩% এবং ধানে ৭.৫% প্রোটিন রয়েছে।

ভারতের সর্বত্র নানা জাতের সন্ধানিত নিয়ে পরীক্ষা চলছে—কোন জাতের বীজ কোন মাটিতে এবং আবহাওয়ার সর্বাধিক কলনশীল। অতএব যদি উপযুক্ত জাতের বীজ ব্যবহার করে ধান ও গম চাষের সঙ্গে সন্ধানিতকেও কৃষি-কার্যামের মধ্যে সন্নিবিষ্ট করা যায়, তাহলে উচ্চ প্রোটিন-যুক্ত খাদ্যের অভাব যেটানো যায়। সন্ধানিতের চুব, ছানা ইত্যাদি মোটামুটি উত্তম খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে। গবেষণার দ্বারা সন্ধানিতের প্রকৃতিজ এবং অনভ্যন্ত গন্ধ বিলোপ করা সম্ভব হয়েছে। অতএব সাধারণ খাদ্যবস্তুর মধ্যে সন্ধানিতের আসন

পেতে কোন বাধা নেই। এছাড়া সম্ভ্রুতি পশ্চিম বঙ্গ রাজ্য সরকার সন্ধানিত চাষের উন্নতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দিয়েছেন।

### অজ্ঞাত কয়েকটি চিন্তনীয় বিষয়

আমাদের কৃষি-প্রকল্পে কখনঃ উন্নত জাতের বীজ ব্যবহার, একাধিক বার শস্তোৎপাদন, সেচ, কীটনাশক ও ঔষধাদির প্রয়োগ বৃদ্ধি পেতে থাকবে। খাদ্য-উৎপাদনের পরিমাণ এতে বাড়বে বটে, কিন্তু তার সঙ্গে কৃষি-ব্যবহারও অনেক পরিবর্তন আনতে হবে। উপরিউক্ত সমস্ত উন্নতিমূলক প্রকল্পে সমগ্রায়ুক্তিতা একটি প্রধান চিন্তনীয় বিষয়। ঠিক সময়ে কণ্ঠ, বপন, সেচ, সার ও রাসায়নিক দ্রব্যাদির প্রয়োগ এবং শস্ত আহরণ না করতে পারলে সমগ্র প্রকল্প বিঘ্নিত হতে বাধ্য। এছাড়া যথেষ্ট লোকবল না থাকাই সম্ভব। অতএব বার্ষিক সাহায্যের প্রশ্ন স্বতাবতঃই এসে পড়ে। ভারী বয়স আমাদের কাজের পক্ষে অবিকার্য্য কেড়েই অকেজো। কিন্তু ছোট বয়স ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা অনেকেই উপলব্ধি করেন। কতখানি বার্ষিক সাহায্য কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে গ্রহণযোগ্য এবং সেগুলি আমাদের আর্থিক, সামাজিক এবং রাজ-নৈতিক পটভূমিকার কতখানি সাকল্যমণ্ডিত হবে, তা বলা যায় না। এই বিষয়ে আমাদের অল্প-সম্মানের অবকাশ রয়েছে।

কৃষিজাত দ্রব্যের আহরণ, গুদামে রাখা এবং রক্ষণাবেক্ষণ বর্তমানে খুবই অবহেলিত। এর জন্তে কঠোর পরিমাণ আৱশ্যক। খাদ্যবস্তুর সংরক্ষণ বর্তমানে একটি বিশেষ বিজ্ঞানে পরিণত হয়েছে। আমাদের দেশে এই নিয়ে যথেষ্ট গবেষণা হয় নি।

আমাদের সকল প্রকল্পে যে সব উপাদানগুলোর প্রয়োজন হয়, তার মধ্যে প্রধান ও অত্যন্ত হলো সেই যান্ত্রিকপণি, যারা প্রকল্পগুলিকে সাকল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে সাহায্য করে। অথচ

এই যাত্রীদের সম্পর্কে এবং তাদের উপযুক্তভাবে প্রস্তুত করার কথা আমরা তাবি নি—বে রকম ভাবে ভাবা উচিত ছিল প্রকল্প আরম্ভের করেক বছর আগেই। এদের শিক্ষা এবং যাত্রা হিসাবে বাঁচবার সুযোগ-সুবিধা দান সর্বাপেক্ষে কর্তব্য।

কুত্র কুবকদের অগ্রবিধা অনেক। দেখা দরকার এরা যাতে উন্নত কৃষি-পদ্ধতি গ্রহণ করতে পারে। তাহলেই এদের দুর্গশা দূর হবে। ভাগীদার চাষীর অবস্থা আরও শোচনীয়; অর্থাৎ যারা দেশের সকলের মুখে অন্ন তুলে দিচ্ছে, তাদের নিজের অন্ন নেই। এই অসম্ভব ও অসহনীয়

অবস্থাই দেশে ও সমাজে নানাবিধ জটিলতার সৃষ্টি করেছে এবং চতুর্থ তথাকথিত ঠাট্টামেন্তাগণ তাদের এই দুঃস্থতার সুযোগ নিচ্ছেন। কৃষিসংস্কারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকৃত হলেও নানা কারণে ভাঙে বাধা আসছে। জোর করে বলা দরকার যে, এই বিষয়ে যদি কোন সুনির্দিষ্ট পছন্দ আমরা অবলম্বন না করি, তাহলে নবলব্ধ কৃষি-বিজ্ঞান ও কৃষি-কৌশল কোন কাজেই লাগবে না। এটিই তাহলে প্রকৃত সমস্যা হয়ে দাঁড়াবে।

[ ৩০বম বার্ষিক 'রাজশেখর বসু স্মৃতি' বক্তৃতার সারাংশ ]

“বস্তুতঃ, বিজ্ঞানের পদ্ধতি যে কি, তাহা আমরা জানি না ও জানা আবশ্যক বোধ করি না, যন্ত্রকে কতকগুলো মশলা পুরিতে পারি, কিন্তু তাহা সাজাইয়া গোছাইয়া বখাবিস্তৃত করিবার ক্ষমতা রাখি না। সমগ্রটা একবারে নিরীক্ষণ করিতে না পারিয়া কেবল এক প্রদেশই দেখিতে থাকি ও তাহা হইতে লম্বা চৌড়া সিদ্ধান্তের আবিষ্কার করি। থাইতে পারি, কিন্তু হজম করিবার শক্তি নাই। প্রাকৃতিক নিয়মের অন্বেষণ করিতে গেলে আগে প্রাকৃতিক ঘটনাগুলি তর তর করিয়া অঙ্গসন্ধান করিয়া চোখের সমক্ষে দাঁড় করাইতে হয় ও পরে সহস্র উপায়ে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া, ছেদ করিয়া, জোড়া লাগাইয়া, তাজিয়া গড়িয়া, বিপুল পরিশ্রম ও অধ্যবসায় সহকারে পরস্পরের সম্বন্ধ নিরূপণ করিতে হয়, তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। আমরা এক লক্ষ সাগর পার হইতে চাই, সেতুবন্ধনের অপেক্ষা করিতে পারি না। ডিম হইতে বাহিরিবা মাত্র উড়িতে চাই, পক্ষোদ্ধবের দেহী সহ্যে না। উদ্ভ্রমও নাই, অধ্যবসায়ও নাই; ইঞ্জিরগুলিকে সংযত করিয়া বহির্জগতে প্রেরণ করিবার দরকার বোধ করি না; কেবল চকিতের মত দৃষ্টিপাত করিয়া, পরে ধ্যানযোগে বিশাল বিশ্বের কার্যপ্রণালীর সামঞ্জস্য করিতে চেষ্টা করি। পাদরি সাহেব জাতিভেদের নিন্দা করিলেই আমরা পৈতা ছিঁড়িয়া কেলি; আবার রিসুলি সাহেব নাক মাগিয়া জাতিভেদের মূল আবিষ্কার করিয়াছেন তুলিলেই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইয়া নের বিস্ফারিত করিয়া থাকি। এমন প্রাচীন পেশোহীন জীব কি আর আছে? ইংরাজী শিক্ষার আবার শতধা উন্নতি হইয়াছে; কিন্তু বৈজ্ঞানিকতা জন্মিয়াছে স্বীকার করিতে পারি না। দেশী হটক আর বিলাতী হটক, গুরুবাক্য বতদিন আমরা বিধাহীন চিত্তে গ্রহণ করিব, ততদিন আমাদের বৈজ্ঞানিকতার উৎপত্তির সম্ভাবনা নাই।”

রামেন্দ্রসুন্দর



# বিজ্ঞান-চিন্তা-পদ্ধতির সার্বজনীনতা

## শ্রীমহাদেব দত্ত

মানুষের সমাজের প্রগতিতে বিজ্ঞানের নানা প্রয়োগ হয়েছে, হচ্ছে এবং হবে। বিজ্ঞানের নিত্যনতুন চমকপ্রদ আবিষ্কার মানুষের মনকে সাড়া দেয়, বিবর্তিত করে, করে বিজ্ঞান সব্বদে উৎসুক। সত্য সমাজে মানুষ নানা দিক থেকে বিজ্ঞানের আবিষ্কারের উপর নির্ভর করে। তাঁর প্রতিদিনের জীবনে নানা আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে বিজ্ঞান নানা সুযোগ-সুবিধা সৃষ্টি করেছে, করছে ও করবে। এসব আবিষ্কার, সুযোগ-সুবিধার সম্যক ব্যবহার করতে গেলে চাই বিজ্ঞানের সঙ্গে পরিচিতি। এর জন্তে গড়ে উঠেছে লোক-বিজ্ঞান।

লোক-বিজ্ঞানের একটা প্রধান উদ্দেশ্য বিজ্ঞানের চমকপ্রদ আবিষ্কারের, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী নানা আবিষ্কারের সঙ্গে জনসাধারণকে সহজভাবে বতব্বর সম্ভব পরিচয় করিয়ে দেওয়া ঐ সব আবিষ্কারের বিস্তারিত তথ্য দিয়ে। লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা তথ্যমূলক। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা যথেষ্ট প্রসার লাভ করেছে, এদেশেও প্রসার ভালই হয়েছে।

নানা চমকপ্রদ আবিষ্কার, মানুষের ব্যবহারের উপযোগী জিনিষপত্র আবিষ্কার ছাড়াও বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে। সেটা হচ্ছে বিজ্ঞানের নানা মূলগত তত্ত্ব। বিজ্ঞানের প্রগতির সঙ্গে সঙ্গে নতুন নতুন তত্ত্ব প্রবর্তিত হয়। এসব তত্ত্ব যেমন একদিকে বিজ্ঞানের নতুন নতুন আবিষ্কারের সাহায্য করছে, দৃষ্ট জগৎকে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পাণ্ডা নানা তথ্যকে ভালভাবে বুঝতে সাহায্য করছে, অপরদিকে তেমনি বিজ্ঞানের গভীর ছাড়িয়ে শিল্প, দর্শন,

সাহিত্য প্রভৃতি মানুষের জ্ঞানের অপর শাখা-গুলির উপর প্রভাব বিস্তার করছে। শিকিত-জনসাধারণের সবাই না হলেও একটা বড় অংশ এসব তত্ত্ব সব্বদে ঘোঁটাছুট আঁগ্রহী। কাজেই এসব তত্ত্বের মূল কথা, এদের বিবরণ সরল ও সহজ ভাষায় আলোচনার অনেক চেষ্টা হয়েছে। লোক-বিজ্ঞানের এই উদ্দেশ্যও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। ওদেশে ও ঘোঁটাছুট এদেশেও লোক-বিজ্ঞানের এদিকটা অবহেলিত নয়।

নানা চমকপ্রদ ও দরকারী আবিষ্কারের ও নানা মৌলিক তত্ত্ব গ্রহণের অতিরিক্ত বিজ্ঞানের আর একটা বিশেষ প্রয়োজনীয় ও গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে, সেটা বিজ্ঞান-চিন্তা, এর ধারণ-ধারণা, এর রীতি-প্রকৃতি। প্রত্যেক আবিষ্কার, প্রত্যেক মূলগত তত্ত্বের গ্রহণের মূলে এ রয়েছে। কিন্তু মজার ব্যাপার, এই বিষয়ে অনেক বিজ্ঞানীই সচেতন নন। ওদেশে যাত্র করেকজন মনীষী এই সব্বদে সচেতনভাবে আলোচনা করেছেন। ওদেশে লোক-বিজ্ঞানে এই বিষয়ে আলোচনা বিরল। আর এদেশে এই বিষয়ে কোনও আলোচনা হয়েছে কিনা, জানা নেই। অবশ্য দেশনেতাদের বক্তৃতায় পোনা বার নানা সমস্তার বৈজ্ঞানিক বিবরণ করে সমাধান করার, বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার সাহায্যে দেশের, সমাজের সুশৃঙ্খলার দূর করে নতুন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে তোলার বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা। ব্যক্তিগত সাধারণ কথাবার্তারও বৈজ্ঞানিক চিন্তা, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গীর কথা প্রায়ই বলা হয়। এই বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী কি? বৈজ্ঞানিক চিন্তার নিজস্ব রূপ, বৈশিষ্ট্য ও ধারণ-ধারণা প্রভৃতি



সম্বন্ধে আলোচনা করে সুস্পষ্ট ধারণা করবার বিশেষ চেষ্টা হয় নি। অবশ্য এই বিষয়ে আলোচনা একটা বিরাট ব্যাপার।

এখানে বিজ্ঞানের সমস্ত সমাধান বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ নিয়ে আলোচনার চেষ্টা করা হবে, যাতে অধিক লোকের পক্ষে এই আলোচনা সহজে বোধগম্য হয়। এছাড়া যে সব সহজ সমস্তার সমাধান মাধ্যমিক বিভাগের অবশ্য পাঠ্য হিসাবে পড়ানো হয়, সে সব থেকে উদ্ধারণ নিয়ে সমস্তা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ বোঝাবার চেষ্টা করা যাবে। পরে বিজ্ঞানের বাইরের কয়েকটি সহজ সমস্তার সমাধান কিতাবে একই ধরণে চিন্তা করে করা যায় আলোচনা করে দেখানো হবে, যাতে এই ধরণের চিন্তার সার্বজনীন উপযোগিতা বোঝা যায়। বর্তমানে এখানে বিজ্ঞান-চিন্তার ধরণ-ধারণের, রীতি-প্রকৃতির সামগ্রিক আলোচনার চেষ্টা করে এই প্রবন্ধকে জটিল করা হবে না, বরং-সম্ভব সহজবোধ্য রাখা হবে। যদি এই বিষয়ে আগ্রহ সৃষ্টি হয়, তবে পরে এই বিষয়ে নানা প্রবন্ধে আলোচনা করা যেতে পারে।

সমস্তা সমাধানে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধরণ সম্বন্ধে সুস্পষ্ট ধারণা করবার জন্তে সাধারণ পরিচিত মাধ্যমিক জ্যামিতি (বা পণিতে ইউক্লিডীয় জ্যামিতি নামে পরিচিত) থেকে আলোচনা শুরু করা যাক। জ্যামিতিতে কয়েকটি মূল বস্তুর (বাদের সংজ্ঞা দেওয়া হয় না, ধরে নেওয়া হয় পরিচর জানা আছে) মূলগত ধর্ম বা নিজেদের মধ্যে সম্বন্ধের নিয়ম (অত্যন্ত নামে সাধারণতঃ পরিচিত) উল্লেখ করে অপরাপর বস্তুর বা সম্বন্ধের সংজ্ঞা দেবার পর নানা সমস্তার সমাধান করা হয়। জ্যামিতির সমস্তাগুলিকে সাধারণতঃ দু-ভাগে ভাগ করা হয়—সম্পাদ ও উপপাদ্য। সম্পাদে কোনও না কোনও চিত্র বা চিত্রাংশ অঙ্কন

করা হয়, অর্থাৎ কোন কাজ সম্পাদন করা হয়। উপপাদ্যে জ্যামিতির বস্তুর অংশগুলির বা কতকগুলি বস্তুর সম্বন্ধ বা তাদের ধর্ম বর্ণনা বলে প্রতিপন্ন করতে হয়, যদিও সম্পাদ ও উপপাদ্যের উদ্দেশ্য ভিন্ন। তবে আলোচনার মূল বাপগুলি ও চিন্তনের ধরণ একই রকমের, পার্থক্য কেবল বিভিন্ন অংশের গুরুত্বের তারতম্যে। সম্পাদে সর্বাধিক গুরুত্ব অঙ্কনে, এখানে যাত্রা যাচাই করা হয়, যা করবার লক্ষ্য ছিল তা সুস্পষ্ট হয়েছে কিনা। উপপাদ্যে সর্বাধিক গুরুত্ব দেওয়া হয় এখানে, অঙ্কন এখানেই সহায়ক যাত্র।

সম্পাদ ও উপপাদ্য উভয়েরই চারটি প্রধান ভাগ সাধারণ বইতে দেখা যায়; যথা—সাধারণ নির্বচন, বিশেষ নির্বচন, অঙ্কন ও প্রমাণ। সাধারণ নির্বচনে সমস্তার মূল কথাটি সংক্ষেপে সাধারণভাবে বলা হয়। বিশেষ নির্বচনে সমস্তাটি লেখ-র সাহায্যে বিভিন্ন অংশের বিভিন্ন নাম সন্নিহিত করে বিশ্লেষণ করে বোঝা বা বোঝানো হয়। সবাই জানেন, সাধারণ নির্বচনে আবার দুই ভাগ থাকে, যথা—সীকার ও সিদ্ধান্তের বিষয়। সীকারে যে সব জ্যামিতিক বস্তু বা তাদের অংশগুলি নেওয়া হয় ও তাদের মধ্যে যে সব সম্পর্ক, তা সব সুস্পষ্টভাবে বলা হয়। সিদ্ধান্ত কি, প্রতিপাদ্য বিষয় বা কি সম্পন্ন করতে হবে, সঠিকভাবে তার নির্দেশ দেওয়া হয়। বিশেষ নির্বচনে ও সাধারণ নির্বচনে উক্ত সীকার ও সিদ্ধান্ত লেখ ও নামের সাহায্যে পরিষ্কৃত করে তোলী হয়। সমস্তা সমাধানে কোন সর্ব দেওয়া থাকলে তাও সাধারণ নির্বচনে সাধারণভাবে ও বিশেষ নির্বচনে সন্নিহিত করে বলা হয়। সাধারণ নির্বচনের সমস্তা সংক্ষিপ্ত বিবরণাদি বিশেষ নির্বচনে ভালভাবে বোঝা বা বোঝাবার চেষ্টা করা হয়; অর্থাৎ এই দুটি নির্বচনের সাহায্যে বিবেচনাধীন সমস্তাটি সঠিকভাবে বোঝা হয়। সমস্তা ঠিকভাবে বোঝা

গেলে অবশ্যই সমস্ত সমাধানের কথা ওঠে। সমস্ত কি, ঠিকমত না জানলে কি সমাধান করা হবে? জ্যামিতিতে সমস্তের প্রকৃত সমাধান করা হয় অঙ্কন ও প্রমাণের সাহায্যে। বিশেষ নির্বচনের পরে আসে অঙ্কন। এতে সম্প্রান্তের সমস্তের উদ্দিষ্ট সমাধানের জন্তে দরকারমত নানা রেখাংশ, বৃত্তাংশ প্রভৃতি লেখ অঙ্কন করে সিদ্ধান্তে উক্ত কাজটি সূক্ষ্মায়ন করা হয়, আর উপপাত্তে সিদ্ধান্ত উক্ত বিষয়টি প্রমাণের সহায়ক দরকারমত লেখ অঙ্কন করা হয়। প্রমাণে যুক্তির দ্বারা সম্প্রান্তে বা করণীয় ছিল, তা সূক্ষ্মায়ন হয়েছে কিনা যাচাই করে দেখে নেওয়া হয়, আর উপপাত্তে মূল প্রতিপাত্ত বিষয়টি প্রতিপন্ন করা হয়। প্রায়ই দেখা যায়, একটি উপপাত্ত প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তির ভিন্ন ভিন্ন রূপে একাধিক সংশ্লিষ্ট বিষয় সহজেই প্রমাণিত বা প্রায় প্রমাণিত হয়েছে আর সম্প্রান্তে অঙ্কন-পদ্ধতিতে আরও কয়েকটি জ্যামিতিক বিষয় অঙ্কিত, প্রায় অঙ্কিত হয়েছে। অহসিদ্ধান্ত প্রভৃতির আলোচনার সংশ্লিষ্ট কলাকলগুলি সম্বন্ধে সজাগ ও সতর্ক হয়ে সম্প্রান্তের অঙ্কন রীতি ও উপপাত্তের প্রমাণ-পদ্ধতির তাৎপর্য ও উপযোগিতা সম্যকরূপে আয়ত্ত করতে হয়। এই আলোচনা অপর সমস্ত সমাধানে বিশেষ সহায়ক হয়।

যে কোন সমস্ত সমাধানের পদ্ধতিতেই এই চারটি প্রধান ধাপ আছে। আবার বাস্তব জগতের সমস্তগুলিও দুই ধরনের, কতকগুলিতে কিছু না কিছু কাজ করাই প্রধান উদ্দেশ্য। এই সমস্তগুলিকে ক্রিয়ামূলক সমস্ত, অস্তগুলিতে কোন একটি বিষয়ের বাধ্যবাধিতা সম্বন্ধে বিচার করা, এগুলিকে বিচারমূলক সমস্ত বলে। ক্রিয়ামূলক সমস্ত সম্প্রান্তের ও বিচারমূলক সমস্ত উপপাত্তের মত। অবশ্য বাস্তব জীবনের বেশীর ভাগ সমস্ত বিশেষ জটিল, এগুলি অনেকগুলি সমস্ত থেকে উদ্ভূত। কাজেই এসব সমস্ত অংশতঃ ক্রিয়ামূলক, অংশতঃ

বিচারমূলক। আগেই বলা হয়েছে, প্রত্যেক সমস্ত সমাধানের ক্ষেত্র আগে এই সম্বন্ধে সূক্ষ্মায়ন করা করতে হয়। একিটা জ্যামিতির সাধারণ ও বিশেষ নির্বচনের মত। সমস্ত ঠিকমত ধারণা করতে পারলে তখন সমাধানের কথা ওঠে। আর সম্প্রান্তের মতই ক্রিয়ামূলক সমস্ত দরকারমত কর্মের অঙ্কন করে সম্পাদন করতে হবে আর উদ্দিষ্ট কাজ সম্পন্ন হয়ে গেলে দেখে নেওয়া উচিত, প্রকৃতই উদ্দিষ্ট কাজটি করা হয়েছে কিনা। একটি অতি সাধারণ উদাহরণ দেওয়া বাক। আগামী পূজার সময় অনেকই স্বাক্ষর, ইতিহাস-প্রসিদ্ধ বা শিল্পপ্রধান শহরে ঘুরে আসতে ইচ্ছুক। ধরা বাক, দশজনের একদল ঐ সময় পুরী বেতে চান। এটিকে একটি ক্রিয়ামূলক সমস্ত হিসাবে দেখলে সাধারণ নির্বচন হবে 'আগামী পূজার সময় পুরী যাওয়া'। এর বিশেষ নির্বচনের স্বীকার হবে, কলিকাতার দশজনের একদল কলিকাতার আছেন, আগামী অক্টোবর মাসে ৬ই থেকে ১০ই পর্যন্ত পূজা হবে, ঐ দশজনের পুরী যাওয়া প্রভৃতির জন্তে আর্থিক ও শারীরিক সামর্থ্য আছে; সিদ্ধান্ত হবে কলিকাতা থেকে ৭৭৭ কিঃ মিঃ দূরে অবস্থিত পুরী যাওয়া। সম্প্রান্তের অঙ্কন যেমন করা হয়, এখানে টিকিট কেটে সময়মত ট্রেন বা বিমান বন্দরে গিয়ে ট্রেন বা বিমানে চেপে বা সময়মত মোটরে (ব্যবস্থা করা সম্ভব হলে) চেপে রওনা। পুরীতে জগন্নাথের মন্দির, সমুদ্র প্রভৃতি পুরীর বিশেষ মিলদর্শন দেখে কৃতনিষ্ঠ হওয়া সম্প্রান্তের প্রমাণের সামিল। দেশের বাস্তব সমস্তও একটি ক্রিয়ামূলক সমস্ত। সাধারণ নির্বচন হবে 'দেশের বা দেশের বাস্তব বাস্তবতা অকালের বাস্তবতা বদল করা'। বিশেষ নির্বচন হবে, দেশের বা বাস্তব-বাস্তবতা অকালের বাস্তবতাবের পরিমাপ, কি ধরনের বাস্তব কত পরিমাণে দরকার, তা সঠিকভাবে নির্ণয় করা। ঐ পরিমাপ ঐ ধরনের বাস্তব কোথা কোথা থেকে কি কি ভাবে সংগ্রহ

করা যেতে পারে, তা সঠিক নিরূপণ করা। সিদ্ধান্ত হবে, যে যে স্থানে ঐ খাত পাওয়া যাবে, তা সংগ্রহ করে দেশের বাইতি অকলে এনে সুনিয়ন্ত্রিতভাবে বন্টন করা। পরে সিদ্ধান্ত মত কাজ করা সম্পাদিত অঙ্কনের সাহায্য ও পরে তথ্যাদি নিয়ে খাত ঠিক মত অভাবীদের কাছে পৌঁছানো কিনা দেখা সম্পাদিত প্রমাণের সাহায্য। অবশ্য খাতসমস্তা বাস্তবে একটি বিশেষ জটিল সমস্তা। খাত বাইতি অকল ঠিকমত নিরূপণ, প্রয়োজনীয় খাতের ধরণ ও পরিমাণ নির্ণয়, খাতের প্রাপ্তিস্থান নির্ণয়, খাত-সংগ্রহ, তা বণাহানে আনয়ন ও ঠিকমত বন্টন—এত্যেকটিই এক-একটি বিরাট সমস্তা। কিন্তু সমস্তা সমাধানের পদ্ধতিতে মূল-খাপগুলি একই ধরণের। শহরের পরিবহন সমস্তাও এভাবে আলোচনা করা যায়।

এবার বিচারমূলক সমস্তার একটি উদাহরণ আলোচনা করা যাক। ধরা যাক, এক শহরের যজ্ঞবাসী একদিন রাতে খুন হয়েছেন। স্থানীয় কর্তৃপক্ষ যজ্ঞবাসীর প্রতিবেশী রামবাবুকে খুনের দায়ে অভিযুক্ত করেছেন। রামবাবুর অভিযুক্তদের জরুরি সাক্ষাৎকারের দাবী, রামবাবু নিরপরাধ ও তিনি তা প্রতিপন্ন করতে সচেষ্ট হলেন। এই সমস্তার সাধারণ নির্বচন হবে ‘রামবাবু যজ্ঞবাসীর খুনের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্কশূন্য’ (কাজেই নিরপরাধ)। সমস্তার বিশেষ নির্বচনের সাহায্য হবে যজ্ঞবাসীর খুন সম্বন্ধে সঠিক বিবরণ, খুনের সময় রামবাবুর অস্তিত্ব অস্তিত্ব কাজে ব্যস্ত থাকার বিবরণ। প্রমাণ করতে হবে—রামবাবু যজ্ঞবাসীর খুনের ব্যাপারে সম্পূর্ণ সম্পর্কশূন্য। খুনের সঠিক বিস্তারিত বিবরণ, রামবাবুর খুনের সময়ের গতিবিধি সম্বন্ধে ও যজ্ঞবাসীর সঙ্গে রামবাবুর সম্পর্ক সম্বন্ধে তথ্যাদি প্রমাণসহ সংগ্রহ করা প্রমাণের সহায়ক অঙ্কনের মত। এসব তথ্যাদি ও বিবরণের উপর নির্ভর করে যে সওয়াল করা হয়, তা উপপাত্তের প্রমাণের সঙ্গে তুলনীয়। অপরাধের বিচারমূলক

সমস্তা সমাধানের পদ্ধতিও একই ভাবে আলোচনা করা যায়। জ্যামিতির চিত্রের এই ধরণ সার্বজনীন। যখন হয়, একত্রে গ্রীক দার্শনিক প্লেটো জ্যামিতি অবশ্যপাঠ্য মনে করতেন ও তিনি জ্যামিতি পড়েন নি, তাঁকে প্লেটো শিক্ষাব্যবস্থার প্রবেশের অধিকার দেন নি।

দুর্ভাগ্যবশত: জ্যামিতি বা বিজ্ঞানের অপরাধের শাস্তির সমস্তা নিয়ে বিভাগের বা পরে মহাবিশ্বালয়ে যখন আলোচনা করা হয়, তখন মনের উপরে উক্ত ধরণ সম্বন্ধে ছাত্রদের দৃষ্টি আকর্ষণের কোন চেষ্টাই হয় না। একত্রে শিক্ষা সমাপ্তি হলো শিক্ষিতদের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অভ্যাস হয় না ও শিক্ষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত হয়েও সমস্তা সমাধানে জটিলতা সৃষ্টি করা হয় প্রকৃত বিশ্লেষণের অভাবে। এর বহু উদাহরণ বাস্তব জীবনে দেখা যায়। সাম্প্রতিক একটিমাত্র ঘটনা এখানে উল্লেখ করা গেল। বর্তমানে শিক্ষাজগতে নানারূপ বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়ে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলিতে নিত্য কাজ চালু রাখা কঠিন হয়েছে। কিতাবে অবস্থার উন্নতি করা যায়, সে সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠানের কর্তৃপক্ষ, শিক্ষক, শিক্ষার্থীরা সবাই চিন্তা করছেন। কিছুদিন আগে একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে দুটি বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সমর্থকদের মধ্যে যখন যখন সংঘর্ষ হওয়ার প্রায়ই ক্রাশ বন্ধ রাখতে হয়। শেষ পর্যন্ত এই সংঘর্ষে দুটি ছাত্র নিহত হয়েছিল। তখন ক্রাশ বন্ধ করে শান্তি রক্ষার ক্ষেত্রে বিশ্ববিদ্যালয় প্রাক্ষেপে অস্ত্র প্রদোষাগত পুলিশবাহিনী মোতায়েন করা হয়। কিছুদিন পরে ওখানে এক জটিল পরিস্থিতির উদ্ভব হয় ও ঐ পুলিশবাহিনী সরিয়ে নেওয়া হয়। বহিরাগতদের প্রকৃত আক্রমণ থেকে অস্ত্র প্রদোষের পুলিশবাহিনী মোতায়েনের সার্বিকতা আছে। কিন্তু যে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যেই বিতর্ক ও সংঘর্ষ, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যেই ছাত্ররাই অশান্তির

মূল, সেখানে স্থানীয় ভাষায় অনতিদূর বহিরাগত পুলিশবাহিনীর পক্ষে দ্রুতকারীদের বের করে শান্তি দেওয়া ও শান্তি স্থাপন করা সম্ভব নয়, তাদের ক্রিয়াকলাপ জটিলতাই বৃদ্ধি করবে। এখানে প্রকৃত সমস্যা ঠিক বোঝাই হয় নি।

এই প্রবন্ধে বৈজ্ঞানিক চিন্তার ধারণা-ধারণ, নীতি-নীতি প্রভৃতির খুব দৃষ্ট বিকটা সংক্ষেপে আলোচনা করা গেল। এসবের দৃষ্ট গভীর দিক নিয়ে অনেক আলোচনা করা যায়। এই বিষয়ে দৃষ্টি আকৃষ্ট হলে এই আলোচনা সার্থক হবে ও পরে অল্প আলোচনার অবতারণা করা যেতে পারে।



### লেসার রশ্মির কার্যকারিতা

লেসার রশ্মি যে কত জোরালো হয়, এই ছবি থেকে তা বোঝা যাচ্ছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে অত্যন্ত জোরালো লেসার রশ্মি এক সেকেন্ডের হাজার ভাগের এক ভাগেরও কম সময়ে অত্যন্ত কঠিন ট্যাংকোয়াম বাতুর পাত ভেদ করে একটি ছিদ্র উৎপন্ন করেছে। ট্যাংকোয়াম বাতুর দৃষ্টমাত্র 5,500 ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড।

# থ্রোম্বোসিস

জীৱন্তাসচক্ৰ কৰ

আধুনিক কালে যে সমস্ত ৰোগেৰ অতিশয় মাজুৰেৰ আত্মত্বকিত পথ ৰোধ কৰে অথবা মৃত্যু জীৱনৰাজ্যৰ ব্যাঘাত কৰি কৰে তাকে পলু ও অকৰ্মণ্য কৰে কৰে দেয়, তাৰ মध्ये অস্ততম প্রধান হলো থ্রোম্বোসিস, বিশেষতঃ কৰোনাৰী (Coronary) থ্রোম্বোসিস। পাশ্চাত্য দেশগুলিতে ও আমেৰিকাৰ এই ব্যাধিটিকে মাজুৰেৰ পৰম শত্রু হিচাবে গণ্য কৰা হয়। তাৰতে সঠিক যুত্ৰুহাৰ কত তা বলা কঠিন, কাৰণ এদেশে জন-সাধাৰণেৰ মध्ये এই ৰোগেৰ একোপ সঘন্থে স্বাস্থ্যসমীকাৰ লিখে ৰাখৰাৰ ব্যবস্থাৰ প্রচলন নেই। সুখেৰ বিবয় এই যে, থ্রোম্বোসিস-প্রাক্কৃত্ত দেশগুলিৰ মত তাৰতেৰ চিকিৎসকেৰা এই মাত্ৰাত্মক ব্যাধি সম্পৰ্কে অবহেলা না কৰে সচেতন হয়ে উঠেছেন। এই ৰোগজনিত যুত্ৰুহাৰ সবচেয়ে বেশী মাৰ্কিন যুক্তৰাষ্ট্ৰে, আৰু জাপানে সবচেয়ে কম। নাৰীদেৰ অপেকা পুৰুষেৰাই বেশী সংখ্যাৰ এই ব্যাধিৰ শিকাৰ হয়ে থাকে। আৰো জানা যায় যে, বৃদ্ধ ও মধ্যবয়স্কদেৰ মध्येই ব্যাধিটি সীমাংক।

## ৰোগেৰ প্রবণতা

সংবাদপত্ৰ পাঠে দেখা যায় যে, গণ্যমান্ত ব্যক্তিকা ইদানীং কালে প্রায়ই হৃদৰোগ বা কৰোনাৰী থ্রোম্বোসিসেৰ কবলে পড়ে যুত্ৰুহাৰণ কৰেছেন। সংক্ষেপে বলা যায় যে, সমগ্ৰ বিশ্বে উচ্চ পৰ্বায়েৰ জনগণেৰ মध्ये এই ব্যাধিৰ প্রাক্কৃত্ত্য হচ্ছে। ধাৰা অতিমাত্ৰাৰ চিক্কাশিল, বুদ্ধিজীৱী ও চিক্কানাৰক, তাঁৰা অধিকাংশ ক্ষেত্ৰেই দৈহিক পৰিশ্ৰম নিতান্তই কম কৰেন (মানসিক

পৰিশ্ৰমেৰ তুলনাৰ)। তাঁৰেৰই এই ব্যাধি হৰাৰ সম্ভাবনা বেশী। এক সৰীকা অহুসাৰে জানা যায় যে, সমাজে উচ্চতৰেৰ ব্যক্তিকা (বেধন—অধ্যাপক, চিকিৎসক, শিকাৰিদ্, প্ৰতিৰকাৰ পদস্থ কৰ্মচাৰী, ইঞ্জিনিয়াৰ, সৰকাৰী শীৰ্ষস্থানীৰ নেতৃত্বস্থ) শতকৰা ৪.১% এই ৰোগেৰ আক্ৰমণে মাৰা যান। শিলে বয়স বেতনেৰ প্ৰমিক প্ৰেণীৰ মध्ये এৰ হাৰ শতকৰা ৩.২%। আৰ মধ্যবিত্ত প্ৰেণীৰ লোকে-দেৰ (বেধন—কেৰানী, ছাত্ৰ ইত্যাদি) এই ব্যাধিটিও হয়ে থাকে উপরেৰ দুটি অক্ৰেৰ মাৰা-মাৰি হাৰে শতকৰা ৬.২%।

## অ্যাথিৰোস্কেল্লোসিস

কৰোনাৰী হৃদৰোগ, কৰোনাৰী ধমনীৰ ব্যাধি এবং ইসকামিক (Ischaemic) হৃদৰোগ—এই কয়টি আখ্যাই সমাৰ্ধবোধক। কৰোনাৰী হৃদৰোগ বোৰাতে চিকিৎসাশাস্ত্ৰে অ্যাথিৰোস্কেল্লোসিস (Atherosclerosis) শব্দটি প্রায়ই প্রযুক্ত হয়। লক্ষণীৰ বিবয় হলো এই যে, অ্যাথিৰো-স্কেল্লোসিসই কৰোনাৰী হৃদৰোগে শতকৰা ৯৫% যুত্ৰুহাৰেৰ জতে দায়ী।

## তিল ধৰণেৰ অ্যাথিৰোস্কেল্লোসিস

অ্যাথিৰোস্কেল্লোসিস বা অ্যাথিৰোমা (Atheroma) ৰোগে দেখেৰ কোন অতি প্ৰয়োজনীৰ অংশে, বিশেষতঃ হৃদযন্ত্ৰ, বক্তিক কিংবা বুদ্ধে (Kidney) বক্ত সৰবৰাহ বক্ত বা কম হয়ে জীৱকে যুত্ৰুহাৰ পথে ঠেলে নিৰে যায়। এই অহুসাৰে অ্যাথিৰোস্কেল্লোসিস হয়ে থাকে কৰোনাৰী, সেৰিক্কাপ ও ৰেনাল ধৰণেৰ।

তবে এগুলির মধ্যে অ্যাথিরোস্কেরোসিস রোগাক্রান্ত হবার অতি সাধারণ বৈশিষ্ট্য হলো— রক্তবাহিনীগুলির করোনারী কাঠামোর। হৃদয়ের বাম নিলয় (Ventricle) থেকে উদ্ভূত বহাধমনী (Aorta) এবং হৃদয়ের ধমনীগুলিও সচরাচর এই ব্যাধির প্রকোপে পড়ে। বাকারি আকারের ধমনীসমূহের এই রোগে আক্রান্ত হবার সম্ভাবনা কম। এখানে বলে রাখা ভাল যে, করোনারী ধমনীর দুটি প্রধান ব্যাধি— এন্ডোইমা পেক্টোরিস এবং করোনারী অবরোধ (Occlusion) বা থ্রম্বোসিস এবং দুটিই অ্যাথিরোস্কেরোসিসের দরূপ হয়। কিন্তু করোনারী অবরোধ বা থ্রম্বোসিসের কলে হৃদয়ের পেশীজাতীয় পদার্থের চ্যুতি বা তানন (Myocardial infraction) এবং অ্যাথিরোস্কেরোসিসের কোন সাদৃশ্য নেই।

### রোগটির নামকরণ ও বিবরণ

অ্যাথিরোস্কেরোসিস শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেন Lobetien—1835 খৃষ্টাব্দে। এটা হলো ধমনীগুলির সাধারণ রোগ, সরল কথায় ধমনীর পাত পুরু হয়ে আঁটসাঁট হয়ে পড়ে। ধমনীসমূহের অন্তর্ভাগে (Intima) রক্ত থেকে কোলেস্টেরল (Cholesterol) অস্রুপ্রবেশ করে। রক্তবাহিনীগুলিতে এদের উপস্থিতির কলে আঠালো পদার্থের সৃষ্টি হয়। নিপিডগুলি অর্থাৎ 'ব্ল্যাক': কোলেস্টেরলের এক্টারসমূহ জমা হতে হতে আঁশের মত কলকের (Plaques) সৃষ্টি হয়—এটাই হলো অ্যাথিরোস্কেরোসিসের গোড়ার অবস্থা (গ্রীক Athere শব্দের অর্থ কেনজাতীয় জিনিস বা পরিজ)। বস্তুত: রক্তবাহিনীগুলির অন্তর্ভাগে সঞ্চিত হয়ে থাকে নরম হৃদয়ে কেনের মত জিনিস, যার কলে তাৎক্ষণিক রোগটির নামকরণ হয়েছে। করোনারী কিংবা হৃদয়ের ছোট ছোট ধমনীগুলিতে ক্ষতের (Lesion) সৃষ্টি হয়ে থাকে

এভাবে এবং কারগা-বিশেষে তিনের ৩ বাইরের গা থেকে হৃদয়ে রক্তের ছোট পিণ্ড দেখা যায়।

উক্ত পিণ্ডগুলি ধমনীর হিত্রকে (Lumen) জীবনভাবে সর্পিণ করে অবস্থা সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করে দেয়। এভাবেই করোনারী ধমনীর পথে ক্রমশ: বাধার স্রবপাত হয়। রোগটি আর একটু অগ্রগতি লাভ করে তখনই, যখন ক্রমে তিনের পদার্থগুলি রক্তের পুষ্টি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে এবং অবরোধ বা বিয় সৃষ্টিকারী পদার্থটি ফুলে ওঠে আর অস্বাভাবিক ধরণের লিপোপ্রোটিন জটিল পদার্থে রক্তবাহিনীগুলি ভরপুর হয়ে জমা-ক্রান্ত হয়ে থাকে। এমনভাবে জমে থাকে আঁশের মত আন্তরণ বা কলক। উপরে যে পিণ্ডের কথা উল্লেখ করা হলো, তা নগণ্য হলেও করোনারী ধমনীর মত ক্ষুদ্রতর রক্তবাহিনীগুলির পথে জীবন-ভাবে অনধিকার প্রবেশ করে, বহাধমনীর মত বড় রক্তবাহিনীর আধারে কোন প্রত্যাব বিস্তার করতে পারে না। শেষ পর্যন্ত এসে দুই কতে পরিণত হয় বা এর মধ্যে রক্তক্ষরণ শুরু হয়ে পাকাপাকিভাবে করো-নারী থ্রম্বোসিসের তিষ্ঠি গড়ে তোলে। জলের নলে যেমন ময়লা জমে থাকলে জল-সরবরাহ হ্রাস পায়, একেত্রেও অস্বল্পভাবে রক্তসঞ্চালন ব্যাহত হয়।

গর্ভধারণকাল নারীদেহে অ্যাথিরোমা কম হয়, তবে বহুতর বা অত্যন্ত কয়েকটি রোগগ্রস্ত হলে স্বতন্ত্র কথা। বলা বাহুল্য: বহুতর রোগীদের মধ্যে এই রোগ ব্যাপক। বহুতর রোগসমূহের চেয়ে বহুতর রোগাক্রান্ত রোগীদের এই রোগে বৃদ্ধিহার প্রায় দ্বিগুণ সংখ্যক এবং তা সব বয়সে হয়ে থাকে। এই অতিরিক্ত বৃদ্ধিহারের কারণ হলো বৃদ্ধিসম্পর্কিত ও অত্যন্ত জটিলতা, যেহেতু উক্ত অঙ্গগুলি অ্যাথিরোমাসমূহ কলক বা আন্তরণে পূর্ণ হয়ে থাকে।

এই ব্যাধি সম্পর্কে কোলেস্টেরলের ভূমিকা— পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হয়েছে যে, করোনারী থ্রম্বোসিসে কোলেস্টেরল এবং তার সীমা একটা

এরোজনীয় ভূমিকা নেয়, সুতরাং প্রচুর পরিমাণে কোলেস্টেরলযুক্ত খাদ্যবস্তু বয়স সহকারে বিবেচনা করে গ্রহণ করা কর্তব্য।

### স্টেরল ও তার রাসায়নিক গঠনভঙ্গিমা

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, প্রত্যেক তেল বা চর্বিতে কিছু না কিছু পরিমাণে স্টেরল থাকে। স্টেরলগুলি হলো উচ্চ গলনবিন্দুর অসম্পৃক্ত মাধ্যমিক অ্যালকোহলবর্গ। উদ্বিদ্ধ তেল ও চর্বিতে যে স্টেরল আছে, তা হলো কাইটোস্টেরল (গলনবিন্দু  $132^{\circ}$ - $144^{\circ}$  সেন্টিগ্রেডিক স্কেলে)। প্রাণিজ তেল ও চর্বির মধ্যে থাকে কোলেস্টেরল (গলনবিন্দু  $148.5^{\circ}$  থেকে  $150.6^{\circ}$  সেন্টিগ্রেডের আকারের দানা)। কোলেস্টেরল ও কাইটোস্টেরল—এগুলি হলো আইসোমার (Isomer) এবং উভয়ের রাসায়নিক সাক্ষেপিক সূত্র  $C_{27}H_{46}OH$ , তবে গলনবিন্দু যে পৃথক, তা আগেই বলা হয়েছে।

ডাঃ কাৎজের প্রাথমিক উক্তি—‘পুষ্টি ও অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস’ বিষয়ক বিখ্যাত গ্রন্থে Dr. Louis P. Katz লিখেছেন—

সাধারণ পরীক্ষাসমূহ অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের পৌষ্টিক ঘেটাবলিক কোলেস্টেরললিপিড-লিপো-প্রোটিন তত্ত্বের ভিত্তিসূত্র নীতিকে সুদৃঢ় করে অর্থাৎ বেশী ও চর্বিবেশী কোলেস্টেরল গ্রহণ হলো হাইপার-কোলেস্টেরলিমিয়া ও অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস সংঘটনের চূড়ান্ত পৌষ্টিক বিপদ। পুনরায় জোর গলায় বলা প্রয়োজন যে, আহার্যের উপর আমরা মূল ভূমিকা আরোপ করে থাকি, কিন্তু একমাত্র ভূমিকা নয়। আমরা কোন রকমেই এটা বুঝিয়ে থাকি না যে, অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিস একটা পূর্ণাপূরি আহার-জনিত ব্যাধি।

হঠাৎ মনের উপর ধকল এসে পড়া বা দীর্ঘ-বিক বৈকল্য (সুদীর্ঘ মানসিক তাবপ্রবণতায়

অভিভাব্য উবেগ), সুরাপানের কলে, বসে থাকবার অভ্যাসে, অতিভোজনে, পারিপার্শ্বিক কারণে, আবহাওয়ার চরম পরিণতিতেও প্রযোজ্য হয়ে থাকে। অ্যাথিরোস্ক্লেরোসিসের বিশিষ্ট লক্ষণগুলির মধ্যে অত্যন্ত প্রধান হলো ধমনী-গায়ে চুন জমা হওয়া।

### কি ধরণের তেল ও চর্বি দেহের পক্ষে

#### এরোজন

আর একটি লক্ষণীয় বিষয় এই যে, এতাবৎ মনে করা হতো যে, চর্বিজাতীয় জিনিস অতি মাত্রার খাওয়ার কুপরিণাম প্রযোজ্য। কিন্তু এখন এই মতবাদ আর ঠিক বলে কেমন করে ধরা যাবে? একটু তলিয়ে দেখলেই তা বোঝা যাবে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা অত্যধিক পরিমাণে তেল ও চর্বি ভক্ষণ করে অথচ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের অধিবাসীদের চেয়ে খুব কম হারে হৃদরোগগ্রস্ত হয়ে থাকে। সুতরাং প্রকাশ পাচ্ছে যে, গৃহীত চর্বির পরিমাণের চেয়ে তার ধরণটা বেশী কার্যকরী ও কলদারক অর্থাৎ তার আভ্যন্তরীণ গঠন-প্রণালীর উপর রোগটি হওয়া বা না-হওয়া নির্ভর করে। সুইডেন ও ডেনমার্কের অধিবাসীরা যে তেল ও চর্বি আহার করে, সেগুলি হলো প্রকৃতিজাত তেল, বিশেষ করে মাছের তেল (যেহেতু সমুদ্রকূলে অবস্থিত হওয়ার অত্যন্ত বেশী পরিমাণে মাই পাওয়া যায়)। মাছের তেলের বৈশিষ্ট্য হলো এই যে, তার ভিতর রয়েছে বর্ষেট পরিমাণে অসম্পৃক্ত যেদার বা ক্যাটি অ্যাসিড। এই সব দোষে চিকিৎসকগণ প্রযোজ্যজাতীয় ব্যাধির আক্রমণের হাত থেকে নিষ্কৃতির সাধারণ উপায় নির্ধারণ করেছেন—কম মাত্রার সম্পৃক্ত যেদারসম্বিহিত তেল ও চর্বি ভক্ষণ অর্থাৎ প্রকারান্তরে প্রচুর অসম্পৃক্ত যেদারসম্বিহিত তেল ও চর্বির আশ্রয়ন। কিন্তু এই বিষয়েও রসায়নশাস্ত্রজ্ঞের সঙ্গে চিকিৎসকদের মতবৈধ রয়েছে।

## ব্যায়ির উপসর্গ

ঠিক কোন বৃগে এই ব্যাধি মানবসমাজে প্রথম দেখা দিয়েছিল, তা জানা নেই। তবে মিশরের বিজ্ঞানী লোকদের মতে নাকি অ্যাথিরোকে-রোসিসের লক্ষণ পাওয়া গেছে। করোনারী প্রবোধন যে ব্যায়িক সভ্যতার কলে উদ্ভগময় জীবনধারণের দরুণ দ্রুত হারে বেড়ে যাচ্ছে, বিশেষজ্ঞদের তা মনে করবার অনেক কারণ আছে। করোনারী প্রবোধন আক্রমণের উপসর্গ সব ক্ষেত্রে এক রকমের বা অভিন্ন হতে দেখা যায় না। তবে সব ক্ষেত্রেই বৃকে বজ্রণা, সময়ে সময়ে রোগী বজ্রণার সঠিক জায়গা বলতে পারে না। মনে হয় যেন বৃকের সামনের অংশের সর্বত্র বজ্রণা। এই বজ্রণা কখনো চাপা, মোচড়ানো বা আঁকড়ানো অথবা জলুনির মত। সচরাচর রোগটি খাওয়া-দাওয়ার পর শুরু হয়। এর কলে আক্রান্ত ব্যক্তি মনে করে, পরিপাকের ব্যাঘাতে বৃকি বৃকে

ব্যথা হচ্ছে। কিন্তু মূলে তা নয়—রোগটি হঠাৎ আক্রমণ করেছে।

## ব্যায়ির প্রতিকার

অস্থখটির প্রতিকারক হিসাবে অনেক রকমের ওষুধ আজকাল পাওয়া যাচ্ছে। সে লক্ষ্যে বিস্তারিত বিষয়ণ ভেদজ-বিজ্ঞানের আলোচ্য বিষয়। তবে একেবারে অশোধ ওষুধ কিছু আছে বলে বিশেষজ্ঞেরা মনে করেন না। করোনারী ধমনীর ব্যাধিতে বিভিন্ন উপায়ে রক্তে কোলে-স্টেরল কমিয়ে আনলেই যে চোহার কোন পরিবর্তন বা রোগের উন্নতি হয়, এমন মনে হয় না। একবার যখন রক্তে চ্যুতি বা তাকন ধরে, তখন থেকে টিকে থাকবার সময় এবং রক্তে কোলেস্টেরল সীমার মধ্যে কোন সম্পর্কই দেখা যায় না। রক্তে কোলেস্টেরলের পরিমাণ এবং তার জমাট বাঁধার সঙ্গে কোন নিকট সম্বন্ধ নেই। সুতরাং এই বিষয়ে এখনও সুদীর্ঘ গবেষণার প্রয়োজন।

“.....পাঠ্যাবস্থার বাঙালী ছাত্র বাছা শিখে, সেই সময়ের মধ্যে তাহার দশ গুণ শিখা উচিত, ‘সিলেবাসে’ (Syllabus) নাই—পরীকার কাজে লাগিবে না; অতএব পড়িবে না—এই একটা ভয়ানক ব্যাধি। জ্ঞানার্জন হউক বা না হউক, শুধু পাশ করিতে পারিলেই হইল। আর যখন, কঠোর করিয়া পাশ করিবার বিস্তৃত আয়োজনে ব্যাপকভাবে বুদ্ধির বিকাশ হইবার অবসর হয় না। কার্যক্ষেত্রে পাশ করা বৃদ্ধি প্রায়ই ‘অকেজো’ হইয়া দাঁড়ায়।”

আচার্য প্রহ্লাদজ



## শনিগ্রহ

### সোমদত্তা লিংক

সৌরজগতের ষষ্ঠ গ্রহ শনির উৎপত্তি সবচেয়ে আমাদের পৌরাণিক সাহিত্যে ও ইউরোপীয় সাহিত্যে নানা ধরনের কাহিনী প্রচলিত আছে। পদ্যপুরাণ অম্বারীশি শনি বিতাম্ব বা সূর্য ও ছারার পুত্র। পুরাণ অম্বারীশি শনি ক্রুরদৃষ্টিসম্পন্ন এবং খঞ্জ। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণ পাঠে জানা যায় যে, শনি শিশুকাল থেকেই কৃষ্ণতক্ত ছিলেন ও সর্বদা তপোনিরত থাকতেন। একবার তপস্রাকালে তিনি তাঁর পত্নীর একটি অম্বরোধ রাখতে সক্ষম না হওয়ার তাঁর পত্নী তাঁকে এই বলে অভিলাপ দেন যে, তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করবেন তাই বিনষ্ট হবে। পত্নীর এই শাপে শনি ক্রুরলোচন হন এবং এই দৃষ্টিপাতের ফলে পার্বতীপুত্র গণেশের মস্তক ছিন্ন হলে পার্বতীর শাপে শনি খঞ্জ হন। প্রাচীন ও আধুনিক রোমানরা শনিকে গ্রীসদেশীয় পৌরাণিক দেবতা Cronus বলে অভিহিত করেন। গ্রীসদেশের পুরাণ অম্বারীশি ক্রোনাস আকাশ (Uranus) ও পৃথিবীর (Gaea) সম্ভাবনের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। পৃথিবীর এই সম্ভাবনের Titan বলা হতো। ক্রোনাস তাঁর যাতার অম্বরোধে পিতাকে হত্যা করেন এবং অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে পিতৃ-রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তাঁর প্রজাগণ দেবতাদের মত স্বাধীনতা ভোগ করতেন। শনির পুত্রেরা দশ বছর ধরে ভীষণ যুদ্ধ করে ক্রোনাসকে পরাজিত করেন। রোমের ক্যাপিটোল পর্বতের পাদদেশে একটি মন্দির আছে, তাতে শনি বা Saturn-এর প্রতিমূর্তি আছে। প্রতি বছর এখানে Saturnalia নামে একটি উৎসব হয়। ইটালিতে প্রাপ্ত বৃত্তান্ত অম্বারীশি শনি বা Saturn এক সময় ইটালীর রাজা ছিলেন; তাই

তাঁর শাসিত ভূমণ্ডলকে Saturnia বলে। শনিকে বলা হয় “Lord of Saturday”। শনির নাম অম্বরারাই সপ্তাহের ষষ্ঠ দিনটি চিহ্নিত হয়েছে।

আমাদের সৌরজগতের নয়টি গ্রহের মধ্যে প্রথম ছয়টিকে (অর্থাৎ Uranus, Neptune ও Pluto বাদে) খালি চোখে দেখা যায় বলে প্রাচীনরাও এদের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। পর-বর্তীকালে অপর তিনটি গ্রহ এবং বহু গ্রহাণুপুঞ্জ আবিষ্কৃত হয়েছে। সবগুলির মধ্যে বৃহস্পতি আকারে সবচেয়ে বড় এবং তাঁর পরেই শনি গ্রহের স্থান। জ্যোতির্বিজ্ঞানের একক অম্বারীশি শনি সূর্য থেকে 9'5 একক অন্তরে অবস্থান করে। এর গতি খুব মন্দ—29'5 বছরে একবার সূর্য প্রদক্ষিণ করে এবং এক বছর পর গ্রহটিকে আকাশে 12° পূর্বদিকে সরে যেতে দেখা যায়। এক-একটি রাশি অতিক্রম করতে এর আড়াই বছর সময় লাগে। শনিকে খালি চোখে একটি ক্ষুদ্র উজ্জল তারার মত মনে হয়। কিন্তু শনি আকারে পৃথিবীর 800 গুণ এবং এর ব্যাস 113000 কিলোমিটার। আকারে বৃহৎ হলেও শনির ভর কিন্তু মোটেই বেশী নয়। পৃথিবীর ঘনত্ব সেখানে 5'5gm/c.c, এই গ্রহের ঘনত্ব সেখানে মাত্র 0'7gm/c.c. অর্থাৎ একটি বিশাল সমুদ্রে শনিকে কেলে দিলে তা তাসতে থাকবে। এথেকে প্রমাণিত হয় যে, শনি অত্যন্ত লঘু পদার্থের দ্বারা গঠিত। শনির নিজ অক্ষে আব-তর্নকাল বিষুবরেখার 10 ঘণ্টা 13 মিনিট ও বিষুব অক্ষরেখার 10 ঘণ্টা 40 মিনিট, অর্থাৎ শনিগ্রহের একদিন আমাদের মাত্র সোয়া দশ ঘণ্টা। এত ক্ষুদ্রত্বের সত্ত্বে এই গ্রহের উত্তর

ও দক্ষিণ থেকে বেশ চাপা। সেই কারণে এর নিরক্ষীয় ব্যাস মেরুদেশীয় ব্যাস অপেক্ষা শতকরা দশ ভাগ বেশী।

শনিগ্রহটি ঘন মেঘগুচ্চে আবৃত এবং এর আলোকচিত্র নিলে এর গায়ে ফিতার মত কতকগুলি সদাচকল কালো দাগ দেখা যায়। দাগগুলি যাকে যাকে বিলীন হয়ে যায়। শনির আলোক বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর বায়ুমণ্ডলে হাইড্রোজেন, মিথেন ও হিলিয়াম গ্যাসে অ্যামোনিয়াম কঠাণ প্রলম্বিত অবস্থায় রয়েছে। শনির বায়ুমণ্ডল 16000 মাইল গভীর বলে মনে করা হয়। তবে এই বায়ুমণ্ডলের গ্যাসগুলি বেশ নিয়মিতভাবে শনির বিঘুরেবার সমান্তরালে অবস্থান করে। শনিগ্রহে মিথেন গ্যাসের মাত্রা বেশী। বৃহস্পতির তুলনায় শনির গায়ে কলক বা ঝলক (Eruption) প্রভৃতি কম দেখা যায়। বৃহস্পতির বিখ্যাত Red spot-এর মত শনির কোন কলক নেই। শনির বিঘুরেবা ও মধ্য অক্ষরেবার আবর্তন বেগের পার্থক্য থাকবার জন্মে একটি নিরক্ষীয় প্রবাহ আছে, যার গতি পূর্বদিকে ও বেগ সেকেন্ডে 400 মিটার।

দূর থেকে বহুদূরে অবস্থিত বলে এই গ্রহের উপরিতলের তাপমাত্রাও খুব কম। অবলোকিত রশ্মির পরিমাণ অনুযায়ী শনিপৃষ্ঠের তাপমাত্রা প্রায়  $-120^{\circ}\text{C}$ । শনির এই শীতলতার জন্মেই তার বায়ুমণ্ডলের অধিকাংশ অ্যামোনিয়া গ্যাস তরল অথবা কঠিন অবস্থায় গ্রহপৃষ্ঠে বর্তমান। বায়ুমণ্ডলের সমস্ত জল জমে বরফ হয়ে শিলাময় শনিপৃষ্ঠকে প্রায় 6000 মাইল পুরু একটি আবরণে ঢেকে রেখেছে। এই আবরণের নীচে শনির দেহ-পিণ্ড 26000 মাইলের বেশী গভীর বলে মনে হয় না। শনির বায়ুমণ্ডল এত বিশাল যে, তার প্রায় অর্ধেক তরই বায়ুমণ্ডলের দ্বারা স্ট্রট। কিন্তু শনি দূর থেকে যে পরিমাণ শক্তি পায়, তাতে তার তাপ-

মাত্রা আরও কম হওয়া উচিত ছিল। তাই মনে করা হয় যে, শনির অভ্যন্তরে নিশ্চয় এমন কোন বস্তু আছে, যা তাপমাত্রার বৃদ্ধি ঘটায়। তাত্ত্বিক গবেষণার ফলে জানা গেছে যে, শনির রাসায়নিক উপাদান ও আভ্যন্তরীণ কাঠামো অনেকটা বৃহস্পতির মত অর্থাৎ এর বেশীর ভাগ অংশই হাইড্রোজেন, হিলিয়াম প্রভৃতির দ্বারা গঠিত।

শনির নয়টি উপগ্রহ আছে এবং 1956 সালে আর একটি অর্থাৎ দশম উপগ্রহের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই পঞ্চোক্ত উপগ্রহটির কক্ষপথ শনির সবচেয়ে নিকটে ও এর আকারও খুব ছোট। শনির এই উপগ্রহগুলির গতিপথের ব্যাস গ্রহের ব্যাসের 4:1 থেকে 220 গুণ বেশী। সেই জন্মে এরা শনির বিখ্যাত বলয়শ্রেণীর বাইরে অবস্থিত। শনির এই উপগ্রহগুলির সঙ্গে বৃহস্পতির উপগ্রহগুলির অনেক ক্ষেত্রে সাদৃশ্য থাকলেও শনির উপগ্রহগুলি অনেক বড়। এই নয়টি উপগ্রহের নাম যথাক্রমে Mimas, Enceladus, Tethys, Dione, Rhea, Titan, Hyperion, Iapetus এবং Phoebe। এদের মধ্যে Titan-এর তর সর্বাধিক এবং সমগ্র সৌরজগতে এটিই দ্বিতীয় বৃহত্তম উপগ্রহ। তাছাড়া এটিই একমাত্র উপগ্রহ, যার নিজস্ব বায়ুমণ্ডল আছে। Titan-এর বায়ুমণ্ডলে বিখ্যাত মিথেন গ্যাস আছে।

শনিগ্রহ সম্বন্ধে কোত্থলের মূল কেন্দ্র হলো তার বলয়শ্রেণী এবং অপকৃষ্ট সৌন্দর্য। দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে গ্রহটির ঈষৎ হেমকান্তি এবং তার ঠিক মধ্যস্থল বেটন করে আলোকমণ্ডিত বলয়শ্রেণীর শোভা আকাশের একটি অপূর্ণ সৌন্দর্য। তিনটি বলয় শনির বিঘুরেবার সমতলে থেকে গ্রহটিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের ব্যাস 135000 থেকে 270000 কিলোমিটার পর্যন্ত। এই বলয়শ্রেণীর তর মূল গ্রহের তরের 1/27000 ভাগ এবং Titan-এর তরের 1/5 ভাগ। যদিও এই বলয়শ্রেণীর বিস্তৃতি অনেক বেশী, তথাপি এর বেধ সেই

ভুলনার খুবই কম—মাত্র 16 কিলোমিটার। আকাশে এদের বিভিন্ন অবস্থানে বলয়ের উপরি-তল কিংবা নিম্নতল মাত্র দেখা যায়। যখন বলয়ের পার্শ্বদেশ পৃথিবীর দিকে থাকে, তখন তাকে একটি সরলরেখা বলে মনে হয় এবং একটি কমলা-লেবুকে শলাকার দ্বারা ছিদ্র করলে যেমন দেখায়, শনিগ্রহ ও বলয়শ্রেণীকেও সেই রকম দেখায়। বলয়ের সমতল আমাদের ঠিক দৃষ্টিরদ্বারা থাকলে কয়েক দিনের মধ্যে বলয়টি অদৃশ্য হয়ে যায়। বলয়ের বেধ কম বলেই এরকম দেখায়। বহির্বলয়, মধ্যবলয় এবং অন্তর্বলয়কে যথাক্রমে A, B এবং C বলে অভিহিত করা হয়। অন্তর্বলয়টি শনিপৃষ্ঠ থেকে 7000 মাইল উচ্চে অবস্থিত। এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, বলয়গুলির মধ্যে শূন্য স্থান আছে। মধ্যবলয় থেকে বেশী সূর্যালোক প্রতিফলিত হওয়ায় তাকে সব সময়ই প্রায় শনিগ্রহের মত উজ্জ্বল দেখায়; তাই একে 'উজ্জ্বল বলয়' বলা হয়। অন্তঃবলয়গুলি এত উজ্জ্বল নয়।

জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মনে করেন যে, এই বলয়গুলি অসংখ্য ছোট ছোট (কয়েক সেন্টিমিটার মাপের) বিচ্ছিন্ন উৎসপিণ্ড ও ধূলিকণার মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদার্থের সাহায্যে গঠিত। প্রত্যেকটি অংশ এক-একটি ছোট ছোট স্বাধীন উপগ্রহের মত শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। বলবিজ্ঞানের নিয়মাবলী দ্বারা শনির এত নিকটে কোন অবিচ্ছিন্ন পদার্থের চাক্তি থাকতে পারে না। এর বিভিন্ন অংশে মহাকর্ষীয় বল বিভিন্ন পরিমাণে ক্রিয়া করার ফলে চাক্তিটি কেটে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়াই স্বাভাবিক। শনির বলয় যে খণ্ড খণ্ড উৎসাক্রান্তীয় পদার্থের দ্বারা গঠিত তার প্রমাণ এই যে, অন্তর্বলয়ের মধ্য দিয়ে মাঝে মাঝে শনির পৃষ্ঠদেশ দেখা যায়। বলয় থেকে প্রতিফলিত সূর্যালোক পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, এই বলয়ের ভিতরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেন্ডে 12 মাইল ও বাইরের দিকের পদার্থসমূহ সেকেন্ডে 10 মাইল বেগে ঘুরছে। এই বলয়শ্রেণীগুলির

কোন কোন স্থান শনির বড় উপগ্রহগুলির (উদাহরণস্বরূপ Mimas) মহাকর্ষীয় আকর্ষণের ফলে বিচ্ছিন্ন হয়ে অবলুপ্ত হয়ে গেছে। বৃহস্পতি তার নিকটবর্তী সূর্যপ্রদক্ষিণকারী গ্রহাণুগুলির উপর অল্পরূপ প্রভাব বিস্তার করার ফলে গ্রহাণু-পুঞ্জের মধ্যে কাকের সৃষ্টি হয়েছে—এদের 'Kirkwood gap' বলা হয়। শনির এই বলয়-শ্রেণীর উৎপত্তি সম্বন্ধে কোন সর্বজনগ্রাহ্য মত এখনও প্রতিষ্ঠিত হয় নি। অন্তঃকোন এহে কিন্তু এই ধরনের কোন বলয় নেই। অনুমান করা হয় যে, কোন উপগ্রহ শনির খুব কাছে এসে পড়বার দক্ষণ তার আকর্ষণ-বল সহ্য করতে না পেরে খণ্ড খণ্ড অংশে বিভক্ত হয়ে বলয়ের সৃষ্টি করেছে। শনির নয়টি উপগ্রহ বলয়শ্রেণী থেকে বহুদূরে অবস্থিত। সুতরাং স্বাভাবিকভাবেই মনে হয় যে, সুদূর অতীতে শনির নিকটস্থিত একটি উপগ্রহ খুব কাছে চলে আসার ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। সেই একটি উপগ্রহ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কোটি অংশে বিভক্ত হয়ে প্রায় একই সমতলে বিভিন্ন দূরত্বে থেকে শনিকে প্রদক্ষিণ করছে। এদের দ্বারা সূর্যালোক প্রতিফলিত হয় আর সুদূর পৃথিবী থেকে সেই প্রতিফলিত আলো দেখে এই ভগ্ন উপগ্রহের বিচ্ছিন্ন অংশগুলিকে আমরা বলয় বলে মনে করি। আবার কেউ কেউ বলেন যে, ঐ উপগ্রহের ধ্বংস শনির আর একটি উপগ্রহের দ্বারা ঘটেছে। এই মতবাদে তিনটি বিভিন্ন বলয় সৃষ্টির কারণের কিছু আভাস পাওয়া যায়।

শনিগ্রহটি যদিও বেশ উজ্জ্বল, তবু নানা কারণ-বশতঃ বৃহস্পতির ভুলনার এটি কিছুটা নিম্প্রভ। পৃথিবী থেকে শনির যে উজ্জ্বলতার পরিবর্তন দেখা যায়, তার কারণগুলির মধ্যে অন্যতম হলো বলয়-শ্রেণীর কোণের পরিবর্তন। তাছাড়া পৃথিবী ও শনির মধ্যবর্তী দূরত্ব ও উভয়ের দ্রুতির পরিবর্তনও উজ্জ্বলতার দ্ব্যস-বৃদ্ধি ঘটবার অন্যতম কারণ।

বৃহস্পতির সঙ্গে শনির অনেক সাদৃশ্য থাকলেও শনি থেকে বেতার-বলক বৃহস্পতির তুলনায় খুব কমই পাওয়া যায়। তবে শনি থেকে যাকে যাকে দুর্বল বেতার-বলক যে আসে, তা সম্প্রতি প্রমাণিত হয়েছে। এই বেতার-বলকের স্বরভার কারণ হিসাবে নানাবিধ মত প্রকাশ করা হয়েছে। কেউ কেউ বলেন, শনির হয়তো কোন চৌম্বক বলয় নেই, যা গ্রহটির কাছে তড়িৎসম্পন্ন কণা-গুলিকে ধরে রেখে বিকিরণ-বলয়ের সৃষ্টি করতে পারে। আবার কারো কারো মতে, পৃথিবী এবং বৃহস্পতির বিকিরণ-বলয়ে বাকী তড়িৎকণিকাগুলি যদি সূর্য থেকে তার সৌর প্রবাহের (Solar wind) সাহায্যে আসে, তাহলে শনি থেকে বেতার-তরঙ্গ নির্গমনের অভাব একমাত্র এই কারণেই হতে পারে যে, সৌর প্রবাহ এই বিরাট দূরত্ব অতিক্রম করে এই গ্রহে পৌঁছতে পারে না। আরও একটি মতবাদ এই যে, হয়তো শনির বলয়-গুলি তার বিকিরণ-বলয় তৈরি হবার পথে বাধার সৃষ্টি করে।

শনিগ্রহ ক্রমবিকাশের নিয়ন্ত্রণে অবস্থিত, অর্থাৎ ক্রমবিকাশের পথে আরও লক্ষ লক্ষ বছর চলবার পর শনির পৃথিবীর অবস্থায় পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে বলা যেতে পারে। ফলে শনিতে জীবনের অস্তিত্ব থাকবার সম্ভাবনা খুব কম। বিরাট বায়ুমণ্ডলের চাপ ও বিবাক্ত মিথেন গ্যাসের উপস্থিতি জীবের প্রাণধারণের পক্ষে প্রতিকূল অবস্থার সৃষ্টি করেছে। কিন্তু বিজ্ঞানীদের মতে, এই অবস্থাতেও একটি জিনিষ থাকতে পারে, তা হলো জীবের ক্ষুদ্রতম অণু (Micro-organism)। এমন জীবাণু আছে, যা অত্যধিক উত্তাপ ও শৈত্যের মধ্যে বেঁচে থাকতে পারে এবং খাচ্ছ আত্মসাৎ করে প্রাণধারণ করে। এদের বুদ্ধি পাবার ক্ষমতাও অদ্ভুত এবং এদের জন্তেই বিবাক্ত বস্তুর সৃষ্টি হয়। সম্ভবতঃ শনিতে যে অ্যামোনিয়া

ও মিথেন রয়েছে, তার সঙ্গে এই গ্রহের জীবাণুরও সম্বন্ধ আছে। অবশ্য এই বিষয়ে সঠিক এখনও কিছুই বলা যায় না।

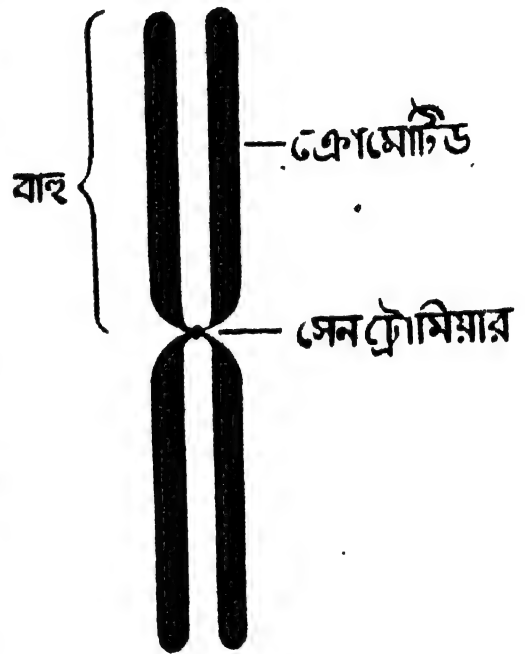
শনিগ্রহ সম্বন্ধে ব্যাপক অন্বেষণ ও গবেষণা হওয়া এখন অত্যন্ত প্রয়োজন। এখন পর্যন্ত যেটুকু জানা গেছে, তার কয়েক নানা রকম কৌতূহলোদ্দীপক প্রশ্নের উদ্ভব হয়েছে, যার উত্তর পেতে হলে প্রচুর নতুন পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও তাত্ত্বিক গবেষণার প্রয়োজন। কিছু পরীক্ষা শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে করা সম্ভব হলেও এমন কিছু বিশেষ তথ্য আছে, যা জানতে হলে কৃত্রিম উপ-গ্রহ থেকে প্রক্ষিপ্ত মহাকাশ-সন্ধানী বহুবাহী বিশেষ যানের (Space probe) সাহায্যে পরীক্ষা চালানো অবশ্যই প্রয়োজন। মহাকাশ-সন্ধানী বিশেষ যান লক্ষ্যস্থলে গিয়ে সংগৃহীত তথ্য পৃথিবীতে পাঠাতে বেশ কয়েক বছর সময় নেবে। কাজেই এভাবে শনিগ্রহ সম্বন্ধে নতুন অন্বেষণ খুব আশাব্যঞ্জক নয়। তবে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সম্প্রদায় গবেষণা সংস্থা NASA (National Aeronautics and Space Administration) তাদের 1972-'73 সালের কর্ম-সূচীতে যে মহাকাশ যাত্রার উদ্ভোগ করছেন, তার নাম তাঁরা দিয়েছেন 'Grand tour'। এবারে তাঁরা মঙ্গলগ্রহের পরিক্রমণ পথ ছাড়িয়ে দূরবর্তী গ্রহ ও গ্রহাণুগুণের দেশে বিচরণ করবার জন্তে আরোহী-বিহীন মহাকাশযান 'Pioneer' তৈরির কাজে হাত দিচ্ছেন। এই যান গ্রহাণুবলয় ভেদ করে বৃহস্পতির কাছে যাবে। এই মহাকাশযান কর্তৃক সংগৃহীত তথ্যের উপর ভিত্তি করে বর্তমান দশকের শেষের দিকে শনি প্রভৃতি গ্রহের দিকে মহাকাশযান পাঠাবার ব্যবস্থা করা হবে। এই সব পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলে আন্তর্জাতিকীয় বিজ্ঞান সম্বন্ধে আমরা আরও অনেক নতুন নতুন তথ্য জানতে পারবো।

## ক্রোমোজোম ও মানুষের রোগ

শ্রীঅসিতবরণ দাস-চৌধুরী\*

ক্রোমোজোম শব্দটির সঙ্গে অনেকই হ্রস্বতো পরিচিত। ক্রোমোজোম জীবকোষের নিউক্লিয়াসে থাকে। ক্রোমোজোম (Chromo= colour, রং; Soma= body, বস্তু) নিউক্লিয়াসের সেই বস্তু, যাঁহার উপর কোন বিশেষ রং প্রয়োগ করিলে তাহা সেই রং গ্রহণ করিয়া অণুবীক্ষণ যন্ত্রে আমাদের চোখে রঙীন দৃশ্যের মত পরিষ্কৃত হইয়া ওঠে। কি উদ্ভিদ, কি প্রাণী—উভয়ের দেহে প্রতিটি কোষে ক্রোমোজোম থাকে। একই প্রেণীর উদ্ভিদের কিংবা একই জাতের প্রাণীর কোষে নির্দিষ্ট সমান সংখ্যক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই ক্রোমোজোমের মধ্যে আমাদের বংশাণুগতির এক-একটি একক জীন (Gene) রেখাকারে সাজানো অবস্থায় থাকে। বর্তমান প্রবন্ধে ক্রোমোজোমের সহিত মানুষের রোগের কি সম্পর্ক, সেই বিষয়ে আলোচনা করিব। কিন্তু এই সম্পর্ক পরিষ্কারভাবে বুঝিতে হইলে মানুষের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে একটু বিস্তারিত বর্ণনা আবশ্যক। জে. আরনল্ড নামে একজন জার্মান বিজ্ঞানী 1879 সালে মানুষের টিউবারের কোষে সর্বপ্রথম ক্রোমোজোম লক্ষ্য করেন। তাহার পর দীর্ঘ অর্ধশতাব্দীকাল যাবৎ মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সঠিক সংখ্যা লইয়া বিজ্ঞানীদের মধ্যে নানা মতবিরোধ চলিতে থাকে। অবশেষে 1936 সালে জে. এইচ. তিজো এবং এ. লিভান নামে দুই জন সুইডিশ বিজ্ঞানী মানুষের অণুস্থিত ফুসফুসের কাইব্রোরিট টিস্যুর উৎপাদন হইতে প্রমাণ করিলেন যে, মানুষের দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা 46। এই 46টি ক্রোমোজোমের মধ্যে 22 জোড়া অটোজোম (Autosome) ও 1 জোড়া

সেক্স-ক্রোমোজোম (Sex-chromosome)। অটোজোম দেহকোষের সেই ক্রোমোজোমগুলি, যেগুলি আমাদের দৈহিক, মানসিক ও শারীরিক

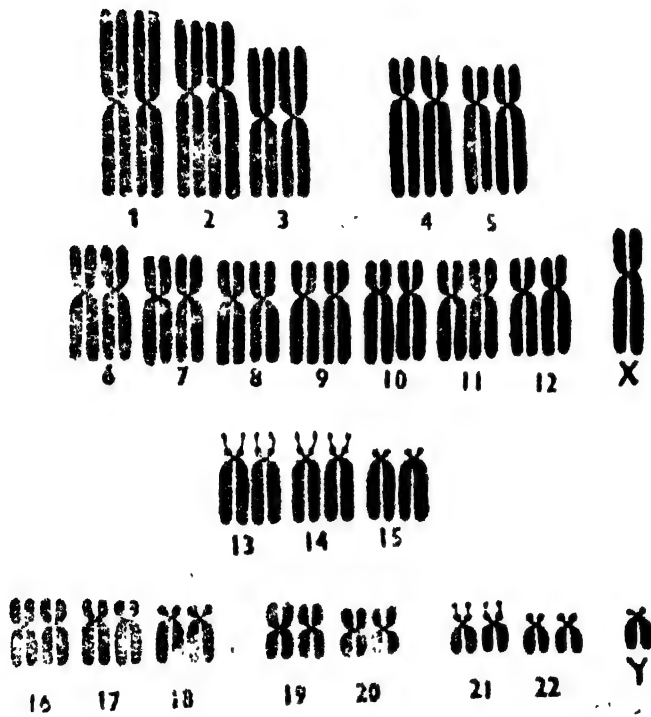


1নং চিত্র। ক্রোমোজোম

বিকাশের জন্ত দায়ী। আর সেক্স-ক্রোমোজোমগুলি আমাদের লিঙ্গের বিকাশের জন্ত দায়ী। মানুষের দেহ-কোষের সেক্স-ক্রোমোজোম দুইটি বথাক্রমে X এবং Y। নারী ও পুরুষের সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন বথাক্রমে XX এবং XY। আজ বিশ্বের সকল বিজ্ঞানী মানুষের দেহকোষে তিজো ও লিভানের আবিষ্কৃত ক্রোমোজোম সংখ্যাকে সঠিক বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছেন, যদিও দুই-একজন চীনা

ও জাপানী বিজ্ঞানী ভিন্ন মত পোষণ করেন। পূর্বেই উল্লেখ করিয়াছি যে, ক্রোমোজোমকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে মৃত্যুর মত দেখায়, কিন্তু কোষ বিভাজনের মেটাকেন্দ্র স্টেজে ক্রোমোজোমকে 1 নং চিত্রের মত দেখা যায়। প্রত্যেক ক্রোমোজোমে দুইটি ক্রিয়া ক্রোম্যাটিড থাকে এবং এই দুইটি ক্রোম্যাটিড যে বিন্দুতে জোড়া লাগিয়া থাকে, তাহাকে সেন্ট্রোমিয়ার বলা হয়। সেন্ট্রোমিয়ারের দুই

সেনট্রিক, সাবমেটাসেন্ট্রিক এবং অ্যাকোসেন্ট্রিক বলা হয়। বিভিন্ন মতাবলম্বী হিউম্যান সাইটোজেনেটিকগণ (অর্থাৎ যে সব বিজ্ঞানী মাহুকের দেহকোষ ও ক্রোমোজোম ইত্যাদি লইয়া গবেষণা করেন) বাহাতে একমত হইয়া মাহুকের ক্রোমোজোম সম্বন্ধে গবেষণার কাজে উন্নতিসাধন করিতে পারেন, তাহার জন্য 1960 সালে ডেনভারে, 1963 সালে লণ্ডনে এবং 1966 সালে শিকাগোতে



2নং চিত্র

মাহুকের ক্রোমোজোম (ডেনভার কংগ্রেসের মতানুসারে)

দিকের অংশ দুইটিকে ক্রোমোজোমের দুইটি বাহ বলা হয়। এই সেন্ট্রোমিয়ারের অবস্থানভেদে ক্রোমোজোমের মধ্যখানে, একটু দূরে এবং শেষের দিকে থাকিলে ক্রোমোজোমকে যথাক্রমে মেটা-

মিডসভা বসে (এই সম্বন্ধে 2নং চিত্র দ্রষ্টব্য)। গবেষণার সুবিধার জন্য ও ক্রোমোজোমের বিভিন্ন গুণাবলী লক্ষ্য করিয়া মাহুকের ক্রোমোজোমকে নিম্নলিখিত বিভিন্ন শ্রেণীতে ভাগ করা হইয়াছে—

গ্রুপ	ক্রোমোজোমের আকার ও সেন্টোমিটারের অবস্থান	ইডিওগ্রাম নম্বর	প্রতি গ্রুপের সংখ্যা	
			পুরুষ	নারী
I, A	সবচেয়ে বড়, মেটাসেন্ট্রিক	1—3	6	6
II, B	বড়, সাবমেটাসেন্ট্রিক	4—5	4	4
III, C	মধ্যম, সাবমেটাসেন্ট্রিক	6—12X	15	16
IV, D	মধ্যম, অ্যাকোসেন্ট্রিক	13—15	6	6
V, E	ছোট, মেটা ও সাবমেটাসেন্ট্রিক	16—18	6	6
VI, F	সবচেয়ে ছোট, মেটাসেন্ট্রিক	19—20	4	4
VII, G	সবচেয়ে ছোট, অ্যাকোসেন্ট্রিক	21—22Y	5	4

46

### মাহুষের ক্রোমোজোমের বিশ্লেষণ

প্রবন্ধের মূল আলোচনার পূর্বে আরও বিষয় উল্লেখ করিবার প্রয়োজন আছে। মাহুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াস পরীক্ষা করিয়া ইহা কোন্ লিঙ্গের তাহা বলা যায়। প্রকৃত নারীর দেহকোষের শতকরা ৩০ হইতে ৬০ ভাগ নিউক্লিয়াসে সেক্স-ক্রোম্যাটিন নামে একটি বস্তু থাকিবে, সেই ক্ষেত্রে প্রকৃত পুরুষের দেহকোষের নিউক্লিয়াসে কখনও সেক্স-ক্রোম্যাটিন থাকিবে না। সেই জন্য প্রকৃত নারী ও পুরুষকে যথাক্রমে সেক্স-ক্রোম্যাটিন পজিটিভ ও সেক্স-ক্রোম্যাটিন নেগেটিভ বলা হয়। প্রবন্ধে সিনড্রোম (Syndrome) শব্দের উল্লেখ আছে। কতকগুলি বৈলক্ষণ্য আমাদের দেহে এক সঙ্গে প্রকাশ পাইয়া যে রোগের সৃষ্টি করে, তাহাকে সিনড্রোম বলা হয়।

মন্ডোলিজম—১৯৫৭ সালে ফরাসী বিজ্ঞানী জে. লুঁজা মন্ডোলিজম এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। ক্রোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রমে মাহুষের দেহে যে নানারকমের বৈলক্ষণ্যের সৃষ্টি হইতে পারে, এই ধারণা পূর্বে অনেক বিজ্ঞানীদের মধ্যে ছিল। কিন্তু মাহুষের ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যা আবিষ্কৃত হইবার পর জে. লুঁজা-ই সর্বপ্রথম মন্ডোলিজম-সিনড্রোমের দ্বারা ইহা সপ্রমাণে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। লুঁজা দেখা-

ইলেন যে, মাহুষের দেহের কোষে ২১ নম্বর ক্রোমোজোমের এক জোড়ার পরিবর্তে যদি তিনটি ক্রোমোজোম থাকে, তবে দেহে একসঙ্গে কতকগুলি বৈলক্ষণ্যের উৎপত্তি হয়। সুতরাং মন্ডোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষে ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে ৪৭, কারণ VII অথবা G গ্রুপের ২১ নম্বর দুইটি ক্রোমোজোমের সহিত একটি অতিরিক্ত খুব ছোট অ্যাকোসেন্ট্রিক ক্রোমোজোম থাকিবে। মন্ডোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহে সাধারণতঃ কতকগুলি বৈলক্ষণ্য দেখা যায়; যথা—এই রোগী দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়া পশ্চাদগত হয়, বুদ্ধিও খুব কম হয়। চোখের উপরের খাতার উপরে একটি তাঁজ থাকে। ঘর্ষকার দেহ, চ্যান্টা হাত-পা, ছোট নাক, হাতে অথবা পায়ে অতিরিক্ত আঙ্গুল, ছোট ছোট হাত ও পায়ের আঙ্গুল, শুষ্ক বক, হৃৎপিণ্ডের রোগ ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। উত্তর লিঙ্গই মন্ডোলিজমে আক্রান্ত হইতে পারে। তবে শতকরা প্রায় বাট-শতাংশই দশ বৎসর অতিক্রম করিবার পূর্বেই মরিয়া যায়। কয়েকটি জাতির মধ্যে প্রতি ছয় শত বা সাত শত জনের মধ্যে একটি মন্ডোলিজম-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশুর জন্ম হয়। পূর্বে বলি-



রাহি, কোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমেই এই মলোজেন-সিনড্রোমের উৎপত্তি; কিন্তু কেন এবং কি করিয়া এই কোমোজোমের সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, ইহা বিজ্ঞানীদের নিকট এক বিরাট সমস্যা। আজ অনেক বিজ্ঞানীই এই মত পোষণ করেন যে, শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষের বিভাগের সময় ক্রোমোজোমগুলি (এই ক্ষেত্রে 21 নম্বর অটোজম) ঠিকমত বিভাজন (Disjunction) হইয়া দুইটি নূতন কোষে বাইতে না পারিলে বৃদ্ধিকরণ (Non-disjunction) অবস্থার থাকে এবং সেই জন্য কোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে, বাহার কলে এই সিনড্রোমের উৎপত্তি হয়। অনেক বিজ্ঞানী প্রমাণ করিয়াছেন যে, অতিরিক্ত বয়সের মায়ের গর্ভজাত সন্তানের দেহেই এই সিনড্রোমের সংখ্যাধিক্য ঘটে।

ক্রাইনোকলটার-সিনড্রোম—1959 সালে পি. এ. জেকব এবং জে. এ. ব্রু নামে দুইজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর দেহকোষের সেক্স-ক্রোমোজোম গঠনে সাধারণ পুরুষ অথবা নারীর ক্রোমোজোমের নির্দিষ্ট সংখ্যা বদলায় XY অথবা XX না থাকিয়া XXY থাকে। সুতরাং এই রোগীর দেহকোষের ক্রোমোজোমের সংখ্যা হইবে 47, কারণ III অথবা C গ্রুপের একটি X ক্রোমোজোমের মত আর একটি অতিরিক্ত মধ্য আকারের সাবমেটাসেন্টিক ক্রোমোজোম থাকিবে। এই সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগী বাহিরের দিক হইতে সাধারণতঃ পুরুষ বলিয়াই মনে হইবে, কিন্তু সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠনের জন্য বিবিধ নারীর স্তন লক্ষণীয়। এই রোগী ক্রোমোজোম পঞ্জিভূত হয়। মানসিক রোগ, বন্ধ্যাত্ব, দৃশ্যমান স্তনবৃদ্ধি, বেশী পরিমাণ গোনাদোট্রোফিন নিকাশন, দৈহিক পরিমাপের বিলম্ব অসুপাত, বিশেষতঃ লম্বা পা ইত্যাদি বৈলক্ষণ্যগুলির অন্তর্ভুক্ত। ককেশীয়

জাতির মধ্যে প্রতি চার শত বালকের মধ্যে একটি ক্রাইনোকলটার রোগী জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রে সেক্স-ক্রোমোজোমে ননডিজাংশনের কলে সেক্স-ক্রোমোজোমে সংখ্যার ব্যতিক্রম ঘটে।

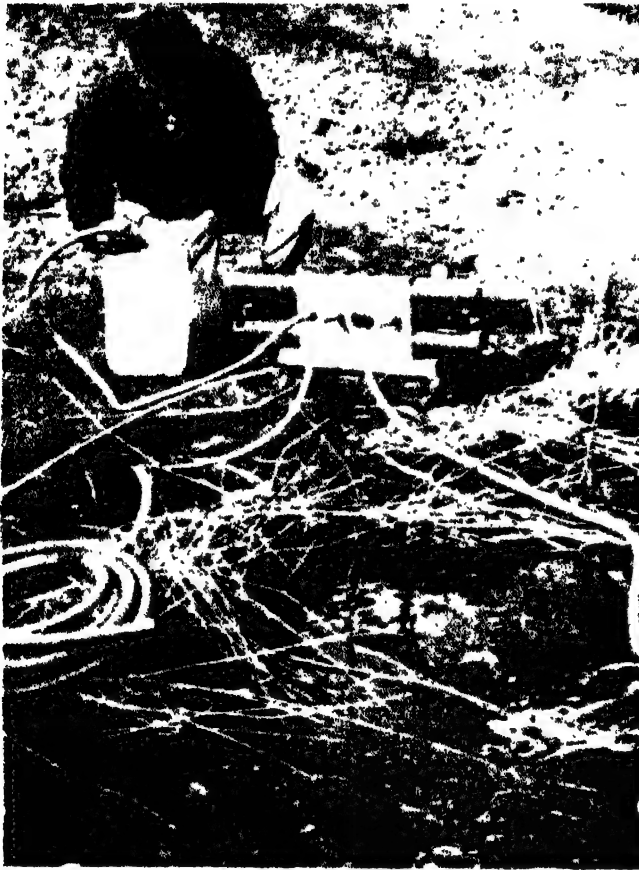
টার্নার-সিনড্রোম—এইচ. এইচ. টার্নার নামে একজন ব্রিটিশ বিজ্ঞানী 1938 সালে এই সিনড্রোমটি আবিষ্কার করেন। তিনি এই সিনড্রোমের কতগুলি বৈলক্ষণ্যের কথা উল্লেখ করেন; যথা—শিশুসুলভ বৈশিষ্ট্য, খর্বকায় দেহ, কাঁপানো গলবেশ এবং কিউবিটাস তালগাস। 1959 সালে আর একজন বিজ্ঞানী ই. বি. ফোর্ড গোনাদাল ডিসজেনেসিস (Gonadal dysgenesis) এই সিনড্রোমের অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্য বলিয়া ঘোষণা করেন। টার্নার-সিনড্রোম রোগীর ক্রোমোজোম সংখ্যা 45। সেক্স-ক্রোমোজোমের গঠন XO অর্থাৎ শুধু একটি X ক্রোমোজোম আর একটি সেক্স-ক্রোমোজোম নাই। শতকরা আশী ভাগ টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর ক্রোমোজোম নেগেটিভ হয়। বাহিরের দিক হইতে এই রোগীকে নারী বলিয়াই মনে হয়। অন্তর্ভুক্ত বৈশিষ্ট্যের মধ্যে বৈসাদৃশ্য—কান, স্তনহীন বক্ষ, বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই বন্ধ্যাত্ব ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। ককেশীয় জাতির মধ্যে প্রতি 10,000 জনের মধ্যে একটি টার্নার-সিনড্রোমে আক্রান্ত শিশু জন্মগ্রহণ করে। এই ক্ষেত্রেও শুক্রকোষ অথবা ডিম্বকোষের বিভাগের সময় সেক্স-ক্রোমোজোমের ননডিজাংশনের কলেই এই বৈসাদৃশ্যের সেক্স-ক্রোমোজোম সংখ্যার উৎপত্তি হয়।

পূর্বেই ক্রোমোজোমের সাধারণ নির্দিষ্ট সংখ্যার ব্যতিক্রমে অটোজোমের একটি এবং সেক্স-ক্রোমোজোমের দুইটি সিনড্রোমের বিষয় সংক্ষিপ্তভাবে আলোচনা করা হইয়াছে। সাধারণ সংখ্যার ব্যতিক্রমের জন্য অটোজোম ও সেক্স-ক্রোমোজোমের আরও অনেক আবিষ্কৃত সিনড্রোম আছে, কিন্তু সেইগুলি আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া হইয়াছে।



তাহার উপরে কোমোজোমের আকৃতির হের-  
কেরের জন্ত যে সকল সিনড্রোমের সৃষ্টি হয়, তাহা  
সম্পূর্ণভাবে প্রবন্ধের আলোচনার বহির্ভূত  
রহিয়াছে। আজ এই বিশ শতাব্দীতে হিষ্টম্যান  
সাইটোজেনেটিসিটগণ মাতৃগের বংশাঙ্গগতিক রোগ-  
সংক্রান্ত যে সকল রোগের রহস্য উদ্ঘাটন  
করিয়াছেন, তাহা চিকিৎসা-বিজ্ঞানীদের নিকট এক  
অমূল্য সম্পদ এবং প্রকৃতপক্ষে বিজ্ঞানের এই দুই

শাখার সহযোগিতায় গড়িয়া উঠিয়াছে ক্লিনিক্যাল  
সাইটোজেনেটিক্স। এইখানে এই কথা উল্লেখ-  
যোগ্য যে, উপরিউক্ত সিনড্রোমে আক্রান্ত রোগীর  
সংখ্যা আমাদের মধ্যে খুব কম হইলেও এবং এই  
সকল রোগের কতকগুলি কারণ আমরা উদ্ঘাটন  
করিতে পারিলেও ইহাদের চিকিৎসার সাহায্যে  
নিয়ন্ত্রণ করিয়া তোলা এখনও পর্যন্ত আমাদের  
সাধারণ বাহিরে রহিয়া গিয়াছে।



জল লবণমুক্ত করবার যন্ত্র

ক্যালিফোর্নিয়ার শ্রান ভিয়ারগোর গাল্ফ জেনারেল অ্যাটোমিক কর্তৃক লবণাক্ত জল  
শূণ্য করবার জন্তে সহজ বহনযোগ্য যন্ত্রমূলের এই যন্ত্রটি উদ্ভাবিত হয়েছে। যন্ত্রটির  
ওজন মাত্র 25 কিলোগ্রাম। যন্ত্রটিকে চালিয়ে দিনে প্রায় 400 লিটার পরিমাণ  
লবণমুক্ত পরিষ্কার জল পাওয়া যায়। বিপরীত অভিস্রবণ পদ্ধতিতে জল থেকে  
অবশিষ্ট ময়লা নিষ্কাশিত হয়। সৈন্তবাহিনী, অভিবাসী দল এবং ভ্রমণকারীরা  
এই যন্ত্রটি সহজেই ব্যবহার করতে পারবে।

# রেডার ও বৃষ্টিপাতের পরিমাপ

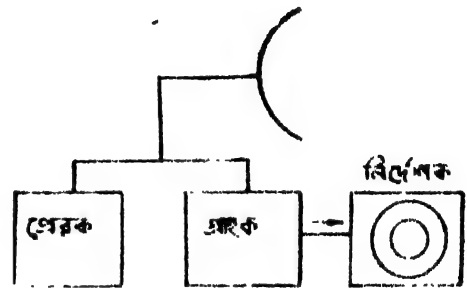
শ্রীমন্তনন্দ দে\*

রেডার কথাটার সঙ্গে আমরা আজ খুবই পরিচিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় প্রয়োজনের তাগিদে ইংল্যাণ্ডে রেডারের আবিষ্কার হয়। অবশ্য প্রযুক্তি-বিজ্ঞানে 'প্রয়োজনের তাগিদে আবিষ্কার' কথাটা খুবই সত্য। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জার্মেনী যখন ইংল্যাণ্ডের উপর অবিরাম বোমা বর্ষণ শুরু করে, টিক তখনই আত্মরক্ষার তাগিদে ইংল্যাণ্ডের বিজ্ঞানীরা শত্রুপক্ষ জার্মানদের বোমাক বিমানগুলিকে আগে থেকে সনাক্ত করার উপায় উদ্ভাবনে সচেষ্ট হন। কেন না, তাঁরা ভাবলেন যদি বোমাবর্ষণের আগে শত্রুপক্ষের বিমান সনাক্ত করা যায়, তাহলে সময়মত আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করা যাবে এবং প্রয়োজনমত আক্রমণও করা যাবে। প্রয়োজনের কলহে রেডার আবিষ্কৃত হয়—বার দ্বারা ঐ সনাক্তকরণ সম্ভব। Radio Angle Detection And Ranging—ইংরেজির এই শব্দগুলির আত্মাকর নিয়েই যন্ত্রটির নাম হয়েছে রেডার (Radar); অর্থাৎ রেডার হচ্ছে এমন একটি যন্ত্র, যার সাহায্যে কোন বস্তুর অবস্থান ও দূরত্ব—বেতার যন্ত্রের মাধ্যমে নির্ণয় করা যায়।

যুদ্ধের সময় গুরুত্বপূর্ণ প্রয়োজন যেটানো ছাড়াও রেডার যন্ত্র আবিষ্কৃত হবার পরের কয়েক বছরের মধ্যেই একে বিজ্ঞানীরা বেতার-জ্যোতি-বিজ্ঞা থেকে শুরু করে দৈনন্দিন প্রয়োজনেও নানানভাবে কাজে লাগাতে সক্ষম হন। নিরাপত্তার ক্ষেত্রে বিমানে রেডারের ব্যবহার আজ অপরিহার্য। আবহাওয়াবিদদের কাছে রেডার অতি প্রয়োজনীয় যন্ত্র। আবহাওয়াবিদগণ আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টিপাতের পরিমাপ ইত্যাদি নির্ধারণ করে রেডিও, ধবনের কাণ্ড প্রভৃতির মাধ্যমে

আমাদের নিকট পরিবেশন করেন। আলোচ্য প্রবন্ধে রেডার যন্ত্র এবং এর সাহায্যে কীভাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, সে সবকিছু আলোচনা করবো। প্রথমে রেডার যন্ত্রের কার্য-প্রণালী সম্পর্কে কিছু বলা যাক।

রেডার যন্ত্রে তিনটি অংশ থাকে—প্রেরক, গ্রাহক এবং অ্যান্টিনা। 1নং চিত্রে সোজাভাবে



1নং চিত্র

তা দেখানো হয়েছে। গ্রাহক-যন্ত্রের সঙ্গে একটি পর্দা বা নির্দেশক-যন্ত্র যুক্ত থাকে।

প্রেরক-যন্ত্র থেকে উচ্চ কম্পনাক বা হ্রস্বতরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম বিদ্যুৎ-চৌম্বক তরঙ্গ (Electro-magnetic pulse) অ্যান্টিনার মাধ্যমে ছাড়া হয়। ম্যাগনেট্রন, ক্রিষ্ট্রন ইত্যাদি বিশেষ ধরনের তাল্প এই প্রেরক-যন্ত্রে ব্যবহৃত হয়। অ্যান্টিনার সঙ্গে একটি অর্ধবৃত্তাকার প্রতিফলক লাগানো থাকে, যা বিচ্ছিন্ন বেতার-তরঙ্গকে এক জায়গায় সংকত করে সমান্তরাল রশ্মির আকারে প্রতিফলিত করে। প্রতিফলকটিকে ইচ্ছামত বিভিন্ন

\*টিনটিউট অব রেডিও কন্সিগার অ্যান্ড ইলেক-ইনিয়, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৭

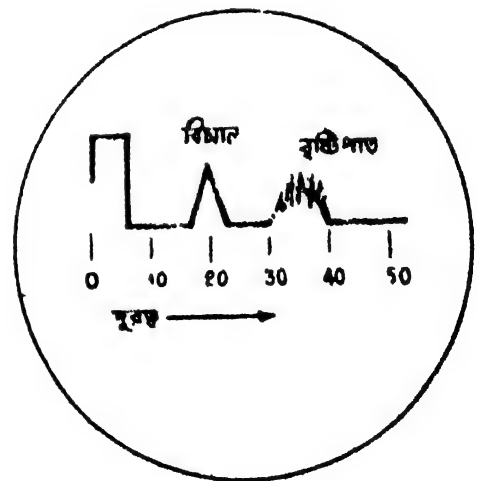
দিকে ঘোরানো যায়। গ্রাহক-বস্ত্রের সঙ্গে যুক্ত নির্দেশক হিসাবে ক্যাথোড-রে টিউব ব্যবহৃত হয়। একই অ্যাণ্ডিনার দ্বারা বৈতর-তরঙ্গ প্রেরণ ও গ্রহণ—উভয় কাজই করা হয়। বিচ্ছিন্ন বৈতর-তরঙ্গ ব্যবহারের ক্ষেত্রে এই সুফল পাওয়া যায়; অর্থাৎ তরঙ্গগুলি পাঠ্যবার পর মাঝখানে কিছু সময়ের ক্ষেত্রে প্রেরক-বস্ত্র নিজের থাকে এবং এই অবসরে অ্যাণ্ডিনা গ্রাহক-বস্ত্রের কাজ করে। এছাড়াও বিচ্ছিন্ন বা সবিরাম তরঙ্গের শক্তি অবিচ্ছিন্ন বা অবিরাম তরঙ্গ-প্রবাহের শক্তির চেয়ে অনেক বেশী হয় এবং এতে ব্যাপ্তিক অটিলতাও কমানো

অঙ্ককারে টর্চের আলো কোন বস্তু থেকে প্রতিকলিত হয়ে আমাদের চোখে পড়বার পর আমরা যেমন বস্তুটির চেহারা, দূরত্ব ইত্যাদির হদিশ পাই, ঠিক একইভাবে রেডারের প্রেরক-বস্ত্র থেকে বৈতর-তরঙ্গ গিয়ে দূর বস্তু থেকে প্রতিকলিত হয়ে গ্রাহক-বস্ত্রে যখন ফিরে আসে, তখন ঐ বস্তুর দূরত্ব এবং অবস্থান জানতে পারি। প্রেরক-বস্ত্র, বৈতর-তরঙ্গ এবং গ্রাহক-বস্ত্রকে বধাক্রমে টর্চ, টর্চের আলো এবং চোখের সঙ্গে তুলনা করা যেতে পারে। অবশ্য টর্চের কার্যকরী দূরত্ব খুবই সীমিত। অন্তর্দিকে রেডারের অদৃশ্য বৈতর-তরঙ্গ মেঘে ঢাকা অঙ্ককার আকাশের মধ্য দিয়েও কার্যকরী।

পাশাপাশি দুটি বস্তুর অবস্থান আলাদা করে নির্ণয় করতে হলে রেডারে ব্যবহৃত বৈতর-তরঙ্গ দুই হওয়া বাঞ্ছনীয়। অ্যাণ্ডিনার আকার বাড়িয়েও তা করা সম্ভব, তবে অ্যাণ্ডিনার আকার বৃদ্ধি করলে একে বিভিন্ন দিকে ঘোরাতে ব্যাপ্তিক অসুবিধা দেখা দেবে। তাই তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যকেই কমানো হয়ে থাকে। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য বড় রাখলে তা আবার বায়ুমণ্ডলে বেশী পরিমাণে শোষিত হবারও সম্ভাবনা আছে। তাই কয়েক সেন্টি-মিটার পর্যন্ত দৈর্ঘ্যের বৈতর-তরঙ্গ রেডারে

ব্যবহার করা হয়। রেডার কতদূর পর্যন্ত কার্যকর হবে, তা নির্ভর করে প্রেরক-বস্ত্রের শক্তি, গ্রাহক-বস্ত্রের সূবেদী বাজা, বাধ্যমে শোষণ এবং তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের উপর। মেঘ বা দুটি রেডারের কাজে ক্ষতি করে না বটে, তবে বায়ুমণ্ডলের আত্মতা পরিবর্তনের সঙ্গে প্রেরিত তরঙ্গের গতি পরিবর্তিত হয়। বায়ুমণ্ডলের চাপও সব জায়গায় সমান নয়। তাই বিভিন্ন চাপযুক্ত বায়ুমণ্ডল দিয়ে বৈতর-তরঙ্গ যাবার সময় প্রতিসরিত হয়ে সামান্য বেঁকে যায়।

বৈতর-তরঙ্গ লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিকলিত হয়ে গ্রাহক-বস্ত্রে ফিরে আসলে তাকে বিবর্তিত করে ক্যাথোড-রে টিউবে ফেলা হয়। এখন দেখা যাক, কিতাবে এই পর্দায় লক্ষ্যবস্তু সনাক্ত হয়। ব্যাপ্তিক ব্যবহার দিকে লক্ষ্য করলেই এর উত্তর মেলে। ক্যাথোড-রে টিউবে প্রতিকলক পাতে বিশেষভাবে আরোপিত তড়িৎ-বিশ্রবের সাহায্যে ইলেকট্রন-প্রবাহকে পর্দার বাঁ-দিক থেকে ডান দিকে ক্ষুণ্ণ পরিচালিত করবার ব্যবস্থা থাকে। ইলেকট্রন



২নং চিত্র

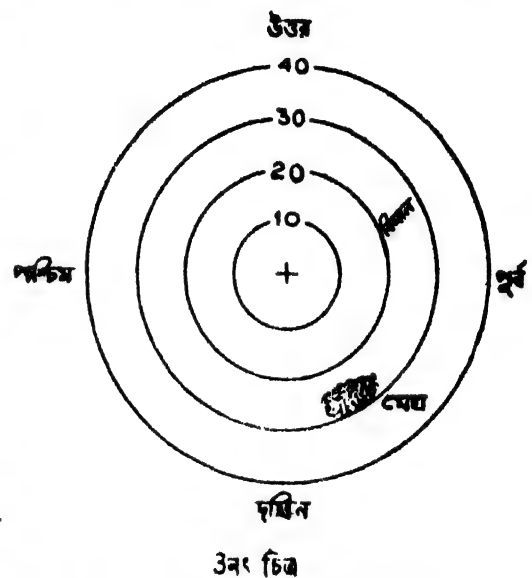
প্রবাহের সময় পর্দার উপর একটা প্রলেপের সৃষ্টি হয়। এই প্রলেপ রেডার থেকে প্রেরিত

বেতার-তরঙ্গের গতিপথের নির্দেশ দেবার কাজ করে; অর্থাৎ রেডার থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গের গতিবেগের সঙ্গে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিবেগের একটা সম্পর্ক থাকে। প্রেরক-বহু থেকে বেতার-তরঙ্গ ছাড়বার সঙ্গে সঙ্গে পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহও ঝাঁক থেকে ঝাঁক শুরু করে দেয়। বেতার-তরঙ্গ কোন বস্তু থেকে বাধা পেয়ে রেডারের গ্রাহক-বস্ত্রে ফিরলে ক্যাথোড-রে টিউবের ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথ সামান্য পরিবর্তিত হয়। ক্যাথোড-রে টিউবের পর্দাটি দূরত্বজাপক সংখ্যার দ্বারা চিহ্নিত থাকে। কাজেই পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের জারগা থেকে শুরু করে প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তনের জারগা পর্যন্ত দূরত্বটুকু সোজা-সুজি মাপা যেতে পারে। এই দূরত্বই নির্দিষ্ট বাধার দূরত্ব। এইভাবে রেডারের সাহায্যে দূরের বস্তুর অবস্থানের নির্দেশ পাওয়া যায়। ২ নং চিত্রে রেডারের পর্দায় ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের চোঁহারা এবং বস্তু থেকে বেতার-তরঙ্গ প্রতিফলিত হয়ে গ্রাহক-বস্ত্রে ফিরে আসবার কালে ইলেকট্রন-প্রবাহের গতিপথের পরিবর্তিত চোঁহারা দেখানো হয়েছে।

কোন কোন রেডারে অ্যাণ্টিনা থেকে প্রেরিত বেতার-তরঙ্গকে বৃত্তাকার পথে ঘোরানো হয়। এই প্রকার রেডারের পর্দায় কেন্দ্র থেকে শুরু করে পরিসীমার দিকে ইলেকট্রন-প্রবাহ হয় এবং ঘড়ির কাঁটার মত বৃত্তাকার পথে ঘোরে। এই ধরনের রেডারে বিস্তৃত এলাকার চিত্র পাওয়া যায়। ৩নং চিত্রে এই জাতীয় রেডারের পর্দাকে দেখানো হয়েছে। চিত্রে একটি বিমান ও ঘেঘের অবস্থান দেখানো হয়েছে। এই জাতীয় রেডারে একই সঙ্গে বস্তুর অবস্থান ও কৌণিক দূরত্ব—হুই-ই মেলো। পর্দায় বিমানটি ঐ সময় ২০ মাইল দূরে  $45^\circ$  কোণ করে আছে। ঘেঘের অবস্থান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, বৃষ্টি-

পাতের পরিমাপ প্রভৃতি কাজে এই জাতীয় রেডার খুবই কাজে লাগে।

তুমাত্র বিচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারই যে হয় তা নয়, অবিরাম বা অবচ্ছিন্ন তরঙ্গের রেডারও হতে পারে। তবে এর বেলায় প্রেরক ও গ্রাহক-বস্ত্রের অন্তে দুটি আলাদা অ্যাণ্টিনা লাগবে—বা কার্যকর করা খুবই অসুবিধাজনক। কয়েকটি



বিশেষ ক্ষেত্রেই এই জাতীয় রেডার ব্যবহৃত হয়। অবিরাম তরঙ্গের রেডারের প্রেরক-বহু থেকে তরঙ্গ-প্রবাহ কোন গতিশীল বস্তু থেকে বাধা পেয়ে যখন গ্রাহক-বস্ত্রে ক্রমাগত ফিরে আসে, তখন বিজ্ঞানী ডপ্লারের সূত্র অনুযায়ী ঐ তরঙ্গের কম্পনাক্রম কিছু পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের মাত্রা নির্ভর করে তরঙ্গ এবং গতিশীল বস্তুর পারস্পরিক গতিবেগের উপর। কম্পনাক্রম পরিবর্তন মেপে বস্তুর গতিবেগ এবং তরঙ্গের বাতায়াতের সময়ের ব্যবধান থেকে বস্তুর দূরত্ব জানা যেতে পারে।

রেডারের প্রয়োগে কিতাবে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা হয়, তা নিয়ে এখন আলোচনা করা যাক।

পৃথিবীর কয়েকটি উন্নত দেশ ছাড়া এখনও অনেক দেশেই—এমন কি, আমাদের ভারতবর্ষেও কীকা জায়গার কোন নির্দিষ্ট আকারের পায়ে বুটের জল সংগ্রহ করে বুটিপাতের পরিমাপ ঘোষণা করা হয়। এই ব্যবস্থা যে খুবই সীমিত, তা খুব সহজেই বোঝা যায়। কেন না, অসময়ের বুটাই মোটামুটি ব্যাপকভাবে হরে থাকে এবং তখনই এই ব্যবস্থা মোটামুট কার্যকরী হয়। কিন্তু বর্ধাকালে যে বুটিপাত হয়, তা বেশীর ভাগ সময়েই ব্যাপকভাবে হয় না অর্থাৎ বিভিন্ন জায়গার বিভিন্ন সময়ে বুটিপাত বেশী হয়ে থাকে। হয়তো দেখা গেল, সহরের এক প্রান্তে প্রবল বুটি অথচ অন্য প্রান্তে রোধ। এই অবস্থায় এই পদ্ধতির সাহায্যে নিতুলভাবে বুটিপাতের পরিমাপ করা যায় না, নিতুলভাবে পরিমাপ করতে গেলে কিছু দূর অন্তর অন্তর জল সংগ্রহ করে তাদের গড় হিসাবকে ধরতে হবে, যা কার্যকর করাও সম্ভব নয়। তাছাড়া এই পদ্ধতিতে বুটিপাতের হার জানা সম্ভব নয়, কেবলমাত্র মোট সময়ের বুটিপাতেরই পরিমাপ করা যেতে পারে। বুটিপাতের হার জানবার যে দু-একটি পদ্ধতি আমাদের জানা আছে, তাও খুব নির্ভরযোগ্য নয়। পায়ে জল সংগ্রহ করে বুটিপাতের পরিমাপ করবার পদ্ধতিকে স্পষ্টভাবে বিচার করলে বলতে হয় যে, এভাবে কেবলমাত্র পাতের মুখের ক্ষেত্রের উপরে বুটিপাতের পরিমাপই করা হয়ে থাকে—বিস্তীর্ণ জায়গার পরিমাপের বেলায় এই পদ্ধতি গ্রহণ করা যায় না। এই অবস্থায় রেডারের সাহায্যেই আমরা নিখুঁতভাবে বিস্তীর্ণ অঞ্চল বা সীমিত অঞ্চলের বুটিপাতের হার ও পরিমাপ পেতে পারি।

রেডার যন্ত্র থেকে বেতার-তরঙ্গ জলকণার দিকে পাঠালে, তা জলকণা থেকে বাধা পেয়ে ফিরে আসে। এই ফিরে-আসা তরঙ্গের শক্তির মান পর্যাপ্ত পরিমাপ হতে হবে, তবেই গ্রাহক-যন্ত্রে তা ধরা যাবে। ছোট বস্তুকণা বা জলকণা

থেকে বাধা পেয়ে যে শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে ফিরে আসে, তা বিজ্ঞানী মাপে কর্তৃক আবিষ্কৃত আলোক-বিচ্ছুরণের নিয়ম মেনে চলে। এই নূর অল্পবাহী নির্দিষ্ট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ থেকে বিচ্ছুরিত শক্তি জলকণার প্রস্থচ্ছেদের বর্গ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক হয়। মাপের নূর থেকে আরও জানা যায় যে, বিচ্ছুরিত শক্তি ব্যবহৃত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে সমানুপাতিক। কাজেই জলকণার প্রস্থচ্ছেদ যদি নির্দিষ্ট থাকে, তবে ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গের মাধ্যমে ভাল শক্তি গ্রাহক-যন্ত্রে পাওয়া যেতে পারে। বস্তুতপক্ষে রেডার দিয়ে খুব ছোট জলকণা দেখতে হলে প্রেরক-যন্ত্রে খুব ছোট তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের তরঙ্গ ব্যবহার করতে হয়। খুব ছোট তরঙ্গ আবার যেহ ও বায়ুমণ্ডলের দ্বারা বেশী শোষিত হয়। জলকণার প্রস্থচ্ছেদও এক থাকে না। এই সব অপ্রবিধা দূর করবার জন্তে রেডারে কয়েকটি বিভিন্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বেতার-তরঙ্গ, সাধারণতঃ 1, 3, 5, 10 এবং 20 সেন্টিমিটারের তরঙ্গ রেডারে ব্যবহার করা হয়।

ছোট একটি জলের কৌটা থেকে বতটা শক্তি ফিরে আসে, সাধারণতঃ তা রেডারে পরিমাপ-যোগ্য নাও হতে পারে। যেমন—দেখা গেছে যে, 10 কিলোমিটার দূরে অবস্থিত 0.1 সেন্টিমিটার ব্যাসের একটি জলের কৌটা থেকে একটি 10 সেন্টিমিটার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারে মাত্র প্রায়  $6 \times 10^{-20}$  ওয়াট শক্তি ফিরে আসে। অথচ অন্তরিকে  $10^{-13}$  ওয়াটের কম শক্তি হলে গ্রাহক-যন্ত্র তা ধরতে পারে না। তাহলে রেডারে জলকণাকে কিভাবে পাওয়া যায়? এখন—কোন এক জায়গায় তো মাত্র এক কৌটা জল থাকে না! প্রতি ঘনমিটারে প্রায় 100 থেকে 1000টি পর্যন্ত জলকণা থাকে। রেডার থেকে প্রেরিত রশ্মি-গুলোর আয়তনের মধ্যে এক সঙ্গে অনেক জলকণাই পড়ে। এদের দ্বারা বাধাপ্রাপ্ত হয়ে পড়

বিচ্ছুরিত শক্তির মান গ্রাহক-বয়ে যাপবার পক্ষে যথেষ্ট হয়। কোন নির্দিষ্ট দূরত্বে অবস্থিত জলকণা থেকে কতটা শক্তি আসবে, তা নিম্নোক্ত সমীকরণ থেকে পাওয়া যেতে পারে।

$$P = \frac{A \times N \times D^6}{r^2} \dots \dots (1)$$

এখানে  $P$ —পাওয়া গড় শক্তি,  $D$ —জলকণাসমূহের গড় ব্যাস,  $A$ —ঋৎক,  $r$ —জলকণাসমূহের দূরত্ব এবং  $N$ —একক আয়তনের মধ্যে জলকণা-সমূহের গড় সংখ্যা। সাধারণতঃ জলকণাগুলির গড় ব্যাসের চেয়ে বড় তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যবিশিষ্ট রেডারের বেলার এই সমীকরণ প্রযোজ্য। বিজ্ঞানীরা বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার সাহায্যে কণার গড় ব্যাসের ( $D$ ) সঙ্গে বৃষ্টিপাতের পরিমাপের ( $R$ ) একটা সম্পর্ক স্থাপন করেছেন। বার সাহায্যে আমরা পাই—

$$N \times D^6 = 200 \times R^{1.6} \dots \dots (2)$$

(1) নং সমীকরণে (2) নং প্রয়োগ করলে

$$P = \frac{200 \times A \times R^{1.6}}{r^2} \dots \dots (3)$$

পাওয়া যায়। জলকণার দূরত্ব এবং ঋৎকের মান জানা থাকলে (3) নং সমীকরণ থেকে ঐ দূরত্বে বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। পরিমাপের সময় রেডারের অ্যান্টেনাকে এমনভাবে রাখা হয়, যাতে সমতলভূমির খুব নিকটেই বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা যায়। অতিকর্ষের ক্রিয়ার এবং ঘূর্ণীবাত্যার প্রভাবে জলকণা অনবরতই স্থান পরিবর্তন করে। আবার উঁচু থেকে নীচে পতনের

সময় জলকণা নিজেদের মধ্যে পারস্পরিক ঘর্ষণ তেজে ছোট হয়ে যায়, আবার কখনও একাধিক কণা এক সঙ্গে জুড়ে গিয়ে বড় হয়ে যায়। এই সব কারণে রেডারের সাহায্যে খুব উঁচু থেকে জলকণা যাপলে সমতলভূমি পর্যন্ত সে পরিমাপ ঠিক নাও থাকতে পারে। বিজ্ঞানী অগ্নি এবং তাঁর সহকর্মীরা একই দূরত্বে অবস্থিত জলকণা-গুলির একই সঙ্গে রেডারের সাহায্যে এবং পুরনো পদ্ধতিতে (পাতের মধ্যে জল সংগ্রহ করে) দেখে (3) নং সমীকরণের বাধ্যতামূলক প্রমাণ করেন। কাজে-কাজেই দেখা যাচ্ছে যে, রেডারের অ্যান্টেনাকে বিভিন্ন দিকে ঘুরিয়ে (3) নং সমীকরণের সাহায্যে সুন্দরভাবে বহু দূর পর্যন্ত বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করা সম্ভব। এমন কি, কোন নির্দিষ্ট এলাকার বৃষ্টিপাতের হার এবং বার্ষিক বৃষ্টিপাতের পরিমাণও রেডারের মাধ্যমে পাওয়া যায়, বার প্রয়োজন যথেষ্ট। বিজ্ঞানীরা রেডারের মাধ্যমে অল্পতাবৎ বৃষ্টিপাতের পরিমাপ করেছেন, তবে এখানে বর্ণিত পদ্ধতিতেই ভাল ফল পাওয়া গেছে।

গত কয়েক বছরে রেডারের বহুল ব্যবহার আজ হাজার হাজার বিজ্ঞানীকে রেডারের প্রযুক্তিবিদ্যার আকর্ষণ করেছে এবং তবিশেষে করবে। আধুনিক সভ্যতার কল্যাণে রেডারের অবদান বহুদূরী। মানুষ নিজের জীবনকে সুখ-সমৃদ্ধিতে তরিয়ে তোলবার জন্তে বিজ্ঞানকে যে কিতাবে প্রয়োগ করেছে, রেডার তার একটি উৎকৃষ্ট দৃষ্টান্ত।

## সংশ্লেষণের মাধ্যমে জিনের ভাষা বিশ্লেষণ—

### খোরানার যুগান্তকারী আবিষ্কার

দেহব্রত নাগ ও জগৎজীবন ঘোষ\*

#### জীবনের ভাষা

জীবনের স্বাক্ষর্য গতি অনবরত তিনটি ভাষায় ব্যক্ত হচ্ছে। প্রথমটি হলো—প্রজনন-বিস্তার ভাষা। এই ভাষার রহস্য খুঁজে পাওয়া গেল প্রায় পঞ্চাশ বছরের গবেষণা থেকে। জানা গেল, বংশজাত ধর্ম লিপিবদ্ধ হয়ে আছে জীবকোষে অবস্থিত একটি বিশেষ সরল মানচিত্রে।

দ্বিতীয়টি হলো—প্রোটিনের ভাষা, যার মূলে আছে প্রায় ২০টি অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রম-পর্ব। বিভিন্ন ক্রমপর্বের অ্যামিনো অ্যাসিড-গুলি থাকবার দ্রুপ বহু হাজার রকম বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতিগত প্রোটিনের সৃষ্টি হয়েছে।

আর তৃতীয়টি হলো—নিউক্লিক অ্যাসিডের ভাষা, যার মূলে আছে যাত্র চারটি নিউক্লিওটাইড। পিউরিন অথবা পিরিমিডিনের সঙ্গে যুক্ত রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস প্রকৃতি জৈব পদার্থ এবং কস্মিক অ্যাসিডের যোগগুলিকে নিউক্লিওটাইড বলা হয়।

ইদানীং তিনটি ভাষার মধ্যে এমন একটি নিগূঢ় সম্পর্ক খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে, যা জীব-জগতের বহু সমস্যা সমাধান করবে। এই বিষয়ে আশা নিশ্চিত।

#### জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ.

আজ থেকে প্রায় এক-শ' বছর আগে অর্থাৎ ১৮৬৬ সাল নাগাদ—যেওগের মতে জিন হলো বংশোদ্ভবের মূলধার, যদিও জিনের রাসায়নিক পরিচয় পাওয়া গেল ১৯৪০-'৪৪ সালে। ১৮৬৯ সালে জুইস বিজ্ঞানী Friedrich Miescher

প্রথম জীবকোষের নিউক্লিয়াস বা কেন্দ্রস্থল থেকে নিউক্লিন নামক একটি পদার্থ পেয়েছিলেন, পরবর্তী কালে এর নামকরণ করা হয়েছিল নিউক্লিক অ্যাসিড। এর বহু বছর পরে নিউক্লিক অ্যাসিডের গুরুত্ব জানা গেছে। O. Avery এবং তাঁর দুই সহকর্মী C. Macleod এবং M. McCarty (১৯৪০-'৪৫) দেখলেন যে, নিউমোককাস নামক ব্যাক্টেরিয়া দুই রকমের হয়ে থাকে। কতকগুলি মৃৎ প্রকৃতির এবং কতকগুলি অমৃৎ প্রকৃতির। মৃৎ নিউমোককাস-গুলি নিউমোনিয়া রোগের কারণ, কিন্তু অমৃৎ-গুলি নয়। যদি ইঁহরের দেহে জীবিত অমৃৎ নিউমোককাসের সঙ্গে মৃত মৃৎ নিউমোককাস মিশিয়ে প্রয়োগ করা যায়, তবে ইঁহরের রক্তে জীবিত মৃৎ নিউমোককাস পাওয়া যায়; অর্থাৎ মৃৎ নিউমোককাসের কোন বিশেষ বৈশিষ্ট্য মৃত অবস্থাতেও অমৃৎ নিউমোককাসকে মৃৎপে পরিণত করতে পারে। এবার মৃত মৃৎ নিউমোককাসের ডি. এন. এ. জীবিত অমৃৎ নিউমোককাসের সঙ্গে মিশিয়ে প্রয়োগ করে দেখা গেল যে, অমৃৎগুলি মৃৎপে পরিণত হয়েছে। কেবল তাই নয়, এরপর মৃৎ ধর্মটির স্থায়িত্বও প্রমাণিত হলো। এই পরীক্ষা থেকে প্রমাণিত হলো যে, জিন—বা হলো বংশোদ্ভবের মূলধার, তার রাসায়নিক পরিচয় ডি-অক্সিরিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে ডি. এন. এ.। ডি. এন. এ. সম্পর্কে কোডুহল তখন আরও অনেক গুণ বেড়ে গেছে।

### ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের সম্পর্ক

একদিকে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি এবং অন্যদিকে ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের পারস্পরিক সম্পর্ক বিশেষভাবে পরীক্ষা করে দেখা হচ্ছিল। ইতিমধ্যে Beadle এবং Tatum দেখালেন যে, জিন এবং জৈব অণুঘটকের মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে। জিনে কোন রকম জট দেখা দিলে জৈব অণুঘটকটি হয়তো তৈরি নাও হতে পারে কিংবা অকেজো প্রোটিন অণু তৈরি হয়ে থাকে। সমস্ত জৈব অণুঘটকই প্রোটিন। তাই জিনের রাসায়নিক পরিচয় ডি. এন. এ. জানবার সঙ্গে সঙ্গে প্রোটিন সংশ্লেষণে ডি. এন. এ.-র ভূমিকাও প্রমাণিত হলো।

### ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি

1953 সালে ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির পরিচয় দিলেন বৈজ্ঞানিক Watson এবং Crick। তাঁদের মতে, ডি. এন. এ. হলো দ্বি-তন্ত্রী (Double stranded)। এর এক-একটি তন্ত্রী তৈরি হয়েছে চারটি বিভিন্ন নিউক্লিয়োটাইডের বিভিন্ন ক্রমপদ্ধিতে। নিউক্লিয়োটাইডগুলি হলো অ্যাডেনিন নিউক্লিয়োটাইড, গুয়ানিন নিউক্লিয়োটাইড, থাইমিন নিউক্লিয়োটাইড এবং সাইটোসিন নিউক্লিয়োটাইড। এক-একটি নিউক্লিয়োটাইডে থাকে অ্যাডেনিন, গুয়ানিন, থাইমিন এবং সাইটোসিন—এই চারটি জৈব পদার্থের যে কোন একটি শর্করাজাতীয় পদার্থ, যেমন—ডি-অক্সিরিবোস এবং অর্জৈব কস্করিক অ্যাসিড। এদের মধ্যে অ্যাডেনিন (A) এবং গুয়ানিন (G) পিউরিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ আর সাইটোসিন (C) এবং থাইমিন (T) পিরিমিডিন শ্রেণীভুক্ত জৈব পদার্থ। বজার কথা এই যে, কেবল মাত্র A-এর সঙ্গে T এবং G-এর সঙ্গে C দুর্বল হাইড্রোজেন বন্ধনীর (Hydrogen bonding) সাহায্যে যুক্ত হতে পারে। তাই দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র

একটি তন্ত্রীতে যখন A থাকে, অন্যটিতে থাকে তখন T, তেমনি G হলো C-এর পূরক। এভাবে ডি. এন. এ.-র একটি তন্ত্রী অপরের পরিপূরক হয়ে থাকে। Watson এবং Crick-এর মতে, দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র এক-একটি তন্ত্রী সমান্তরালভাবে থেকে মোচড় দেওয়া লোহার সিঁড়ির মত ধাপে ধাপে দৈর্ঘ্যে বেড়ে গেছে। এক-একটি তন্ত্রী অপরের সঙ্গে বহু সংখ্যক AT এবং GC-এর হাইড্রোজেন বন্ধনীর সাহায্যে যুক্ত থাকে। পরবর্তী বহু রাসায়নিক, প্রাণরাসায়নিক এবং ভৌত পরীক্ষা থেকে Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি প্রমাণিত হয়েছে। ডি. এন. এ.-র এই একটিমাত্র গঠন-প্রকৃতি, কোষ বিভাজন, বংশজাত ধর্ম, বংশজাত ধর্মের সংশ্লিষ্ট, বংশ-জাত ধর্মের স্থায়ী পরিবর্তন (Mutation) এবং তার প্রকাশ প্রভৃতি জীববিজ্ঞানের বহু মৌলিক প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে। কেবল তাই নয়, বংশাণুক্রমের মূলধার জিন যে স্বাতন্ত্র্য (Specificity) এবং অনুলিপি (Replicability) বজায় রেখে চলে, তা Watson এবং Crick উল্লিখিত ডি. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতির দ্বারা পূর্ণাঙ্গ ব্যাখ্যা করা সম্ভব (1নং চিত্র)।

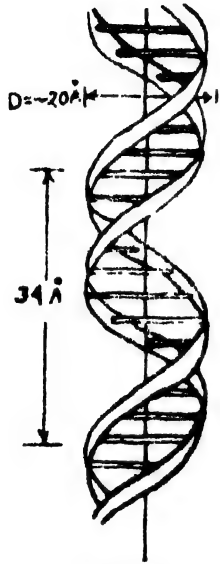
1956 সালে বৈজ্ঞানিক Kornberg ডি. এন. এ. পলিমারেজ জৈব অণুঘটকটি আবিষ্কার করেন এবং প্রাণরাসায়নিক পরীক্ষার সাহায্যে দেখান যে, ডি. এন. এ. নিজেই নিজেকে কপি করতে পারে।

### আর. এন. এ.-র পরিচয়

এতদূর ডি. এন. এ.-র কথা বলা হলো। আর এক রকম নিউক্লিক অ্যাসিড আছে, তার নাম রিবোনিউক্লিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে আর. এন. এ.। ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র মধ্যে পার্থক্য শুধু ডি. এন. এ.-র ডি-অক্সিরিবোস এবং



থাইমিন-এর জায়গায় আর. এন. এ. তে যথাক্রমে রিবোস এবং ইউরাসিল থাকে। আর. এন. এ.-র গঠন-প্রকৃতি যতটা জানা গেছে তা হলো, আর. এন. এ. কোথাও বি-ভঙ্গী আবার কোথাও এক-ভঙ্গী। আর. এন. এ. প্রধানতঃ তিন রকমের।



1নং চিত্র  
ডি. এন. এ.-র গঠন।

1960 সালে বৈজ্ঞানিক Jacob এবং Monod এক রকমের ডি. এন. এ. সদৃশ কণাহারী আর. এন. এ. আবিষ্কার করেন। এর নাম বার্তাবহ আর. এন. এ. (messenger—RNA) বা সংক্ষেপে m-R. N. A.। আর এক রকম আর. এন. এ. আছে, যা কোষের রিবোসোম নামক যন্ত্রের সঙ্গে বেশীর ভাগ যুক্ত থাকে। তাছাড়া কতকগুলি আর. এন. এ. অ্যামিনো অ্যাসিড বহন করে। এদের বলা হয় পরিবাহক আর. এন. এ. (transfer-R. N. A)। জীবকোষে প্রত্যেকটি অ্যামিনো অ্যাসিডের জন্যে তিন তিন পরিবাহক আর. এন. এ. আছে। এগুলি আকৃতিতে ছোট এবং গঠন-প্রকৃতি অনেকটা লবঙ্গ পাতার (Clover leaf) মত। 2নং চিত্রে

কিনাইল অ্যানাটিন পরিবাহক আর. এন. এ.-টির গঠন-প্রকৃতি দেখানো গেল।

### জিনের ভাষা বিশ্লেষণ

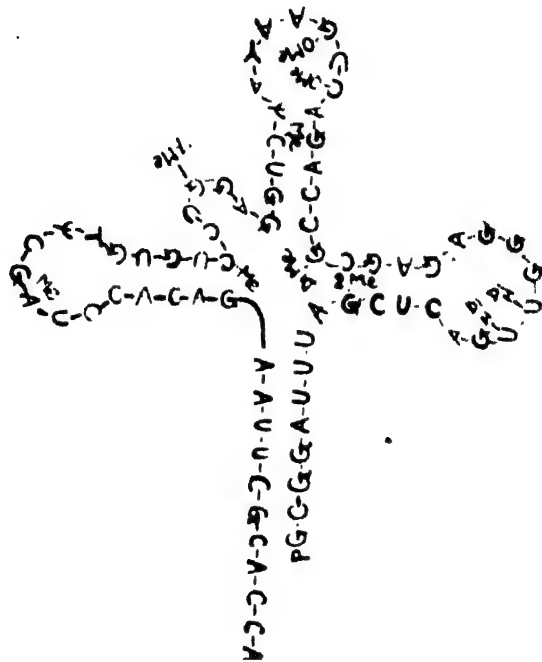
আণবিক জীববিজ্ঞান প্রকৃত উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কিন্তু ডি. এন. এ. এবং আর. এন. এ.-র ভাষা পড়বার কষড়া এখনও আমরা অর্জন করি নি। এখানে বলে রাখা প্রয়োজন, ডি. এন. এ. কিংবা আর. এন. এ.-র ভাষা নিউ-ক্লিওটাইড ক্রমপর্ধারের উপর নির্ভর করে। আর প্রোটিনের ভাষা নির্ভর করে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্ধারের উপর। বৈজ্ঞানিক Sanger-এর পদ্ধতিতে আজকাল প্রোটিনে অ্যামিনো অ্যাসিডের ক্রমপর্ধার জানা সহজ হয়ে গেছে, কিন্তু নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউ-ক্লিওটাইডের ক্রমপর্ধার নির্ধারণের তেমন কোন প্রণালী এখনও সাকল্য লাভ করে নি।

জীবকোষ থেকে যে ডি. এন. এ. পাওয়া যায়, তার দৈর্ঘ্য সম্পর্কে প্রথমে ধানিকটা ধারণা করে নিলে হয়তো নিউক্লিওটাইডের ক্রমপর্ধার নির্ধারণ যে এক জটিল ব্যাপার, তা অনুমান করা সহজ হবে। একজন প্রাপ্তবয়স্ক লোকের দেহ রক্তকোষ, পেশীকোষ, নান্নুকোষ, চর্মকোষ ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকৃতির প্রায়  $10^{13}$  টি কোষ দিয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের কেন্দ্রস্থলে আছে 46টি ক্রোমোজোম। আর এক-একটি ক্রোমোজোমে ডি. এন. এ. এমন জটিল পাঁচ খেয়ে আছে যে, একটি মানুষের জীবকোষ থেকে বতটা ডি. এন. এ. উদ্ধার করা যায়, তা লবঙ্গ-লম্বিতাবে সাঁতালে দৈর্ঘ্যে ঠাঁড়ার প্রায় 2 গজ অর্থাৎ 6 ফুট। এই 6 ফুট ডি. এন. এ.-তে আছে বহু হাজার নিউক্লিওটাইড। এবার ধারণা করা বাক,  $10^{13}$  টি কোষের ডি. এন. এ. তনিকে যদি পাশাপাশি রাখা যেত, তবে কি হতো? দৈর্ঘ্য ঠাঁড়াজো  $6 \times 10^{13}$  ফুট অর্থাৎ  $11 \times 10^9$

বাইলেরও বেশী। তার মানে চাঁদ ও পৃথিবীর মধ্যে যে দূরত্ব (প্রায়  $24 \times 10^4$  মাইল), তা 20 হাজার বারেরও বেশী বাওয়া-আসা করা যেত।

সুতরাং এটা অল্পের বে, জীবকোষের ডি. এন. এ.-র সমান দৈর্ঘ্যের একটি কৃত্রিম ডি. এন. এ., যার মধ্যে বহু হাজার নিউক্লিয়োটাইড

এন. এ.-পলিমারেজ দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ.-র কেবল মাত্র একটি তন্ত্রীর ভাষাই প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ.-কে সহায়তা করে। কিন্তু ইদানীং জানা গেছে, আর. এন. এ.-পলিমারেজ যখন যে তন্ত্রীর বে স্থানে যুক্ত হয়, সেখান থেকেই একটি নির্দিষ্ট গতিপথে ডি. এন. এ.-র ভাষা প্রতিলিপি এবং অনুবাদ করতে আর. এন. এ.-কে



২নং চিত্র

কিনাইল অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. র গঠন।

আছে, তা সংশ্লেষণ করা আধুনিক রসায়নের মাপকাঠিতে ধরা-ছোঁয়ার বাইরে। অথচ আশ্চর্যের কথা এই যে, ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় অর্থাৎ ডি. এন. এ.-র দূর্ভেদ্য ভাষা যে বর্ণমালায় সজ্জিত, তা সহজেই প্রতিলিপি-করণ এবং অনুবাদন করতে পারে একমাত্র আর. এন. এ.। এই কাজে আর. এন. এ.-কে সহায়তা করে আর. এন. এ.-পলিমারেজ নামক একটি জৈব অঙ্কুশটক। আগে ধারণা ছিল, আর.

সহায়তা করে।

পূর্বেই আশার কথা এই যে, মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন পরিবাহক-আর. এন. এ. ইতিমধ্যে পাওয়া গেছে। এমন কি, বৈজ্ঞানিক ডক্টর হোলি (1965) ই আর. এন. এ. টির গঠন-প্রকৃতি ও নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্যায় নির্ধারণ করেছেন। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. কেবলমাত্র অ্যালানিন নামক অ্যামিনো অ্যাসিড পরিবহন করতে পারে। এর গঠন-প্রকৃতি

অনেকটা লবঙ্গ পাতার মত। বর্ষিও মাত্র 77টি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-তে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্ষায় জানা সম্ভব হয়েছে, কিন্তু আরও বৃহৎ দৈর্ঘ্যের নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্ষায় নির্ধারণ করা এক অতি দুর্ভব ব্যাপার। এর কারণ হলো, প্রচলিত বিকারকগুলি (Reagents) নিউক্লিক অ্যাসিডকে এলোপাথারি ভেঙ্গে দেয়। ফলে পর পর নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্ষায় নির্ধারণ করা যায় না। তাই বলা যায়, ধোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড-সংশ্লেষণ পদ্ধতিটি নিউক্লিক অ্যাসিডে নিউক্লিয়োটাইডের ক্রমপর্ষায় বিশ্লেষণের প্রকৃত উপায়। কেবল তাই নয়, জিন-এর কতটুকু অংশ কোন্ বিশেষ প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে, তার কার্য-কারণ সম্পর্কের পরিচায়ক।

### ধোরানার পদ্ধতিতে নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ

অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র পরিচয় ধোরানার কাজকে অনেকটা এগিয়ে দিল। অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-র মূলে যে জিনটি অংশগ্রহণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্ষায় ধোরানা কাগজে-কলমে লিখলেন। উদ্দেশ্য হলো, এমন একটি জিন সংশ্লেষণ করা, যা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে। কেবল তাই নয়, সংশ্লেষিত অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. প্রাণরাসায়নিক প্রোটিন সংশ্লেষণে অংশগ্রহণ করে কিনা, তাও পরীক্ষা করে দেখা।

ধোরানার নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণ-পদ্ধতির ক্রমবিকাশ তিনটি প্রধান ধাপে আলোচ্য।

প্রথম : (1952-1962)—কয়েকটি নিউক্লিয়োটাইড সমন্বিত পলিনিউক্লিয়োটাইড এবং ছোট

ছোট দ্বি-তন্ত্রী নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের উন্নত রাসায়নিক পদ্ধতির উদ্ভাবন।

দ্বিতীয় : (1962-1967)—বিভিন্ন প্রচলিত পদ্ধতির সাহায্যে জিনের ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য, বা কোন নির্দিষ্ট প্রোটিন কিংবা আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তা নির্ধারণ করা। আর. এন. এ.-র নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্ষায় অবলম্বন করে যে জিনটি আর. এন. এ. সংশ্লেষণ করতে পারে, তার নিউক্লিয়োটাইড ক্রমপর্ষায় নির্ধারণ করা।

তৃতীয় : (1967 থেকে শুরু)—প্রথমে ছোট ছোট দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ এবং পরে ঐগুলি বিশেষ প্রণালীতে জুড়ে একটি লম্বা ডি. এন. এ. তৈরি করা, যা স্বাভাবিক প্রাণরাসায়নিক বিক্রিয়ার অংশ গ্রহণ করে আর. এন. এ. কিংবা প্রোটিন তৈরি করতে পারবে।

পলিনিউক্লিয়োটাইডে থাকে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড। হুতরাং ধাপে ধাপে বহুসংখ্যক নিউক্লিয়োটাইড জুড়ে পলিনিউক্লিয়োটাইড তৈরি হতে পারে। এখানে বলা প্রয়োজন, পিউরিন অথবা পিরিমিডিনের সঙ্গে রিবোস কিংবা ডি-অক্সিরিবোস যুক্ত থাকলে নিউক্লিয়োসাইড তৈরি হয়। দু-একটি নিউক্লিয়োসাইড, নিউক্লিয়োটাইড এবং পলিনিউক্লিয়োটাইডের পরিচয় দেখুয়া গেল ( 3নং চিত্র )।

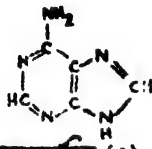
### সংশ্লেষণ-পদ্ধতি

একটু লক্ষ্য করলে দেখা যাবে, নিউক্লিয়োসাইডে কতকগুলি মুক্ত হাইড্রক্সিল বা  $-OH$  মূলক এবং অ্যামিনো বা  $-NH_2$  মূলক আছে। নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণে এই মূলকগুলির গুরুত্ব খুবই বেশী। মূলকগুলি নানাতাবে ছুটি নিউক্লিয়োসাইডকে কস্করিক অ্যাসিডের মাধ্যমে যুক্ত হতে বাধ্য দেয়। সে জন্তে মূলকগুলিকে বিভিন্ন আক্রমণাত্মক বিকারক থেকে রক্ষা করা

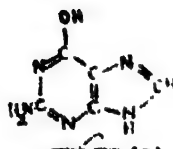
হয়ে থাকে। যে সব প্রচলিত রক্ষক-বিকারক (Protecting agent)  $-\text{OH}$ ,  $-\text{NH}_2$  এবং কসকেট ( $\text{PO}_4 - 3$ ) মূলতঃ রক্ষা করার জন্য ব্যবহৃত হয়, সেগুলি হলো বেকারিল ক্লোরাইড, অ্যানিসোবিল ক্লোরাইড, পেরামিথোমিট্রাইল, টাইটল ক্লোরাইড ইত্যাদি। রক্ষক-বিকারকগুলি

সংযোজক বিকারক (Condensing agent)। উল্লেখযোগ্য যে, সংযোজক বিকারকগুলি হলো ডাইসাইক্লোহেক্সাইলকার্বোডাই-ইমাইড বা সংক্ষেপে ডি. সি. সি. অ্যারোমেটিক সালাকোনিক অ্যাসিড ক্লোরাইড প্রভৃতি। রক্ষক-বিকারক, সংযোজক-বিকারক ইত্যাদি

### নিউক্লিন :-

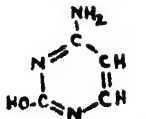


অ্যাডেনিন (A)

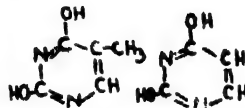


গুয়ানিন (G)

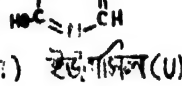
### নিউক্লিডিড :-



সাইটোসিন (C)

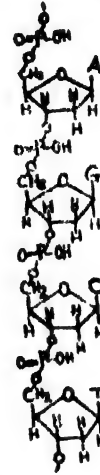


থাইমিন (T)

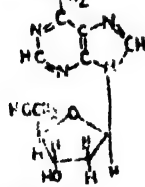


ইউরাসিল (U)

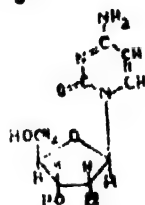
### ছোট পলিনিউক্লিওটাইড



### নিউক্লিওসাইড :-



অ্যাডেনিন-  
নিউক্লিওসাইড

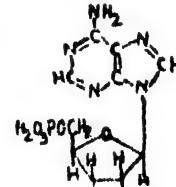


সাইটোসিন-  
নিউক্লিওসাইড

### নিউক্লিওটাইড :-



সাইটোসিন-  
নিউক্লিওটাইড



অ্যাডেনিন-  
নিউক্লিওটাইড

৩নং চিত্র

ব্যবহার করার সুবিধা হলো, পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি হয়ে গেলে রক্ষক-বিকারকগুলিকে সহজেই সংশ্লেষিত অণু থেকে বিচ্ছিন্ন করে নেওয়া যায়।

কতকগুলি বিকারক আবার নিউক্লিওটাইড-গুলির মধ্যকার কসকেট সেতু-বন্ধনী তৈরিতে অংশগ্রহণ করে। এদের বলা হয় কসকেট সেতু

ব্যবহার করে নিম্নলিখিত ধাপে ধোঁরা ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ করেছেন।

### মূল উপাদান

1 রক্ষক-বিকারকের সাহায্যে বিত্তির  $-\text{OH}$  এবং  $-\text{NH}_2$  মূলকগুলি রক্ষা করা।

(2) সংযোজক-বিকারকের সাহায্যে নিউ-ক্লিওটাইডগুলির মধ্যে সংযোগ সাধন এবং ধাপে ধাপে ছোট পলিনিউক্লিওটাইড প্রস্তুতি (5-20টি নিউক্লিওটাইড সমন্বিত)।

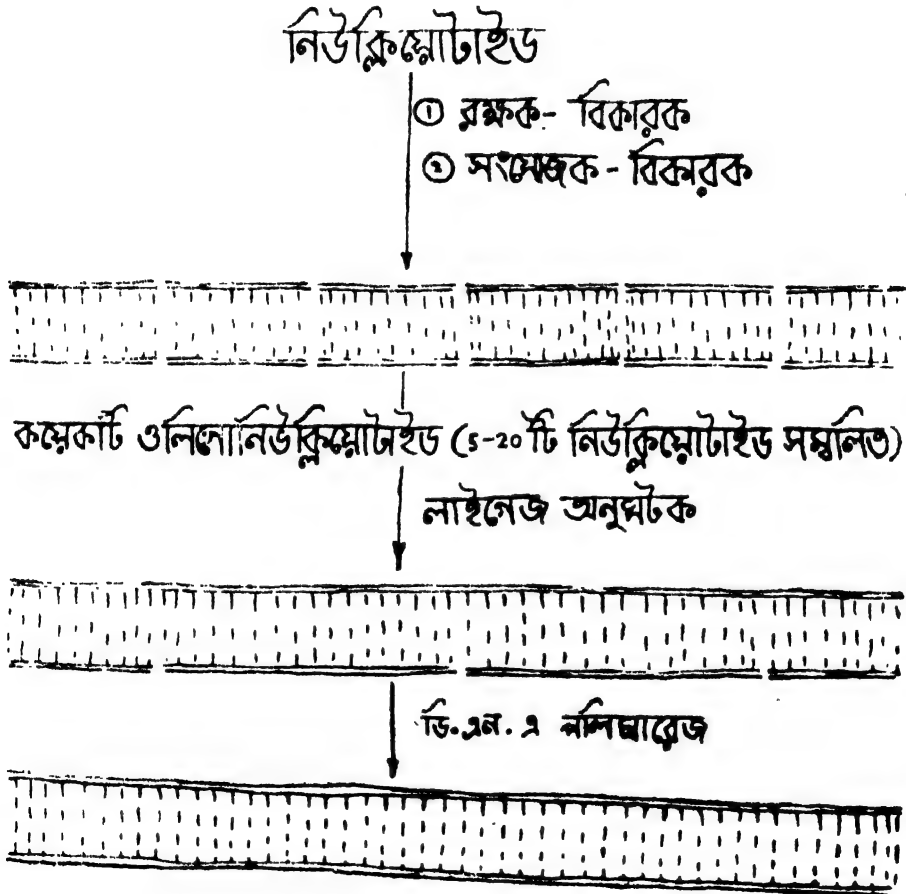
(3) উন্নত আধুনিক প্রণালীতে বিস্তৃত পলিনিউক্লিওটাইড সংশ্লিষ্টকরণ।

প্রণালীতে ছোট ছোট দ্বি-স্তরী পলিনিউক্লিওটাইডের সংযোজন।

কুজুতম দৈর্ঘ্যের সক্রিয় জিন বা ডি. এন. এ.

এখানে বলে রাখা প্রয়োজন যে, রাসায়নিক প্রণালীতে কেবলমাত্র কয়েকটি নিউক্লিওটাইড

ধোঁরানার পদ্ধতিতে ডি. এন. এ. সংশ্লেষণ



৪নং চিত্র

সংশ্লেষিত ডি. এন. এ.

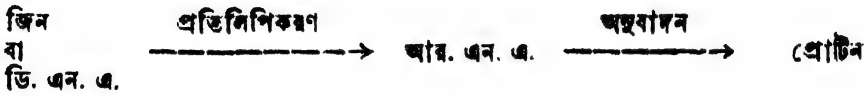
(4) পলিনিউক্লিওটাইড থেকে রক্ষক-বিকারক বিচ্ছিন্ন করা।

(5) রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক

সমন্বিত পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি করা সম্ভব।

এগুলিকে ওলিগোনিউক্লিওটাইড (Oligonucleotide) বলা হয়। ওলিগোনিউক্লিওটাইড-

ভলিকে রাসায়নিক এবং প্রাণরাসায়নিক প্রণালীতে জুড়ে পলিনিউক্লিওটাইড তৈরি করা হয়। একাজে লাইগেজ নামক একটি জৈব অণুঘটক ব্যবহার করা হয়। দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি হয়ে গেলে তার পরিপূরক এক-তন্ত্রীগুলির অনেক জায়গা থাকে ভাঙা। সেগুলিকে জোড়বার জন্তে E. coli থেকে পাওয়া ডি. এন. এ. পলিমারেজ নামক জৈব অণুঘটকটি ব্যবহৃত হয় (4নং চিত্র)।

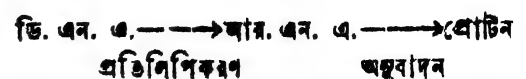


জিন-সংশ্লেষণের পদ্ধতি আবিষ্কারের আগে বৈজ্ঞানিকেরা নানা উপায়ে জিনের ক্ষুদ্রতম অংশ, বা কোন একটি বিশেষ প্রাণরাসায়নিক ঘটনার সঙ্গে জড়িত, তা জানবার চেষ্টা করেছিলেন। দু-একজন খানিকটা সফলতা অর্জন করলেও এই কাজ শ্রমসাপেক্ষ—এমন কি, কোন নির্দিষ্ট পথের নির্দেশও নেই। খোরানার পদ্ধতিটিতে পথের নির্দেশ তো আছেই—এমন কি, সফলতা লাভের আশাও অনেক গুণ বেশী। মাত্র 77টি নিউক্লিওটাইড সমন্বিত পূর্বনির্ধারিত নিউক্লিওটাইডের ক্রমপর্ষায় জানা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-কে যে জিনটি সংশ্লেষণ করতে পারে, তার সম্ভাব্য নিউক্লিওটাইড ক্রমপর্ষায় প্রথমে ডট্টর খোরানা কাগজে লিখলেন। এরপর 5-20টি নিউক্লিওটাইডের দৈর্ঘ্যের সমান 15টি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তারপর জৈব অণুঘটক ব্যবহার করে তিনটি পুথক লগা ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। তিনটি লগা

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের বাস্তব রূপ

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণই সব শেষ নয়। দেখতে হবে, নিউক্লিক অ্যাসিডের কোন ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্য জীবকোষের কোন একটি বিশেষ ঘটনাকে রূপ দিতে সক্ষম। এটি বাচাই করে দেখতে হলে জিন থেকে প্রোটিন সংশ্লেষণের বিভিন্ন ধাপগুলি পরীক্ষা করে দেখতে হবে। জিন অথবা ডি. এন. এ. এবং প্রোটিনের পার-স্পরিক সম্পর্ক ইতিমধ্যে একরকম প্রায় জানা হয়ে গিয়েছিল।

ডি. এন. এ.-কে জুড়ে 77টি নিউক্লিওটাইড সমন্বিত একটি দ্বি-তন্ত্রী ডি. এন. এ. তৈরি করলেন। এই ভাবে ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের ডি. এন. এ., বা অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ. তৈরি করতে পারে, তা পরীক্ষা-নলে সংশ্লেষণ করলেন। এবার পরীক্ষা-নলে 77টি নিউক্লিওটাইড সমন্বিত ডি. এন. এ.-টি ব্যবহার করে এবং অন্তান্ত বা বা প্রয়োজন, তা দিয়ে অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টিও তৈরি করলেন। সংশ্লেষিত আর. এন. এ.-টি সক্রিয় কিনা, এবার তা পরীক্ষা করার পালা। C<sup>14</sup>-চিহ্নিত অ্যালানিন, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ. এবং বিক্রিয়ার অন্তান্ত ন্যূনতম প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি থাকলে দেখা গেল, সংশ্লেষিত পরিবাহক আর. এন. এ.-টি C<sup>14</sup>-অ্যালানিনকে প্রোটিনে জুড়ে দিতে পারে। এই পরীক্ষা প্রত্যক্ষভাবে—



ঘটনাটির বিভিন্ন ধাপগুলি প্রমাণ করলো। ধোঁরা-  
নার অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি কতটুকু  
সক্রিয়, তা আরও ভালভাবে পরীক্ষা করে দেখা  
যেতে পারে এমন একটি জীবাণুতে, যার মধ্যে  
অ্যালানিন-পরিবাহক আর. এন. এ.-টি অল্পপরিমাণে  
এই ধরনের কাজ জীবকোষে সংশ্লেষিত জিনের  
সক্রিয়তা প্রমাণ করতে সক্ষম হবে।

### তাৎপর্য

নিউক্লিক অ্যাসিড সংশ্লেষণের তাৎপর্য বহু-  
মুখী। সুদূরপ্রসারী কল্পনার না যেতে আমাদের  
বাস্তব পরিকল্পনাটি প্রথম তৈরি করতে হবে।  
মনে হয়, আধুনিক আণবিক প্রজনন প্রয়োগ-  
বিজ্ঞানের উন্নতি সাধন করে বহু বংশজাত ক্রটি  
সংশোধন করতে বিজ্ঞানীসমাজ এখন বেশ  
উৎসাহী। ইতিমধ্যে অনেকেই ডায়াবেটিস নামক  
তরুণ রোগের হারী প্রতিবিধান করবার জন্তে  
চিন্তা ও চেষ্টা করছেন। বহুৎ থেকে স্বাভাবিক-  
ভাবে ইনসুলিন নামক উত্তেজক রসটি সংশ্লেষিত  
না হলে কিংবা স্বাভাবিকভাবে নিঃসৃত না হলে  
ডায়াবেটিস হয়ে থাকে। আশার কথা এই যে,  
ইনসুলিনের গঠন-প্রকৃতি এবং এর অ্যামিনো  
অ্যাসিডের ক্রমপর্ধার বৈজ্ঞানিক Sanger বহুদিন

আগেই নির্ধারণ করেছিলেন। এখন বাকী  
তথ্য এমন একটি ক্ষুদ্রতম দৈর্ঘ্যের জিন তৈরি  
করা, যা ইনসুলিন তৈরি করতে পারে। পক্ষাৎ  
অপসরণ পদ্ধতি (Extrapolation method)  
অবলম্বন করে প্রথমে ইনসুলিনে অ্যামিনো  
অ্যাসিডের ক্রমপর্ধার থেকে আর. এন. এ.-র  
সম্ভাব্য নিউক্লিওটাইড ক্রমপর্ধার নির্ধারণ করা  
এবং পরে ডি. এন. এ.-তে অবস্থিত সম্ভাব্য নিউ-  
ক্লিওটাইডের ক্রমপর্ধার স্থির করা—এর পর  
ধোঁরানার পদ্ধতিতে ধাপে ধাপে ডি. এন. এ.-টি  
তৈরি করা। এখানেই সকলতা সম্পূর্ণ নয়।  
সংশ্লেষিত ডি. এন. এ.-টি সাধারণ জীবকোষে  
কতটা সক্রিয়, তাও পরীক্ষা করে দেখতে  
হবে। এই ক্ষেত্রে কোন রকম ভুলক্রটি থাকলে  
হয়তো আরও দুরারোগ্য ব্যাধির সম্মুখীন হতে  
হবে। সে জন্তে ডায়াবেটিস, ক্যান্সার প্রভৃতি  
জটিল ব্যাধিগুলির মোকাবেলা করবার আগে  
আমাদের আরও বহু পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে  
যেতে হবে। বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে এগিয়ে  
গেলে নিকট ভবিষ্যতে বহু দুরারোগ্য ব্যাধির  
নির্মূল সাধনে ধোঁরানার ‘জিন-সংশ্লেষণ’ হবে  
একটি যুগান্তকারী আবিষ্কার।

## পুস্তক-পরিচয়

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান—ডি. রিড্‌নিক প্রণীত।  
প্রকাশক—নবীবা প্রহ্লাদ প্রাইভেট লিমিটেড,  
কলিকাতা। ইংরেজী সংস্করণের অহ্বাদ করেছেন  
শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী, শ্রীহরিত চক্রবর্তী, শ্রীসনৎ বসু ও  
ডক্টর জয়ন্ত বসু। ভূমিকা লিখেছেন জাতীয়  
অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা  
করেছেন অধ্যাপক অমরেন্দ্রপ্রসাদ মিত্র ও ডক্টর  
জয়ন্ত বসু। পৃষ্ঠা-323 ; মূল্য 6'00 টাকা।

বাংলাভাষী পাঠকের সম্মুখে নব্য পদার্থ-  
বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ, চমকপ্রদ আবিষ্কার  
এবং বিভিন্ন তত্ত্ব ও তথ্যকে উপস্থাপিত করবার  
মত উল্লেখযোগ্য পুস্তকের একান্তই অভাব।  
এই বিষয়ে বাংলা ভাষার মৌলিক পুস্তক রচনা  
নিঃসন্দেহে কাঁচা, তবে তার অভাবে অল্প ভাষার  
রচিত প্রাথমিক পুস্তকের অহ্বাদও সমতাবে  
প্রশংসনীয় প্রচেষ্টা। এই পুস্তকের প্রকাশ সে ক্ষেত্রে  
অকুণ্ঠ সাধুবাদ পাবার যোগ্য।

1900 সালের 17ই ডিসেম্বর ম্যাক্স প্লাঙ্ক বস্তুর  
তাপীয় বিকিরণের তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে  
কোয়ান্টাম তত্ত্বের প্রস্তাবনা করেছিলেন। প্রকৃত  
পক্ষে সে দিন থেকে নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের আবির্ভাব  
হলো, ক্লাসিক্যাল পদার্থ-বিজ্ঞান চিন্তার অপূর্ণতা  
ধরা পড়লো। বিংশ শতাব্দীর সূচনাতে যে নব্য  
পদার্থ-বিজ্ঞানের স্তম্ভ আবির্ভাব, তা পরকালের  
মধ্যে বিশ্বব্যপক দ্রুতগতিতে বিজ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত  
শাখাকে ছাড়িয়ে গেল। বস্তুতঃ বিজ্ঞানের  
অস্তিত্ব সমস্ত শাখাই পদার্থ-বিজ্ঞানের এই অগ্র-  
গতিতে প্রভাবিত হয়ে পুষ্টিলাভ করেছে এবং  
মানবসমাজের চিন্তাধারাকেও গভীরভাবে আচ্ছন্ন  
করেছে।

নব্য পদার্থ-বিজ্ঞানের সামগ্রিক রূপ—প্লাঙ্কের

কোয়ান্টাম তত্ত্ব থেকে প্রাথমিক বস্তুকণা সম্পর্কিত  
অতি আধুনিক ধারণা কোয়ান্টাম পর্বত—এই  
পুস্তকে খুবই সরল এবং চিত্তাকর্ষকভাবে বর্ণিত  
হয়েছে। পুস্তকটিতে মোট ছয়টি অধ্যায় আছে।  
প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান  
সীমাবদ্ধতা এবং কোয়ান্টাম তত্ত্বের আবির্ভাব  
বিবৃত হয়েছে। তপ্ত বস্তুর উত্তাপ বিকিরণের  
তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা এবং তেজস্বিরতা ও রঞ্জন রশ্মির  
আবিষ্কার ক্লাসিক্যাল পদার্থবিজ্ঞান মূল ভিত্তিকে  
প্রচণ্ড ধাক্কা দিচ্ছিল। আইনস্টাইনের কোটো-  
ইলেকট্রিক প্রক্রিয়া প্লাঙ্কের তত্ত্বকে আরো সুপ্র-  
তিষ্ঠিত করলো।

1912 সালে নীল বোর হাইড্রোজেন-বর্ণালীর  
তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা প্রদান করেন। 1924 সালে  
লুই ডি ব্রগলি জড় তরঙ্গের অস্তিত্ব সম্পর্কে  
অহ্বান করেন। এর কয়েক বছর পরে ভেলি-  
সন ও জারমার এবং ভার্টালফ-কেনসের  
দ্বারা ইলেকট্রনের অবচ্যুতি (Diffraction)  
পরীক্ষা করেন; এতে ইলেকট্রনের তরঙ্গ-ধর্ম  
প্রমাণিত হয়। পুস্তকের তৃতীয় অধ্যায়ে এসব  
বিষয় চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। 1927  
সালে ভার্ণার হাইসেনবার্গ এবং অ্যারতিন  
প্রোব্রেন্ডিয়ার আধুনিক কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান  
হরণাভ্যাস করেন। ক্লাসিক্যাল বলবিজ্ঞান বস্তুকণা  
নিষ্করণশীলক, তাতে সম্ভাব্যতার কোন স্থান  
নেই। কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান বস্তুকণা সকল সময়ের  
সম্ভাব্যতার মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই  
কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞান সাহায্যে ইলেকট্রন বা  
অস্তিত্ব কণার বৈদ্যুতিক দ্বারা (Potential barrier)  
অতিক্রমণের ঘটনা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করা  
হয়েছে।



চতুর্থ অধ্যায়ে পরমাণু, অণু ও কেলসের ধর্ম ব্যাখ্যার কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রয়োগ বিবৃত হয়েছে। পরমাণুর মিলনে অণু গঠনে বিনিময়ী মিথ-ক্রিয়ার (Exchange interaction) ভূমিকার বর্ণনা চিত্তাকর্ষক। রেখাচিত্রের সাহায্যে ইলেকট্রন ঘেঘের ব্যাখ্যাও খুব সুন্দর।

কোয়ান্টাম বলবিজ্ঞানের প্রয়োগ শুধু পারমাণবিক ক্রিয়াতেই সীমাবদ্ধ থাকে নি, পরমাণু-কেন্দ্রকের আন্তঃকরণী প্রক্রিয়ার ক্ষেত্রেও এর সার্থক প্রয়োগ ঘটেছে। পুস্তকের পঞ্চম ও ষষ্ঠ অধ্যায়ে পরমাণু-কেন্দ্রকের আন্তঃকরণী প্রক্রিয়া, মৌল কণার সৃষ্টি ও পারস্পরিক প্রক্রিয়ার আধুনিক তথ্যাবলী সন্নিবেশিত হয়েছে। কেন্দ্রকে নিউট্রন ও প্রোটনের একত্র অবস্থানের কারণ অহুসঙ্কান করতে গিয়ে বিজ্ঞানী ট্যাম এবং উকাওয়া কেন্দ্রকের নিউট্রন ও প্রোটনের মধ্যে তীব্র বিনিময়ী আকর্ষণী বলের অহুমান করেন। উকাওয়া অত্র কোন মৌলিক কণা ( পরে যার নাম দেওয়া হয়েছে মেসন ) বিনিময়ের ফলে এই বলের সৃষ্টি হয় বলে প্রস্তাব করেন। 1947 সালে পাওয়েল সেই অতীর্ণিত পাই-মেসন আবিষ্কার করেন। মৌল কণার পারস্পরিক ক্রিয়াসম্প্রদায় বলসমূহের মধ্যে কেন্দ্রকীয় বলই সর্বাধিক জোড়ালো—অবশ্য এর বিস্তার খুবই কম।

পুস্তকটির শেষ অংশে কেন্দ্রকের বিভিন্ন মডেল, কেন্দ্রক বিভাজন প্রক্রিয়ার ব্যাখ্যা এবং মৌল কণার বিপরীত কণার অস্তিত্ব, মৌলকণার অহুমান প্রভৃতি সুন্দর ও প্রাঞ্জলভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। মৌল বিভ্রাসে জ্বিতর, অষ্টতর প্রভৃতির অহুমান ও সেই সঙ্গে কোয়ার্ক ইত্যাদিরও বর্ণে ভালভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বস্তুতপক্ষে পুস্তকে সন্নিবেশিত বহুল তথ্যের পরিচয় এই বয়স পরিসরে দেওয়া দুঃসাধ্য। মৌল কণাসমূহের একটি তালিকা

এদত হওয়াতে পুস্তকের উপযোগিতা বৃদ্ধি পেয়েছে। পুস্তকটিতে ব্যবহৃত পরিভাষা ও সেগুলির ইংরেজী প্রতিশব্দের একটি তালিকা পুস্তকটির শেষে সংযোজিত হয়েছে। তালিকাটি প্রস্তুত করেছেন ডক্টর জয়ন্ত বসু। বাংলা ভাষায় স্রুতি প্রতীতি বিজ্ঞানবিষয়ক পুস্তকে এরূপ তালিকা এদত হলে তা পরিভাষা-সমস্তার সমাধানের বহুলাংশে সহায়ক হবে।

এই তথ্যবহুল ও জনপ্রিয় পুস্তকের অহুবাদে কিছু ক্রুটি পরিলক্ষিত হয়েছে। এই প্রকার অহুবাদ পুস্তকের বহুল প্রচার সর্বথা কাম্য এবং বাংলা ভাষায় এইরূপ একটি প্রচেষ্টা প্রথম বলেই ক্রুটিগুলি সম্পর্কে অধিকতর সচেতন হওয়া প্রয়োজন। কয়েক ক্ষেত্রে অহুবাদ আক্ষরিক অর্থেই ইংরেজীর অহুগামী হয়েছে। কলে স্থানে স্থানে ভাষা কিছুটা হুবোধ্য হয়েছে। এই ধরনের অহুবাদ গ্রহের ভাষা সহজ ও সাবলীল করবার জন্তে অহুবাদ কোন কোন ক্ষেত্রে বিপরবস্তুর ভাব অহুগারে হওয়াই বাঞ্ছনীয়। ইংরেজী এবং বাংলার বাচনভঙ্গী তো একরকম নয়।

একথা নিশ্চয়ই ঠিক যে, গ্রহটির উপযোগিতার কথা চিন্তা করলে ক্রুটি-বিচ্যুতি খুবই নগণ্য মনে হয়। সর্বস্তরের শিক্ষিত বাংলাভাষী পাঠকই এই গ্রহ পাঠে আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের সঙ্গে পরিচিত হবেন। বস্তুতপক্ষে এইরূপ একটি গ্রহ প্রকাশ করে অহুবাদক এবং প্রকাশক আধুনিক বিজ্ঞান-জগতের দ্বার সবার কাছে উন্মোচিত করেছেন—এই জন্তে বাংলাভাষী জনসাধারণ তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবে।

ব্রজেননাথ দাশগুপ্ত

সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স,  
কলিকাতা-9

# କିଶୋର ବିଜ୍ଞାନୀର ଦମ୍ଭର

## ଜ୍ଞାନ ଓ ବିଜ୍ଞାନ

ସେପ୍ଟେମ୍ବର-ଅକ୍ଟୋବର — 1970

ତ୍ରୟୋବିଂଶ ବର୍ଷ — ନବମ-ଦଶମ ସଂଖ୍ୟା



বসন্ত সমাগমে অ্যারিজোনার মরুভূমির বিস্তীর্ণ বালুকারণির মধ্যে বিরাট আকৃতির  
ক্যাকটাস গাছে ( সিজ বা মনসাজাতীয় গাছ ) ফুল ফুটেছে।

## কৃত্তিকা তার নাম

তুখু চোখে দেখা।

সন্ধ্যার নির্মল আকাশে যখন তারা ফোটে এক, দুই, তিন—তখনও মহাকাশ এমন কিছু নয়, কিন্তু তারপর এক সময়ে যখন অন্ধকার জমাট বেঁধে ঘন হয়ে আসে, তখন দিনের আলোর গভীরে লুকিয়ে থাকা অসংখ্য তারকার মেলায় মহাকাশ অপরাপ দর্শন হয়ে ওঠে।

উর্ধ্বাকাশ—যেদিকে তাকানো যায়, তারা আর তারা। তার কোনটি উজ্জ্বল—সহজে দৃষ্টি আকর্ষণ করে, কোনটি স্মিয়মান—চোঁচায় বার অস্তিত্ব ধরা পড়ে, কোনটি একক—মহাকাশে সে নিঃসঙ্গ, কোনটি যুগ্ম—দূরবীনে যা লক্ষ্য করবার মত। তারকাগুলির বর্ণবৈচিত্র্যও আছে। কোনটির বর্ণ হলুদ—আকাশের অধিকাংশ তারকাই তাই, কোনটি রক্তিম—সেগুলি অতীব সুন্দর, সন্দেহ নেই।

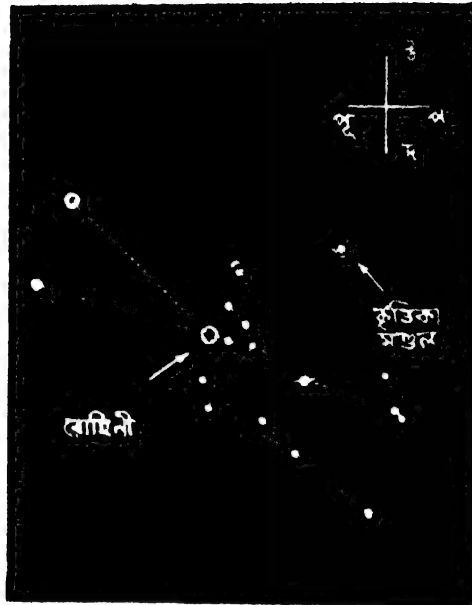
আকাশে বত-উজ্জ্বল এবং দর্শনীয় তারা, প্রাচীন কালের মহাকাশ অনুসন্ধানীরা সেই সব তারাগুলি নিয়ে বিভিন্ন রূপ কল্পনা করেছিলেন। সঙ্গে সঙ্গে কাহিনীর ভাবনা। সে ভাবনার পরিচয় পাই—রামায়ণ, মহাভারত, পৌরাণিক বিভিন্ন কাহিনী ও উপাখ্যানে।

শীতের আকাশে সন্ধ্যাবেলায় যদি সরাসরি মাথার উপরে চোখ তুলে তাকানো যায়, তাহলে উজ্জ্বল ও অল্পজ্বল তারকায় মেলা একটি তারকাগুচ্ছ সকলেরই নজরে আসবে, অনেকটা মুড়ির ঠোঙ্গার মত আকৃতি—নাম তার কৃত্তিকা। মণ্ডলটিতে কয়টি তারা আছে? সহজ দৃষ্টিতে ছয়; কিন্তু দৃষ্টি যদি একটু তীক্ষ্ণ করা যায়, তাহলে মণ্ডলটিতে আর একটি তারাও নজরে আসতে পারে। সব জড়িয়ে তখন সেখানে সাতটি তারা। বাংলায় এই মণ্ডলটির একটি আটপোঁরে নাম আছে। সেটি হলো সাত-ভৈরবে বা সাত ভাই চম্পা। ইংরেজীতে এটির নাম Pleiades। এটির অবস্থান পাঁচ-দশ'আলোক-বর্ষ দূরে।

এই কৃত্তিকাকে নিয়ে বাংলায় আর একটি তারামণ্ডল আছে—সেটি বুধ রাশি, ইংরেজী নাম Taurus। সেকালের জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা মণ্ডলটির বিভিন্ন তারা নিয়ে একটি বুকের মূর্তি কল্পনা করেছিলেন বলেই মণ্ডলটির এই নাম। বুধ রাশিতে রীতিমত উজ্জ্বল একটি তারা আছে। মহাকাশে সর্বোজ্বল তারাগুলির মধ্যে এটি চতুর্দশ। তারার নাম রোহিণী।

মহাকাশের তারা বা তারামণ্ডল নিয়ে ভারতীয় পুরাণের যে সব আখ্যান বা উপাখ্যান মনকে চমৎকৃত করে, সে রকম একটি উপাখ্যান হলো কৃত্তিকামণ্ডলের তারাগুলিকে নিয়ে। কাহিনীটি বিচিত্র সন্দেহ নেই।

কৃত্তিকা নক্ষত্রকে নিয়ে কাহিনীটি বলতে গেলে মহাকাশের আর একটি তারা-মণ্ডলের কথা না বলে উপায় নেই। এটির নাম সপ্তর্ষিমণ্ডল। মহাকাশে কৃত্তিকামণ্ডলে কিছুটা উত্তর-পূর্বে এটির অবস্থান। অনেকটা স্থান জুড়ে উজ্জল তারা নিয়ে মণ্ডলটির অসংখ্য সৌন্দর্য লক্ষ্য করবার মত। মণ্ডলটির নাম থেকেই বোঝা যায় যে, মণ্ডলটিতে আছে সাতটি তারা, সেই সাতটি ঋষির নামাঙ্কিত। মণ্ডলটির পূর্ব প্রান্তে আছে মরীচি, তারপর বশিষ্ঠ, অঙ্গিরা, অত্রি। অত্রির দক্ষিণে পুলহা, পুলহার পশ্চিমে পুলহ ও পুলহের উত্তরে ক্রতু।

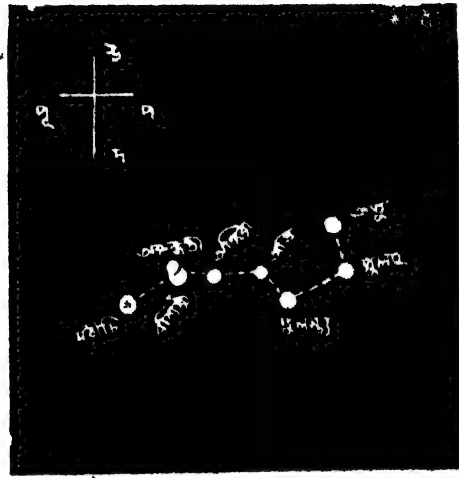


খুব রাশি

ভারতীয় জ্যোতির্বিজ্ঞানে এই সপ্তর্ষিমণ্ডলটির বিশেষ গুরুত্ব আছে। এর পশ্চিম প্রান্তের দুটি তারা পুলহ ও ক্রতুকে যোগ করে উত্তর দিকে বর্ধিত করলে আমরা ঋষতারিটিতে পৌঁছবো। এই ঋষতারিটি উত্তর দিক-নির্দেশ করে এবং প্রাচীন কালে সকলের কাছে ঐ তারাটিই ছিল দিক-নির্দেশক। তারাটি বিশেষ উজ্জল নয়। পাছে ভুল হয়, এই কারণে সপ্তর্ষিমণ্ডলের পুলহ ও ক্রতুকে অবলম্বন করেই ঋষতারিকে চিনবার পদ্ধতি প্রচলিত ছিল।

যাই হোক, সপ্তর্ষিমণ্ডলে যে সাতজন ঋষি আছেন, তাঁদের জীবনের কথার আসা যাক। সপ্তর্ষির জীবনের নাম অনশুয়া, কমা, শ্রীতি, অরুন্ধতী, শিবা এবং লজ্জা। এর মধ্যে অরুন্ধতী বশিষ্ঠের জ্যেষ্ঠা। সপ্তর্ষিমণ্ডলের বশিষ্ঠের খুব কাছেই একটি অল্পজল

তারা আছে, সেটিই বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতী হিসাবে নির্দিষ্ট। অস্ত্রাঙ্কু অবিদের কাছে কোন তারা নেই। কলে সপ্তর্ষির অস্ত্র হয় অবিদর সঙ্গে তাঁদের পত্নীরা যুক্ত হন নি। তাহলে তাঁরা কোথায়? পৌরাণিকেরা তাঁদের কৃত্তিকামণ্ডলে প্রত্যক্ষযোগ্য ছয়টি তারায় নির্দিষ্ট রাখলেন। কিন্তু সে শুধু মুখের কথায় নয়। বক্তব্যকে কাহিনীযুক্ত করে তাঁরা তা নতুন ভাবে পরিবেশন করলেন।



সপ্তর্ষিমণ্ডল

শাস্ত্রে আছে, অগ্নিদেব নিঃসঙ্গ—পরিবার-পরিজন কেউ নেই। হঠাৎ একদিন সপ্তর্ষির সাত পত্নীকে দেখে অগ্নিদেবের তাঁদের দাসী করবার বাসনা হলো। সেই মত প্রস্তাব—কিন্তু রাজী হলেন না অবি-পত্নীরা। সে বড় ভয়ানক অপমান। তখন লজ্জায় প্রাণত্যাগের ভয়ে গভীর জঙ্গলে বসে অগ্নিদেব ধ্যান করতে লাগলেন।

দক্ষের কন্যা স্বাহা দেবী অগ্নিদেবের এই অবস্থা দেখে দয়াপূরবশ হয়ে অজিরার স্ত্রী শিবির রূপ ধারণ করে অগ্নিদেবের কাছে এলেন। খুসী হলেন অগ্নিদেব, শিবাকে বিবাহ করলেন।

দিন কাটতে লাগলো। কিন্তু সপ্তর্ষির অস্ত্রাঙ্কু স্ত্রীদের দাসী করবার ঝোঁক তাঁর গেল না। স্বাহা কি করেন। একে অজিরার স্ত্রী শিবির রূপ ধারণ করে তিনি অস্ত্রাঙ্কু করেছেন, আবার অস্ত্র অবি-পত্নীদের রূপ ধারণ করতে তাঁর আগ্রহ হলো না। স্বাহা মনের হুঃখে পাখী হয়ে উড়ে গিয়ে এক পাহাড়ের চূড়ার বাসা বাঁধলেন।

কিন্তু অগ্নিদেবকে ছেড়ে স্বাহার বেশী দিন থাকা হলো না। স্বাহা নেই, অগ্নিদেব অস্থির—দিশাহারা। সেই অবস্থা দেখে কিরে এলেন স্বাহা। হয় অবি-পত্নীর রূপ ধারণ করে তিনি অগ্নিদেবের মনস্তৃষ্টি করতে লাগলেন। কিন্তু বশিষ্ঠ-পত্নী অরুন্ধতীর রূপ

তিনি গ্রহণ করতে পারলেন না। বশিষ্ঠ যেমন মহাজ্ঞানী ও তপস্বী ছিলেন, অরুণ্ডতীও ছিলেন ঠিক সেই রকম মহাবিহুসী ও তাপসী। কলে অরুণ্ডতীর রূপ ধারণ করতে তিনি সাহস পেলেন না।

সময় এগিয়ে চললো। স্বাহা একটি পুত্রের মা হলেন। অল্পদেবেতে ছেলেটি। ছেলেটিকে কিন্তু তিনি অগ্নিদেবের কাছে রাখলেন না। বে পাহাড়ে স্বাহা পাখী হয়ে আশ্রয় নিয়েছিলেন, সেই পাহাড়ের একটি গুহায় ছেলেটি বড় হতে লাগলো।

এদিকে মহা জলুস্থল। সপ্তর্ষির ছয় ঋষি গুনতে পেলেন যে, তাঁদের স্ত্রীরা অগ্নিদেবের দাসীপনা করছেন। কষ্ট হলেন ঋষিরা। আর রক্ষা নেই। তাঁরা স্ত্রীদের ভৎসনা করলেন আর সেই সঙ্গে বহিষ্কার।

অসহায় ঋষি-পত্নীরা নিরাশ্রয় হয়ে স্বাহার পুত্র স্বন্দের কাছে এসে সব বললেন। স্বন্দ বললো, চিন্তার কি আছে? ঐ উদার মহাকাশ আপনাদের আশ্রয়স্থল। আপনারা সমবেতভাবে ওখানে আশ্রয় নিন।

উদার মহাকাশ ভারতীয় পুরাণের বিবিধ আখ্যান-উপাখ্যানের অনেক অবলম্বনেরই আশ্রয়স্থল। কিন্তু আজ আমাদের অবহেলায় সেগুলির মহাকাশে তারা ছাড়া অণু কোন পরিচয় নেই।

[ মহাকাশে তারকাচিত্র লক্ষ্য করবার সময়ে মনে রেখ, তারকাচিত্রকে নিম্নাতিমুখী করে মাথার উপরে ধরে উত্তর-দক্ষিণ, পূর্ব-পশ্চিমকে সঠিকভাবে মিলিয়ে নিতে হবে। ]

অরুণরতন ভট্টাচার্য

## জানবার কথা

তোমরা মাঝে মাঝে সংবাদপত্রে বিভিন্ন দেশের প্রচণ্ড ঝড়ের খবর পড়ে থাকবে। কিন্তু পৃথিবীতে সর্বাপেক্ষা প্রচণ্ড ঝড়ের খবর জান কি? বিজ্ঞানীদের মতে— 1934 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকায় প্রবাহিত ঝড়ই নাকি সবচেয়ে প্রচণ্ড হয়েছিল। সেই সময় বাতাসের গতিবেগ ছিল ঘণ্টার 231 মাইল। বিজ্ঞানীরা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটনের পর্বতশীর্ষে এই ঝড় সম্পর্কে তথ্যাদি সংগ্রহ করেন।

তোমাদের যদি প্রশ্ন করা হয়—পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ পর্বত কোনটি? সবাই একবাক্যে বলবে—হিমালয় (এর সর্বোচ্চ শৃঙ্গ মাউন্ট এভারেস্টের সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে উচ্চতা হলো 29,028 ফুট)। কিন্তু জেনে রাখ—হাওয়াইয়ের মটুনা কেয়া নাবক পর্বতের উচ্চতা হচ্ছে 30,785 ফুট। এর মধ্যে 17,000 ফুট অবশ্য সমুদ্রের নীচে অবস্থিত।

## চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্স

চিকিৎসা বলতে সাধারণতঃ যা আমাদের মনে আসে, তা হলো নিশ্চিত মিস্তার বা ওষুধের বড়ি, যন্ত্রপাতির মধ্যে টেবিলস্কোপ বা ইলেকশনের সিরিজ। আর ইলেকট্রনিক্স বলতে আমরা বুঝি রেডিও, টেলিভিশন, কম্পিউটার ইত্যাদি—যাতে ইলেকট্রনিক ভাল্‌ব, ট্রানজিস্টর বা ঐ জাতীয় সব উপাদান ব্যবহার করা হয়। তাহলে চিকিৎসায় সঙ্গে ইলেকট্রনিক্সের সম্পর্ক কোথায়?

চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের একটা ব্যবহারের কথা অবশ্য আমরা অনেক দিন থেকেই জানি। দেহের কোন ভিতরের অংশের—যেমন, কোন হাড় বা ফুসফুসের ছবি তোলাবার ক্ষেত্রে যখন র‍্যাট্‌গেন রশ্মি প্রয়োগ করা হয়, তখন সেই রশ্মি উৎপাদনের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সাহায্য নেওয়া হয়ে থাকে। তবে প্রধানতঃ যে কারণে সম্প্রতি চিকিৎসায় ইলেকট্রনিক্সের প্রভূত প্রয়োগ হচ্ছে, তার মূলে রয়েছে মরা ব্যাং নিয়ে এক ধরনের মজার পরীক্ষা।

### গ্যালভানির পরীক্ষা ও জৈব বিদ্যুৎ

সে প্রায় দু-শ' বছর আগেকার কথা। ইতালির লুইজি গ্যালভানি এক মেঘলা দিনে একটি সম্মুত ব্যাণ্ডের দেহ ব্যবচ্ছেদ করে তাই নিয়ে এক অদ্ভুত পরীক্ষা দেখিয়ে তাঁর বন্ধুবান্ধবদের একেবারে অবাক করে দিয়েছিলেন। বজ্রপাত থেকে তাঁর বাড়িকে রক্ষা করবার ক্ষেত্রে বাড়ির ছাদে যে লৌহদণ্ড খাড়া করা ছিল, তাতে একটা তার বেঁধে তিনি সেই তারের অন্য প্রান্তে বাঁধলেন মরা ব্যাণ্ডের মাথার দিকে; আর একটা তার ব্যাণ্ডের এক পায়ে বেঁধে সেই তারের অপর প্রান্ত রাখলেন তাঁর বাড়ির কুয়ার জলের ভিতর। এরপর যখনই কাছাকাছি বজ্রপাত হচ্ছিল, তখন দেখা যাচ্ছিল—ব্যাণ্ডের দেহটি সঙ্গেসঙ্গে উঠছে। অনেকেই একে ভৌতিক কাণ্ড বলে মনে করলেন। কিন্তু গ্যালভানি আসল ব্যাপারটা বুঝেছিলেন। বজ্রপাতের সময় বিদ্যুতের একটা অংশ ছাদের লৌহদণ্ডে ধরা পড়ছিল এবং তখন ব্যাণ্ডের দেহের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হচ্ছিল। মরা ব্যাণ্ডকে নাচানো যে বিদ্যুতেরই কারসাজি, তা গ্যালভানি আন্দাজ করেছিলেন।

গ্যালভানি এই ধরনের আরও পরীক্ষা করেছিলেন। তাঁর পরীক্ষা থেকে জানা যায় যে, বিদ্যুতের ক্রিয়ায় দেহের পেশী ও স্নায়ুতে গতির সঞ্চার হয়। তাই যদি হয়, তাহলে জীবন্ত প্রাণীর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ চালনার মূলেও কি বিদ্যুৎ রয়েছে? ক্রমে জানা গেল, ধারণাটা ঠিকই—প্রাণীর বোধশক্তির কেন্দ্র যে মস্তিষ্ক, সেখানে সব



খবর জানিয়ে দেওয়া এবং সেখান থেকে দেহের বিভিন্ন অংশে কাজ করবার আদেশ পৌঁছে দেবার ব্যাপারে বিদ্যুৎপ্রবাহই দূতের কাজ করে। দেহের প্রত্যেকটি পেশী বা স্নায়ু হাজার হাজার জীবকোষের সমন্বয়ে গঠিত। প্রতিটি কোষের চারদ্বারে একটি অত্যন্ত পাতলা ঝিল্লীর (Membrane) আবরণ থাকে। দেহের মধ্যে নানারকম রাসায়নিক প্রক্রিয়া ও সেই সঙ্গে ঐ ঝিল্লীর বিশেষ ধর্মের ফলে ঝিল্লীর ভিতরে ও বাইরের অংশের মধ্যে বৈদ্যুতিক বিভব-বৈষম্যের উৎপত্তি হয়। এই বিভব-বৈষম্য থেকে কিভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহের সৃষ্টি হয় এবং সেই বিদ্যুৎপ্রবাহ কেমন ভাবে দেহের মধ্যে কাজ করে, একটি উদাহরণ দিলে তা বোঝা যাবে। ধরা যাক, শ্রামের পায়ে রাম একটা চিমটি কাটলো। শ্রামের পায়ে ঐ অংশের স্নায়ুকোষগুলির ভিতর ও বাইরের মধ্যে যে বিভব-বৈষম্য, তার তখন পরিবর্তন ঘটলো এবং সে ক্ষেত্রে বিদ্যুৎপ্রবাহ উৎপন্ন হলো। অতঃপর ঐ সব কোষের পার্শ্ববর্তী কোষগুলিরও ভিতর ও বাইরের বিভব-বৈষম্যের পরিবর্তন হয়ে সেগুলির মধ্য দিয়েও বিদ্যুৎপ্রবাহ চালিত হলো। এইভাবে বিদ্যুৎপ্রবাহ শেষ পর্যন্ত মস্তিষ্কে গিয়ে পৌঁছলো এবং তখনই কেবল চিমটির অসুস্থতি শ্রামের বোধগম্য হলো। অতঃপর শ্রামের মস্তিষ্ক যদি মনে করে যে, তার ডান হাত দিয়ে পায়ে একটু হাত বুলিয়ে নিলে ভাল হয়, তাহলে বিদ্যুৎপ্রবাহ মারফৎ মস্তিষ্কের আদেশ গিয়ে পৌঁছবে ডান হাতের এমন সব স্নায়ুতে, যাদের সক্রিয়তায় ডান হাতটি পায়ে হাত বুলাতে থাকবে।

### জৈব বিদ্যুৎ ও রোগ-নির্ণয়

প্রাণিদেহে নিরন্তর স্রুৎস্পন্দন হচ্ছে। এর ফলে বিদ্যুৎপ্রবাহ চলাচলের মাধ্যমে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে অনবরত বিদ্যুৎতরঙ্গের সৃষ্টি হয়। কোন লোকের হাতের কজি বা পায়ে গোড়ালিতে ছোট ছোট ধাতব পাত রাখলে সেগুলি তড়িৎদ্বার হিসাবে কাজ করে এবং তাদের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎতরঙ্গ অসুযায়ী সঙ্কেত পাওয়া যায়। যে যন্ত্রে এই সঙ্কেত লিপিবদ্ধ করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাফ (Electro-cardiograph)। তড়িৎদ্বার থেকে পাওয়া সঙ্কেত ঐ যন্ত্রে ইলেকট্রনিক অ্যাম্প্লিফায়ারের সাহায্যে পরিবর্ধিত করে সেই পরিবর্ধিত সঙ্কেতের দ্বারা একটি বিশেষ কলমের গতি নিয়ন্ত্রিত করা হয়। আবার যন্ত্রটির এক বিশেষ ব্যবস্থার—একটি কাগজের বাণ্ডুল থেকে ক্রমাগতই কাগজ বেরিয়ে এসে ঐ কলমের মুখের ঠিক তলা দিয়ে সমান গতিতে সরে যেতে থাকে। এই ব্যবস্থায় ঐ কাগজের উপর যে রেখাচিত্র অঙ্কিত হতে থাকে, তা কলমের গতির উপর নির্ভর করে। আবার ঐ কলমের গতি নির্ভর করে বৈদ্যুতিক সঙ্কেতের উপর—যে সঙ্কেত উৎপন্ন হয়েছে স্রুৎস্পন্দনজনিত বিদ্যুৎতরঙ্গ অসুযায়ী। সুতরাং রেখাচিত্রটি ঐ তরঙ্গের প্রকৃতি নির্দেশ করে। এই চিত্রকে বলা হয় ইলেকট্রোকার্ডিওগ্রাম

(Electrocardiogram)—সংক্ষেপে ECG বা EKG। জংপিণ্ড হৃদযন্ত্র থাকলে ECG-এর প্রকৃতি একটি নির্দিষ্ট ধরনের হয়। কোন রোগ থাকলে ECG-এর প্রকৃতি পরিবর্তিত হয়ে যায়। ECG দেখে চিকিৎসক বুঝতে পারেন, জংপিণ্ডের কোন রোগ আছে কি না। কোন রোগ থাকলে ECG পরীক্ষা করে চিকিৎসক বহু ক্ষেত্রেই রোগটি নির্ণয় করতে পারেন।

আমাদের মস্তিষ্কের বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্তে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হয়, তার নাম ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাফ (Electroencephalograph)। এই যন্ত্র থেকে যে রেখাচিত্র পাওয়া যায়, তাকে বলা হয় ইলেকট্রোএনসেফালোগ্রাম (Electroencephalogram)—সংক্ষেপে EEG। স্নায়বিক রোগ নির্ধারণে EEG-এর বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। আমাদের পেশী, চোখ বা চোখের রেটিনার বিদ্যুৎতরঙ্গ লিপিবদ্ধ করবার জন্তেও পৃথক পৃথক যন্ত্র নির্মিত হয়েছে।

### অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্স

আমাদের দেহের ভিতরের বিদ্যুৎতরঙ্গ ইত্যাদি পরীক্ষা করে দেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অবস্থা বুঝতে পারা যায়। যখন কোন গুরুতর অস্ত্রচিকিৎসা চলতে থাকে, তখন দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা চিকিৎসকের সব সময়েই জানা দরকার। এই ব্যাপারে ইলেকট্রনিক্স তাঁকে বখেটে সাহায্য করে। এর একটি চমকপ্রদ দৃষ্টান্তের কথা বলি। জংপিণ্ড উন্মুক্ত করে যখন অস্ত্রোপচার করা হয়, তখন রোগীর দেহের অবস্থা ক্রমাগত নির্ধারণ করবার জন্তে উন্নত চিকিৎসা-পদ্ধতিতে যে যন্ত্র ব্যবহার করা হচ্ছে, তাতে রোগীর জংপিণ্ডের গতি, রক্তের চাপ প্রভৃতি চব্বিশটি বিভিন্ন বিষয় একই সঙ্গে নির্ণয় করা হতে থাকে। টেপ-রেকর্ডারে যে টেপ বা কিতা ব্যবহার করা হয়, সেই রকম কিতায় ঐ সব তথ্য সঞ্চিত হতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যার মাধ্যমে কতকগুলি বোর্ডের উপর সেগুলি প্রদর্শিত হয়। চিকিৎসক ঐ বোর্ডগুলির দিকে একবার তাকিয়েই রোগীর দেহের আভ্যন্তরীণ অবস্থা সম্যক জানতে পারেন। প্রতি আধ সেকেন্ডে অন্তর অন্তর বোর্ডের সংখ্যাগুলি পাণ্টে যেতে থাকে। কলে রোগীর অবস্থার যদি কোন পরিবর্তন হয়, তা প্রায় তখনই চিকিৎসকের নজরে পড়ে। এছাড়া রোগীর জংস্পন্দনের শব্দ পরিবর্তিত করে চিকিৎসককে শোনাবার ব্যৱস্থা থাকে। কোন সময় যদি ঐ শব্দ অস্বাভাবিক বলে চিকিৎসকের মনে হয়, তিনি পাঁচ মিনিট আগেকার শব্দের সঙ্গে তখনই তা তুলনা করে দেখতে পারেন। যে কিতার উপর ঐ শব্দের সঞ্চিত ধরা থাকছে, সেটির পাঁচ মিনিট আগেকার অংশ আবার বাজালেই পাঁচ মিনিট আগের শব্দ তিনি এখন কের শুনতে পারেন। অস্ত্রোপচারের বিভিন্ন পর্যায়ে রোগীর অবস্থা কেমন থাকছে এবং সেই

অজ্ঞাবাহী চিকিৎসার কোন হেরকের করতে হবে কি না, চিকিৎসক এইভাবে যন্ত্রের সাহায্যে তা বুঝতে পারেন। কঠিন অস্ত্রোপচারের সময় চিকিৎসকের সহকারী হিসাবে ঐ যন্ত্রের গুরুত্ব তাই অপরিণীম।

জ্বংপিণ্ডের উপর অস্ত্রোপচারের ক্ষেত্রে অনেক সময় স্বাভাবিক জ্বংপিণ্ড ও ফুস্ফুসকে অচল করে তার পরিবর্তে 'হার্ট-লাং' যন্ত্র (533 পৃষ্ঠা ৯৫৮) নামে একটি অত্যন্ত চর্ষ যন্ত্র ব্যবহার করা হয়। অস্ত্রোপচার চলবার সময় এই যন্ত্রটি দেহের বাইরে থেকেই জ্বংপিণ্ড ও ফুস্ফুসের কাজ সঠিকভাবে করে যায়। এই যন্ত্রের জন্তে যে নিখুঁত নিয়ন্ত্রণ-ব্যবস্থা দরকার, তা সম্ভব হয়েছে ইলেকট্রনিক্সের যথাযথ প্রয়োগে।

### বিবিধ

কোন রোগীর জ্বংপিণ্ডের অবস্থা খুবই আশঙ্কাজনক হলে ক্রমাগত সেই অবস্থা নির্ধারণ করবার জন্তে ইলেকট্রনিক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ংক্রিয় ব্যবস্থা থাকে। যদি অবস্থা গুরুতর হয়, তাহলে তা তৎক্ষণাৎ চিকিৎসককে জানাবার জন্তে বাস্তবিক ব্যবস্থাতেই একটি ঘটা বাজতে থাকে বা একটি আলো জ্বলে ওঠে।

জন্মরোগের কালে যদি কোন রোগীর জ্বংপিণ্ডের স্বাভাবিক স্পন্দন ব্যাহত হতে থাকে, তবে সেটা তার দেহের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক। এরকম রোগীর জন্তে ক্ষুদ্র জ্বংস্পন্দন-সহায়ক যন্ত্র (পৃ: 619) নির্মিত হয়েছে। সামান্য অস্ত্রোপচার করে এই ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে বক্ষচর্মের নীচে বসিয়ে তার দিয়ে একে জ্বংপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। ব্যাটারী-চালিত এই যন্ত্রটি বৈদ্যুতিক শক্তি দিয়ে জ্বংপিণ্ডকে তার স্বাভাবিক স্পন্দন বজায় রাখতে সাহায্য করে। এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার এখন প্রতি বছর কয়েক হাজার করে বাড়ছে।

বাঁধা কানে কম শোনে, তাঁদের জন্তে এমন ইলেকট্রনিক যন্ত্র প্রস্তুত হয়েছে, যা আকারে ক্ষুদ্র হলেও শব্দকে যথেষ্ট পরিবর্তিত করে তাঁদের শুনতে সাহায্য করে। বাঁধের কোন অজ্ঞহানির কালে কৃত্রিম অঙ্গ ব্যবহার করতে হয়, তাঁদের ঐ অঙ্গের সঞ্চালন নিয়ন্ত্রিত হয় ইলেকট্রনিক ব্যবস্থায়।

দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গহ্বর আছে, তাদের কোনটির মধ্যে কোন ভাঙচুর ঘটেছে কি না বা কোড়াজাতীয় কোন কিছুর উৎপত্তি হয়েছে কি না—দেহের বাইরে থেকেই এই সব নির্ণয় করবার জন্তে আলোকাল শব্দোত্তর (Ultrasonic) তরঙ্গ ব্যবহার করা হয়। বিশেষতঃ মাথার মধ্যে কোড়া হলে তা নির্ধারণ করবার পক্ষে এই তরঙ্গ অত্যন্ত উপযোগী। শব্দোত্তর তরঙ্গের প্রকৃতি সাধারণ শব্দ-তরঙ্গের মত, তবে এর কম্পনাঙ্ক অপেক্ষাকৃত বেশী। এই তরঙ্গ আমাদের দেহের মধ্যে সহজেই প্রবেশ

করতে পারে। শল্যোত্তর তরঙ্গের উৎপত্তি ও প্রয়োগের মূলে রয়েছে ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি।

ঐ যে মাথার মধ্যে কোড়ার কথা বলা হলো, ওটা দেহের পক্ষে অত্যন্ত বিপজ্জনক হতে পারে। বর্তমানে এর চিকিৎসা অপেক্ষাকৃত সহজ হয়েছে লেসার নামক



চুৎপান-সহায়ক যন্ত্র

এই ক্ষুদ্র ইলেকট্রনিক যন্ত্রটিকে রোগীর বক্ষস্থলের নীচে বসিয়ে তার নিচে একে চুৎপিণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত করে রাখা হয়। বর্তমানে কেবল আমেরিকাতেই প্রায় ১২,০০০ লোক এই যন্ত্র ব্যবহার করেন।

এক ধরনের যন্ত্রের সহায়তায়। লেসার থেকে যে শক্তিশালী আলোকরশ্মি পাওয়া যায়, তাকে মাথার মধ্যে পাঠিয়ে কোড়া নষ্ট করে ফেলা সম্ভব হচ্ছে। তাছাড়া লেসার-রশ্মি প্রয়োগে চোখের রেটিনার হিন্ন স্নায়ু জোড়া দেবার মত সূক্ষ্ম কাজও এখন করতে পারা যাচ্ছে।

গোণ নির্ণয়ের জন্তে নানারকম যন্ত্রপাতির কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। ইলেকট্রনিক কম্পিউটার নামে যে যন্ত্র আছে, তা আবার অন্তর্ভাবে চিকিৎসককে

রোগ নির্ণয়ে সাহায্য করে। কোন রোগে কি কি উপসর্গ দেখা দেয়, সেই বিষয়ে যত তথ্য জানা আছে, তা সব কম্পিউটারে সঞ্চিত করা থাকে। কোন রোগীর ক্ষেত্রে উপসর্গগুলি দেখে কম্পিউটারকে জানালে কম্পিউটার সেগুলিকে বিভিন্ন রোগের বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে মিলিয়ে অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সঠিক রোগটি নির্ণয় করে জানিয়ে দেয়। কোন কোন ক্ষেত্রে রোগ নির্ণয়ের জন্যে বহু বইপত্র ঘেঁটে চিকিৎসককে যে সময় ব্যয় করতে হয়, কম্পিউটারের সাহায্য পেলে তার আর দরকার হয় না।

কোন রোগীকে প্রয়োজনমত অচেতন করার জন্যে ক্লোরোফর্ম ব্যবহারের কথা তোমরা বোধ হয় শুনেছ। এখন কিন্তু রোগীর মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠিয়েও তাকে অচেতন করার ব্যবস্থা হয়েছে। এতে রোগীর কোন রকম কষ্ট হয় না। ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ বন্ধ করে দিলেই আবার রোগীর চেতনা ফিরে আসে। যে যন্ত্রের সাহায্যে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহ পাঠানো হয়, তার নাম ইলেকট্রোঅ্যানাস্থেসিয়া (Electroanaesthesia)। এই যন্ত্র আমাদের দেশেও বর্তমানে প্রস্তুত হচ্ছে।

বস্তুতঃ চিকিৎসার ক্ষেত্রে ইলেকট্রনিক্সের ব্যবহার এত বেড়ে গেছে যে, নানারকম ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া কোন আধুনিক হাসপাতালের কথা এখন প্রায় ভাবাই যায় না।

অরুণ বসু

\*সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, কলিকাতা-9

## নাইলনের জাল

নাইলন, টেরিলিন, ডেক্রনের নাম আজ সকলের মুখে। আমাদের নিত্য পরিধেয় জামা-প্যাঁট থেকে শুরু করে নানারকম সৌধিন জব্যও আজকাল প্রস্তুত হচ্ছে এগুলি থেকে। তোমরা শুনলে অবাক হবে, সম্প্রতি নাইলন থেকে মাহ ধরবার সূতা ও জাল তৈরি হচ্ছে। অবশ্য দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর থেকে পাশ্চাত্য দেশে নাইলনকে মাহ ধরবার জাল তৈরির কাজে অল্পবিস্তর লাগানো হয়েছে।

এই নাইলন হচ্ছে পলিঅ্যামাইড গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত এক রকম রাসায়নিক তত্ত্ব। প্রথমে এই তত্ত্বের নাম ছিল 'পলিমার 66'। এত প্রয়োজনীয় নাইলন কিন্তু হঠাৎ একদিনে আবিষ্কৃত হয় নি। এই নাইলন আবিষ্কারের কাজে যৌথভাবে অগ্রসর হয়েছিলেন আমেরিকা এবং যুক্তরাজ্যের বিজ্ঞানীরা। আমেরিকার অন্তর্গত New York থেকে NY এবং যুক্তরাজ্যের London-এর Lon মিলিয়ে NYLON শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। বর্তমানে সৌধিন জব্যের প্রস্তুতি ছাড়াও মাহ ধরবার জন্যে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে নাইলন তত্ত্বকে কাজে লাগানো হচ্ছে।

পরীক্ষা করে দেখা গেছে, মাহ ধরবার জন্তে যে সব নুতা ব্যবহৃত হয়, তার মধ্যে নাইলনের নুতাই সবচেয়ে শক্ত। শুধু তাই নয়, নাইলনের নুতাকে টানলে স্প্রিংয়ের মত লম্বায় বেড়ে যায় আর আয়তনেও কমে যায়। তাছাড়া নাইলনের নুতা ওজনেও খুব হালকা। তাই এই নুতা থেকে তৈরী জাল মাহ ধরবার ব্যাপারে খুবই উপযোগী। নাইলন নুতার ধারণশক্তি খুব বেশী, তবে এই ধারণশক্তি ঘনত্ব প্রতি 6 থেকে 7 গ্রামের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। নাইলনের নুতা নানানরকম ধকল সহ্য করতেও সক্ষম। সমুদ্রের প্রচণ্ড স্রোত, তরঙ্গবিক্ষুব্ধ সমুদ্রের জলের মধ্যে মাহের লড়াই সহ্য করার ক্ষমতাও আছে এই নুতার। উচ্চ প্রসারণ ক্ষমতার দরুণই নাইলনের নুতা এত গুণের অধিকারী। অথচ সাধারণ নুতাকে আর একটু টানলেই লম্বা হওয়া তো দূরের কথা, ছিঁড়ে যাবে। আবার অস্ত্রাস্ত্র নুতার তুলনায় নাইলনের নুতা খুবই মসৃণ।

আগেই বলেছি, নাইলনের নুতা অস্ত্রাস্ত্র নুতার চেয়ে অনেক হালকা, কারণ এর আপেক্ষিক গুরুত্ব 1.14। ফলে নাইলনের তৈরী বড় বড় জাল বয়ে নিয়ে যেতে জেলেদের কোন কষ্টই হয় না। অথচ সাধারণ নুতা দিয়ে ঐ আকারের জাল তৈরী হলে জালের আয়তন যেমন বড় হবে, তেমনি ভারীও হবে খুব। তবে নাইলনের জালের অনুবিধা হলো—এই জাল খুব-আন্তে আন্তে জলে ডোবে আর জালটাকে জলে ছুড়ে দেবার পর নির্দিষ্ট জায়গায় সঠিকভাবে নাও পড়তে পারে। ফলে মাহ ধরায় দেরী হয়। তেমনি আবার অনুবিধাও আছে। অস্ত্রাস্ত্র নুতার চেয়ে নাইলন কম জল শোষণ করে। ফলে জালকে এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় টেনে নিতে কম পরিশ্রম হয় ও জাল খুব তাড়াতাড়ি শুকিয়ে যায়।

নাইলনের নুতা অশেষ গুণের অধিকারী। এই নুতা খুব মসৃণ আর আকারেও বেশ সরু। তাই নাইলনের জাল দিয়ে মাহ ধরবার খুব সুবিধা, কারণ মাহ সহজে এই জালকে দেখতে পায় না। আর মসৃণতার জন্তে জালের কোথাও গেরো পড়লে একটু টান দিলেই খুলে যায়। নাইলনের তৈরী জাল খুব দীর্ঘস্থায়ী, অথচ বেশ বেশ কিছুদিন কেলে রাখলেও সহজে নষ্ট হয় না। অথচ সাধারণ নুতার জাল সামান্য অথচই অকেজো হয়ে পড়ে। নাইলনের জালের গায়ে কোন প্রলেপ দেবার প্রয়োজন হয় না। তীব্র সূর্যের আলোর কিছুক্ষণ কেলে রাখলেই নাইলনের জাল শুকিয়ে যায়। তবে বেশীক্ষণ রাখলে জাল নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

আমাদের দেশে মাহ ধরবার জন্তে নাইলনের জাল তৈরী করার প্রচেষ্টা প্রাথমিক স্তরে সীমাবদ্ধ। বর্তমানে Central Institute of Fisheries Technology (C.I.F.T.) এই জালকে আরও উন্নত করে তোলবার জন্তে গবেষণা চালিয়ে যাচ্ছেন। আজকাল নাইলনকে বিভিন্ন প্রয়োজনীয় কাজেও লাগানো হচ্ছে।

## সৌরজগতে প্রাণের সন্ধানে

500 বছর আগেও বাসভূমি পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের ধারণা পরিষ্কার ছিল না। প্রথমতঃ, পৃথিবীটা গোল বটে, তবে খালার মত না বলের মত? 230 খৃষ্টপূর্বাব্দে গ্রীক দার্শনিক অ্যারিস্টারকাস পৃথিবী সূর্যের চারদ্বারে ঘুরছে বলেও উল্লেখ করেন। ধারণাটাই চালু ছিল। কারণ সাধারণভাবে সূর্য, চন্দ্র নিয়ে সমস্ত আকাশটাই যেন পৃথিবীর চারদ্বারে ঘুরছে বলে মনে হয়। তেমনি পৃথিবীর বাইরে মহাকাশ, তথা মহাবিশ্ব কত দূর বিস্তৃত, সে সম্পর্কেও ধারণা পরিষ্কার ছিল না।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রায় শুরু থেকে গ্যালিলিও (1610 খৃষ্টাব্দে) যখন প্রথম স্বনির্মিত দূরবীন বা টেলিস্কোপ দিয়ে চাঁদকে দেখে বুঝতে পারলেন যে, চাঁদ যেন আসলে আর একটা ছোট পৃথিবী এবং বৃহস্পতি গ্রহের আবার চারটি চাঁদ আবিষ্কার করলেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বিশাল মহাবিশ্ব এবং তার মধ্যে সৌরজগৎ ও পৃথিবী সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান বহু দূর এগিয়ে গেছে।

### মহাবিশ্ব ও সৌরজগৎ

সূর্যের চারদ্বারে উপবৃত্তাকারে ঘুরছে নয়টি গ্রহ—সূর্য থেকে যথাক্রমে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, (এগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট গ্রহ), তারপর বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস ও নেপচুন (এগুলি বেশ বড় আকারের গ্রহ) এবং সব শেষে প্লুটো—এটা আকারে আবার পৃথিবীর মত।

সূর্য আসলে একটি মাঝারি আকারের নক্ষত্রের মত। সূর্যের চেয়ে বড় এবং ছোট, নানা রকমের প্রায় দেড়-শ' কোটি নক্ষত্র নিয়ে একটি বিরাট তারকাজগৎ বা গ্যালাক্সি—একটি দ্বীপপুঞ্জের মত, যেটি নিজের চারদ্বারে নিজে ঘুরছে।

আমাদের তারকাজগতের মত এই রকমের অগণতি তারকাজগৎ ছড়িয়ে আছে, যাদের নিয়ে মহাবিশ্ব।

এই বিশাল মহাবিশ্ব সসীম কি অসীম, তা নিয়ে অবশ্য তর্কের মীমাংসা হয় নি। তবে আমাদের দৈনন্দিন জীবনের অভিজ্ঞতার অসীম বা অনন্ত বলতে বাধা নেই। তোমরা জানে গোঁধ হয়, মহাকাশের দূরত্ব আলোর গতিবেগ দিয়ে মাপা হয়।

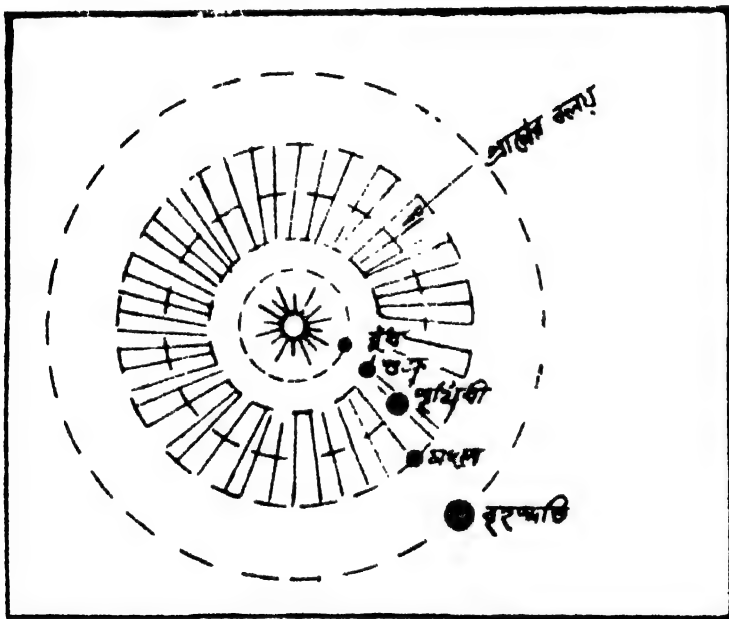
আলো দৌড়য় প্রতি সেকেন্ডে 1.86,000 মাইল—সর্বাধিক দ্রুতগামী বস্তু, এত গতিবেগ আর কারোর নেই। আলো এক বছরে চলে যায় প্রায়  $6 \times 10^{13}$  মাইল বা ছয়ের পিঠে বারোটা শূন্য দিলে বে অঙ্কটা হয়, তত মাইল। একে বলা হয় এক আলোক-বছর।

মহাবিশ্বে আমরা ৪০০ কোটি আলোক-বছর দূরেও নক্ষত্রমণ্ডলীর সন্ধান পেয়েছি; তার তুলনায় সূর্য থেকে পৃথিবীতে আলো আসতে সময় লাগে মাত্র ৯ মিনিট (বা দূরত্ব ৯ আলোক-মিনিট), সূর্য থেকে মঙ্গলের দূরত্ব মাত্র ৫ আলোক-ঘণ্টা। তাহলে ৪০০ কোটি বছরের তুলনায় ৫ ঘণ্টা যতটুকু মাত্র সময়, সঙ্গ্রহ মহাবিশ্বের তুলনায় আমাদের সৌরজগৎ মাত্র ততটুকু।

### প্রাণের বলয়

এখন প্রশ্ন উঠছে, বিশেষ করে আজ যখন আমরা মহাকাশে সবে যাওয়া শুরু করেছি—এই বিশাল মহাবিশ্বে প্রাণ কি একমাত্র আমাদের এই ছোট্ট গ্রহ পৃথিবীতেই সৃষ্টি হয়েছে? প্রশ্নটির জবাব বৈজ্ঞানিক যুক্তি দিয়ে বিচার করা যেতে পারে।

প্রথমে দেখা যাক, প্রাণ সৃষ্টি কি করে সম্ভব? প্রাণ সৃষ্টির মূলে রয়েছে কার্বন



### প্রাণের বলয়

সূর্য থেকে গ্রহগুলির গড় দূরত্ব : বুধ—৩½ কোটি মাইল, শুক্র—৬½ কোটি মাইল, পৃথিবী—৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল, মঙ্গল—১৪ কোটি মাইল, বৃহস্পতি—৪৮ কোটি মাইল।

পদার্থের (Element) সমস্ত পদার্থের সঙ্গে জোট বাঁধবার প্রাণ অস্বল্প ক্ষমতা। আর এই জোট বাঁধবার জন্তে প্রয়োজন একটা সমপরিমাণের তাপমাত্রা—খুব বেশী গরম বা ঠাণ্ডা, কোনটাই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অনুকূল নয়।

আচ্ছা, আমাদের সৌরজগতে তাপের উৎস নিশ্চয়ই সূর্য। তাহলে সূর্য থেকে কত



খানি দূরত্বে থাকলে কতটুকু তাপ পাওয়া যাবে, বাত্রে কার্বন পদার্থের জোট বেঁধে প্রাণসৃষ্টি সম্ভব, সেটা আমরা সহজেই হিসাব করতে পারি।

সূর্য থেকে সবচেয়ে কাছেই এই বৃথ রয়েছে  $3\frac{1}{2}$  কোটি মাইল দূরে (সব গড়-পড়তা হিসাব এখানে দেওয়া হচ্ছে)। খুবই গরম প্রাণসৃষ্টির পক্ষে। তারপর রয়েছে শুক্র  $6\frac{1}{2}$  কোটি মাইল দূরে, পৃথিবী 9 কোটি 30 লক্ষ আর মঙ্গল 14 কোটি মাইল দূরে। সূর্যের  $6\frac{1}{2}$  কোটি থেকে 14 কোটি মাইল দূরত্বে এই অঞ্চলটিই প্রাণসৃষ্টির পক্ষে উপযুক্ত তাপমাত্রা পেয়ে থাকে। এই এলাকাটিকে তাহলে আমরা সৌরজগতের ‘প্রাণের বলয়’ বা ‘লাইফ বেল্ট’ বলতে পারি। মঙ্গলের পরে 48 কোটি মাইলে বৃহস্পতি—খুবই ঠাণ্ডা, তার পরে পরে শনি, ইউরেনাস, নেপচুন ও প্লুটোর দূরত্বও অনেক বেশী এবং দারুণ ঠাণ্ডাও বটে।

### পৃথিবীর দুই প্রতিবেশী

তাহলে আমরা দেখলুম ‘প্রাণের বলয়’ এলাকার এক প্রান্তে, সূর্য থেকে  $6\frac{1}{2}$  কোটি মাইল দূরে রয়েছে শুক্র, অল্প প্রান্তে 14 কোটি মাইল দূরে রয়েছে মঙ্গল; আর এই এলাকার একেবারে প্রায় মধ্যে বা কেন্দ্রে, সূর্য থেকে 9 কোটি 30 লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে পৃথিবী। প্রাণের সৃষ্টি ও তার লীলার জন্তে পৃথিবী যে বিশেষ যোগ্যতম স্থানে রয়েছে, সেটা তাহলে বোঝা গেল।

এখন দেখা যাক, পৃথিবীর একদিকে শুক্র অল্পদিকে মঙ্গলে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে কিনা?

শুক্র : এতদিন একটা চালু ধারণা ছিল যে, শুক্রে হয়তো প্রাণের প্রভাব বা নাট্যলীলার সবে শুরু হয়েছে। কারণ, শুক্রগ্রহকে ঘিরে রয়েছে ঘন পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি মেঘ। এখন পৃথিবীতেও প্রাণের প্রভাবে অক্সিজেন মুক্ত অবস্থায় ছিল না, ছিল কার্বন ডাই-অক্সাইড। উদ্ভিদজাতীয় প্রাণ, তথা গাছপালা, অরণ্যানী যেমন যেমন গড়ে উঠেছে, তেমনই তারা কার্বন ডাই-অক্সাইডকে সূর্যালোকের সাহায্যে শুবে নিয়ে অক্সিজেন রূপে ফেরৎ দিয়েছে। প্রক্রিয়াটির নাম দেওয়া হয়েছে আলোক-সংশ্লেষণ (Photosynthesis)।

পৃথিবীর আকাশে বা বায়ুমণ্ডলে আজ যে শতকরা 21 ভাগ অক্সিজেন রয়েছে, সেটা তার জন্মের শুরু থেকেই ছিল না; পরে এসেছে—যেমন যেমন উদ্ভিদজাতীয় প্রাণের বিকাশ হয়েছে।

আবার এটাও ঠিক যে, আমরা পৃথিবীর 300 কোটির বেশী মানুষ যে পরিমাণ অক্সিজেন শ্বাসের সঙ্গে গ্রহণ করে নিঃশ্বাসের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইডরূপে পরিত্যাগ করি, তাতে কিছুদিনের মধ্যে নিশ্চয়ই পৃথিবীর বায়ুমণ্ডল আর অক্সিজেন না থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইডে ভর্তি হয়ে যাওয়া উচিত ছিল। হচ্ছে না, কারণ আমাদের

নিঃবাসের সঙ্গে নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডকে উদ্ভিদে গ্রহণ করে আবার অক্সিজেনরূপে ফেরৎ দিচ্ছে।

কাজেই শুক্রগ্রহের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলে পুঞ্জ পুঞ্জ কার্বন ডাই-অক্সাইড ভর্তি যেম দেখে সেখানে প্রাণের নাট্যলীলার প্রথম অঙ্ক সবে শুরু হয়েছে—এরকম ধারণা করা কিছু অধৌক্তিক ছিল না। মনে হয়েছিল যে, ঐ ঘন কার্বন ডাই-অক্সাইড মেঘের (বাক্য তেন করে আমাদের টেলিস্কোপের দৃষ্টি চলে না) তলায় রয়েছে ঘন বাষ্পাকুল অরণ্যানী, হয়তো বা প্রাণের ক্রমবিবর্তনের সিঁড়ির আর এক ধাপ উপরে পৃথিবীর জুরাসিক যুগের অতিকায় প্রাণীরও উদ্ভব ইতিমধ্যেই হয়েছে।

মঙ্গল: মঙ্গলের আকাশ বেশ পরিষ্কার, অক্সিজেন নেই, তার জমির চেহারা লাল; বোকা গেছে, মঙ্গলের জমিটা যেন মরচে-পড়া লাল (ফেরাস অক্সাইড)। আসলে মঙ্গলের আকাশ বা বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনকে শুধে নিয়েছে মঙ্গলের জমি, তাতেই মরচে-পড়া লাল রঙের চেহারা। প্রসঙ্গতঃ, মঙ্গলকে খালি চোখে দেখলেও মনে হবে যেন একটি মাঝারী আকারের লাল 'ভারকা'র মত; অবশ্যই 'ভারকা' নয়, গ্রহ—কারণ মঙ্গলের নিজের কোন আলো নিশ্চয়ই নেই।

যাই হোক, মরচে-পড়া গ্রহ মানে বুড়ো গ্রহ, অর্থাৎ মঙ্গলের প্রাণের নাট্যলীলার পঞ্চম বা শেষ অঙ্ক আজ অভিনীত হচ্ছে। এটা আশো বোঝা যায়, যখন টেলিস্কোপে দেখি, মঙ্গলের গ্রীষ্মকালে তার মেরুপ্রদেশের বরফ ঢাকা সাদা টুপি আস্তে আস্তে মিলিয়ে যায় বা গলে যায় এবং একটা পূর রং মঙ্গলের বিযুবরেখার অঞ্চলকে ছেয়ে ফেলে।

অবশ্য এক সময়ে মঙ্গলের মেরুপ্রদেশ থেকে বিযুবরেখা অবধি দাগ টানা হয়েছে দেখে প্রথমে ইতালিয়ান সিয়াপেরেলি, পরে প্রফেসর লাওয়েল টমাস ভেবেছিলেন যে, ওগুলি বিরাট খালের দাগ। সিয়াপেরেলি 'খাল' বলতে বুঝিয়েছিলেন প্রকৃতির হাতে-গড়া খাল। লাওয়েল টমাস বলতে চেয়েছিলেন, না ওগুলি কৃত্রিম। মঙ্গলে জলের একান্ত অভাব বলে তার বুদ্ধিমান প্রাণীরা বিরাট খাল খনন করে মেরুপ্রদেশ থেকে বিযুবরেখা অবধি সারা মঙ্গলগ্রহের গোলক জুড়ে খাল খনন করে রেখেছে। আজকে অবশ্য এই চিন্তাকর্ষক মতটি বাতিল।

তথাপি মঙ্গলের গ্রীষ্মে তার বিযুবরেখাতে পূর রঙের বিস্তার দেখে সেখানে উদ্ভিদ রয়েছে, এটা আজ প্রায় প্রমাণিত হয়েছে।

গত দশ বছর আগেও পৃথিবীর এই দুই প্রতিবেশী সম্পর্কে চিত্রটি ছিল বেশ ম্লানবদ্ধ। পৃথিবীতে প্রাণের মধ্যাহ্ন; তার একদিকে (সূর্যের দিকে) শুক্রে প্রাণের প্রত্যুষ, অতীতকে মঙ্গলে প্রাণের সন্ধ্যা।

কিন্তু এখন মাহুঘের তৈরি স্বয়ংক্রিয় মহাকাশ যানগুলি শুক্রে পৌঁছে খবর পাঠিয়েছে, সেখানকার তাপমাত্রা প্রাণসৃষ্টির পক্ষে অত্যন্ত বেশী, 400° ডিগ্রী সেন্টিগ্রেড

বা আরো বেশী। অতএব শুক্রে এখনও প্রাণের যবনিকার উন্মোচন হয় নি, এটাই বলতে হবে। তেমনি মঙ্গলের বায়ুমণ্ডলে মনে হচ্ছে হিটেকোঁটাও নাইট্রোজেন নেই। তাহলে অবশ্য সেখানে কোনদিনই প্রাণসৃষ্টি হয় নি, এটাই বলতে হয়।

অবশ্যই এই দুয়েরই আবার পাণ্টা নানা রকমের যুক্তি আছে, যার বিশদ আলোচনা করা এখানে সম্ভব নয়।

### নক্ষত্রলোকের গ্রহাস্তরে

একমাত্র পৃথিবীতেই কি তাহলে প্রাণসৃষ্টি হয়ে প্রাণের পূর্ণ বিকাশ হয়েছে? আমাদের সৌরজগতে হয়তো তাই, কিন্তু এই বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই যে, মহাকাশের প্রায় অনন্ত কোটি নক্ষত্রের মধ্যে অন্ততঃ কয়েক কোটি নক্ষত্রের ( বা সূর্যের ) চারদিকে আমাদের মত 'সৌরজগৎ' বিরাজ করছে এবং তাহলে সেই কয়েক কোটি সৌরজগতে অন্ততঃ কয়েক লক্ষ 'পৃথিবীর' ধরণের গ্রহ পাওয়া যাবে। পৃথিবীর ধরণের বলতে আমরা বোঝাচ্ছি সেই সমস্ত গ্রহগুলিকে, যারা তাদের নিজ নিজ সূর্য ( বা নক্ষত্র ) থেকে ঠিক ততখানি দূরত্বে আছে, যাতে তারা তাদের 'প্রাণের বলয়ের' একেবারে মধ্যবর্তী অঞ্চলে রয়েছে। আর পৃথিবীর ধরণের গ্রহ থাকলে সেখানে প্রাণসৃষ্টি হয়েছে এবং ক্রমবিবর্তনের ধাপে ধাপে হয়তো পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর প্রাণীর সৃষ্টি ইতিমধ্যে হয়ে গেছে।

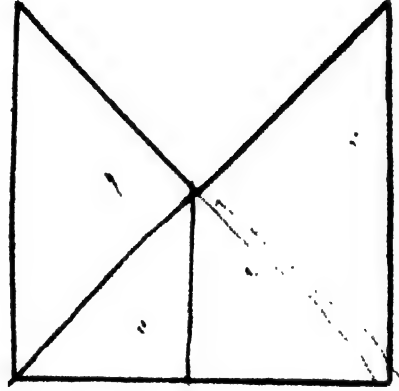
সমগ্র পৃথিবীর বয়স যেখানে সাড়ে চার-খ' কোটি বছর, প্রাণের জন্ম সেখানে দশ কোটি বছর অতীতে, আর মানুষের জন্ম তো মাত্র লাখ দশেক বছর আগে। তার মধ্যে আবার তার সত্যতার বয়স খুব বেশী হলেও দশ হাজারের বেশী নয়। কাজেই পৃথিবীর মানুষের চেয়েও উন্নততর, তথা প্রাচীনতর সভ্য প্রাণী মহাকাশের অন্তঃনক্ষত্রের অস্ত্র গ্রহে থাকা মোটেই বিচিত্র নয়। অবশ্য তাদের অস্তিত্বের কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমাদের হাতে নেই, তবে যুক্তির দিক থেকে আমাদের সেটা ধেনে নিতে হচ্ছে। হয়তো একদিন প্রত্যক্ষ যোগাযোগও তাদের সঙ্গে আমাদের হবে।

দিলীপ বসু

## ধাঁধা

1। যোগ-বিয়োগ-গুণ-ভাগ ইত্যাদি বিভিন্ন চিহ্নের (Operators) সাহায্যে 3 সংখ্যাটিকে মাত্র তিনবার ব্যবহার করে কি ভাবে 0, 1, 2,.....10 পর্যন্ত প্রকাশ করা যায়? (উদাহরণ:  $1=3^{\circ} \times 3^{\circ} \times 3^{\circ}$ )।

2। এক বৃদ্ধের চার পুত্র। বৃদ্ধের মৃত্যুর পর অত্যন্ত সমস্ত সম্পত্তিই বেশ নির্বিঘ্নে ভাগাভাগি হয়ে গেল, কিন্তু যত বিবাদ বাঁধলো, এক টুকরা জমি নিয়ে। জমিটার আকার এমনই যে, সমান চার ভাগে ভাগ করতে সকলেই বেশ হিমসিম খেয়ে গেল।



চেষ্টা করে দেখ না। সেই জমিটিকে (চিত্রে জটব্য) সমান চারভাগে ভাগ করে দিয়ে এই বিবাদের অবসান ঘটাতে পার কি না।

3। পরেশবাবু ব্যাঙ্কে গেলেন চেক ভান্ডাতে। ব্যাঙ্কের ক্যান্সার বাবু বরাবরই একটু অশ্রমবদ্ধ প্রকৃতির। তিনি ভুলবশতঃ পরেশবাবুর চেকটিতে টাকার অঙ্কটিকে পরস্পর ও পরস্পর অঙ্কটিকে টাকা হিসাবে ধরে গণগোল করে ফেললেন। আর সেই মত টাকাও দিয়ে ফেললেন পরেশবাবুকে। ফেরার পথে পরেশবাবু সেই টাকা থেকে শুধুমাত্র 20 পরস্পর দিয়ে একটা খবরের কাগজ কিনলেন। বাড়ী ফিরে পরেশবাবু টাকা-পরস্পর গুণে দেখেন যে, চেকে যে পরিমাণ অঙ্ক ছিল, ঠিক তার দ্বিগুণ অঙ্ক তাঁর কাছে রয়েছে।

চেকে প্রকৃত কি পরিমাণ অঙ্ক ছিল?

4। একটি নিরেট গোল কাঠের বলের মাঝখান থেকে ছয় ইঞ্চি লম্বা চৌকাকৃতি (Cylindrical) একটি অংশ কেটে বের করে নেওয়া হলো। বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন কত হবে? আপাতদৃষ্টিতে যদিও তোমাদের মনে হতে পারে যে, প্রশ্নটি অসম্পূর্ণ বা প্রয়োজনীয় সব তথ্য দেওয়া নেই, তবুও এর সমাধান করা সম্ভব। চেষ্টা করে দেখ না! (উত্তর 629 পৃষ্ঠায় জটব্য)।

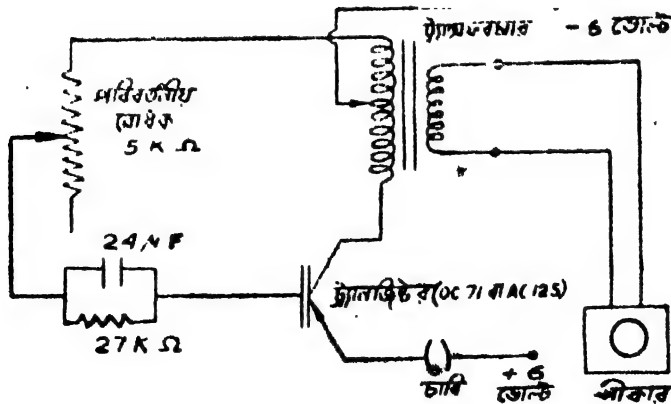
সমীরকুমার ঘোষ\*

## ৩. মজার যন্ত্র

সাধারণ বিজ্ঞান-বৃত্তিকে কাজে লাগিয়ে আজকাল দর্শকদের নতুন নতুন জিনিষ দেখানো হচ্ছে বিজ্ঞান প্রদর্শনীর অন্ততম অঙ্গ। বর্তমানে ট্রানজিস্টরের বহুল ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে বিভিন্ন বর্তনীর সাহায্যে অনেক চমকপ্রদ জিনিষ তৈরির প্রাচুর্য বেড়েই চলেছে। বিজ্ঞান প্রদর্শনীগুলিতে ট্রানজিস্টরকে কাজে লাগিয়ে চোর-ধরা, কালো-করসার মান বিচার, প্রতিবেদন শক্তি পরীক্ষা ইত্যাদি বহু যন্ত্রের মডেল তৈরি করে দেখানো হয়। এই রকম একটা যন্ত্র সম্পর্কে এখানে আলোচনা করবো।

### মাছ-ধরা যন্ত্র

বাঁশির সুরের প্রভাবে বিষধর সাপকে বশে এনে সাপুড়েনের খেলা দেখানোর সঙ্গে আমরা পরিচিত। তাছাড়াও রাখালদের বাঁশি বাজিয়ে গরুকে পোষ মানাবার উদাহরণ দেখে স্বভাবতই মনে হয় যে, জীব-জগতের উপর সুরের প্রভাব যথেষ্ট কার্যকরী। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, বিশেষ ধরনের শব্দের উদ্ভিদের উপর দিয়ে বিশেষ কম্পনাঙ্কের শব্দপ্রবাহ চালিত হলে শব্দের উৎপাদন বৃদ্ধি পায়। জলচর প্রাণীরাও পোকামাকড়ের শব্দে আকৃষ্ট হয়ে থাকে এবং এই শব্দ-সঙ্কেতকেই জলচর প্রাণীরা আহার সংগ্রহ বা প্রয়োজন অনুযায়ী আশ্রয়কার কাজে লাগায়। কাজে



কাজেই বোঝা যাচ্ছে যে, মাছের ক্ষেত্রেও বিভিন্ন কম্পনাঙ্কের শ্রুতিগোচর শব্দ আছে, যার দ্বারা তারাও আকৃষ্ট হয়। সাধারণ ট্রানজিস্টরকে বৈজ্ঞানিক বর্তনীতে কাজে

লাগিয়ে আমরা এই জাতীয় ঘটনা প্রত্যক্ষ করতে পারি, হয়তো উপযুক্ত যন্ত্রপাতির সাহায্যে প্রকৃত মাহ ধরবার কাজেও প্রয়োগ করতে পারি।

যন্ত্রটি আসলে একটা সাধারণ ঋতিগোচর আন্দোলক (Audio Oscillator)। চিত্রে বর্তনীটি বিশদভাবে দেখানো হয়েছে। কন্ডেন্সার, কুণ্ডলী, বোধক, তড়িৎ-কোষ ও একটা ট্রানজিস্টরের (OC 71 বা AC 125) সাহায্যে এই ঋতিগোচর কম্পন সৃষ্টি করা যেতে পারে। চিত্রে প্রদর্শিত পরিবর্তনীয় রোধকের সাহায্যে কম্পন-সংখ্যা কমানো বা বাড়ানো যেতে পারে। এই কম্পন ট্রান্সফরমারের মধ্য দিয়ে পরিচালিত হয়ে স্পীকারে ঋতিগোচর শব্দ উৎপন্ন করে। এইবার এই যন্ত্রের সাহায্যে মজা উপভোগ করবার জন্যে একটি বড় পাত্রে মধ্য বৃদ্ধ জলে বিভিন্ন প্রকার মাহ রেখে যদি স্পীকারটিকে পলিথিন কাগজে মুড়ে (যাতে জলে ভিজেনা যায়) ঐ পাত্রে ডুবিয়ে রাখা হয়, তাহলে আন্দোলকের কম্পনাক পরিবর্তন করলে দেখা যাবে যে, কোন বিশেষ কম্পনাকের দ্বারা কিছু মাহ আকৃষ্ট হচ্ছে। আবার কম্পনাকের পরিবর্তন করলে তারা দূরে চলে যাবে এবং অল্প জাতীয় মাহ শব্দের উৎসের দিকে আকৃষ্ট হবে। এথেকে বোঝা যায়, উৎস থেকে নির্গত বিভিন্ন কম্পনাকের শব্দ বিভিন্ন জাতের মাহকে আকর্ষণ করে। এই ব্যাপারটা খুব সহজেই পরীক্ষা করে দেখা যেতে পারে।

মহুয়া বিশ্বাস

### ধাঁধার উত্তর

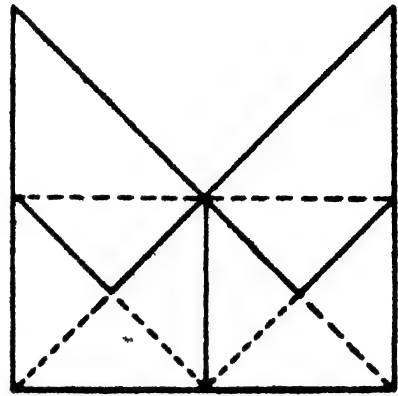
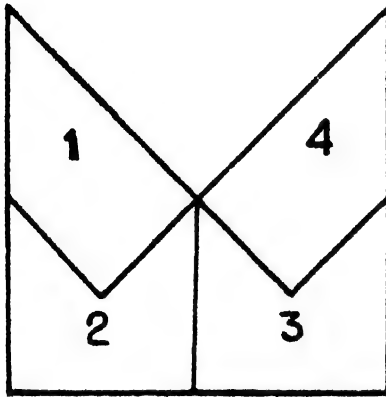
$$1. 0-3 \times (3-3), 1-3^{\circ} \times 3^{\circ} \times 3^{\circ}; 2 = 3 - \frac{1}{3}$$

$$3 = \frac{3 \times 3}{3} \text{ বা } 3^{\circ} + 3^{\circ} + 3^{\circ}; 4 = 3 + \frac{3}{3}; 5 = 3 + 3^{\circ} + 3^{\circ}$$

$$6 = 3 + \frac{3}{3^{\circ}}; 7 = 3 + 3 + 3^{\circ}, 8 = 3 \times 3 - 3^{\circ}$$

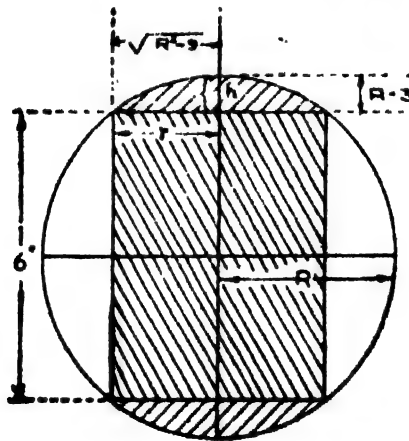
$$9 = 3 + 3 + 3; 10 = 3 \times 3 + 3^{\circ}$$

2। কমিটি ভাগ করতে হবে (ক) চিত্র অনুযায়ী। (খ) চিত্র দেখলে কমিটি ভাগ করবার কৌশলটা বুঝতে পারবে।



3। চেকে প্রকৃত অঙ্কের পরিমাণ ছিল 26 টাকা 53 পয়সা। হিসাব করে দেখলেই এই অঙ্কটি বের করতে পারা যায়।

4। নীচের চিত্র অনুযায়ী চোলাকৃতি অংশের আয়তন  $6\pi r^2 = 6\pi R^2 - 54\pi$ ।  
টুপির আকৃতির দুটি অংশের আয়তন  $\frac{2\pi h}{6} (3r^2 + h^2) = \frac{\pi}{3} (R-3) [3(R^2-9) + (R-3)^2] = \frac{1}{3}\pi R^3 - 6\pi R^2 + 18\pi$ । সুতরাং চোলাকৃতি অংশ ও টুপির আকৃতির



দুটি অংশের মোট আয়তন  $\frac{1}{3}\pi R^3 - 36\pi$ । বলের আয়তন  $\frac{1}{3}\pi R^3$  থেকে এই আয়তন বাদ দিলে বলের অবশিষ্ট অংশের আয়তন হবে  $36\pi$ , যেটা ধ্রুবক; অর্থাৎ এই অংশের আয়তন বলের আকার বা চোলায় ব্যালার উপর নির্ভর করবে না।

## প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1. কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটে কি ভাবে ?

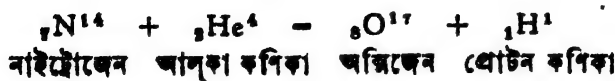
রেবা রায়, হাসানাবাদ।

প্রশ্ন 2. আকাশ কেন নীল দেখায় এবং সমুদ্রের জলই বা নীল দেখায় কেন ?

অভিজিৎ ভট্টাচার্য, ত্রিপুরা

উঃ 1. বস্তুজগতের মূলে রয়েছে পরমাণু। এই পরমাণুর কেন্দ্রে আছে কেন্দ্রীন, যার মধ্যে ধনাত্মক তড়িৎধর্মী প্রোটন ও তড়িৎ-নিরপেক্ষ নিউট্রন কণিকা অবস্থান করে। কেন্দ্রীনের বাইরে চারদিকে প্রোটনের সমান সংখ্যক কিন্তু বিপরীত অর্থাৎ ঋণাত্মক তড়িৎধর্মী ইলেকট্রন কণিকা বিভিন্ন কক্ষপথে ঘুরে বেড়াচ্ছে। পরমাণুর প্রোটনের বা ইলেকট্রনের সংখ্যা পরমাণুর পারমাণবিক সংখ্যা নির্ধারণ করে। নিউট্রন ও প্রোটনের সম্মিলিত সংখ্যা হচ্ছে পরমাণুর ভর সংখ্যা।

যে কোন পরমাণুর বৈশিষ্ট্য নির্ধারিত হয় তার পারমাণবিক সংখ্যা দিয়ে। উদাহরণস্বরূপ নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের কথাই ধরা যাক। অক্সিজেন ও নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা যথাক্রমে ৮ ও ৭। এখন বোঝা যাচ্ছে যে, যদি কোন উপায়ে নাইট্রোজেনের পারমাণবিক সংখ্যা ৮ করা যায়, তাহলেই আমরা অক্সিজেন পরমাণু পেতে পারি। হিলিয়াম পরমাণুর কেন্দ্রে রয়েছে দুটি নিউট্রন ও দুটি প্রোটন এবং বাইরের কক্ষপথে আছে দুটি ইলেকট্রন। তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকে আলফা কণিকা নির্গত হয়। এই আলফা কণিকা আর কিছুই নয়—হিলিয়াম কেন্দ্রীন অর্থাৎ একটা হিলিয়াম পরমাণু, যার বাইরের দুটি ইলেকট্রন খনিজে নেওয়া হয়েছে। রাদারফোর্ড প্রচণ্ড শক্তিশিষ্ট এই আলফা কণিকার সাহায্যে নাইট্রোজেন পরমাণুকে আঘাত করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত করতে সক্ষম হন। এই প্রক্রিয়ায় একটি প্রোটন কণিকা নির্গত হয়। প্রক্রিয়াটি সমীকরণের সাহায্যে নীচে দেখানো হলো :



এইভাবে কৃত্রিম উপায়ে আলফা কণিকার সাহায্যে বোরন, সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম প্রভৃতির রূপান্তর ঘটানো সম্ভব হয়েছে। ক্রমান্বয়ে বিজ্ঞানীদের অক্লান্ত পেষণায় আবিষ্কার হলো আরও অনেক কণিকা (প্রোটন, নিউট্রন, ডয়টেরিয়াম, পামা-রশ্মি



ইত্যাদি), যেগুলির দ্বারা পরমাণুকে আঘাত করে মৌলিক পদার্থের রূপান্তর ঘটানো সম্ভব বলে প্রমাণিত হয়েছে। তবে এই রূপান্তর ঘটাবার ক্ষেত্রে নিউট্রনের অবদানই সবচেয়ে বেশী—কেন না, নিউট্রন তড়িৎ-নিরপেক্ষ কণিকা বলে পরমাণু কেন্দ্রীর দ্বারা আকর্ষিত বা বিকর্ষিত হয় না—বা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নিউট্রন সহজেই কেন্দ্রীকে আঘাত করতে পারে। এই নিউট্রন কণিকার সাহায্যেই সাধারণ ইউরেনিয়ামকে আঘাত করে প্রাকৃতিক অক্টিবিসিটী নতুন নতুন মৌলিক পদার্থ আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমস্ত কণিকার আঘাতে পারমাণবিক বিক্রিয়া ঘটিয়ে পারমাণবিক সংখ্যার পরিবর্তন ঘটানো আজ মোটামুটিভাবে মানুষের আয়ত্তাধীন। তবে এই কৃত্রিম উপায়ে মৌলিক পদার্থের পরিবর্তন ঘটানোর ব্যাপারটা খুবই ব্যয়সাপেক্ষ।

উঃ 2. সূর্য থেকে আগত আলোকরশ্মি পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের ধূলাবালি, জলকণা ইত্যাদির দ্বারা বিচ্ছুরিত হয়ে আকাশে নীল রঙের সৃষ্টি করে। ঘনসন্নিবিষ্ট ধূলাবালি, জলকণা—এমন কি, বিভিন্ন প্রকার অণু-পরমাণুর দ্বারা আলোক বিচ্ছুরিত হবার ফলে এর তীব্রতা হ্রাস পায়। বিজ্ঞানী র্যালের তত্ত্ব অনুযায়ী এই প্রক্রিয়ার একটা ব্যাখ্যা মেলে। এই তত্ত্ব অনুসারে বিচ্ছুরণের হার আপত্তিত আলোকের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের চতুর্থ ঘাতের সঙ্গে ব্যস্তানুপাতিক।

কাজেই সূর্য থেকে আগত দৃশ্য আলোক-বর্ণালীর বেগুনী ও নীল অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত ছোট হওয়ার বেগুনী ও নীল আলো হাল্ধে এবং লাল আলোর তুলনায় বেশী বিচ্ছুরিত হয়। বেগুনী আলোর তীব্রতা নীল আলোর তুলনায় কম, তাই তীব্রতর নীল আলোকের বিচ্ছুরণে উদ্ভাসিত আকাশকেই আমরা নীল দেখি।

একইভাবে সমুদ্রের জলকণা ও সমুদ্রের জলে দ্রবীভূত বিভিন্ন বস্তুকণা আপত্তিত আলোককে বিচ্ছুরিত করার ফলে সমুদ্র নীল দেখায়।

শ্রীমানন্দ্র দে\*

\* ইনস্টিটিউট অব রেডিও কেমিস্ট্রি অ্যান্ড ইলেকট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-9।

# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

নভেম্বর, ১৯৭০

একাদশ সংখ্যা

## মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ

গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়\*

সম্প্রতি বহু আবিষ্কার বিজ্ঞান-জগৎকে নাড়া দিয়েছে। চন্দ্রাভিবান বা পরমাণু বিস্ফোরণের মত তাদের সব কয়টি সাধারণের গোচরীকৃত না হলেও বা সাধারণের মনে ঢাকলোর সৃষ্টি না করলেও এই আবিষ্কারগুলির মধ্যে এমন অনেক বস্তু আছে, যা বিজ্ঞানে বহু আকাঙ্ক্ষিত অথবা বিজ্ঞানের মূল প্রশ্নে কিছু না কিছু আলোকপাত করেছে। এই রকম একটি আবিষ্কারের নাম দেওয়া যায় মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ (Gravitational waves)। বিদ্যুত আলোচনার আগে সংক্ষেপে বিষয়টির আভাস দেওয়া যেতে পারে।

মাধ্যাকর্ষণের কথা কারও অবিদিত নয়—সব বস্তুই অল্প সব বস্তুকে আকর্ষণ করে—হৃৎ-

পৃথিবী-গ্রহাদি ভারী বস্তুর ক্ষেত্রে এই আকর্ষণ বিশেষভাবে প্রকট হয়ে ওঠে। সূর্য্যায় চলমান বস্তুর মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রে যে পরিবর্তনশীল হবে, এটা সহজেই অসম্ভব। কিন্তু এই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে আর কোনও আলোড়নের সৃষ্টি হবে কি? প্রশ্নটি বোঝাবার জন্তে একটি উপমা নেওয়া যাক। সমুদ্রের এক স্থানে একটি জাহাজ দাঁড়িয়ে থাকলে সে স্থানের কিছু জল স্থানচ্যুত হয়। জাহাজটি চলতে আরম্ভ করলে জলের স্থানচ্যুতির ক্ষেত্র পরিবর্তিত হয়, অর্থাৎ এক স্থানের জল স্থানান্তরে ফিরে আসে ও অন্য স্থানের জল স্থানচ্যুত হয়। কিন্তু এটা তির্যক একটা জিনিষও হয়—সমুদ্রের বুকে আলোড়নও

\*ইতিপূর্বে ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজি, কলকাতায়

হয়—সেখানে তরঙ্গ ওঠে। মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও ঠিক সেই প্রায়—কোনও ভারী বস্তু এক স্থান থেকে অল্পদূরীত্ব হলে পৃষ্ঠস্থানের কাছে মাধ্যাকর্ষণ কমে যায় ও নতুন স্থানে মাধ্যাকর্ষণ বাড়ে। কিন্তু তাছাড়াও এই সমুদ্রের তরঙ্গের মত আর কিছু ঘটে কি? উপরিউক্ত উপমা আশ্রয় করে আরও একটা কথা বলে নেওয়া যায়—একটি চৌবাচ্চায় একটি বড় বল অর্ধনিমজ্জিত অবস্থায় খুলে জলের উপর তরঙ্গের সৃষ্টি হয়। অল্পরূপ প্রায় মাধ্যাকর্ষণের ক্ষেত্রেও তোলা যায়—ঘূর্ণায়মান ভারী বস্তুর কাছে মাধ্যাকর্ষণঘটিত কোনও আলোড়ন ওঠে কি? নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ তত্ত্বে এরূপ কোনও আলোড়নের অস্তিত্ব ছিল না, কিন্তু আইনস্টাইনের তত্ত্বে দেখা গেল যে, ঘূর্ণায়মান দণ্ড থেকে তরঙ্গের উদ্ভব হবে। 1916 সালে আইনস্টাইন এই বিষয়ে গবেষণা করেন। পরে বিখ্যাত বিজ্ঞানী সার আর্থার এডিংটনও এই বিষয়ে গবেষণা করেন। আইনস্টাইনের তত্ত্বের স্বরূপেই সারা আপেক্ষিকতা তত্ত্বে উৎসাহী ছিলেন, এডিংটন তাঁদের মধ্যে অন্যতম। পরে আরও অনেক বিজ্ঞানী এই সম্বন্ধে তত্ত্বীয় আলোচনা করেছেন। পরীক্ষার কিন্তু এতদিন এই তরঙ্গ ধরা পড়ে নি এবং মনে করবার যথেষ্ট কারণ ছিল যে, পরীক্ষার এই তরঙ্গ ধরা অতি দুর্লভ। তবু বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ ও আকর্ষণের উপমার কথা চিন্তা করে অনেক বিজ্ঞানীই মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গে বিশ্বাস করতেন। আজ এই দুর্লভ পরীক্ষা সকল হতে চলেছে। এর কিছু বর্ণনা দেওয়াই এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য, কিন্তু তার আগে বেশ একটু ভূমিকার প্রয়োজন।

আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব দুই ভাগে বিভক্ত—বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (Special theory of relativity) ও সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব (General theory of relativity)। পরস্পরের কাছ থেকে অপরিবর্তিত বেগে অপস্থায়মান বস্তুদ্বয়ের একের দৃষ্টিতে অপরটির দৈর্ঘ্য ও সময়ের

মানের পরিবর্তন বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের মূল কথা। এরই কলে বেশ একটু ছরছর গণিত ও যুক্তি দিয়ে বোঝা যায় যে, প্রতিবেগ বাড়বার সঙ্গে সকল বস্তুই বেশী ভারী হয়ে ওঠে—সঠিকভাবে বললে তার ভর (Mass) বেড়ে যায়। দ্রুতবেগে গতিতে ইলেকট্রন-প্রোটনাদির ভর কত বাড়ে, তা খুব ভাল করে মাাপা যায় এবং এইভাবে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রতিনিয়তই পরীক্ষার প্রমাণিত হচ্ছে। এই তত্ত্বটি সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীরা এত নিঃসন্দেহ হয়েছেন যে, কণাতত্ত্ব তত্ত্বের (Quantum mechanics) সমস্ত দুইই বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কঠিনাধারে বাঁচাই না করলে তাঁরা নিশ্চিত হন না। কণাতত্ত্ব তত্ত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে আজ অতি মূল্যবান তত্ত্ব। সুতরাং কণাতত্ত্ব তত্ত্ব যে বিষয়টিকে এত গুরুত্ব দিয়েছে, তা পদার্থ-বিজ্ঞানীদের কাছে যে একান্ত প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।

এবার সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের কথাই আসা যাক। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব সম্বন্ধে পদার্থ-বিজ্ঞানীদের মনোভাব অল্প রকম। এত সর্বাঙ্গসুন্দর তত্ত্ব পদার্থবিজ্ঞান যে আর নেই, এই কথা স্বীকার করলেও এবং যে চিন্তাপ্রণালী অবলম্বন করে বিজ্ঞান-জগতের পূজনীয় আইনস্টাইন এই তত্ত্ব উপনীত হয়েছেন, তার প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাবান হলেও বিজ্ঞানীরা বলেন যে, দৈনন্দিন পদার্থবিজ্ঞানের আলোচনার আদৌ এই তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায় না। পদার্থবিজ্ঞানের তোরণে তোরণে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায়, কিন্তু সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বকে দেখা যায় না। এর কারণ, সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের বক্তব্য কি, সেটা একটু আলোচনা করলেই বোঝা যাবে—মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের পরীক্ষার গুরুত্বও সেই সঙ্গে বোঝা যাবে।

বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের পরস্পরের দৃষ্টিতে অসম বেগে গতিতে বস্তুদ্বয়ের আলোচনার

প্রায় অকম। যেখানে তারী বস্তু বর্তমান ও তার চীনে তার দৃষ্টিতে অসম বেগে অস্তিত্ব বস্তু তার দিকে এগিয়ে আসছে, সেখানে বিশেষ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য নয়—সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্ব প্রযোজ্য। সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের চিন্তাধারা আরও গভীর। এই চিন্তাধারা অঙ্গুরণ করে বুঝতে পারা যায় যে, তারী বস্তুর কাছে ‘হান ও কাল বক্রতা প্রাপ্ত হয়’। কথাটার অর্থ একটু বিশদ করবার চেষ্টা না করে উপায় নেই। আমাদের সাধারণ যাপজোখ যে ভাবে চলে, বক্রতা প্রাপ্ত দেশে তা চলে না—যাপজোখের এই নিয়ম বদলানোটাই দৃষ্টমান সত্য, বক্রতাটা একটা নাম মাত্র—এই নামের শিছনে একটা উপমা লুকিয়ে আছে, এই ভাবে বুঝলেই বোধ হয় বোঝবার সবচেয়ে সুবিধা। উপমাটা এই বলা যেতে পারে। সমতল ভূমিতে অঙ্কিত কোনও ব্যাসবিশিষ্ট বৃত্তের অন্তর্হিত কেন্দ্রকল একটি বজ্রুনের উপর অঙ্কিত সেই একই ব্যাসের অন্তর্হিত কেন্দ্রকলের বেনী হবে। কেন্দ্রকলটি কত কম হলো, তার পরিমাণ থেকে বজ্রুনের ব্যাস অর্থাৎ তার বক্রতা বোঝা যায়। আইনস্টাইনের তত্ত্ব অনুসারে তারী বস্তুর নিকটস্থ দেশে ঐ রকম যাপজোখের নিয়ম পরিবর্তিত হবে, যথা—একটি বজ্রুনের অন্তর্হিত আরতন তারী বস্তুর কাছে যা হবে, দূরে তা হবে না। এ হলো শুধু হান বা দেশের বক্রতার কথা। ‘হান-কালের বক্রতা’র অর্থ অল্পরূপভাবে এই যে, হান-কালের বক্রতা হেতুই তারী বস্তুর কাছে ছোট বস্তু আর তার দৃষ্টিতে সরলরেখার সমবেগে ধাবিত হয় না।

বহুদিন পর্যন্ত তত্ত্বটি পরীক্ষিত হওয়া সম্ভব হয়েছিল যাত্র তিনটি ক্ষেত্রে এবং সেই ক্ষেত্রেই পদার্থবিজ্ঞানের খুব কম ক্ষেত্রেই সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের দেখা পাওয়া যায়। এদের সবগুলিই মহাকাশে ঘটিত ঘটনা নিয়ে এবং যেখানে হান-কালের বক্রতা দ্বি-সেখানে। অথবা যদিও মসবয়ের একেই একটি পরীক্ষাকে পৃথিবীপৃষ্ঠতঃ

ঘটনার উপর পরীক্ষাকে সম্ভাব্যের কাছাকাছি এনেছে, তবুও হান-কালের বক্রতার আলোড়নের হান সেখানে নেই। মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ হান-কালের বক্রতার আলোড়ন, ঠিক যে আলোড়ন সমুদ্রবক্ষে চলমান জাহাজের কাছে দেখি। সুতরাং পরীক্ষার মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ ধরতে পারা শুধু যে একটি নতুন পরীক্ষা তা নয়, আইনস্টাইনের সাধারণ আপেক্ষিকতা তত্ত্বের যে অংশ এখাবৎ আদৌ পরীক্ষিত হয় নি, সেই রকম একটি পরীক্ষা।

এবছের গোড়াতেই ঘূর্ণায়মান দণ্ডের কথা বলা হয়েছে। ঐ দণ্ডের আলোচনার দৃষ্টি বিষয় পরিশুদ্র হয়েছে। দণ্ডটির ঘূর্ণনহেতু যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব হবে, তা বয়ে ধরবার মত শক্তিশালী করতে হলে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ খুবই বেশী করতে হয়। এত অধিক বেগে ঘুরতে গেলে কিন্তু দণ্ডটি তেজে বাবে। সুতরাং এই পরীক্ষা সম্ভব নয়। দ্বিতীয় বা পরিশুদ্র হয়েছে তা এই যে, ঘূর্ণিত দণ্ড উৎসারিত মহাকর্ষণ-তরঙ্গ শানিকটা শক্তি নিয়ে বাবে—এই কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ ক্রমেই কমে আগবে বাটে, কিন্তু আরও অস্তিত্ব কারণে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগ আরও ক্রম কমবে। সুতরাং সরাসরি মহাকর্ষণ-তরঙ্গ না দেখে দণ্ডটির ঘূর্ণনবেগের হ্রাস মাত্র দেখেই যে মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সত্যে কিছু অনুমান করা বাবে, সে আশাও নেই।

পরীক্ষার মহাকর্ষণ-তরঙ্গের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে হলে প্রথমে প্রয়োজন মহাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব ঘটানো, তারপরে প্রয়োজন, সেই তরঙ্গ বয়ে ধরা। যদিও আইনস্টাইন ও এডিংটনের পরেও মহাকর্ষণ-তরঙ্গ সত্যে কয়েক জন বিজ্ঞানী তত্ত্বীয় চিন্তা করেছেন এবং তদ্বারা বিজ্ঞান-জগৎ কিছু লাভবানও হয়েছে, তবু মহাকর্ষণ-তরঙ্গ বয়ে ধরবার প্রারম্ভে যে তত্ত্বীয় চিন্তার প্রয়োজন ছিল, সে সত্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ-

কেন্দ্র করেন অধ্যাপক জোসেফ ওয়েবর। সেটি প্রথমে বর্ণনা করা বাক।

স্থিতিস্থাপক বস্তু বলতে কি বোঝায়, সে কথা অনেকেরই জ্ঞানেন। প্রায় সব বস্তুর উপরেই চাপ বা টান পড়লে বস্তুটিতে কিছু সঙ্কোচন বা সম্প্রসারণ ঘটে। বস্তুর অভ্যন্তর সব স্থানেই যে সমানভাবে এই সম্প্রসারণাদি ঘটবে, তা নয়। চাপ বা টানের ধর্মের উপর নির্ভর করে, কি রকম সম্প্রসারণ বা সঙ্কোচন কখন কোথায় ঘটবে। সম্প্রসারণ ও সঙ্কোচনের তরঙ্গ কখনও কখনও বস্তুটিতে উদ্ভব হতে পারে। বিজ্ঞানী ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মহাকর্ষণ-তরঙ্গ অর্থাৎ স্থান-কালের বক্রতার তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুতে কম্পনের সৃষ্টি করতে পারে। অল্পরূপভাবে স্থিতিস্থাপক বস্তু থেকেও মহাকর্ষণ-তরঙ্গের উদ্ভব সম্ভব। অভ্যন্তর বহু তরঙ্গীয় গবেষণার মত এই গবেষণাতেও কিছু আদর্শীকরণ ছিল। ওয়েবর বস্তুতঃ প্রমাণ করেন যে, স্প্রিং-এ বাঁধা ছুটি ভারী বস্তু মহাকর্ষণ-তরঙ্গের দোলার দোল খেতে পারে। যেহেতু স্থিতিস্থাপক বস্তুমাঝেই যেন স্প্রিং-এ বাঁধা বহুসংখ্যক অণুর সমষ্টি, সেহেতু মহাকর্ষণ-তরঙ্গের দোলার দোল খাবে, এমন মনে করা যায়। কিন্তু কেমনভাবে বিভিন্ন ধরনের তরঙ্গ বিভিন্ন ধরনের দোলন বা কম্পনের সৃষ্টি করবে, সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন।

স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুকে একটু কাঁপিয়ে দিলে এবং বাইরে থেকে কোনও বল (Force) তার উপর কার্যকরী না হলে সেটা একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে কম্পিত হয়; অর্থাৎ একই অবস্থা থেকে বার বার সেই অবস্থায় কিরে আসে। সেক্ষেপে যতবার ফেরে, সেই সংখ্যাটির নামই কম্পাঙ্ক (Frequency)। শুধু স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তু কেন, একটি পুতার কোলানো অল্প ওজনের বলও ছলিয়ে দিলে একটা বিশেষ কম্পাঙ্কে দোলে। এই কম্পাঙ্কের নাম দেওয়া

যায় স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক (Natural frequency), অর্থাৎ বহিঃ বলের অভাবে যে কম্পাঙ্ক, তারই নাম স্বাভাবিক কম্পাঙ্ক। বহিঃ বল যদি প্রযুক্ত হয় এবং বলটি যদি বিশেষ কম্পাঙ্কে বাড়ি-কমে, তাহলে অবশ্য স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুটি বলের কম্পাঙ্কেই কম্পিত হবে। কিন্তু বলটির কম্পাঙ্ক তার স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের চেয়ে ভিন্ন হলে কম্পনের পরিমাণটা অল্প হবে। বলের কম্পাঙ্ক স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের কাছাকাছি হলে ঐ পরিমাণ আরও বাড়বে এবং স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে কম্পন খুবই শক্তিশালী হয়ে উঠবে। এসবই দীর্ঘদিন তত্ত্ব প্রমাণিত ও বহু পরীক্ষিত। ওয়েবর প্রমাণ করেন যে, মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ স্থিতিস্থাপক বস্তুর উপর অর্থাৎ আদর্শীকৃত স্প্রিং-এ বাঁধা বস্তুর উপর বহিঃ বলের মতই কাজ করে—অর্থাৎ তরঙ্গের কম্পাঙ্ক স্থিতিস্থাপক বস্তুটির স্বাভাবিক কম্পাঙ্কের সমান হলে স্থিতিস্থাপক বস্তুটিতে শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়, অল্পখান অল্প শক্তিশালী তরঙ্গের উদ্ভব হয়। এই তত্ত্বের উপর নির্ভর করেই অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্র।

যন্ত্র নির্মাণের প্রথমেরই এলো, কোন্‌ বাতাস বা অধাতু নির্মিত বস্তুকে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গের দ্বারা কম্পিত করা সুবিধাজনক হবে। ডক্টর রবার্ট করোয়ার্ড অধ্যাপক জোসেফকে এই সম্বন্ধে পরামর্শ দেন। অ্যালুমিনিয়ামকেই তিনি এই কাজের জন্তে প্রকৃষ্ট মনে করেন। অতঃপর ডক্টর সিসিক ও অধ্যাপক ওয়েবর একত্রে যন্ত্রের ধারা মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ উপর করে অল্প একটি যন্ত্রে এই তরঙ্গ ধরেন। তরঙ্গটি ধরা হয়েছিল 154 সেন্টি-মিটার দৈর্ঘ্যের 20 সেন্টিমিটার ব্যাসবিশিষ্ট একটি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভে। একে একটি বায়ুশূন্য কক্ষে রাখতে হয়েছিল এবং কম্পনটিকে দর্শনযোগ্য অবস্থায় আনবার জন্তে পিউজোইলেকট্রিক কেলাস ব্যবহার করতে হয়েছিল। এই কেলাসের বর্ণনা

অন্য নিম্নপ্রয়োজন—তুচ্ছ কেনে রাখলেই হলো যে, অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভের কম্পন ধরবার জন্তে আরও একটি বস এই পরীকার ব্যবহৃত হয়েছে। এই পরীক্ষা হয় প্রায় ১৯৬৭ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে।

১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯ সালের মধ্যে অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে আরও অনেক জানবার মত ঘটনা ঘটেছে। এই সময়ের মধ্যে বা কিছু হয়তো তারও আগে কত আরও কয়েকটা অজ্ঞত যন্ত্র তৈরি করা হয় এবং বেশ কয়েকটি কল্পনা সামনে রেখে অধ্যাপক ওয়েবর তাঁর গবেষণা চালিয়ে যান। চন্দ্র ও গ্রহাদির ৩৬০০ কম্পাঙ্কের তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র, পালসারের তরঙ্গ ধরবার চেষ্টা—এইরূপ আরও বেশ কয়েকটি চেষ্টা অধ্যাপক ওয়েবরের গবেষণাগারে চলতে থাকে। তবে বিশেষ করে বলবার মত বা ঘটেছে, তা ১৬৬০ কম্পাঙ্ক আশ্রয় করে। এই বিষয়ে অবশ্যই কিছু বর্ণনার প্রয়োজন।

বর্ণনা আরম্ভ করবার আগে বলা দরকার, উক্ত অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভকে কম্পিত দেখলেই যে, সে কম্পন মহাকর্ষণ-তরঙ্গটিই, একথা মনে করা সর্বৈব তুল। পৃথিবীর কম্পন, শব্দ ইত্যাদি নানা কারণে স্তম্ভ উত্তেজিত অর্থাৎ কম্পিত হতে পারে। কোন্ কোন্ কারণে কতটা কম্পন হওয়া সম্ভব, সেটা বিশ্লেষণ ও পরীকার বিষয়। যে যে কারণে কম্পন হতে পারে বলে সন্দেহ, তার মধ্যে কিছু হয়তো বিশ্লেষণের পর বোঝা গেল যে, এরা কম্পন ঘটাবে না, আবার কিছুই সম্বন্ধে বোঝা গেল যে, এদের সম্বন্ধে বিশেষ সাবধান হওয়া প্রয়োজন। ওয়েবরের দল বিশেষ ভীত শব্দ সম্পর্কে—তাই তাঁদের যন্ত্রের জন্তে তাঁরা শব্দহীন প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করেছেন। আরও একটা ভয় ছিল মহাজাগতিক রশ্মিকে—এর কথা পরে বক্তব্য।

১৯৬৯ সালের প্রায় দ্বারাদ্বারি অধ্যাপক ওয়েবরের যন্ত্রাগারে ছয়টি অ্যালুমিনিয়াম স্তম্ভ

ছিল। এদের মধ্যে চারটি ১৫৩ সেন্টিমিটার লম্বা এবং অন্য দুটির একটি ৬৬ ও একটি ৬১ সেন্টিমিটার লম্বা। ৬৬ সেন্টিমিটার লম্বা একটি স্তম্ভ মেরিল্যান্ডের ১০০ কিলোমিটার দূরস্থিত আরাগন জাতীয় যন্ত্রাগারে (Aragonne National Laboratory) স্থাপিত। পরীকার যদি দেখা যায় যে, মেরিল্যান্ড ও আরাগনস্থ যন্ত্র একই সঙ্গে কম্পিত হচ্ছে, তাহলে বুঝতে হবে, এই কম্পনের উৎসজনা আসছে মহাজগৎ থেকে। পৃথিবীপৃষ্ঠস্থ কম্পন আরাগন থেকে মেরিল্যান্ড যেতে যে সময় লাগে ও পৃথিবী কম্পনের কেন্দ্র কোথায় হলে প্রায় একত্র মেরিল্যান্ড ও আরাগনে কম্পন পৌঁছাবে—এসব হিসাব করে এই সত্যাবনা খুবই কম দেখা গেছে। ১/২ সেকেন্ডেরও কম একটি বিশেষ সময়ের মধ্যে কম্পন আরাগন ও মেরিল্যান্ডে হলে তাকে ওয়েবরের দল ‘একত্র-কম্পন’ বলেছেন। বহুসংখ্যক ‘একত্র-কম্পন’ দেখে মহাজগৎ থেকে আগত এই কম্পন সম্বন্ধে উক্ত বিজ্ঞানীদ্বয় প্রায় নিঃসন্দেহ।

আগেই বলা হয়েছে যে, যে কম্পাঙ্কে প্রধানতঃ পরীক্ষা চলছে, তা হলো ১৬৬০। সুপারনোভার কারণ এই কম্পাঙ্ক মহাজগৎ থেকে আসা খুবই স্বাভাবিক এবং বস্তুও তা ধরা পড়েছে। এখন প্রশ্ন হলো, এই তরঙ্গ মহাজগৎ থেকে আগত হলেও এটা কি মহাকর্ষণ-তরঙ্গই বটে? ১৯৬৯ সালে অধ্যাপক যখন তাঁর কীত্তি—বিশেষ করে ১৯৬৭ থেকে ১৯৬৯-এর কীত্তি—লোকসমক্ষে উপস্থিত করেন, তখনও এই প্রশ্নের ঠিক উত্তর দেওয়া হয় নি। ১৯৭০-এর এপ্রিলে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে ঘোষিত হয়েছে যে, মহাজাগতিক রশ্মির কারণে তাঁদের যন্ত্রের কম্পন ঘটবে না। সুতরাং কম্পনের কারণ যে মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ, সে সম্বন্ধে আরও নিঃসন্দেহ হওয়া গেল।

চাঁদ শব্দশূন্য। এই জন্তেও অসম্ভব কারণে চাঁদ বৈজ্ঞানিক তরঙ্গ ধরবার যন্ত্র বসাবার প্রকৃষ্ট স্থান।

বিখ্যাত বিজ্ঞানী হার্ক ম্যাক্সওয়েল বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সম্ভাবনার কথা বলেছিলেন—পরে তাকে বসে ধরেন হার্টস (Hertz)—আইনষ্টাইনের অল্পমিত মাধ্যাকর্ষণ-তরঙ্গ সেই বস্তু বসে ধরলেন অধ্যাপক ওয়েবের। তাঁদের গবেষণা আরও অগ্রসর

হলে—আরও অল্পাত্ত কম্পাঙ্কের তরঙ্গ নিয়ে কাজ হলে—এক কথায়, বিজ্ঞান-জগৎ এই বিষয়ে আরও নিঃসন্দেহ হলে (সত্যাপনসম্বন্ধে চাই করে নিঃসন্দেহ হওয়া তুল) ওয়েবেরের কীর্তি বিজ্ঞান-জগতে অমরীয় হয়ে থাকবে।

## প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের অবদান

### মিনতি চক্রবর্তী

প্রত্নতত্ত্ব বলিতে সাধারণতঃ মানুষের তৈয়ারী প্রত্নবস্তুর বিষয় সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা বুঝায়; অর্থাৎ প্রাচীন মানুষ বাহ্য করিয়াছে তাহা যদি কোনও স্থান হইতে চিত্তব্রূপ উদ্ধার করা যায়, তাহা হইতে সেই সময়ের মানুষের শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করাই প্রত্নতত্ত্বের প্রধান উদ্দেশ্য। এই কারণে কোনও প্রাচীন স্থানের সময় নির্ধারণ একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। বর্তমানে আমাদের আলোচ্য বিষয় হইল প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা আমাদের কিরূপে সাহায্য করে।

প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণ সাধারণতঃ দুই রকমভাবে হইতে পারে :—

প্রথমটি হইল আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ আর দ্বিতীয়টি হইল পরম সময় নির্ধারণ।

আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ—যখন কোনও স্থানের অবস্থিত সময়কে অন্য স্থানের বিচিত্র প্রত্নতাত্ত্বিক সময়ের সহিত তুলনা করিয়া আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ করা হয়, তাহাকে বলা হয় আপেক্ষিক সময় নির্ধারণ। এইভাবে যে সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে, তাহা সাধারণতঃ যুগ্য অর্থে ব্যবহৃত হয়; যেমন—পুরাপ্রত্ন যুগ (Paleolithic Age), মধ্যপ্রত্ন যুগ (Mesolithic Age) প্রভৃতি।

আপেক্ষিকভাবে সময় নির্ধারণ নিম্নলিখিত প্রকারগুলিতে পাওয়া যায় :—

(ক) প্যালিওস্ত্রোলজিক্যাল—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাত্মের সাহায্য লওয়া হয়। এই জীবাত্মগুলি প্রাচীন মেরুদণ্ডী অথবা অমেরুদণ্ডী প্রাণীর হওয়া চাই। এইরূপ কোন প্রাণীর জীবাত্ম যদি কোন একটি বিশিষ্ট স্তরে বা স্তরের উপর পাওয়া যায়, তাহা হইলে সেই প্রাণীটির অস্তিত্ব যে যুগে ছিল, সেই যুগ হইতে সেই বিশিষ্ট স্তরের সময় তুলনামূলকভাবে নির্ণয় করা বাইতে পারে। যদিও কোনও স্থান হইতে টাইপ কসিল (যাহা কোনও বিশিষ্ট সময় ও বিশিষ্ট কালচারের নির্দেশ দেয়) পাওয়া যায়, তাহা প্রত্নতাত্ত্বিক সময় নির্ধারণে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা অবলম্বন করে। তারতবর্ষের নর্মদার উপকূলে পুরাপ্রত্ন যুগের যে ভরবিভাগ পাওয়া গিয়াছে, তাহার নিম্নভাগে এইরূপ একটি মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাত্ম পাওয়া গিয়াছে। ইহার নাম এলিক্যাল অ্যান্টি-ক্যুরাস নোমাস্তিক্যাল এবং ইহার অস্তিত্ব হইতে এই স্থানের সময় নির্ধারিত হইয়াছে প্লাই-স্টোসিনের মধ্যভাগ।

(খ) প্যালিওবটানিক্যাল—এই ভাবে সময় নির্ধারণে প্রাচীন প্রাণীর জীবাত্মের

পরিবর্তে প্রাচীন উদ্ভিদের জীবাশ্মের সাহায্য লওয়া হয় এবং কোনও স্তরের ভিতর ঐ জীবাশ্মের উপস্থিতি হইতে উহার সময় নির্ধারিত হইয়া থাকে।

(গ) ইভোলুজিয়াল—আবহাওয়া পরিবর্তনের মাত্রা নির্ধারণের দ্বারা এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারিত হয়। বিভিন্ন সময়ে প্রাকৃতিক যে পরিবর্তন সাধিত হয়, যেমন—পুষ্টিগুণ পরিমিত্রে কোনও স্থানে সফর ও ইন্টারপুষ্টিগুণ পরিমিত্রে কর হইলে সেই সফর ও সফরের মাত্রা লক্ষ্য করিয়া ঐ স্থানের সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ভারতে সোয়ান উপত্যকার এইভাবে সময় নির্ধারিত হইয়াছে।

টাইপোলজিক্যাল—এইভাবে সময় নির্ধারণে মাত্র কতক তৈয়ারী ও ব্যবহৃত প্রাচীন আয়ুধ, হাতিয়ার অথবা মৃৎপাত্রের সাহায্য লওয়া হয়। খননকার্যের কালে ঐ সকল প্রস্তুত যদি কোন বিশিষ্ট স্তর হইতে পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ সকল বস্তু একটি বিশিষ্ট ঐতিহাসিক অথবা প্রাগৈতিহাসিক সময়ের নির্দেশ করে। এখন, অল্পরূপ আর একটি প্রস্তুত যদি অল্প কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায় এবং উহাদের গঠন-কৌশল যদি এক রকমের হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে ঐ বস্তুটি পূর্বোক্ত সময় নির্ধারিত বস্তুটির সমসাময়িক এবং ঐ বস্তু হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারিত হয়।

ম্যাগনেটিক—পোড়া মাটি, ইট, চূড়ী, টেরাকোটা প্রভৃতি জিনিস, বাহার মধ্যে লৌহ-জাতীয় পদার্থ আছে, তাহা কোন স্থানের সময় নির্ধারণে সাহায্য করে। এই সকল পদার্থ যদি অপরিবর্তিত অবস্থায় কোন স্থানে থাকে, তাহা হইলে তাহার পৃথিবীর চুম্বকীয় ভ্রামক প্রাপ্ত হয়। যে সকল বস্তু এইরূপ ভ্রামক প্রাপ্ত হয়, তাহা সময়ের দীর্ঘ ব্যবধানে কোনরূপ পরিবর্তিত হয় না। আবার জামি, পৃথিবীর

চৌম্বক কেন্দ্র ক্রমশঃ পরিবর্তিত হইতেছে। যদি উপরিউক্ত কোন বস্তু কোন স্থান হইতে উদ্ধার করা যায়, তবে ঐ সকল বস্তু পোড়াইলে তাহা হইতে লৌহজাতীয় পদার্থ পৃথক করা যায় এবং দেখা যায় যে, সেই লৌহের চৌম্বক্য প্রাঞ্জির কালে তাহা যে ভূগের তৈয়ারী, সেই ভূগের পৃথিবীর চৌম্বক কেন্দ্রের দিগ্‌নির্ঘর করিতেছে। এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণের জন্য অল্প একটি বস্তু (যাহার সময় পূর্বে নির্ধারিত হইয়াছে) সাহায্য লওয়া হয়। যদি উদ্ধারপ্রাপ্ত বস্তুর সময়, সময়-নির্ধারিত বস্তুর সময়ের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, দুইটি বস্তুর নির্মাণকাল একই সময়ে সম্পন্ন হইয়াছে অর্থাৎ দুইটি বস্তু একই সময়ের।

কালের খেলিয়ার, ইংল্যান্ডের কুক, আইডকেন এবং জাপানের ওয়াটনেবল এই পদ্ধতির সাহায্যে অনেক স্থানের সময় নির্ধারণ করিয়াছেন।

কেমিক্যাল—কোন কোন ক্ষেত্রে প্রত্ন-তাত্ত্বিক বস্তুসমূহের রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা সময় নির্ধারিত হইতে পারে। ইহা কার্বন-14 পদ্ধতির দ্বারা বস্তুসমূহের আত্যন্তরীণ পরীক্ষার দ্বারা নির্ধারিত হইয়া থাকে। কার্বন-14 পদ্ধতিতে সাধারণতঃ 70,000 বৎসর পর্যন্ত সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। কিন্তু তাহার অধিক হইলে কার্বন বহনকারী বস্তুসমূহ তাহাদের তেজস্ক্রিয়তা নষ্ট করিয়া দেলে। সেই জন্য যে সকল হাড় 70,000 বৎসর পূর্বকার (যেমন প্রাইস্টোসিন ভূগের প্রথম ভাগের), রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা তাহার সময় নিশ্চিত হইতে পারে। এই পরীক্ষার জন্য হাড়জাতীয় পদার্থের আত্যন্তরীণ ক্লোরিন, নাইট্রোজেন এবং ইটের-নিরামের প্রয়োজন হইয়া থাকে।

খননকার্যের কালে মাটি হইতে প্রাচীন মাত্র বা অল্প কোনও প্রাণীর যে সকল হাড় পাওয়া যায়, সেগুলির অভ্যন্তরে যে হাইড্রোজি-



অ্যাপেটাইট থাকে, সেগুলির মাটির অভ্যন্তরের জল শোষণ করিবার একটি সহজাত প্রবণতা থাকে। এই সকল ক্রোরিন হাইড্রোক্সি-অ্যাপেটাইটের সহিত বিক্রিয়া করিয়া হাড়ের মধ্যে বর্তমান থাকে। যতদিন এই সকল হাড় মাটির মধ্যে থাকিবে, ততদিন উহার অভ্যন্তরের ক্রোরিনের পরিমাণ বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে। হাড়ের এই ক্রোরিন গ্রহণ করিবার একটি নির্দিষ্ট সীমা আছে, বাহার বেশী ক্রোরিন আর হাড়গুলি গ্রহণ করিতে পারে না। এই হাড়ের ক্রোরিনের পরিমাণ নির্ধারণ করিয়া উহার সহিত অল্প কোন নির্ধারিত সময়ের হাড়ের তুলনা করিয়া প্রথমোক্ত হাড়ের সময় নির্দেশিত হয়। তবে এই পদ্ধতিতে একটি অকলের হাড়ের শুণাশুণ পরীকার দ্বারাও সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ প্রাউণ্ড ওয়াটারে ক্রোরিনের পরিমাণ স্থানান্তরিত পৃথক হইয়া থাকে।

হাড়ের আত্যন্তরীণ ইউরেনিয়ামের পরিমাণ দেখিয়াও উহার আপেক্ষিক সময় নির্ধারিত হইতে পারে। কারণ সত্ত-প্রাপ্ত হাড়সমূহে ইউরেনিয়াম থাকে না।

ডেনড্রোক্রোনোলজিক্যাল—বিজ্ঞানের যে শাখার সাধারণতঃ বৃক্ষের বলয় গণনা করা হয়, তাহাকে বলা হয় ডেনড্রোক্রোনোলজি। গাছের অভ্যন্তরে যে ক্যাথরিয়াম থাকে, তাহার কম-কমতার প্রতি বৎসর গাছের বাৎসরিক বৃদ্ধি-বলয়ের সৃষ্টি হয়। এই বৃদ্ধি-বলয়গুলি গাছের পুরাতন অংশ ও ছালের মধ্যে থাকে। সাধারণতঃ যে ঋতুতে (যেমন বসন্তকালে) গাছের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তখন গাছে বড়, পাতলা প্রাচীর-বিশিষ্ট কোব গাছের কাঠে স্তূত হয়। গ্রীষ্ম অথবা বর্ষার শেষের দিকে এই কোবগুলি আরও বৃদ্ধি পাইতে থাকে। পরের বৎসর বসন্তে একই প্রকারে আবার নূতন কোব উপর হইয়া গাছের বলয়ের সৃষ্টি করে। গাছের অভ্যন্তরে

এইরূপ নূতন ও পুরাতন অর্থাৎ ছোট ও বড় বলয়ের সৃষ্টির কালে একটি নির্দিষ্ট সীমা পাওয়া যায়।

গাছের যে স্থানে এই বলয়ের সৃষ্টি হয়, সেই অংশ হইতে একটি পাতলা গোলাকার অংশ কাটিয়া উহার উপর কোন তরল পদার্থ দিয়া পরীক্ষাগারে বলয়ের সংখ্যা গণনা করা হয়। এই গণনা সাধারণতঃ গোলাকার অংশের ব্যাসার্ধ পরিমাপ করা হয়। প্রতিটির 10টি বলয় যেখানে শেষ হইয়াছে, সেখানে একটি শিনের দ্বারা চিহ্নিত করা হয়। যে বলয়গুলির বেধ খুব পাতলা, সেগুলিকে চিহ্নিত করা হয় না, কেবলমাত্র গণনা করা হয়। কিন্তু যে সকল বলয়ের বেধ বেশ মোটা অথবা পাঁচবর্গ বলয়ের তুলনায় মোটা, তাহাই কেবল চিহ্নিত করা হয়।

গাছের বলয় গণনার পদ্ধতি করেক রকমের হইতে পারে। নিম্নে Douglass-এর পদ্ধতিটির বিষয় আলোচনা করা বাইতেছে :—

ডগলাস গাছের বলয়ের বেধ নির্ণয় করিয়া একটি সরল রেখার উপর কতকগুলি লম্ব টানেন। যে বলয়গুলি সাধারণ বেধের, সেগুলিকে কেবল B, BB প্রভৃতি অক্ষরের দ্বারা চিহ্নিত করেন এবং যে বলয়গুলির বেধ একটু বেশী মোটা, সেগুলিকে কেবল বড় বড় লম্বাকৃতির রেখার দ্বারা চিহ্নিত করেন। তারপর এই রেখাগুলির পরিবর্তন দেখিয়া তাহা হইতে গাছের বলয়ের সংখ্যা নির্ণয় করেন।

বৈজ্ঞানিক গ্রন্থ যে পদ্ধতির আবিষ্কার করেন, তাহাতে তুলনামূলকভাবে বলয়ের সংখ্যা বাহির করা হয়। ইহাতে সাধারণতঃ দুই রকম গাছের বলয় লওয়া হয়। কতকগুলি গাছ লওয়া হয়, বাহাদের প্রকৃত বলয় আছে। আবার কতকগুলি নূতন উদ্ভিদ লওয়া হয়, বাহাদের প্রকৃত বলয়ের সংখ্যা পাওয়া যায় না। কোনও প্রাচীন উদ্ভিদের বলয় কোরও নূতন উদ্ভিদের বলয়ের সহিত মিলিয়া বাইতে পারে। উভয় গাছের

বলয়গুলি যদি এইরূপে মিলিয়া যায়, তবে একটি বৃক্ষের আভ্যন্তরীণ বলয়ের সহিত ও অল্প বৃক্ষের বাহিরের বলয়ের সহিত একটি সরল রেখা টানিয়া সময় নির্ধারিত হয়। যে সকল বৃক্ষের প্রকৃত বয়স পাওয়া যায় না, এই পদ্ধতিটি সেই সকল ক্ষেত্রে অঙ্গসরণ করা হয়। উত্তর পরীক্ষাতেই যে সকল গোলাকার অংশ লওয়া হয়, তাহার ব্যাস, মূলের উপর হইতে সেই অংশের উচ্চতা, যে স্থান হইতে উদ্ভিদটিকে লওয়া হইয়াছে, সেই স্থানবিশেষের বিবরণ বা Topography ও অবস্থান, যে মাটি হইতে উদ্ভিদটিকে তোলা হইয়াছে তাহার প্রকৃতি, পাখবর্তী অঞ্চলে কোন প্রস্তর বা গাছ-গাছড়া যদি পাওয়া যায়, তাহা চিহ্নিত করা হয়। গোলাকার অংশ যদি মূলের কাছাকাছি বৃক্ষের কোনও স্থান হইতে পাওয়া যায়, তবে সেই অংশ সময় নির্ধারণের পক্ষে সর্বাধিক উপযুক্ত।

**ভার্ড-ক্লে অ্যানালিসিস—**বৈজ্ঞানিক De Geer ১৮৭৮ সালে সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। বরফাবৃত স্থানে হিমবাহ হইতে বরফ গলিবার পর হিমবাহিনিঃসৃত যে জল থাকে, তাহার উপর প্রতি বৎসর কতগুলি স্তর পড়ে। এই স্তরগুলিকে সুইডিশ ভাষায় বলা হয় ভার্ডস (Varves) এবং স্তরের সমাবেশকে ভূতাত্ত্বিকগণ ভার্ড-ক্লে (Varve clay) অথবা স্ত্রাওস বলিয়া থাকেন। এই সমাবেশ সাধারণতঃ লেক, টার্মিনাল মোরেন, সমুদ্র বা নদীর উপরেই হইয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে বরফ গলন প্রবণতায় গলিতে থাকে, তখন বরফাবৃত অঞ্চলের নিকটবর্তী জলাধারসমূহে প্রবণতায় এই ভার্ড-ক্লে-র সমাবেশ দেখা যায়। এই সমাবেশে অপেক্ষাকৃত মৃদুকার কণিকাগুলি সাধারণতঃ নীচের দিকে এবং দৃশ্যতঃ কণিকাগুলি উপরি-ভাগে অধিক থাকে এবং দৃশ্যতঃ কণিকাগুলি সর্বাধিক উপরে থাকে। পরের বৎসর আবার সেই

স্থানে এইরূপ ভার্ড-ক্লে-র সমাবেশ হয়। এই-ভাবে বৃক্ষের বলয়ের ভাষা জলাধারসমূহে এক-একটি বলয়ের সৃষ্টি হয়। প্রতিটি বলয় এক-একটি বৎসরের নির্দেশ করে। প্রতি বৎসরের এই সমাবেশ হইতে বৃক্ষের গোলাকার অংশ লইয়া উহা হইতে সেই স্থানের সময় জানা সম্ভব। যদি কোন স্থানের ভার্ড-ক্লে কোন স্থানের ভার্ডের সহিত মিলিয়া যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে দুইটি স্থানের ভার্ড একই সময়ে গঠিত হইয়াছে। এইভাবে ভার্ড-ক্লে পরীক্ষা করিয়া কোনও বিস্তৃত স্থানের সময়ের নির্দেশ পাওয়া যায়। শুধুমাত্র এই পদ্ধতির উপর ভিত্তি করিয়া নির্দেশ করিয়াছেন যে, উত্তর ইউরোপের শেষ শৈত্যযুগের সমাপ্তি ১২,০০০ বৎসর পূর্বে হইয়াছিল।

**পোলেন অ্যানালিসিস—**এই পদ্ধতিটি উদ্ভিদ-বিজ্ঞানের উপর ভিত্তি করিয়া গঠিত হইয়াছে। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে বিভিন্ন স্থানের পরাগরেণুর পরীক্ষার দ্বারা একটি সময়-নির্দেশ পাওয়া যায়। এই পরাগ সাধারণতঃ দেখা যায় উদ্ভিদের পত্রা শিকড়বিশিষ্ট জলা-ভূমির বৃত্তিকার উপর জৈব পদার্থগত হ্রদ এবং কদমাক্ত স্থানের উপর। এই পরাগসমূহ বহুদিন ধরিয়া জমা হইবার পর বাতাসের সংস্পর্শে জীবাশ্মে পরিণত হয়। কোনও স্থানের পরাগ পরীক্ষা করিয়া সেই স্থানে কি ধরণের ফুলের আধিক্য ছিল, তাহা জানিয়া আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। এই আবহাওয়া নির্ণয় করিয়া সেই স্থানের সময় নির্দেশ করা সম্ভব। পোলেন অ্যানালিসিসের একটি প্রধান উদ্দেশ্য হইল—উদ্ভিদের উপাদানের পরিবর্তন লক্ষ্য করা। একটি নমুনা হইতে বিভিন্ন সময়ে উদ্ভিদের উপাদানের যে পরিবর্তন হয়, তাহা বোঝা সম্ভব নয় বলিয়া বিভিন্ন বর্ষের নমুনা লওয়া হয়।

পোলেন অ্যানালিসিসের কলাকল সাধা-

রণতঃ তালিকার পরিবর্তে চিত্রের সাহায্যে সৃষ্টি করা হয়। প্রত্যেকটি পোলেন নির্দেশের জন্য একটি বিশিষ্ট চিত্রের সাহায্য লওয়া হয়। কেহ কেহ প্রতিটি উদ্ভিদের গণ (Genus) অথবা প্রজাতির (Species) জন্য একটি মানচিত্র তৈয়ারী করেন এবং তাহা হইতে বিভিন্ন পোলেনের আবতনের ব্যবধান মাপিয়া সময় নির্ধারণ করেন।

**আলট্রাসোনিক—বৈজ্ঞানিক স্পেস্ট্রা এবং বার্গ** সর্বপ্রথম এই পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। তাঁহারা প্রমাণ করেন যে, প্রাণীদের হাড়ে শব্দোত্তর তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী ধীরে ধীরে কমিয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ নূতন হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের যে বেগ দেখা যায়, তাহা 500 বৎসর পূর্বের হাড়ে শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগের ঠিক অর্ধেক, আবার 5000 বৎসর পূর্বকার হাড়ের শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ তাহারও অর্ধেক। হাড়ের এই শব্দোত্তর শব্দ-তরঙ্গের বেগ সময়ানুযায়ী হ্রাস পাইবার মাত্রা সর্বত্র সমান নয় এবং এই ভাবে যে সময় নির্ধারিত হয়, তাহা ভ্রমশূন্য নয়। তাহা ছাড়া এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে কতকগুলি বাধা সৃষ্টিকারী প্রক্রিয়া, যেমন—ক্যালসিফিকেশন, নিলিসিফিকেশন অথবা স্কেলজিনাইজেশন প্রভৃতির হাড়ের উপর বিভিন্ন রকম বিক্রিয়ার ফলে বাধা সৃষ্টি করে।

**ষ্ট্যাটিগ্রাফিক জিওমরফিক—**এই পদ্ধতিটি ভূতাত্ত্বিক স্তরবিজ্ঞানের উপর নির্ভর করিয়া প্রবর্তিত হইয়াছে। অধ্যবেক্ষণ ও কয়ের ফলে পৃথিবীর উপর যে বিভিন্ন স্তর, নদীতটচ্ছন্ন প্রভৃতির সৃষ্টি হয়, তাহার উপর যদি কোন প্রস্রবস্ত পাওয়া যায়, তাহা হইলে ঐ ভূতাত্ত্বিক স্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব। যে স্তরে ঐ প্রস্রবস্ত পাওয়া যাইবে, তাহার সহিত নিকটবর্তী কোন অধ্যবেক্ষণের ভূতাত্ত্বিক স্তরের স্তরবিজ্ঞানের সম্পর্ক টানিতে হইবে। যদি উভয়ের স্তরবিজ্ঞানের সম্পর্ক

এক হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, উভয় স্তর এক সময়ে গঠিত হইয়াছে। এই পদ্ধতিতে ভারতের ব্রহ্মগিরির সময় নির্ধারণ করা হইয়াছে।

**নদীতটরেখার স্তরবিজ্ঞানের পরিবর্তন**—যদি কোন প্রস্রবস্ত সমুদ্র বা নদীর তীর-সংলগ্ন কোন স্থানে পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহার সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়। এই তীরসংলগ্ন স্থানগুলি পূর্বে যে ঐ স্থানে নদী অথবা সমুদ্র ছিল এবং ভূমির উচ্চতা অথবা সমুদ্র-পৃষ্ঠের পরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ নিমজ্জিত হইয়াছে, তাহা নির্দেশ করে। ঐ তীরসংলগ্ন যে সকল প্রস্রবস্ত পাওয়া যাইবে, সেগুলিকে যে সময়ে ঐ ভৌগোলিক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল, সেই সময়ের বুঝিতে হইবে।

**বালুকাস্তূপের স্থান পরিবর্তনের হার**—ষ্ট্রা নামক বৈজ্ঞানিক প্রমাণ করেন যে, বালিয়াড়ি বিচলনের জন্য যে নির্দিষ্ট সময় লাগে, তাহা বারব অধ্যবেক্ষণের সর্বাঙ্গেকা কম সময়ের সহিত মিলিয়া যায়। এইভাবে প্রকৃতিতে বালিয়াড়ি বিচলনের সময় মাপিয়া সেই স্থানের সময় নির্ধারণ সম্ভব করা হয়।

**ট্রাভারটাইন সফয়ের হার**—স্তরের অতীত স্ট্যালাগমাট ও স্ট্যালাকটাইট সফয়ের হার নির্ধারণপূর্বক সেই স্থানের আবহাওয়া সম্পর্কে অবহিত হওয়া যায়। কোন স্থানের আবহাওয়া নির্ধারণ করিতে পারিলে তাহা হইতে সেই স্থানের সময় নির্ধারণও সম্ভব হয়।

**ডেজক্রিয়তার পদ্ধতি**—এই পদ্ধতিতে সময় নির্ধারণে যোটাযুটভাবে পরম সময় নির্ধারণ (Absolute dating) সম্ভব হয়।

ডেজক্রিয় পরমাণুগুলির রশ্মি বিকিরণের হার সাধারণতঃ অর্ধ-জীবনকাল বা হাফ লাইফের দ্বারা প্রকাশ করা হয়। ডেজক্রিয় পরমাণুর বিকিরণের সঙ্গে সঙ্গে উহার পরমাণুগুলি

স্থাপিত হইতে থাকে। যে সময়ের মধ্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের অর্ধেক সংখ্যক পরমাণুর ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে, তাহাকে ঐ পদার্থের হাফ লাইফ বলা হয়। পরীক্ষামূলক পদ্ধতির সাহায্যে তেজস্ক্রিয় পদার্থের নিউক্লীয় বিভাজনের ধ্রুবক নির্ণয় করা যায়। এই ধ্রুবকের সাহায্যে ঐ তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ নির্ণয় করা সম্ভব। কোন তেজস্ক্রিয় পদার্থের হাফ লাইফ জানা গেলে যে প্রস্তরে ঐ পদার্থ থাকে, আমাদের ইচ্ছানুযায়ী কোনও পুঙ্খ সময় (O-time) হইতে বর্তমান কাল পর্যন্ত সেই প্রস্তরের সময় নির্ধারণ সম্ভব হয়।

কার্বন-১৪—আমরা জানি, বাতাসে কার্বন ডাই-অক্সাইড, অক্সিজেন, নাইট্রোজেন প্রভৃতি আছে। এই কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন ১২। বায়ুস্তরের উপরিভাগে যে নাইট্রোজেন-১৪ আছে, তাহা নভোরশ্মি হইতে আগত নিউট্রনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে একটি নির্দিষ্ট অল্পপাতে কার্বন<sup>১৪</sup> উৎপন্ন করে। এই কার্বন-<sup>১৪</sup> তেজস্ক্রিয় পদার্থ। বিক্রিয়াটি এইরূপ :—

নিউট্রন + নাইট্রোজেন-১৪ = প্রোটন + কার্বন<sup>১৪</sup>। এই কার্বন পরমাণুগুলি বাতাসের অক্সিজেনের সহিত বিক্রিয়ার ফলে কার্বন ডাই-অক্সাইড তৈয়ারী করে। এই শেযোক্তরূপ কার্বন ডাই-অক্সাইডে কার্বনের পারমাণবিক ওজন ১৪ এবং ইহা জীবমণ্ডলে সঞ্চালিত হয়।

যখন বাতাসের সহিত কার্বন ডাই-অক্সাইড গ্রহণ করে, তখন এই কার্বন<sup>১৪</sup> কার্বন ডাই-অক্সাইডের সহিত উদ্ভিদের দেহে প্রবেশ করে। প্রাচীন উদ্ভিদসমূহের দেহ হইতে এই কার্বন<sup>১৪</sup> বাহির করিয়া লওয়া হয়। এই তেজস্ক্রিয় কার্বন<sup>১৪</sup> তাহার পর তেজস্ক্রিয় রশ্মি বিকিরণ করিতে থাকে। অতঃপর যে স্থান হইতে প্রাচীন উদ্ভিদ লওয়া হইয়াছিল, সেই স্থান হইতে কিছু নতুন

উদ্ভিদ লওয়া হয়। অল্পকালব্যয়ে ঐ সকল উদ্ভিদের দেহ হইতেও কার্বন<sup>১৪</sup> বাহির করিয়া উহার তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের তেজস্ক্রিয়তার পরিমাণ তুলনা করিয়া প্রাচীন উদ্ভিদটির সময় নির্ধারণ করা সম্ভব হয়। পরীক্ষার দ্বারা নির্ণয় করা হইয়াছে কার্বন<sup>১৪</sup>-এর অর্ধজীবনকাল ৫,৫৬০ বৎসর। এই পদ্ধতিতে ৫০,০০০ বৎসরের মধ্যকার উদ্ভিদের সময় নির্ধারণ করা সম্ভব। এইভাবে সময় নির্ধারণে যে ভ্রম ঘটা হয়, তাহা হইল ১০০ হইতে ১২,০০০ বৎসর।

তেজস্ক্রিয়তার (Pleochroic halo) বর্ণায়নের ভিত্তিতে পরিমাপ পদ্ধতি—পূর্বেই বলা হইয়াছে যে, তেজস্ক্রিয় পরমাণুগুলি আলো কণা বিকিরণ করে। আলো কণাগুলির বিশেষ দর্শন হইল এই যে, সেগুলি কাচ, ক্ষতিক এবং অগ্নেয় বর্ণবিক্রিতি বা উহাদের রঞ্জিত করিতে পারে। এই অংশগুলিকে অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে বুতাকার অংশরূপে দেখা যায়। এই বুতাকার অংশগুলির নাম তেজস্ক্রিয় (Pleochroic halo)। অণুবীক্ষণ যন্ত্রের নীচে এই বুতাকার অংশগুলির সমবর্তন তল পরিবর্তনের ফলে প্রাথমিক পরিবর্তন ঘটে। একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রাথমিক হইতে রঞ্জন ঘটিতে কতটা বিকিরণ ঘটে, তাহা স্থির করা হয়। এইভাবে একটি নির্দিষ্ট তালিকা-মুচী প্রস্তুত করা হয়। কোন নির্দিষ্ট প্রস্তরের বিকিরণের দ্বারা প্রাথমিক স্থির করা হয়। যে প্রাথমিক পাওয়া যায়, তাহার জন্য কতটা আলো কণা দরকার, তাহা তালিকা-মুচী হইতে বাহির করা হয়। এই আলো কণা বিকিরণ করিতে যে সময় লাগে, তাহা হইতে ঐ নির্দিষ্ট প্রস্তরের সময় বাহির করা হয়।

ইউরেনিয়াম ও থোরিয়ামের অনুপাত—ইউরেনিয়ামের পরমাণু বিভাজনের ফলে আটটি আলো কণা নির্গত হয়। আলো কণা দুই

একক ধনবিদ্যুৎযুক্ত হিলিয়াম পরমাণু। বনীবৃত্ত পদার্থের মধ্যে এই হিলিয়াম পরমাণুর গতি খুব কম হইবার কালে ইহাদের অধিকাংশই প্রস্তরের মধ্যে আটকা পড়িয়া যায়। এই পদ্ধতি প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তরের মধ্যে যে থোরিয়াম থাকে, তাহার পরিমাণ নির্ণয় করা দরকার। কারণ থোরিয়ামও হিলিয়াম কণার বিকিরণ ঘটায়। সুবর্ণশি হইতেও হিলিয়াম কণা বিকিরিত হয়। এই হিলিয়াম কণার পরিমাণ মাপিবার পর উপরি-উক্ত কনুলায় সাহায্যে সময় নির্ধারণ করা হয়।

$$T = \frac{88 \text{ He}}{U + 0.27 \text{ Th}} \times 10^6 \text{ years.}$$

ইউরেনিয়াম লেড<sup>২০৬</sup> এবং থোরিয়াম লেড<sup>২০৬</sup>-এর অনুপাত—ইউরেনিয়ামের বিভাজনের কালে যে দ্বারী পদার্থ পাওয়া যায়, তাহা হইল লেড<sup>২০৬</sup>। মাস-স্পেকট্রোমিটার নামক যন্ত্রের সাহায্যে দেখা হয় লেড<sup>২০৬</sup>-এর পরিমাণ কত বা লেড<sup>২০৬</sup>-এর পরিমাণ কত। লেড<sup>২০৬</sup>-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কনুলায় (১) সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়। আর লেড<sup>২০৬</sup>-এর ক্ষেত্রে নিম্নোক্ত কনুলা (২)-এর সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$(1) t = 15.15 \times 10^9 \log \left( 1 + 1.58 \frac{\text{Pb}^{206}}{U} \right) \text{ years}$$

$$(2) t = 46.2 \times 10^9 \log \left( 1 + 1.116 \frac{\text{Pb}^{206}}{\text{Th}^{232}} \right) \text{ years.}$$

এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণের সুবিধা এই যে, লেড<sup>২০৬</sup> দ্বারী পদার্থের পরিমাণ প্রাকৃতিক সংস্পর্শে কম হয়।

ইউরেনিয়াম-লেড ও অ্যান্টিমনিয়াম-

লেড-এর অনুপাত—পূর্বেই পদ্ধতির দ্বারা লেড<sup>২০৬</sup> ও লেড<sup>২০৭</sup>-এর পরিমাণ মাস-স্পেকট্রোমিটার যন্ত্রের সাহায্যে মাপিবার পর নিম্নোক্ত কনুলায় বেলা হয়।

$$\frac{\text{লেড}^{206}}{\text{লেড}^{207}} = \frac{1}{139} \left( \frac{e^{\lambda_{\text{U}^{238}} t} - 1}{\lambda_{\text{U}^{238}} t - 1} \right) \text{ years.}$$

( $\lambda$  = নিউক্লিয় বিভাজন অবক)

লেড<sup>২১০</sup> ও লেড<sup>২০৬</sup>-এর অনুপাত—

ইহা চার নম্বর পদ্ধতির পরিবর্তিত রূপ। প্রাচীন প্রস্তরে লেড<sup>২১০</sup> ইউরেনিয়ামের সহিত একই সমতার থাকে। মাস-স্পেকট্রোমিটারে

প্রথমে লেড<sup>২০৬</sup>-এর পরিমাণ মাপা হয়, তাহার পর রেডিও কেমিক্যাল অ্যানালিসিসের দ্বারা লেড<sup>২০৬</sup>-কে মাপা হয়। অতঃপর নিম্নোক্ত কনুলায় সাহায্যে সময় নির্ধারিত হয়।

$$t = 15.15 \times 10^9 \log \left( 1 + 1.58 \frac{\text{Pb}^{206} + \text{Pb}^{210}}{U} \right) \text{ years.}$$

পটাশিয়াম<sup>৪০</sup> ও আরগন-এর অনুপাত—পটাশিয়াম<sup>৪০</sup> তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা আরগন দ্বারী পদার্থ বা ক্যালসিয়াম দিতে পারে।

আরগন<sup>৪০</sup>-এর পরিমাণ মাপিয়া কনুলায় বেলা হয়—

$$\frac{A^{40}}{K^{40}} = \frac{\lambda K}{\lambda K + \lambda_B} \left[ \frac{(\lambda_B + \lambda K)t}{e} - 1 \right]$$

রুবিডিয়াম ও ট্রেন্সিউরামের অক্সিপাত—  
রুবিডিয়াম<sup>৪৭</sup> তেজস্ক্রিয় পদার্থ। ইহা বিশেষ-  
পূর্বক হারী পদার্থ ট্রেন্সিউরাম দিতে পাবে। মাস-  
স্পেকট্রোমিটারের দ্বারা ট্রেন্সিউরাম<sup>২৩২</sup>-এর পরিমাণ  
যাণীরা নির্যুক্ত কর্তৃকার কলা হয়—

$$t = \frac{6.2 \times 10^{10}}{0.6993} \times \frac{Sr^{87}}{Rb^{87}}$$

তেজস্ক্রিয়াজাত লেড ও সাধারণ লেড-এর  
অক্সিপাত—যে প্রত্যয়ের মধ্যে লেড<sup>২০৬</sup>, লেড<sup>২০৭</sup>

এবং লেড<sup>২০৮</sup>—এই তিনটি পদার্থ থাকিবে, সেই  
প্রত্যয়েরই এই পদ্ধতির সাহায্যে সময় নির্ধারণ  
করা যাইবে। লেড<sup>২০৬</sup>, লেড<sup>২০৭</sup> ও লেড<sup>২০৮</sup>-কে  
রেডিওজেনিক লেড (Radiogenic lead) বলা  
হয়। তেজস্ক্রিয়াজাত নহে, এরূপ আদিম লেড-এর  
206 ও 207-এর অক্সিপাতের সহিত তেজস্ক্রিয়াজাত  
লেড-এর উক্ত আইসোটোপগুলির অক্সিপাত  
তুলনা করিয়া প্রত্যয়ের সময় নির্ধারণ করা  
যায়।

## উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে রাসায়নের ভূমিকা

রবীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়\*

মাছ ও অন্তান্ত প্রাণীর মত উদ্ভিদের দেহও  
নানাপ্রকার রাসায়নিক উপাদানে গঠিত।  
আমাদের দেহের পুষ্টি ও বৃদ্ধি যেমন করেকটি  
হরমোনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে থাকে, উদ্ভিদ-  
দেহের পুষ্টি এবং বৃদ্ধিও তেমনি করেকটি হরমোনের  
দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়।

হরমোন হচ্ছে কতকগুলি রাসায়নিক উপাদানে  
গঠিত এমন এক প্রাণীর পদার্থ, যা দেহের কোন  
বিশেষ ক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে থাকে। মাছ ও  
অন্তান্ত প্রাণীর দেহে অন্তঃপ্রাণী হরমোনগুলির  
সন্ধান বহু পূর্বেই পাওয়া গেছে এবং সেগুলিকে  
সনাক্ত করাও সম্ভব হয়েছে। কিন্তু উদ্ভিদ-দেহের  
হরমোনগুলির সন্ধান ও সেগুলির সনাক্তকরণ সম্ভব  
হয়েছে সাম্প্রতিক কালে।

এখন পর্বত উদ্ভিদ-দেহের পুষ্টিসহায়ক তিন-  
প্রাণীর গুরুত্বপূর্ণ হরমোনের সন্ধান পাওয়া গেছে।  
এই তিন প্রাণীর হরমোন হচ্ছে, অক্সিন (Auxin)

জিবারেলিন (Gibberelin) এবং সাইটোক্রি-  
নিন (Cytokinin)। এই তিন প্রাণীর হরমোনের  
আলোচনা প্রসঙ্গে আর একটি হরমোনের কথা  
স্বতাবতঃই এসে পড়ে—যার প্রভাব হচ্ছে  
বিপরীত, অর্থাৎ যা উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে  
সহায়তা না করে বরং তা রোধ করে থাকে।  
সেটি হচ্ছে অ্যাবসিসিক অ্যাসিড (Abscissic  
acid) বা সংক্ষেপে ABA।

উদ্ভিদের শারীরতাত্ত্বিক কার্যকলাপ নিয়ন্ত্রণে  
এই হরমোনগুলির ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। করেকটি  
জৈবিক পরীক্ষার দেখা গেছে, ABA-এর ভূমিকা  
হচ্ছে অপর তিনটি হরমোনের বিপরীত; অর্থাৎ  
প্রযোজ্য হরমোন তিনটি যেখানে উদ্ভিদের পুষ্টি ও  
বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, ABA সেখানে উদ্ভিদের  
পুষ্টি ও বৃদ্ধি রোধের পক্ষে সহায়ক হয়। এই

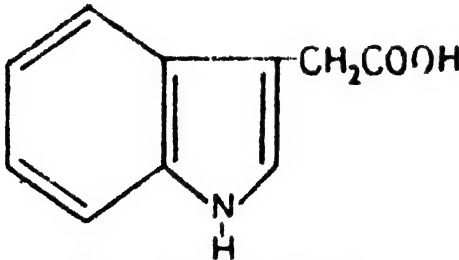
\*দ্র ক্যালকাটা কেমিক্যাল কোং লিঃ, কলিকাতা-  
29।

এসঙ্গে ইথিলিনের (Ethylene) কথাও উল্লেখ করতে হয়। দীর্ঘকাল থেকে জানা আছে, উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির নিয়ন্ত্রক হিসাবে ইথিলিনের প্রভাব আছে বশেষ্টে এবং উদ্ভিদের দোহাত্যন্তরেই তা সংশ্লেষিত হয়ে থাকে। এই নিবন্ধে আমাদের আলোচনা সীমিত থাকবে উদ্ভিদের পুষ্টি সহায়ক তিন শ্রেণীর হরমোনের মধ্যে।

### অক্সিন

উদ্ভিদের দেহে অক্সিনের প্রভাবে বেসব প্রতিক্রিয়া দেখা যায়, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে—কান্ডের দৈর্ঘ্য বৃদ্ধি, মূলের বৃদ্ধিরোধ, অস্থানিক মূলের উৎপত্তি, পাতা ও কলের পতনরোধ এবং পরাগযোগ ছাড়াই কলের উৎপত্তি।

উদ্ভিদ-দেহ থেকে বেসব অক্সিন এখন পর্যন্ত পৃথক করা সম্ভব হয়েছে, তার মধ্যে প্রধান হচ্ছে ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড বা সংক্ষেপে AA।



ইণ্ডোল-3-অ্যাসেটিক অ্যাসিড

অল্পরূপ প্রতিক্রিয়া বহু সংশ্লেষিত অক্সিন যৌগেও দেখা গেছে। এই ধরনের সংশ্লেষিত অক্সিন বর্তমানে বিশেষ বিশেষ আগাছানাশক হিসাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। লম্বু জ্বপে অক্সিনগুলি আগাছা বিনাশে খুবই কার্যকর। কিন্তু অধিক মাত্রার অক্সিন ব্যবহার করলে মূল গাছই ছু-এক সপ্তাহের মধ্যে মরে যায় অথবা কাণ্ড বিলীর্ণ হয়ে ও পাতার আকার বিকৃত হয়ে কিতুতকিমাকার হয়ে দাঁড়ায়।

বিশেষ বিশেষ উদ্ভিদের উপর অক্সিন-গুলি যে কাজ করে, তার মূলে আছে কয়েকটি কারণ :

(1) বেসব গাছ অক্সিনের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, যেখা যার সাধারণতঃ তাদের পাতা প্রশস্ত ও অল্পভূমিকভাবে ছড়ানো হয়ে থাকে। এর ফলে বীকতর (Herbicide) জ্বপ বধন শ্রে করে পাতার উপর ছিটানো হয়, তখন সেই জ্বপের কণাগুলি সহজেই পাতার লেগে থাকে; কিন্তু বেসব গাছের পাতা সরু ও ঝাড়াভাবে ছড়ানো থাকে, তাদের পাতার উপর এই জ্বপের কণাগুলি লেগে থাকে না এবং তার ফলে এই সব গাছে অক্সিন জ্বপের তেমন কার্যকারিতা দেখা যায় না।

(2) অক্সিনের আগাছানাশক বিকিরণের একবীজপত্রী উদ্ভিদের তুলনায় দ্বিবীজপত্রী উদ্ভিদ তাড়াতাড়ি প্রভাবান্বিত হয়।

(3) কোন কোন উদ্ভিদের দ্বকে বীকতর সহজেই অল্পপ্রবেশ করে। সংশ্লেষিত অক্সিনের অনেকগুলির ক্রিয়া উদ্ভিদ-দেহে দীর্ঘস্থায়ী হয়, কারণ IAA-এর মত জৈবিক বিক্রিয়ার তারা সহজে বিঘ্নিত হয় না।

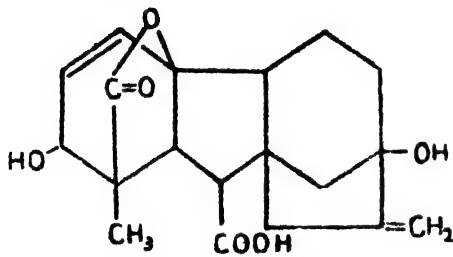
ব্যবহারিক ক্ষেত্রে অক্সিনের আর একটি মূল্যবান উপযোগিতা হলো—যেখানে প্রাকৃতিক পরাগযোগ ঘটে না, সেখানে অক্সিনের সাহায্যে উদ্ভিদে কল উৎপাদন করা যায়। সংশ্লেষিত অক্সিনের জ্বপ বধন টোম্যাটো গাছের উপর শ্রে করা হয়, তখন একেবারে স্বাভাবিকভাবেই সে গাছে কল ধরে এবং সেই কলে সাধারণতঃ কোন বিচি থাকে না।

### জিব্বারেলিন

বর্তমান শতাব্দীর চতুর্থ দশকে জাপানে এই শ্রেণীর হরমোন প্রথম আবিষ্কৃত হয়। জাপানে ধানগাছে Gibberella fujikuroi নামে এক প্রকার ছত্রাকের দ্বারা সৃষ্টি রোগ সম্পর্কে অল্প-সন্ধান চালানোর সময় জিব্বারেলিন আবিষ্কৃত হয়। বেসব ধান গাছ এই ছত্রাকের দ্বারা



আজ্ঞাত হয় নি, তাদের সঙ্গে তুলনা করে দেখা গেছে, এই ছত্রাকাক্রান্ত ধানগাছ তাদের চেয়ে সূক্ষ্ম ও লম্বা হয় এবং বৃদ্ধির দিক থেকে তাদের ছাড়িয়ে যায়। 1938 সালে এই ছত্রাকের কোষহীন নির্বীজিত নির্বাণে এমন একটি রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পাওয়া যায়, যা উদ্ভিদদের বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক। জাপানী বিজ্ঞানীরা এই নির্বাণ থেকে রাসায়নিক পদার্থটিকে পৃথক করতে সক্ষম হন এবং তার নাম দেন জিবারেলিন। এখন পর্যন্ত 27টি জিবারেলিন সনাক্ত করা গেছে। এদের মধ্যে সমধিক পরিচিত হচ্ছে জিবারেলিক অ্যাসিড  $GA_3$ । বাণিজ্যিক



জিবারেলিক অ্যাসিড

ভিত্তিতে এই রাসায়নিক পদার্থটি প্রস্তুত করা হয় ছত্রাক চাষের পচন (Fermentation) থেকে। রাসায়নিক গঠন-বৈশিষ্ট্যের বিচারে  $GA_3$  থেকে অপরূপ জিবারেলিনের পার্থক্য অতি সামান্যই, কিন্তু জৈবিক ক্রিয়াকলাপে তাদের মধ্যে পার্থক্য প্রচুর। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় Forget Me Not নামক ফুলগাছে  $GA_7$  এবং  $GA_1$  ব্যবহার করে সহজেই ফুল উৎপাদন করা যায়, কিন্তু  $GA_3$ ,  $GA_4$ ,  $GA_5$  এবং  $GA_6$  ব্যবহার করলে ফুল ধরে না।

জৈবিক ক্রিয়াকলাপের তারতম্যের হেতু সম্পর্কে বিজ্ঞানীদের অতিমত হচ্ছে, এই ফুলের গাছগুলি সাধারণত: পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করে বহুদূর সম্ভব বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। কিন্তু এই শ্রেণীর খর্বকার গাছগুলি

পর্যাপ্ত পরিমাণে জিবারেলিন উৎপাদন করতে পারে না বলে তাতে ফুল ধরে না। লক্ষ ভাগের এক ভাগ ঘনত্বে যদি জিবারেলিন রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়, তাহলে দেখা যায়, উদ্ভিদের বিটপ ও অজ্ঞাত অঙ্গের বৃদ্ধি ঘরাবিত্ত হয়। খর্বকার সীমাজাতীয় গাছের পাতার  $GA_3$ -এর উপরিউক্ত ঘনত্বের দ্রবণ ব্যবহার করলে গাছের আকারে একটা অল্পত পরিবর্তন দেখা যায়, কিন্তু এই দ্রবণ যদি প্রয়োগ না করা হয়, তা হলে আকারে কোন পরিবর্তনই দেখা যায় না।

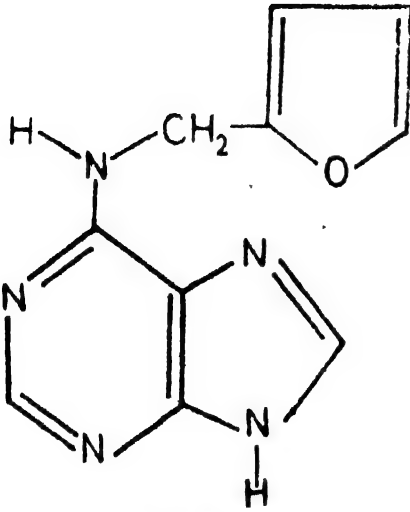
জিবারেলিনের এই বৃদ্ধিসহায়ক ক্রিয়া দেখে অন্বেষণ করা অসম্ভব নয় যে, এই ক্রিয়াকে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে উদ্ভিদের কলন বৃদ্ধির কাজে লাগানো যেতে পারে, কিন্তু এখনও পর্যন্ত তা সম্ভব হয় নি। বস্তুতপক্ষে পরীক্ষার দেখা গেছে, জিবারেলিন উদ্ভিদবিশেষের পুষ্টিবৃদ্ধিতেই শুধু সহায়তা করে, কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তার পরিমাণ বৃদ্ধির পক্ষে সহায়ক নয়। তবে ইঞ্জ-শর্করা গাছে জিবারেলিন ব্যবহার করে শর্করার পরিমাণ বৃদ্ধি করা গেছে এবং শলজাতীয় গাছের কলন বৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কিছু ফল পাওয়া গেছে।

### সাইটোকিনিন

উদ্ভিদের বৃদ্ধিসহায়ক তৃতীয় শ্রেণীর হরমোন হচ্ছে সাইটোকিনিন। 1955 সালে হেরিং স্পার্মের DNA থেকে কাইনেটিন (Kinetin) নামে একটি রাসায়নিক পদার্থ পৃথক করার পর সাইটোকিনিনের আবির্ভাব হয়। তামাকগাছের Tobacco callus টিসুতে কোষবিভাজনে (Cytokinesis) পূর্বেক্ত রাসায়নিক পদার্থটি সহায়ক বলে এর নাম দেওয়া হয় কাইনেটিন। কিন্তু বোহেল্ড  $N_6$ -প্রতিস্থাপিত অপর বহু অ্যাডোনি (Adenine) জাতীয় রাসায়নিক পদার্থ একই কল দেয়, সেহেতু তাদের থেকে পার্থক্য



বোঝাতে সাইটোকিনিন নামটির প্রস্তাব করা হয় এবং এই শ্রেণীর সমস্ত হরমোনের সাধারণ নামকরণ করা হয় সাইটোকিনিন। উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের গঠন-নিয়ন্ত্রণে, শাখা-প্রশাখার বিস্তারে এবং ফুল ও বীজের অঙ্কুরোদগম ঘরাসিত করার কাজে সাইটোকিনিন সহায়ক বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন।



কাইনেটিন

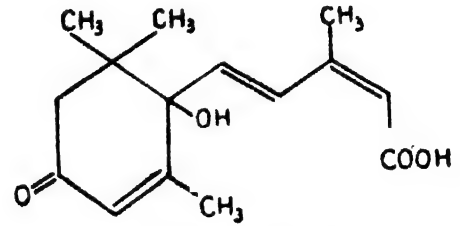
উদ্ভিদ-দেহে সাইটোকিনিন এত অল্প পরিমাণে থাকে যে, তাদের পৃথক ও সনাক্ত করা খুবই দুঃস্ব। এর ফলে 1964 সালের আগে পর্যন্ত কোন সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয় নি। 1964 সালে জুটোর অপক অন্তর্বীজ থেকে জিরাতিন (Zeatin) নামে প্রথম প্রকৃত সাইটোকিনিন পৃথক করা সম্ভব হয়। পরবর্তী কালে একাধিক উদ্ভিদ-সাইটোকিনিন আবিষ্কৃত হয়েছে।

ধর্মকার আপেল গাছের ফুল ও কলের উপর সাইটোকিনিনের ক্রিয়া পর্যবেক্ষণ করা হয়েছে। দেখা গেছে, সাইটোকিনিনের প্রভাবে আপেল কলের আকৃতি বিশেষভাবে পরিবর্তিত হয়। কি ধরণের এবং কি পরিমাণ সাইটোকিনিন ব্যবহার করা হয়, তার উপর কলের পুষ্টি ও বৃদ্ধির তারতম্য

নির্ভর করে। উদ্ভিদপালনবিদ্যার (Horticulture) অগ্নি এবং জিবারেলিন যেমন ব্যবহার করা হয়, অল্পরূপভাবে সাইটোকিনিনও প্রয়োগ করা যেতে পারে।

### অ্যাবসিজিক অ্যাসিড

আগেই বলা হয়েছে অগ্নি, জিবারেলিন ও সাইটোকিনিন যেমন উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধিতে সহায়তা করে, অ্যাবসিজিক অ্যাসিড তার বিপরীত প্রভাব বিস্তার করে থাকে; অর্থাৎ



অ্যাবসিজিক অ্যাসিড

শেষোক্ত এই হরমোনটির প্রভাবে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়ে থাকে। বৃদ্ধিরোধক এই হরমোনটিকে সর্বপ্রথম পৃথক ও সনাক্ত করা হয় 1965 সালে। ঘাস, সীম, আলু, আপেল ইত্যাদি বহু উদ্ভিদে ABA-এর অস্তিত্বের সন্ধান পাওয়া গেছে। পরীক্ষার দেখা গেছে, ABA উদ্ভিদের কল ও পাতা ত্যাগাতাড়ি ঝরিয়ে দেয় এবং ফুল ও অঙ্কুরোদগম দীর্ঘায়িত করে।

উদ্ভিদ-দেহে এই হরমোনগুলি কিস্তাবে কাজ করে, তার জৈব-রাসায়নিক পদ্ধতি এখনও পর্যন্ত সম্যকভাবে উপলব্ধি করা যায় নি। এই বিষয়ে ব্যাপক গবেষণার প্রয়োজন। এই হরমোনগুলির জৈব-রাসায়নিক ক্রিয়াকলাপ যেদিন সম্পূর্ণভাবে উপলব্ধি করা যাবে, সেদিন উদ্ভিদরাজ্যে তার উপযোগিতা পুরামাত্রার কাজে লাগানো যাবে এবং শেষ পর্যন্ত আমরা হয়তো এই হরমোনগুলির সাহায্যে উদ্ভিদের পুষ্টি ও বৃদ্ধির ক্ষেত্রে পুরাপুরি নিয়ন্ত্রণ সাধনে সক্ষম হবো।

# ভারতের মহাকাশ গবেষণা

## শঙ্কর চক্রবর্তী

গত কয়েক বছর ধরে মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে ভারতবর্ষের একটি ভূমিকা তৈরি হয়ে চলেছে। চাঁদে মানুষের অবতরণের ঘটনার পাশে এই ভূমিকাকে তত উজ্জল মনে না হলেও এর বৈজ্ঞানিক তাৎপর্য রয়েছে যথেষ্ট পরিমাণেই। বর্তমান প্রবন্ধে মহাকাশ-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতের এই ভূমিকার একটি সংক্ষিপ্ত পরিচয় আমরা গ্রহণ করার চেষ্টা করবো।

1962 সালে সংযুক্ত রাষ্ট্র পরিষদের বৈজ্ঞানিক ও কারিগরীবিজ্ঞান-সংক্রান্ত উপসমিতি মহাকাশের শান্তিপূর্ণভাবে ব্যবহারের জন্তে নিরক্ষীয় এলাকার কোন অঞ্চলে একটি আন্তর্জাতিক সড়ানী রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার কথা বিবেচনা করেন। ভারত সরকার অগ্রণী হয়ে ভারতের জমিতে এই জাতীয় একটি পরীক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠার আগ্রহ প্রকাশ করেন। ভারতের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর ভারতের পারমাণবিক সংস্থার তৎকালীন ডিরেক্টর ডক্টর হোমি ভাবা এবং মহাকাশ গবেষণা কমিটির প্রধান ডক্টর বিক্রম সরাস্বতীর উপর এই রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র সংগঠনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয়। তিন মাসের মধ্যে ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে থুবা নামে একটি জায়গাকে এই কাজের স্থান হিসেবে নির্বাচন করা হলো।

থুবা থেকে 1963 সালের 21শে নভেম্বর ভারতের প্রথম সড়ানী রকেট উৎক্ষেপণ করা হয়েছিল।

### থুবা

থুবা ভারতের দক্ষিণ প্রান্তে কেরালা রাজ্যের রাজধানী ত্রিভুবান নগর থেকে 16 কিলোমিটার

উত্তরে অবস্থিত। থুবুর সবচেয়ে বড় ভৌগোলিক বিশেষত্ব হলো, জায়গাটি রয়েছে পৃথিবীর চৌম্বক বিবুরেখার উপর। পৃথিবীর চৌম্বক বিবুরেখার কাছাকাছি মহাদেশের জমির উপর থুবুর মত রকেট উৎক্ষেপণ কেন্দ্র পৃথিবীর আর কোথাও নেই।

পৃথিবীর চৌম্বক বিবুরেখার উপর কোন জায়গা থেকে বৈজ্ঞানিক অন্বেষণকার্যের বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। কারণ এখানে বায়ুমণ্ডলের উচ্চ অঞ্চলে, ভূপৃষ্ঠের উপর 90 থেকে 130 কিলোমিটারের মধ্যে একটি Electrojet বা বিদ্যুৎপ্রবাহ প্রবাহিত হচ্ছে। এই বিদ্যুৎপ্রবাহের প্রকৃতি এবং ধর্ম সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানীরা আজও সঠিকভাবে জেনে উঠতে পারেন নি। কিন্তু গোটা পৃথিবীর আবহাওয়া তৈরির পিছনে ঐ বিদ্যুৎপ্রবাহের যে একটি সুদূরপ্রসারী প্রভাব রয়েছে, তা সহজেই বোঝা যাচ্ছিল।

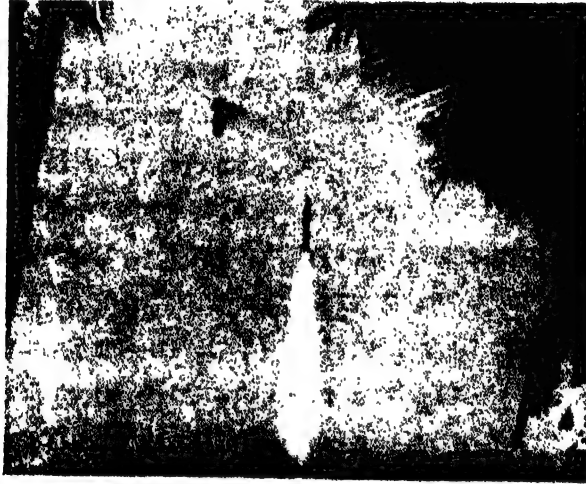
চৌম্বক বিবুরেখার কাছে পৃথিবীর চৌম্বক কেন্দ্র পুরাপুরিভাবে অসুস্থ অবস্থার রয়েছে। পৃথিবীর চৌম্বক কেন্দ্রের প্রভাব আবার তাড়ত মহাসাগরীর অঞ্চলে সবচেয়ে জোরালো এবং দক্ষিণ আমেরিকার উপর সবচেয়ে দুর্বল। পৃথিবীর চৌম্বক বিবুরেখার কাছাকাছি মির অকায়নের অঞ্চলে মহাজাগতিক রশ্মির অত্যন্ত শক্তিশালী কণাসমূহ এসে বায়ুমণ্ডলে প্রবেশ করে।

এসব কারণের জন্তে থুবুর উপরে কয়েক-শ' কিলোমিটার বিস্তৃত একটি অঞ্চল রয়েছে (এর অবস্থিতি হলো আরনবণ্ডলের F স্তরের উপরে), যার বৈজ্ঞানিক অন্বেষণকার্য থুবুই গুরুত্বপূর্ণ।

চৌম্বক বিদ্যুৎবাহকের উপর কোন জারণ থেকে আয়নমণ্ডল-সংক্রান্ত গবেষণারও বিপুল সম্ভাবনা রয়েছে।

বায়ুমণ্ডলের যে অঞ্চল পৃথিবীপৃষ্ঠের উপরে 30 কিলোমিটার থেকে 200 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে অবস্থিত, সন্ধানী রকেট হলো তার গবেষণার একমাত্র মাধ্যম। কারণ এই অঞ্চলটি যেমন গবেষণার যন্ত্রপাতিসম্প্রদিত বেলুনের পরিক্রমা-অঞ্চলের উদ্দেশ্যে, তেমনি আবার কৃত্রিম উপগ্রহগুলির

ছিল এক স্তরবিশিষ্ট। ঘণ্টায় এটি প্রায় 3500 কিলোমিটার বেগে অর্জন করেছিল এবং পৃথিবী থেকে এর সর্বোচ্চ দূরত্ব দাঁড়িয়েছিল প্রায় 180 কিলোমিটার। পৃথিবী থেকে 100 কি.মি. দূরত্বে রকেটটির মাধ্যমে বসানো Payload-স্বপ্নী আবার থেকে 30 কিলোগ্রামের মত সোডিয়াম বাষ্প নির্গত করে একটি কৃত্রিম মেঘের সৃষ্টি করা হয়। সুর্বাণীকৃত সেই মেঘের চেহারা যে রকম সর্পিলা গতি লাভ করেছিল, দক্ষিণ ভারতের কয়েকটি



ভারতের পৃথ্বা কেজ্জে তৈরী একটি রকেট উৎক্ষেপণ করা হচ্ছে

পরিক্রমা-পথেরও অনেক নীচে অবস্থিত। এই অঞ্চলের অল্পসন্ধানের কাজে পৃথ্বা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছে। সন্ধানী রকেটের পরিকল্পনা যথেষ্ট ব্যয়বহুল না হবার কালে ভারতবর্ষের পক্ষে তাকে কাজে রূপ দেওয়াও সম্ভব ছিল।

### সন্ধানী রকেট

1963 সালের 21শে নভেম্বর পৃথ্বা কেজ্জে থেকে উদ্ঘাটকালে প্রথম যে রকেটটি ছোঁড়া হয়, সেটি পাওয়া গিয়েছিল আমেরিকার National Aeronautics and Space Administration বা NASA নামে বৈজ্ঞানিক সংস্থার কাছ থেকে। রকেটটি

জারণ থেকে তার আলোকচিত্র গ্রহণ করে উদ্ঘাটকালে বায়ুমণ্ডলের গতিবিধি ও তাপমাত্রা সম্বন্ধে বেশ কিছু নতুন তথ্য সংগৃহীত হয়।

পৃথ্বাতে আন্তর্জাতিক সহযোগিতার ক্ষেত্র ক্রমেই বিস্তৃত হতে থাকে। কানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, পশ্চিম জার্মানী, জাপান প্রভৃতি দেশের বিজ্ঞানীরা এখানে বিভিন্ন বৈজ্ঞানিক পরীক্ষাকার্যে অংশগ্রহণ করতে থাকেন।

1967 সালের 31শে অগাস্ট পৃথ্বা থেকে রোহিণী নামে দুটি রকেট ছোঁড়া হয়। এই রকেট দুটির সমগ্র অংশ তৈরি করেছিলেন ভারতীয়

বিজ্ঞানীরা—এটিই ছিল ঘটনাটির সবচেয়ে বড় বিশেষত্ব।

পৃথা থেকে গত কয়েক বছর ধরে ভূগুণের প্রায় 50 কি. মি. উচ্চতার বায়ুগুণ-সংক্রান্ত গবেষণার জন্মে মেনকা নামে বেশ কিছু আবহাওয়া রকেট পাঠানো হয়েছে। ভারতের মোসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি বোঝবার জন্মে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ব্যাপক আবহাওয়া-সংক্রান্ত অন্বেষণের প্রয়োজনীয়তা বিজ্ঞানীরা অনেক দিন ধরেই উপলব্ধি করছিলেন। টাইরস ও নিখাস শ্রেণীর আবহাওয়া উপগ্রহগুলির কাছ থেকে Automatic Picture Transmission System-এর মাধ্যমে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলের মত ভারত মহাসাগরীয় এলাকারও বহু ছবি (প্রতিটি প্রায় 10 লক্ষ কিলোমিটারব্যাপী অঞ্চল জুড়ে) বোম্বাইয়ের কোলাবাতে আবহাওয়া কেন্দ্রের হাতে এসে পৌঁছয়। এই সব ছবির মাধ্যমে ভারত মহাসাগরে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে জুলাই মাসেও সবচেয়ে ঘন দুটি মেঘের স্তরের অস্তিত্ব ধরা পড়ে, যে দুটি স্তরের মাঝে আবার ঘন ঘন একটি মেঘের স্তরও ছিল। ভারতের দক্ষিণ-পশ্চিম মোসুমী বায়ুর অন্বেষণের কাজে একে একটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্যরূপে গণ্য করা হচ্ছে।

পৃথা বর্তমানে একটি আন্তর্জাতিক আবহাওয়া গবেষণা কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছে। পৃথার বিশেষ ভৌগোলিক অবস্থানের জন্মে শান্তিপূর্ণ কাজে মহাকাশ গবেষণার সহযোগিতার উদ্দেশ্যে ভারতের প্রধান মন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী 1968 সালের গোড়ার দিকে পৃথা কেন্দ্রটিকে রাষ্ট্রদূতের হাতে অর্পণ করেন।

1969 সালের 26-শে ফেব্রুয়ারী পৃথাতে সেক্টর নামে একটি রকেটের পরীক্ষার কাজ সাকল্য-যুক্ত হয়। ফ্রান্সের সঙ্গে সহযোগিতার ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা দুই স্তরবিশিষ্ট এই রকেটটিকে এদেশেই তৈরি করেন। ফ্রান্সেরই

সাহায্যে সেক্টর রকেটের জন্মে প্রয়োজনীয় কঠিন জালানী তৈরির একটি কারখানাও পৃথাতে চালু করা হয়েছে, যেখানে পরবর্তী কালে সম্পূর্ণভাবে ভারতীয় মালয়নকার সাহায্যে জালানী তৈরির ব্যবস্থাকে গড়ে তোলা হবে।

### মহাকাশ গবেষণা

পৃথা মহাকাশ কেন্দ্র থেকে এপর্যন্ত 70টিরও বেশী সন্ধানী রকেট মহাকাশে পাঠানো হয়েছে এবং ভারতে তৈরী 50টিরও বেশী রকেটকে সাকল্যের সঙ্গে ছোঁড়া হয়েছে। রকেট প্রকল্পের মাধ্যমে ভারতের মহাকাশ গবেষণার বৈজ্ঞানিক উদ্দেশ্যকে প্রধানতঃ চারটি ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথমতঃ, উৎসর্গাক্ষের অন্বেষণের মধ্য দিয়ে আয়নমণ্ডলের তড়িৎচৌম্বক কণিকা বা আয়ন এবং তড়িৎনিরপেক্ষ (Neutral) কণিকা সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করা। দ্বিতীয়তঃ, ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর যে Electrojet বা বিদ্যুৎ-প্রোত প্রবাহিত হচ্ছে, তার সঙ্গে যুক্ত চৌম্বক ও বৈজ্ঞানিক কেন্দ্র সম্বন্ধে গবেষণার কাজ পরিচালনা এবং সৌরদেহের ক্রিয়া-প্রক্রিয়ার সঙ্গে সম্বন্ধ রেখে সেগুলি কিতাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তা পর্যবেক্ষণ করা। তৃতীয়তঃ, বায়ুগুণের উপরের দুটি স্তর—ইয়াটোফিয়ার ও মেসোফিয়ার অঞ্চলে আবহবিজ্ঞা-সংক্রান্ত গবেষণা এবং চতুর্থতঃ, জ্যোতির্বিজ্ঞার কয়েকটি কেন্দ্র, বিশেষ করে দূরবর্তী নক্ষত্রলোক থেকে কি পরিমাণে রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে, তার পরিমাপ সংগ্রহ করা।

পৃথা থেকে রকেট ক্ষেপণের মাধ্যমে নিরক্ষীয় অঞ্চলের উপরে বায়ুগুণের উৎস্রের গঠন-প্রকৃতি ও গতিবিজ্ঞা-সংক্রান্ত বহু তথ্য লাভ করা সম্ভব হয়েছে। রকেটের মাধ্যম বসানো বৈজ্ঞানিক আধার থেকে বাম্পের মেঘ ছড়িয়ে দিয়ে ভূগুণের উপরে 30 থেকে 60 কিলোমিটারের মধ্যবর্তী অঞ্চলে বায়ুর বেগ মাপা হয়েছে। আবার

বায়ুগুলের মেনোফিয়ার অঞ্চলে ঐ আধার থেকে লক্ষ লক্ষ তাহার টুকরা ছড়িয়ে দিয়ে রেডারের সাহায্যে ঐ টুকরাগুলির গতি-বিধির উপর লক্ষ্য রেখে সেখানে বায়ুর গতি এবং দিক নির্ণয় করাও সম্ভব হয়েছে।

ভারতীয় বিজ্ঞানীরা আরনমণ্ডলের বৈজ্ঞানিক প্রকৃতি ও গঠনসংক্রান্ত গবেষণার ক্ষেত্রে রকেটের মাধ্যমে চালিয়ে Electron probe, Plasma roise probe, Ultraviolet detector এবং Ion mass-spectrometer জাতীয় বহু পাঠিয়েছেন।

ভূ-চৌম্বক নিরক্ষরেখার উপর বিদ্যুৎশ্রোতের গঠন, বিস্তৃতি এবং গতিবিধি সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে রকেটের মধ্যে Proton Precession Magnetometer নামক বহু পাঠানো হয়েছে। জানা গেছে, পৃথ্বীর 105 কিলোমিটার উপরে এই বিদ্যুৎশ্রোতের সর্বোচ্চ তীব্রতা হলো প্রতি বর্গ-কিলোমিটার ক্ষেত্রে 500 অ্যাম্পিয়ারের মত।

নৈনিতালে অবস্থিত উত্তর প্রদেশের রাষ্ট্রীয় মানমন্দির, আমেরিকার Smithsonian Astrophysical Observatory-র সঙ্গে সহযোগিতায় গত দশ বছর ধরে আলোকরশ্মির সাহায্যে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ পর্ববেক্ষণের কাজে নিযুক্ত রয়েছে। এই জাতীয় কাজ করা হচ্ছে পৃথিবীর আরো এগারটি কেন্দ্র থেকে। নৈনিতাল এবং অন্যান্য কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের সাহায্যে পৃথিবীর অভিকর্ষ কেন্দ্র এবং তার চেহারার সঠিক জ্যামিতিক পরিমাপ (Geodesy নামে বিজ্ঞানশাস্ত্রের বা বিষয়বস্তু) নির্ধারণ করা এবং পৃথিবীর কেন্দ্রের পরিপ্রেক্ষিতে ঐ স্থানগুলির স্থানাঙ্ক (Co-ordinates) প্রায় নিখুঁতভাবে 15 মিটারেরও কম বিচ্যুতির সঙ্গে নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছিল। এভাবে সংগৃহীত আরো কয়েকটি তথ্য থেকে জানা গিয়েছিল যে, ত্রিতাজ্রামের কাছে সমুদ্রপৃষ্ঠ সিঙ্গাপুরের নিকটবর্তী

সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় পৃথিবীর কেন্দ্রের 90 মিটার কাছে রয়েছে এবং ভোভারের কাছাকাছি ইংলিশ চ্যানেলের সমুদ্রপৃষ্ঠের তুলনায় এই নৈকট্যের পরিমাণ 140 মিটারের মত।

1962 সালে মহাকাশে X-রশ্মি নির্গমনকারী নক্ষত্রের আবিষ্কার জ্যোতির্বিজ্ঞানের জগতে এক নতুন গবেষণাক্ষেত্র উন্মুক্ত করে দিয়েছিল। এই জাতীয় বহু নক্ষত্র থেকেই কোন আলোক বা রেডিও-তরঙ্গ নির্গত হতে দেখা যায় না। 1969 সালের এপ্রিল মাসে আমেরিকাবাদের Physical Research Laboratory এবং টোকিও বিশ্ব-বিদ্যালয়ের Institute of Space and Aeronautical Science, X-রশ্মি জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ে একটি যুক্ত কার্যক্রম গ্রহণ করে। SCO-X-1, Centaurus-X-2 এবং TAU-X-1 প্রভৃতি নক্ষত্র থেকে নির্গত X-রশ্মির পরিমাণ ও শক্তির মাত্রা নিরূপণের জন্তে ঐ দুই বিজ্ঞান সংস্থা যৌথ-ভাবে রকেট উৎক্ষেপণ করেন। দক্ষিণ গোলার্ধের আকাশের একটি সাধারণ পর্ববেক্ষণ বা জরীপের কাজ করাও ঐ পরীক্ষার অন্ততম উদ্দেশ্য ছিল। SCO-X-1 নক্ষত্রটি থেকে নির্গত আলোক ও X-রশ্মির মধ্যকার পারস্পরিক সম্পর্ক আবিষ্কার করার জন্তে একই সঙ্গে ভারতের কোদাইকানাল মানমন্দিরও টোকিওর জ্যোতির্বেজ্ঞানিক মানমন্দির থেকে নজর রাখা হয়। যাবে মাঝেই সন্ধানী রকেট উৎক্ষেপণের দ্বারা ঐ নক্ষত্রটি থেকে X-রশ্মির নির্গমনের পরিমাণ সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে কিস্তাবে পরিবর্তিত হচ্ছে, তার উপর নজর রাখা হয়েছে।

#### আগামী দিনের পরিকল্পনা

পৃথা কেন্দ্রে গত আট বছরের বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর আগামী দশকের জন্তে ভারতের মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে এক বিস্তৃত কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। এই কর্মসূচীর অন্ততম

এখান লক্ষ্য—মহাকাশ গবেষণার ক্ষেত্রে গ্রহো-  
জনীর ব্যবহার সরঞ্জাম তৈরির ব্যাপারে বড়দূর  
সম্ভব ব্যবহৃত্য অর্জন করা।

পৃথ্বা একটি জনবহুল এলাকার অবস্থিত এবং  
পৃথ্বা থেকে কৃত্রিম উপগ্রহ উৎক্ষেপণ করা  
বাবে একমাত্র পশ্চিম দিকেই। কলে পৃথিবী  
পশ্চিম থেকে পূবে আপন অক্ষের উপর ঘড়ায়  
বে 1760 কিলোমিটার বেগে ঘুরে চলেছে, সেটি  
আর কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেটের দেখে  
যুক্ত হবে না। এই অস্থিবিধাগুলির কথা ভেবে  
ভারতের পূর্ব উপকূলে অন্ধ্র প্রদেশে শ্রীহরি-  
কোটের কাছে একটি ঘোঁষে আর একটি রকেট  
উৎক্ষেপণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা গ্রহণ করা  
হয়েছে। এখান থেকে রকেটগুলিকে ছোঁড়া  
হবে পূর্ব দিকে, কলে পৃথিবীর ঘড়ায় 1760  
কিলোমিটারগামী বেগ আপনা-আপনি ওদের  
দেহের সঙ্গে যুক্ত হয়ে যাবে।

আগামী দশকের ভারতীয় মহাকাশ কার্য-  
ক্রমের আর একটি কাজ হলো—স্বাধীন রকেটের  
সাহায্যে ভারতের মৌসুমী বায়ুর গতি-প্রকৃতি  
সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে আরো উন্নত করা  
এবং মাঝারি ধরনের আবহাওয়ার পূর্বাভাসকে  
আরো নিখুঁত করা। এর কলে আমাদের  
জাতীয় অর্থনীতিও বৃষ্টি পরিমাণে উপকৃত হবে,  
যেহেতু বৃষ্টির উপর আমাদের কৃষিকাজের  
এক বিরাট অংশকে এখনো নির্ভর করতে হয়।

পৃথ্বা কেন্দ্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার মধ্য দিয়ে  
নিরক্ষর অঞ্চলে, বিশেষ করে ভারত মহাসাগরীয়  
এলাকার আবহবিস্তা বিষয়ে আমাদের পূর্বকার  
ধারণা ইতিমধ্যেই অনেক বেশী সম্পূর্ণতা লাভ  
করেছে।

বিতাজ্যমে কৃত্রিম উপগ্রহগুলির গতিপথ  
পর্ববেক্ষণকারী একটি কেন্দ্র অদূর ভবিষ্যতে গড়ে  
তোলা হবে। ঐ কেন্দ্রের সংগৃহীত তথ্যের  
সাহায্যে দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন জায়গার স্থানিক

পূর্বের ভুলনার অনেক বেশী নির্ভুলভাবে নির্ধারণ  
করা সম্ভব হবে।

আমেরিকার NASA-র সঙ্গে ভারতের একটি  
চুক্তি সম্পাদিত হয়েছে। এই চুক্তি অল্পব্যয়ী  
আমেরিকা 1972 সালের মাঝামাঝি নাগাদ  
ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের উপর ভূগৃহ থেকে  
35,900 কিলোমিটার দূরে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে  
একটি কৃত্রিম উপগ্রহ প্রতিষ্ঠা করবে এবং দু-বছরের  
ক্ষেত্রে তার ব্যবহারের সম্পূর্ণ সুযোগ ভারতের  
হাতে ছেলে দেবে। সমগ্র ভারতভূমি থেকে  
কৃত্রিম উপগ্রহটিকে সব সময়েই মাথার উপরে  
একই জায়গার স্থিরভাবে অবস্থান করতে দেখা  
যাবে।

উপগ্রহটির দৃষ্টগোচর এলাকার ছুটি বহু দূরবর্তী  
অঞ্চল এই synchronous বা সমগতিসম্পন্ন  
কৃত্রিম উপগ্রহটির মাধ্যমে পরস্পরের মধ্যে অতি  
নিখুঁত রেডিও ও টেলিভিসন যোগাযোগ  
ব্যবস্থাকে গড়ে তুলতে পারবে। টেলিভিসন  
অনুষ্ঠানকে বহু দূরবর্তী কোন স্থানে পৌঁছে  
দেবার ক্ষেত্রে যে একাধিক রিলে ঠেশের প্রয়োজন  
হয়, একেজে সে ছাড়াই কাজ চলবে। আমেরিকা-  
বাদে, কৃত্রিম উপগ্রহের সঙ্গে পরীক্ষামূলকভাবে  
যোগাযোগ স্থাপনের ক্ষেত্রে যে কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা  
করা হয়েছে, তা আলোচ্য কৃত্রিম উপগ্রহটির  
কাছে ভারতের টেলিভিসন অনুষ্ঠানকে পৌঁছে  
দেবে

ভারতীয় বিজ্ঞানীদের দৃঢ় বিশ্বাস, আগামী  
1973 সাল নাগাদ তারা ভারতের প্রথম কৃত্রিম  
উপগ্রহকে মহাকাশে প্রতিষ্ঠা করতে পারবেন।  
কৃত্রিম উপগ্রহটির বাহক রকেট হবে চারটি  
পর্দারবিশিষ্ট, রকেটের মাথায় চাপানো উপ-  
গ্রহরূপী বৈজ্ঞানিক আধারটির ওজন হবে 30  
কিলোগ্রামের মত এবং ভূগৃহ থেকে 400  
কিলোমিটারের দূরবর্তী একটি কক্ষপথে বসতি

পৃথিবীকে পরিক্রমা করে চলবে। কৃত্রিম উপগ্রহের বাহক রকেট, আন্তরীক্ষীয় এবং রকেটের গতিবিধি নিয়ন্ত্রণের উপযোগী জটিল যন্ত্রপাতি সংক্রান্ত গবেষণা এবং নির্মাণের কাজ খুবই মহাকাশ-বিজ্ঞান এবং প্রযুক্তিবিজ্ঞান কেন্দ্রে চলছে।

এই দশকের শেষের দিকে 1980 সাল নাগাদ মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি যে পর্যায়ে পৌঁছবে, তাতে প্রায় 1200 কিলোগ্রাম ভরবিশিষ্ট একটি রেডিও ও টেলিভিসন যোগা-

যোগ রক্ষাকারী কৃত্রিম উপগ্রহকে ভূপৃষ্ঠের 35,900 কিলোমিটার উর্ধ্বে একটি বৃত্তাকার কক্ষপথে প্রতিষ্ঠার আশা রাখেন ভারতীয় বিজ্ঞানীরা। এটি হবে একটি synchronous কৃত্রিম উপগ্রহ এবং ওকে সব সময়ে একই জায়গায় অবস্থান করতে দেখা যাবে।

মহাকাশ-বিজ্ঞানে ভারতের অগ্রগতি ক্রমেই সৃষ্টির পথে এগিয়ে চলবে, সে আশাই আমরা পোষণ করি।

## পেঁয়াজ

### প্রণবকুমার তপস্বী\*

খাদ্যশস্ত্রের মধ্যে পেঁয়াজ একটি পরিচিত নাম। পৃথিবীর সর্বত্র এর জনপ্রিয়তা অবিসংবাদিত। পেঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম *Allium cepa*, এটি লিলি পরিবারের অন্তর্গত। এর আদি জন্মস্থান মধ্যপ্রাচ্যে। তাছাড়া পশ্চিম এশিয়া ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলেও প্রাচীনকাল থেকে এর চাষ হয়ে আসছে। বর্তমানে পেঁয়াজ পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই জন্মায়—বিশেষ করে উষ্ণ অঞ্চলে এর ব্যাপক চাষ হয়। ভারতবর্ষে উৎপন্ন প্রধান প্রধান শস্তের মধ্যে পেঁয়াজ একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করে আছে। অধিকাংশ তৈরী খাদ্য-দ্রব্যের মধ্যে পেঁয়াজ একটি অবিচ্ছেদ্য অংশ। মাছ, মাংস কিংবা ডিমের তরকারীতে এটি অবশ্য প্রয়োজনীয়। তরকারীর বাদ ও মান বাড়াতে পেঁয়াজের বিকল্প নেই।

পেঁয়াজের উপকারিতা—পেঁয়াজ চক্ষুরোগের একটি ভাল ঔষধ। চোখ টনটন করা, চোখ দিয়ে জল পড়া, কিংবা চোখের দৃষ্টি কমে যাওয়া, চোখ লাল হওয়া ও পিঁচুটি পড়া প্রভৃতি রোগ পেঁয়াজ উপশম করে প্রত্যহ সকালে বা রাতে

শোবার আগে একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খেলে চোখের কোন রোগের ভেদন আশঙ্কা থাকে না এবং চোখের দৃষ্টিশক্তিও বৃদ্ধি পায়।

দাঁত ভাল রাখবার জন্তে পেঁয়াজ খুব উপকারী। পেঁয়াজ চিবানোর কালে এথেকে মুখের মধ্যে যে রস নির্গত হয়, তা দাঁত এবং মুখের ক্ষতিকারক জীবাণুগুলিকে ধ্বংস করে অথবা ঐগুলির আক্রমণের আশঙ্কা দূর করে। এর কালে দাঁত ও মুখগহ্বর জীবাণুশূন্য হয় এবং সজীবতা লাভ করে। সম্প্রতি একজন ব্যাতনামা রাশিয়ান চিকিৎসক মন্তব্য করেছেন যে, কেউ যদি প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ চিবিয়ে খায়, তাহলে সে কখনও দাঁত বা মাড়ির রোগে ভুগবে না।

পেঁয়াজের আর একটি গুণ হচ্ছে—উষ্ণ অঞ্চলে গ্রীষ্মকালে লু-এর আক্রমণের বিরুদ্ধে এর ব্যবহার। যদি কেউ প্রত্যহ একটি করে পেঁয়াজ খায়, তবে সে লু-এর আক্রমণের



বিক্রমে পূর্ণ প্রতিরোধশক্তি অর্জন করবে। অনেকের ধারণা, কেউ যদি সারাদিন পকেটে একটি করে পেরাজ রাখে—তাতেও নাকি সু-এর আক্রমণ ঠেকিয়ে রাখা যায়। সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে, গরম দেশে মারাত্মক সু-এর আক্রমণের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্যে পেরাজ যান্ত্রিকের পরম বন্ধুর মত কাজ করে।

পেরাজের সবচেয়ে বড় গুণ (যার খবর এখনও অনেকেই জানেন না) হচ্ছে হৃদ্রোগে এর বিশিষ্ট ভূমিকা। অনেকেই জানেন, শিরার অভ্যন্তরে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়া হৃদ্রোগের একটি অন্ততম কারণ। রক্তজমাট বাঁধবার কাজে অন্ততম উল্লেখযোগ্য উপাদান হচ্ছে কাইব্রিন (Fibrin)। এটি স্রুত পুতায় মত জিনিষ, যা রক্তের কোষগুলিকে ঘিরে ধরে প্রোটিনেট নামক আর এক প্রকার কোষের সহযোগিতায় রক্তকে জমাট বাঁধায়। সাধারণতঃ শরীরের মধ্যে এই রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ হয় না। কোন কারণে কেটে গেলে রক্ত বাইরে বেরিয়ে এসে জমাট বাঁধে। কিন্তু শরীরের শিরা-উপশিরার মধ্যে হঠাৎ যদি কাইব্রিন রক্ত জমাট বাঁধবার কাজ আরম্ভ করে দেয়, তখন সেই জমাট-বাঁধা রক্ত ব্যতীক রক্ত চলাচলের পথ বন্ধ করে দেয় এবং হৃৎপিণ্ডের উপর প্রবল চাপের সৃষ্টি করে। এটাই হৃদ্রোগের একটি অন্ততম কারণ। পেরাজের ভূমিকা হলো, এটি জমাট-বাঁধা রক্তের মূল কারণ কাইব্রিনকে কাইব্রিনোলাইসিস (Fibrinolysis) অর্থাৎ তরল করে দেয়, যাতে জমাট রক্তও অপসারিত হয়ে যায় এবং রক্তের চলাচল আবার স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। ক্রান্তে একটা রীতি প্রচলিত আছে, যখন কোন ঘোড়ার পায়ের শিরার মধ্যে রক্ত জমাট বাঁধে, তখন তাকে পেরাজের তরকারী খাইয়ে সারিয়ে তোলা হয়। এই ক্ষেত্রে ধরে তিনজন ভারতীয় বিজ্ঞানী—ডাঃ এন. এন. গুপ্ত, আর. বেহেরোয়া এবং এ. সরকার ১৯৬৬ সালে

সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন যে, চর্বিযুক্ত খাতের সঙ্গে পেরাজ যোগ করে হৃদ্রোগীকে খাওয়ালে রোগীর রক্তের ঘনিত জমাট বেঁধে যাওয়া কমে তো যায়ই। উপরন্তু কাইব্রিনের রক্ত জমাট বাঁধবার ক্ষমতাও কমিয়ে দেয় অর্থাৎ কাইব্রিনের তরল হয়ে যাবার প্রক্রিয়া ত্বরান্বিত করে। এর পর ডাঃ মেনন ও তাঁর সহকর্মীরা তাজা পেরাজ ও সিদ্ধ পেরাজ নিয়ে আরও কাজ করেন এবং দেখান যে, রক্তের কাইব্রিনোলাইসিসের ক্ষমতা তাজা পেরাজের আরও বেশী পরিমাণে আছে।

পেরাজের মধ্যে আছে মূল স্নেহজাতীয় পদার্থগুলি (Essential oils), Allypropyl, Disulphide, Catechols, Thiopropione-aldehyde, Protocatechuic acid, Thiocyanates এবং কিছু ক্যালসিয়াম, কস্করাস, লৌহ এবং ভিটামিন। এগুলির মধ্যে কোনটি বা কোনগুলি এই কাইব্রিনোলাইসিস ত্বরান্বিত করার কারণ, তা এখনও জানা সম্ভব হয় নি। জানা গেলে শুধু সেই জিনিষটি দিয়েই হৃদ্রোগের আরও ভাল ওষুধ তৈরি করা সম্ভব হতে পারে।

তাহলে দেখা যাচ্ছে যে, হৃদ্রোগীদের পক্ষেও পেরাজ একটি বিশেষ উপকারী পদার্থ। প্রত্যেক হৃদ্রোগী বা প্রেসারের রোগী প্রত্যহ কিছুটা করে তাজা পেরাজ বা পেরাজি অথবা পেরাজ সিদ্ধ খান (অমৃত পেটের অবস্থা বুঝে) তাহলে হৃদ্রোগের হঠাৎ আক্রমণ থেকে কিছুটা নিশ্চিত থাকতে পারবেন। প্রত্যহ পেরাজ তরল হৃদ্রোগের অন্ত যে কোন পেটের ওষুধ অপেক্ষা অনেক বেশী কলদায়ক।

চিকিৎসার ক্ষেত্রে পেরাজের আরও অনেক ব্যবহার দেখা যায়। দিনে দিনে পেরাজের আরও অনেক গুণ আবিষ্কৃত হচ্ছে। অমিশ্র, সর্দি, ইনফ্লুয়েন্স প্রভৃতি রোগেও পেরাজ ভাল কাজ করে।



# মহাবিশ্ব

আবুল হক খন্দকার \*

দিনের বেলায় সূর্যের প্রথম আলোর মহাকাশের অনেক কিছুই আমাদের দৃষ্টির অগোচরে থেকে যায়। মনে হয়, আমাদের এই পৃথিবী এবং দূর আকাশের সূর্য ছাড়া বিশ্বলোকে বেন বিশ্বরূপ আর তেমন কিছুই নেই। কিন্তু সূর্য যখন বিদ্যায় নেয়, তখন বেশ বোঝা যায়—মহাকাশে শুধু সূর্য আর পৃথিবীই নয়, আরও অনেক রহস্যময় বস্তু রয়েছে—আকাশের চাঁদ, রাশি রাশি তারকা, বিচিত্র নীহারিকা, আবহা মেঘের মত দিগন্তবিস্তৃত হারাপথ ইত্যাদি। আকাশের এই জ্যোতিষ্কগুলির মধ্যে কোনটি উজ্জ্বল, কোনটি নিম্নস্ত, কোনটি বা মিটমিট করে জলে, কোনটিকে আবার মনে হয় বেন স্থির, নিদ্রা। যেগুলি মিটমিট করে জলে, সেগুলি হলো তারা, আর যেগুলি স্থির কিরণ ছড়ায়, সেগুলি হলো গ্রহ অথবা উপগ্রহ। গ্রহের সংখ্যা অবশ্য বেশী নয়—আমাদের মধ্যে এখন এদের সংখ্যা হলো নয়টি। কিন্তু তারার সংখ্যার কোন পরিমাপ করা সম্ভব নয়—সারা জীবনেও গুণে শেষ করা যাবে না।

এদের মধ্যে ঔজ্জ্বল্য এবং দীপ্তিতে যেটি সহজেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সেটি হলো চাঁদ—পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ, সকল জ্যোতিষ্করাশির মধ্যে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশী। চাঁদকে যদিও আমরা সবচেয়ে কাছের প্রতিবেশী বলছি—তবুও পৃথিবী থেকে তার দূরত্ব প্রায় দু-লক্ষ উনচল্লিশ হাজার মাইলের মত। রাতের আকাশে চাঁদ সবচেয়ে উজ্জ্বল দেখালেও তার কিরণ কিন্তু দুর্বল। অবশ্য এই আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্যের আলো চাঁদের বৃক্কে প্রতিফলিত হয়েই এই দিগ্ধ আলোর

উৎপত্তি ঘটিয়ে থাকে। পৃথিবী থেকে চাঁদের জন্ম অধুনা হয়েছে—চাঁদাশিলা পরীক্ষা করে সম্প্রতি এই মতবাদ সবচেয়ে অবশ্য সন্দেহ করা হয়েছে।

পৃথিবী থেকে সূর্যের গড় দূরত্ব প্রায় ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল। চাঁদ পৃথিবীর চেয়ে আকারে ছোট—পৃথিবীর প্রায় এক-চতুর্থাংশ, কিন্তু সূর্য পৃথিবীর চেয়ে আরতনে ১৩ লক্ষ গুণ বড়, অর্থাৎ সূর্যের দেহের মধ্যে পৃথিবীর মত ১৩ লক্ষ বিরাটকার বস্তুপিণ্ড অনায়াসে স্থান পেতে পারে। পৃথিবী থেকে বহুদূরে আছে বলেই সূর্যকে অত ছোট দেখা যায়—আসলে কিন্তু সূর্যই আমাদের সব কিছু। সূর্য একদিকে যেমন আমাদের পৃথিবীর জন্মদাতা, তেমনি আমাদের সকল সম্ভা—আমাদের জীবনধারণের সকল রকমের শক্তি এবং কর্মপ্রেরণার মূল উৎস। শুধু পৃথিবীর উপরই যে সূর্যের আধিপত্য, তা নয়—সমগ্র সৌরজগৎ জুড়েই রয়েছে তার বিশাল প্রভাব। নয়টি গ্রহ এবং তাদের উপগ্রহ (সর্বমোট ৩১টি) ও গ্রহাছাড়া প্রভৃতি নিয়ে মহাশূন্তের কোটি কোটি মাইল জুড়ে যে সৌরজগৎ বিস্তৃত, তার মধ্যে সূর্যই একমাত্র সম্রাট। তার বিপুল মহাকর্ষের আকর্ষণে গ্রহগুলি তার সৃষ্টির আদি থেকে তাকে অবিরাম প্রদক্ষিণ করে চলেছে। সূর্যের বিপুল শক্তির সামান্য অংশ লাভ করেই পৃথিবী হয়েছে এমন শক্তিশালী, অগণিত জীবজন্তুর বাসস্থান এবং বিচিত্র বৃক্ষলতা ও ফল-ফুলে হয়েছে সমৃদ্ধ। সূর্যের তাপ ও আলোর প্রেরণায় পৃথিবীতে জেগেছে

\* পি. সি. এম. আই. আর. ঢাকা—৫, পূর্ব-পাকিস্তান।

একদিন প্রাণের স্পন্দন, আর সেই প্রাথমিক জীবনস্পন্দন কালে বর্ধিত এবং বিস্তৃত হয়ে দিনে দিনে তরে তুলেছে পৃথিবীর এই বিরাট সম্পদ।

সূর্যের অভাবে চাঁদ যেমন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে বাবে—তার এই কিরণ যেমন আর দেখা বাবে না কোন দিন, তেমনি পৃথিবীও হারাবে তার বাবতীর সম্পদ—গাছপালা, জীব-জন্তু সব কিছুই বিলুপ্ত হয়ে বাবে। পৃথিবীতে চিরন্তরে সাজ হবে সকল সৌন্দর্য, সকল জীবজন্তুর জীবনধারা—আলোর অভাবে অন্ধকারে আচ্ছন্ন হবে সমগ্র পৃথিবী আর তাপের অভাবে ডুবে বাবে সে তুহীন শীতলতার অতলে।

কিন্তু এমন যে বিরাট সূর্য, যার তুলনায় পৃথিবী অনেক ক্ষুদ্র, জানা গেছে—সেই সূর্যও শূন্য আকাশে তেমন কোন গোরবের আসনে সমাসীন নয়। সূর্যের চেয়েও বিরাট—তার চেয়েও উজ্জলতর বস্তু বিরাজ করছে মহাশূন্যের বুকে—পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্ব আরও অনেক বেশী। সেগুলিকে আমরা বলি নক্ষত্র বা তারকা। অবশ্য সব তারকাই যে সূর্যের চেয়ে বড় এবং বেশী উজ্জল তা নয়, তবে বেশীর ভাগ তারকাই সূর্যের চেয়ে বড়—তার চেয়েও উজ্জল। অবশ্য ছোট কিংবা বড়ই হোক, সব তারকাই রয়েছে পৃথিবী থেকে বহু দূরে, আর তাদের সংখ্যারও কোন সীমা নেই। খালি চোখেই আকাশে ৭ হাজারের মত তারকা দেখতে পাওয়া যায়। ক্যালিকোর্নিয়ার মাউন্ট প্যালোমারের দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে ১০ কোটির মত তারকা দৃষ্টিগোচর হয়ে থাকে। আকাশের আলোকচিত্র নিলে এই সংখ্যা দাঁড়ায় আরও অনেক বেশী। আবার এমন অনেক তারকাও আছে, যেগুলি নিশ্চয়—এক কালে জলে জলে সেগুলি এখন নিবে গেছে।

কাজেই বিশ্বে তারকার সংখ্যা নির্ণয় করা সত্যই কঠিন। প্রখ্যাত বিজ্ঞানী জেমস জীন্স তারকাগুলির সংখ্যার হিসাব দিতে গিয়ে

তাই নিকপার হয়ে বলেছেন যে, পৃথিবীর সমস্ত সাগর উপকূলে বসত বালিকণা রয়েছে, সমগ্র বিশ্বে তারকার সংখ্যাও অনেকটা তেমনি।

বাহোক, এই তারকারাশি যেমন অগণিত, পৃথিবী থেকে তাদের দূরত্বও তেমনি অভাবনীয়। আমাদের সবচেয়ে কাছে রয়েছে যে তারকাটি, তার দূরত্ব ২৫,০০০,০০০,০০০ মাইলের মত; অর্থাৎ ঘণ্টায় ২৫ হাজার মাইল গতি-সম্পন্ন রকেটের পক্ষেও এই তারকাটিতে পৌঁছুতে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার বছর লাগবে। সর্বাধিক্রম জ্ঞাতগ্রামী রকেটে চড়ে সারাজীবন পাড়ি দিয়ে তো দূরের কথা, সবচেয়ে দীর্ঘজীবী মানুষের বয়সকে বিশ হাজার গুণ বাড়িয়ে দিয়েও সেই সময়ের মধ্যে এই তারকাটির কাছাকাছি পৌঁছুতে পারা বাবে কিনা সন্দেহ! এর পরের তারকাটির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশে বহু তেমন অনুবিধা নাও দাঁড়ায়, তথাপি তার পরের তারকাগুলির দূরত্ব মাইলের হিসাবে প্রকাশ করতে গেলে হরহানির আর অন্ত থাকবে না। কাজেই এই অনুবিধার জন্তে বিজ্ঞানীরা তারকাগুলির দূরত্ব নির্ণয় করতে অল্প এক মাপকাঠির সাহায্য নিয়েছেন। সে মাপকাঠি হলো আলোর গতি। মাত্র এক সেকেন্ডেই আলো ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মাইল দূরত্ব অতিক্রম করতে পারে। এক সেকেন্ডে আলো যতটা পথ পাড়ি দেয়, তা যদি বেশী দূরের জিনিষের দূরত্ব পরিমাপ করার কাজে ব্যবহার করা যায়, তবে তাদের দূরত্ব প্রকাশের কাজটি যেমন সহজ হয়, তেমনি তাদের দূরত্বের পরিমাপ করার ব্যাপারেও সুবিধা হয়। সূর্যের কথাই ধরা যাক। পৃথিবী থেকে সূর্য যে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূরে রয়েছে, সে দূরত্ব যদি আলোর মাপকাঠিতে মাপা যায়, তবে সূর্যের দূরত্ব দাঁড়াবে আট আলোক-মিনিটের সামান্য কিছু বেশী। এমনি তাতে সব-চেয়ে নিকটের তারকা—প্রক্সিমা সেন্টোরাই,

বার দূরত্ব হলো 25 লক্ষ কোটি মাইল—আলোর মাপকাঠিতে তার দূরত্ব দাঁড়াবে 4'2 আলোক-বছর এবং লুবকের (Sirius) দূরত্ব দাঁড়াবে, 8'7 আলোক-বছর। এর পর অবশ্য আরও অনেক তারকাই রয়েছে, কিন্তু সেগুলির দূরত্বের কথা বলতে গেলে তা লিখে শেষ করা যাবে না কোন দিন। তাই সবচেয়ে দূরের তারকাটির দূরত্বের কথাই এখানে বলছি। এই দূরত্ব হলো 11 কোটি আলোক-বছর। কাজেই দেখা যায়, আকাশের বৃকে ছোট ছোট প্রদীপের মত বিটুমিত করে জগছে যে তারকাগুলি, তাদের দূরত্বের তুলনায় আমাদের চাঁদ বা সূর্যের দূরত্ব ধরতে গেলে, কত ছুছ! তাছাড়া এই নক্ষত্রগুলি পৃথিবী থেকে শুধু যে দূরে দূরেই অবস্থান করছে তা নয়, তাদের পরস্পরের মধ্যেও রয়েছে হস্তর ব্যবধান।

তারকাগুলির দূরত্বের কথা বলতে গিয়ে একটি বেশ মজার কথাও মনে আসে। এই মুহূর্তে যে তারকাটিকে আমরা প্রত্যক্ষ করছি, তা যে সত্য সত্যই আকাশের বৃকে এখন বিরাজ করছে—তার কিরণ ছড়াচ্ছে, এমন কথা কিন্তু বলা চলে না। হয়তো অনেক আগেই সে তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে, হয়তো বা তার কোন নিশানাই নেই—জলে জলে সেটি হয়তো এখন অথবা অনেক আগেই নিবে গেছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হলো, অসীম দূরত্বের জন্তে তার এক কালের অস্তিত্ব তাকে এখনও আমাদের দৃষ্টি থেকে মুছে দিতে পারে নি। তবে হিসেব করলেই দেখা যায়, এতে আশ্চর্য হবার ভেদন কিছু নেই। সবচেয়ে কাছে তারকা প্রোজিমা সেন্টোরাই-এর কথাই ধরা যাক। মনে করা যাক, 4 বছর আগে কোন কারণে সেই তারকাটি ধ্বংস হয়ে গেছে। আমাদের কাছ থেকে এর দূরত্ব হলো 4'2 আলো বছর; অর্থাৎ 4'2 বছর আগে প্রোজিমা সেন্টোরাই আকাশের বৃকে

যে কিরণ ছড়িয়েছে, সেই কিরণ সেক্ষেত্রে 1 লক্ষ 86 হাজার মাইল বেগে ছুটে আসা সত্ত্বেও পৃথিবীতে পৌঁছতে তার সময় লাগবে দীর্ঘ 4'2 বছর। তারকাগুলির অস্তিত্ব আমরা জানতে পারি তাদের আলোর সূত্রে। কাজেই প্রোজিমা সেন্টোরাই ধ্বংস হবার সময় যে শেষ আলোক-রশ্মিটি পৃথিবীতে পাঠিয়েছে, আমাদের কাছে আসতে তার লাগবে 4'2 বছর। কাজেই তার ধ্বংস হবার সংবাদ 4 বছর পরেও আমরা জানতে পারবো না, জানবো 4 বছরের আরও প্রায় আড়াই মাস পরে। কাজেই 4 বছর আগে তা ধ্বংস হলেও তাকে আমরা দেখতে পাব আকাশে। পৃথিবী থেকে কোন তারকা 10 লক্ষ আলোক-বছর দূরে রয়েছে বললে বুঝতে হবে—বিদ্যুটে, বিরাটাকারের জন্তজানোয়ার বধন পৃথিবীর বৃকে বিচরণ করতো, তখন সেই তারকাটি যে আলো ছড়িয়েছিল, সেই আলোই আমরা এতদিন পর আজ প্রত্যক্ষ করছি।

আগেই বলেছি, আরতনে পৃথিবীর চেয়ে 13 লক্ষ গুণ বড় যে সূর্য, তার চেয়েও অনেক বড়, অনেক উজ্জ্বল তারকা মহাকাশের বৃকে বিরাজ করছে। সূর্যের ব্যাস যেখানে 8 লক্ষ 65 হাজার মাইল, সেখানে সবচেয়ে বড় তারকাটির ব্যাস হলো 180 কোটি মাইল। বস্তুতঃ সূর্য একটি সাধারণ তারকা ছাড়া আর কিছুই নয়। অল্প তারকাগুলির তুলনায় সূর্য আমাদের অনেক কাছে আছে বলেই তাকে আমরা অল্প তারকাগুলির চেয়ে বড় দেখি, তার তাপ ও আলো আমরা বেশী করে পাই। বিজ্ঞানীদের মতে, সূর্য আরতনে—এমন কি, তার তাপ ও উজ্জ্বল্যের দিক থেকেও একটি মাঝারি ধরনের তারকা মাত্র। .আবার বিশ্বজগতের তুলনায় এই সূর্য, এই অগণিত তারকা, সকলে মিলেও ভেদন বিশাল কিছু নয়, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ মাত্র, বা বিপুল বিশ্বের বিশালতাকে শুধু আভাস-

ইদিকে কেবল যেন প্রকাশ করবার প্রয়াস পাচ্ছে। মহাশূন্তের অগণিত তারকারাশিকে নিয়ে গঠিত যে ছায়াপথ, হুহুরের শত শত নীহারিকা যেন বিশাল এক সমুদ্রবকে ইতস্ততঃ বিকিণ্ড ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত এক-একটি ভাসমান ক্ষুদ্রকার বিষ।

শীতের রাতে আকাশের দিকে তাকালে দেখা যায়, আকাশের উত্তর দিগন্ত থেকে শুরু করে মাথার উপর দিয়ে একটি জ্যাতির্ময় নদী যেন দক্ষিণ প্রান্তে মিশে গেছে। একে ছায়াপথ বা ইংরেজীতে গ্যালাক্সি বলে। খালি চোখে ছায়াপথকে দেখার হাফা মেঘের মত, কিন্তু শক্তিশালী কোন দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে দেখলে দেখা যাবে, সেখানে ভীড় করে রয়েছে রাশি রাশি তারকা। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই ছায়াপথে ১০ হাজার কোটির মত ছোট-বড় নানা আকারের তারকা রয়েছে। সম্পূর্ণ আকাশকে আমরা যদি একেবারে দেখতে পেতাম, তাহলে দেখা যেতো, এই ছায়াপথটি যেন একটি বিরাট বলয়ের মত পৃথিবীকে বেঁঠন করে রয়েছে। সমগ্র বিশ্বে আজ পর্যন্ত প্রায় এমন ১০০ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। অন্ধকার রাতে যে ছায়াপথটিকে আমরা সারা আকাশে পরিব্যাপ্ত থাকতে দেখি, তার একটি বিশেষ নাম দেওয়া হয়েছে—ইংরেজীতে বাকে বলে মিড্‌ওয়ে

এই মিড্‌ওয়ের অন্তর্ভুক্ত হলো আমাদের পৃথিবী, যার আকার অনেকটা আতসী কাচের মত। পৃথিবী যে ছায়াপথে অবস্থান করছে—মিড্‌ওয়ে সেই ছায়াপথটির সীমানা নির্দেশ করে থাকে। আমাদের এই ছায়াপথটি, যার মাঝের অংশটি লেলের মত চওড়া, তার ব্যাস হলো ১০ হাজার কোটি আলোক-বছরের মত। আদিত্যে লোকের ধারণা ছিল যে, সৌরজগৎটি এই ছায়াপথের কেন্দ্রে অবস্থিত। কিন্তু অধুনা জানা গেছে যে, সূর্য এর কেন্দ্র থেকে দু-হাজার

পাঁচ-দশ কোটি আলোক-বছর দূরে রয়েছে এবং এই সৌরজগৎটিও মোটেই স্থির নয়, প্রচণ্ড বেগে ঘুরপাক খাচ্ছে। অবশ্য ছায়াপথের কেন্দ্রকে প্রদক্ষিণ করতে সূর্যের সময় লাগছে প্রায় ২২৫ কোটি বছর; অর্থাৎ বিজ্ঞানীরা যে অনুমান করেন, তাতে ২০০-৩০০ কোটি বছর আগে পৃথিবী তথা সৌর জগৎ সৃষ্টির যে স্থানা বটেছিল, তখন থেকে আজ পর্যন্ত সূর্য প্রবল বেগে ঘুরপাক বেয়েও একবারই মাত্র এই ছায়াপথের কেন্দ্রটিকে প্রদক্ষিণ করতে সক্ষম হয়েছে।

আমাদের এই ছায়াপথটি, যার ব্যাস ১০ হাজার কোটি আলোক-বছর, মাইলের হিসাবে তার ব্যাস যে কত দাঁড়াবে—কত বৃহৎ যে তার আরতন, সহজে তা ধারণা করা যায় না। আবার সমগ্র বিশ্বে একটি-দুটি নয়, ইতিমধ্যেই ১০০ কোটি ছায়াপথের সন্ধান পাওয়া গেছে। আরও অজানা কত ছায়াপথ রয়েছে, তার হিসাব কে করবে? ছায়াপথের বাইরে যে সকল ছায়াপথ রয়েছে, সেগুলিকে আমরা দেখতে পাই এক-একটি নীহারিকারূপে। শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে এদের কোনটিকে দেখার উজ্জ্বল হালুকা মেঘের মত, কোনটিকে দ্রুতিমান চরকির মত, আবার কোনটি মোটেই উজ্জ্বল নয়, অনেকটা নিশ্চত। বিজ্ঞানীদের মতে, যেগুলি উজ্জ্বল, সেগুলি অতি যুগ্ম গ্যাসীয় পদার্থে গঠিত। অনেকের মতে এরা নিজেরা জ্যাতির্ময় নয়, কাছাকাছি তারকার আলোর আলোকিত। অতি শক্তিশালী দূরবীক্ষণ যন্ত্র দিয়েও এদের মধ্যে কোন তারকার সন্ধান পাওয়া যায় নি। চরকির মত নীহারিকাগুলিই কিন্তু বিজ্ঞানীদের কৌতূহলী করে তুলেছে সবচেয়ে বেশী। এরা যেন বিশালাকার প্রজলিত গ্যাসের এক-একটি চরকি—মহাশূন্তে বন্ বন্ করে ঘুরছে অবিরাম। নিশ্চয় নীহারিকাগুলির নিজস্ব কোন আলো নেই। সূর্যের তারকাপুঞ্জের মাঝে তাই এদের দেখা যায় যেন কালো মেঘের

যত। যেন হয়, রেণু রেণু ধুলিমেঘে ঢাকা আত্মাদানের মধ্যে মাঝে মাঝে যেন এক-একটি কালো স্ফুটনের সূত্র হাঁ করে রয়েছে। নিম্নতর নীহারিকাগুলি আমাদের দৃষ্টিকে এমনভাবে আকর্ষণ করে দেয় যে, তাদের পিছনের তারকাগুলিকে আমরা দেখতে পাই না।

পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে যাবতীয় নীহারিকা। আমাদের কাছের দুটি নীহারিকার দূরত্ব হলো 1 লক্ষ আলোক-বছরের মত। দূরের নীহারিকাগুলি বাদের সন্ধান মেলে শুধু আলোক-চিত্রের সাহায্যে, সেগুলি রয়েছে 10 কোটি আলোক-বছর দূরে। অ্যাণ্ড্রোমিডা নীহারিকাটি আমাদের কাছ থেকে প্রায় কুড়ি লক্ষ আলোক-বছর দূরে আছে।

বিজ্ঞানীরা বলেন, এক-একটি নীহারিকার মধ্যে নিহিত রয়েছে কোটি কোটি তারকা। পৃথিবী থেকে বহু দূরে রয়েছে বলে নীহারিকার তারকাগুলিকে যেন মিলেমিশে একাকার হয়ে থাকতে দেখা যায়।

নীহারিকা সম্পর্কে জানতে গিয়ে বিজ্ঞানীরা আবার জেনেছেন আর এক বিস্ময়কর ব্যাপার। একমাত্র অ্যাণ্ড্রোমিডা ছাড়া সকল নীহারিকাই তীব্র গতিতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। অ্যাণ্ড্রোমিডা আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে সেকেন্ডে প্রায় 200 মাইল গতিবেগে। আর আমরা সেকেন্ডে প্রায় 25 হাজার মাইল গতিতে দূরে সরে যাচ্ছি। প্যালোমারের দূর-বীক্ষণ বস্ত্র দিয়ে যে সকল অস্পষ্ট বস্তু দেখতে পাওয়া যায়, তাদের মধ্যে কৃতকগুলি নাকি সেকেন্ডে 60 হাজার মাইল গতিতে পৃথিবী থেকে দূরে সরে যাচ্ছে। কাজেই এই সব নীহারিকা বা অস্পষ্ট বস্তুকে কিছু দিন পরে আর আমরা দেখতে পাব না। চিরকালের জন্তে তারা চলে যাবে আমাদের দৃষ্টির বাইরে সীমাহীন বিশ্বের কোন্ স্তূর লোকে, কে জানে!

প্রায় সকল নীহারিকাই আমাদের কাছ থেকে এমনি ভাবে যে অসীম ব্যবধান রচনা করে চলছে, সে জন্তে অনেকে অস্বস্তান করেন যে, মহাবিশ্ব ক্রমাগতই প্রসারিত হয়ে চলছে। হিসেব করে দেখা গেছে যে, 150 কোটি বছর পরে মহাবিশ্বের আয়তন দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে দ্বিগুণ।

কাজেই দিনে দিনে যতই নানাপ্রকার বস্ত্র-পাতির সাহায্যে মহাশূণ্ডে আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হচ্ছে, বিস্ময়ও আমাদের ক্রমাগত ততই বেড়ে চলছে। অবশ্য বিস্ময়ের ব্যাপার শুধু এদিক থেকেই নয়—অন্ত দিকও রয়েছে। আমরা জানি, পৃথিবী স্থির নয়, অনবরত ঘুরছে নিজের মেরু-দণ্ডের উপর, সূর্যের চার ধারে, অনেকটা লাটমের মত টলমল করে। সূর্যও গতিশীল—একদিকে যেমন অভিজিৎ নক্ষত্রকে লক্ষ্য করে তীব্র গতিতে ছুটছে, তেমনি আবার আমাদের ছায়াপথের কেন্দ্রকে ঘিরে সেকেন্ডে প্রায় 175 মাইল বেগে প্রদক্ষিণ করছে। তারকাগুলিও গতিশীল—এমন কি, যে তারকারাশি কিংবা গ্যাসীয় পদার্থের সমষ্টিতে ছায়াপথ গঠিত, জানা গেছে সেগুলিও স্থির নয়, তীব্র তাদের গতিবেগ। কেন যে সব কিছুই এমন গতিশীল—ছুটছে তীব্র গতিতে কিংবা ঘুরপাক খাচ্ছে তীব্র বেগে, তা আমরা সঠিক জানি না। তবে এটুকু জানা গেছে যে, মহাবিশ্বে সব কিছুই গতিশীল। শুধু মাত্র বড় বড় বস্তুর মধ্যেই যে এই গতিশীলতা বিদ্যমান তা নয়, সকল পদার্থের মধ্যে রয়েছে যে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম পরমাণু—এমন কি, পরমাণুর মধ্যেও যে তাত্ত্বিক সূক্ষ্ম বিদ্যুৎ-কণা রয়েছে—বিজ্ঞানীরা তাদের মধ্যেও পেয়েছেন তীব্র গতিবেগের সন্ধান। কাজেই দেখা যায়, বিশ্বে কোন কিছুই স্থির নেই। সবাই চঞ্চল—সব কিছুই অস্থির। সমগ্র বিশ্ব জুড়ে চলছে যেন এক অপরাধ নৃত্য। আর এই বিশ্বনৃত্যে, এই চঞ্চল গতিহর্ষে, যোগ দিয়েছে ছোট-বড় যাবতীয় বস্তু।

এমনি ছোট-বড় বাবতীর বস্ত্র নিয়ে যে বিশাল বিশ্বজগৎ, সে যে কত বড়, তার ধারণা আমাদের আসে না। মহাবিশ্বের আরতন সম্পর্কে বতর্কু জানা গেছে, তাতে জানা যায় যে, মহাবিশ্বের ব্যাস অনেকটা ২৬০ কোটি আলোক-বছরের মত; অর্থাৎ পৃথিবী সৃষ্টির সময়ে যদি কোন আলো মহাবিশ্বের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্তের দিকে চলতে থাকে, তবে তার সূদীর্ঘ চলার পথ শেষ হবে একেবারে আমাদের আধুনিক জীবনায় এসে। কাজেই খালি চোখে, দূরবীক্ষণ যন্ত্র এবং অধুনা আবিষ্কৃত রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে মহাবিশ্বের যে বিশালতার পরিচয় আমরা পাই, তা একদিকে যেমন আমাদের বিশ্ববাসিষ্ট করে, অপরদিকে তেমনি এই মহাবিশ্বের মাঝে আমাদের অস্তিত্বকে করে তোলে অতি নগণ্য, অতি তুচ্ছ—প্রাণে জাগার পদম নৈরাশ্র। একদিন মাক্স্‌য়ের ধ্যান-ধারণার পৃথিবীই ছিল বিশাল, আকাশের চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি জ্যোতিষকে পৃথিবীর চেয়ে বড় বলে সে ভাবতে পারে নি—শুধু নয়, নিজেকে সে দাবী করেছে সৃষ্টির সেবা জীব তাই হিসেবে আর সেই শ্রেষ্ঠত্বের সুরে সে তেবেছে বিশ্বের সব কিছু একমাত্র তার জগ্গেই সৃষ্টি হয়েছে, শুধু তারই উপকারার্থে—তারই মঙ্গলের নিমিত্ত! এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তাই সে কল্পনা করেছে, সমগ্র বিশ্বের কেন্দ্রস্থলে রয়েছে পৃথিবী। তেবেছে, এই পৃথিবীর ভাবদ্বারে তাকে ঘিরেই ঘুরছে চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-নক্ষত্র আর নীহারিকা—এক কথায় আকাশের বাবতীর জ্যোতিষ। কিন্তু আজ আমরা কি দেখছি? মহাবিশ্ব তো দূরের কথা, মহাবিশ্বের এক অতি ক্ষুদ্র অংশ জুড়ে রয়েছে যে সৌরজগৎ, তারই এক সাধারণ গ্রহ হলো আমাদের এই পৃথিবী। বৃহস্পতি, শনি প্রভৃতি গ্রহ তার চেয়েও অনেক বৃহৎ। সূর্য মোটেই তার চারদিকে ঘুরছে না, বরং সে নিজেই প্রদক্ষিণ করছে সূর্যকে, আকারে সূর্য তার চেয়ে তের লক্ষ গুণ বড়। অন্ত-

দিকে এই সূর্যও আবার তেমন বিরাট কিছু নয়—একটি মাঝারি গোত্রের তারকা মাত্র। এমনি সূর্যের সমান এবং তার চেয়ে ছোট-বড় প্রায় ১০ হাজার কোটি তারকা নিয়ে গঠিত হয়েছে এক-একটি ছায়াপথ—বাদের মোটামুটি ব্যাস হলো ১৭ হাজার কোটি আলোক-বছর। আবার সেই ছায়াপথের সংখ্যাও কম নয়—১০০ কোটির মত। এই ১০০ কোটি ছায়াপথ ২৬০ কোটি আলোক-বছর ব্যাসের মহাবিশ্বে ছড়িয়ে আছে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে, যেন এক মহাসমুদ্রে তাসমান ক্ষুদ্র দ্বীপপুঞ্জের মত। মহাবিশ্বের এই বিশালতা তাই আমাদের ঠিক বোধগম্য হয় না, উপলব্ধি করতে পারি না আমরা সে বিশালত। মোটের উপর এই ছায়াপথের বিশালতা আমাদের কল্পনা-ভীত। কাজেই এমনি বিপুল মহাবিশ্বের মাঝখানে আমাদের পৃথিবীর স্থান যে কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়, তা সহজেই অস্বপ্নের।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির ফলে দূরবীক্ষণ, রেডিও-দূরবীক্ষণ যন্ত্র প্রভৃতি আবিষ্কারের সুরে সূর্যের নক্ষত্র-লোকেও আমাদের দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে। অনেক কিছুই আমরা জেনেছি সত্য, কিন্তু তবু অনেক কিছুই আজও আমাদের অজানা রয়ে গেছে। কবে এবং কখন চন্দ্র বা সূর্যগ্রহণ হবে, কতক্ষণই বা তা স্থায়ী থাকবে, কখন কোন্‌ পৃথকতু আমাদের আকাশ সীমা লঙ্ঘন করবে—বিজ্ঞানীরা আজ নিশ্চিতভাবেই সে কথা বলতে পারেন। কিন্তু আজও তারা সঠিকভাবে বলতে অক্ষম, কখন এবং কি ভাবে এট মহাবিশ্বের সৃষ্টি হয়েছে। সে কি চিরন্তন, না তার বিন্দুটি ঘটবে কোন দিন? এই বিশ্ব বা মহাবিশ্ব কি সসীম, না অসীম? কেউ কেউ বলেছেন—বিশ্ব সসীমও নয়, সৃষ্টিরও নয়—অন্ত থেকে সে শুধু সম্প্রসারিত হয়েই চলেছে! আবার কেউ কেউ বলেছেন—না, তা নয়, বিশ্ব বিশাল হলোও সসীম—একবার সঙ্কুচিত হচ্ছে, পুনরায় প্রসারিত হচ্ছে। যে মহাকালের স্রোতে আমরা

ভেসে চলেছি, তার স্তম্ভ যে কোথায়, কোথায়  
যে, তার শেষ, কেন এই বিশালকার বিশ্বলোকের  
সৃষ্টি, আর কেনই বা সেখানে আমাদের স্বয়ংক্রিয়  
জন্তে উপস্থিতি—কোন বিজ্ঞানীই তা আজও  
বলতে পারেন না। কেউ কেউ বলেছেন, এই  
সৃষ্টির আদিও নেই, অন্তও নেই—সমগ্র বিশ্ব জুড়ে

চলেছে ভাঙ্গা-গড়া—একদিকে ধ্বংস, অন্য দিকে  
সৃষ্টি—ছুই-ই চলেছে সমান তালে। বা ধ্বংস  
হচ্ছে, তাৎক্ষণিকই সৃষ্টি হচ্ছে নতুন, প্রতিনিয়ত  
চলেছে এই ভাঙ্গা-গড়ার খেলা—বার আদি নেই,  
সমাপ্তি নেই, আর এমনি তাৎক্ষণিকই চলেবে তা অনন্ত  
কাল ধরে।

## সঞ্চয়ন

### ক্যান্সার রোগের নতুন ওষুধ

জীবন্ত কোষের ভিড়ের মধ্যেও রোগদুই  
মারাত্মক কোষ কি করে এমন বিপুল পরিমাণে  
বেড়ে যেতে পারে, ক্যান্সার রোগের চিকিৎসকদের  
কাছে সেটি হলো এক বিরাট প্রহেলিকা।

জর্নৈক মার্কিন বিজ্ঞানী এই রহস্য ভেদ করতে  
গিয়ে ক্যান্সার রোগদুই কোষের মধ্যে এক প্রকার  
রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পেয়েছেন। এই পদার্থ  
ঐ রোগদুই কোষগুলি থেকে বেরিয়ে আসে এবং  
সংলগ্ন স্নায়ু ও স্বাভাবিক কোষসমূহের ক্যান্সার  
রোগগ্রস্ত কোষের মত বিপুল পরিমাণে বৃদ্ধিপ্রাপ্তিতে  
সাহায্য করে। রোগদুই কোষের চারপাশের  
কোষসমূহের এই বৃদ্ধি কি কারণে ঘটে থাকে?  
ক্যান্সার রোগাক্রমণের কালে ঐ কোষের গঠন-  
প্রণালীর মধ্যে কি কি পরিবর্তন ঘটেছে, তা জানা  
গেলেই এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যেতে পারে এবং  
এই বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণের পথেরও সন্ধান দিতে পারে।

ক্যালিকোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের আগবিক জীব-  
বিজ্ঞানী ডাঃ হ্যারি রুবিন একটি সুরগীর জুগকে  
ক্যান্সার জীবাণু বা ভাইরাস দিয়ে সংক্রামিত  
করবার চার-পাঁচ দিন পরে জুগটির কোষ পরীক্ষা  
করে ঐ রাসায়নিক পদার্থের সন্ধান পান। তাঁর  
বারণা, যে সকল রক্তসংবাহক নালী ও সংযোজক  
তন্তুর জন্তে রোগদুই কোষের অনিয়ন্ত্রিত

বৃদ্ধি ঘটে এবং ঐ সকল কোষ বেঁচে থাকে, সেই  
সকল শিরার কোষ ও তন্তুসমূহের বৃদ্ধির মূলে  
রয়েছে রাসায়নিক পদার্থ। তাছাড়া ক্যান্সার  
রোগদুই কোষসমূহের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির মূলেও  
ঐ বস্তুটি থাকতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থ ক্যান্সার রোগের  
চিকিৎসার এক নতুন পথের ইঙ্গিত দিয়েছে।  
রোগদুই কোষের সম্বন্ধিত স্বাভাবিক স্নায়ু কোষের  
বৃদ্ধি কোন রাসায়নিক উপাদানের সাহায্যে  
প্রতিহত করতে পারলে এই ব্যাধি নিয়ন্ত্রণ করা  
সম্ভব হবে। এই বৃদ্ধি প্রতিহত হলে রোগদুই  
কোষগুলি বেঁচে থাকবার জন্তে রক্তসংবাহক  
নালী বা ব্লাড ভেসেল ও সংযোজক তন্তুর কোন  
রকম সাহায্য পাবে না।

ঐ পদার্থ কি কি রাসায়নিক উপাদানে গঠিত,  
তা এখনও পুরাপুরি জানা যায় নি। ডাঃ রুবিন এই  
প্রসঙ্গে বলেছেন যে, বতটুহু জানা গেছে তাতে  
মনে হয়, ঐ বস্তুটি কোন প্রোটিন অথবা এনজাইম  
হতে পারে।

তবে পরীক্ষাগারে দেখা গেছে, ভাইরাস-  
দুই কোষ থেকে ঐ রাসায়নিক পদার্থ পৃথক  
করে নিলে স্বাভাবিক কোষসমূহের সাময়িক



অস্বাভাবিক বৃদ্ধি ঘটে। কিন্তু এর ফলে ঐ সকল কোষের প্রকৃতির কোন পরিবর্তন ঘটে না এবং এরা যারামূলক কৃত্রিমও হয় না।

ডাঃ কুবিন গত পনেরো বছর ধরে পশুর ক্যান্সার রোগের তাইরাস নিয়ে গবেষণা করছেন। এক্ষেত্রে তিনি একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানী। বর্তমানে তিনি ক্যান্সার রোগ সম্পর্কে যে তথ্যাদ্ভুত জ্ঞান ও গবেষণায় ব্যাপৃত রয়েছেন, তা যুক্তরাষ্ট্রের জ্ঞান-জ্ঞান ক্যান্সার ইনস্টিটিউটও সমর্থন করছেন।

অজ্ঞাত কোষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে থাকবার সময় প্রত্যেকটি জীবন্ত কোষের আকার, আয়তন ও বৃদ্ধি নিয়ন্ত্রণ করবারও ক্ষমতা থাকে। এই বিষয়টির উপরেও ডাঃ কুবিনের নতুন উদ্ভাবন বিশেষভাবে আলোকপাত করতে পারে।

গবেষণাগারে জীবন্ত প্রাণী ও উদ্ভিদের কোষ নিয়ে গবেষণার সময় দেখা গেছে, অজ্ঞাত কোষের সঙ্গে মিলিত হয়ে থাকবার সময় ক্যান্সার রোগ-বাহক তাইরাস ও কোন কোন রাসায়নিক উপাদান জীবন্ত কোষকে অজ্ঞাত কোষ থেকে বিচ্ছিন্ন করতে পারে এবং ঐ কোষের অস্বাভাবিক বৃদ্ধির কারণ হতে পারে। সাধারণতঃ যে সকল রাসায়নিক উপাদান ঐ সকল কোষকে অস্বাভাবিক বৃদ্ধির পথে চালিত করে, তাদের কাজে পূরাপূরি বাধা সৃষ্টি করতে পারে।

ঐ রাসায়নিক পদার্থের অস্তিত্ব নিরূপণ এবং জীবদেহে তার প্রতিক্রিয়া পরীক্ষার উদ্দেশ্যে ডাঃ কুবিন গবেষণাগারে মুরগীর জ্ঞপের কোষে রুস সারকাম নামক তাইরাস প্রয়োগ করেন। পাখীর

দেহে এই সকল তাইরাস ক্যান্সার রোগ সৃষ্টি করে থাকে।

কয়েক দিন পরেই বধন দেখা গেল, সংক্রামিত কোষগুলি যারামূলক হয়ে উঠেছে এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, তখন ডাঃ কুবিন ঐ সকল কোষের চার-পাশের জলীয় অংশ এবং তাইরাসগুলিকে সবচেয়ে বেশি করে আনলেন। তাইরাসমুক্ত এই জলীয় অংশ বিভিন্ন সময়ে কয়েকবারই বেশি করে আনা হলো। তারপর অস্বাভাবিক মুরগীর জ্ঞপের জীবন্ত কোষের মধ্যে ঐ জল ঢোকানো হলো।

তখন দেখা গেল, যেখানে অস্বাভাবিক জ্বর কোষের সংখ্যা খুব কম এবং দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, সেখানে ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হওয়ার তেমন কোন প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয় নি। কিন্তু যেখানে কোষগুলি ঘন সন্নিবিষ্ট এবং তাদের বৃদ্ধি খুবই মন্থর, ঐ জলীয় অংশ প্রবিষ্ট হবার তিন দিন পরে দেখা গেল, ঐ সকল কোষ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে, কোষগুলি দ্বিগুণিত হয়েছে এবং ক্যান্সার রোগসৃষ্ট কোষের মত অস্বাভাবিক আকৃতি নিয়েছে। 100 ঘণ্টার পর দেখা গেল, ঐ সকল কোষ আবার অস্বাভাবিক আকার ও অস্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে এসেছে।

রুস সারকাম তাইরাসের তুলনায় ঐ রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগের ফলে কোষসমূহের বৃদ্ধি দ্রুততর হয়ে থাকে। ডাঃ কুবিন ঐ রাসায়নিক পদার্থ কোন্ কোন্ মৌলিক উপাদানের সমন্বয়ে গঠিত, তা নিরূপণের চেষ্টা করছেন। ক্যান্সার রোগের ওষুধ উদ্ভাবনের পক্ষে এটি হবে একটি বিরাট পদক্ষেপ।

### পরমাণু ভাঙ্গবার বৃহত্তম যন্ত্র

অ্যাটম শাসার নামে পরমাণু ভাঙ্গবার পৃথিবীর বৃহত্তম যন্ত্র নির্মাণের কাজ প্রায় সমাপ্তির পথে। 1971 সালের মাঝামাঝি সময়েই এটি চালু হতে

পারে। বিজ্ঞানী ও প্রকৌশলীরা মনে করে-ছিলেন, এই যন্ত্র নির্মাণের কাজ শেষ হতে আরও এক বছর লাগবে।



আমেরিকার ইলিনয় রাজ্যের উত্তরাঞ্চলে সহর বাটাভিয়ার কাছে 6800 একর জমির উপর মার্কিন পারমাণবিক শক্তি কমিশন এই বৃহত্তম বৈজ্ঞানিক যন্ত্রটি তৈরি করছেন। গত ছ-বছর ধরে এর নির্মাণকার্য চলছে। 50,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে। তবে প্রথমে 20,000 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টে এটি চালিত হবে বলে পরিকল্পনা করা হয়েছিল। এই যন্ত্রটির ছয় কিলোমিটার পরিধির চারপাশে রয়েছে বিশ টন ওজনের 1000 চূষক। এগুলি আছে মাটির নীচে। এই যন্ত্রের সাহায্যে হাইড্রোজেন পরমাণু থেকে বের করে আনা প্রোটনজটর গতি বাড়ানো হবে এবং আলোর গতির কাছাকাছি এসে দাঁড়াবে। আলোক-তরঙ্গের গতি প্রতি সেকেন্ডে 1,86,326 মাইল।

যন্ত্র-সৃষ্ট কোন রশ্মির অগ্রভাগে এরকম প্রচণ্ড বৈদ্যুতিক শক্তিকে এর আগে আর এভাবে কেন্দ্রীভূত করা হয় নি। এই প্রোটন রশ্মিজটর ঠাগ পরমাণুর কেন্দ্রে এসে আঘাত করবে এবং পরমাণুটি ভেঙ্গে যাবে। ঐ ভাঙ্গা পরমাণুর কেন্দ্রের পদার্থসমূহ গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখা হবে। পরমাণু সম্পর্কে এই ধরনের তথ্যসম্ভান এর আগে সম্ভব ছিল না। বিজ্ঞানীরা মনে করেন, পদার্থের মৌলিক গঠন ও প্রকৃতি সম্পর্কে এই তথ্যসম্ভানের কলে অনেক কিছু জানা যাবে।

আমেরিকার মধ্য-পশ্চিমাঞ্চলের সহর বাটাভিয়ার স্ট্রিকটবর্ডী ভাষাভাল অ্যাকসিলেরেটর লেবরেটরীর এই নতুন অ্যাটম শ্বাসার বা পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্রটি হবে একটি বিশেষ আকর্ষণ। কেবল আমেরিকারই নয়, ভারত, পশ্চিম ইউরোপ, ক্যানাডা, অস্ট্রেলিয়া যুক্তরাজ্য, ইজ্রায়েল এবং জাপানের বিশিষ্ট পদার্থ-বিজ্ঞানীদেরও এই যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণু সম্পর্কে গবেষণা ও তথ্যসম্ভানের সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে।

এর আগে 1960 সালে আর একটি পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্র নির্মাণের কাজও সেখানে সমাপ্ত হয়েছে। এটি ছিল 3,300 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের। এই যন্ত্রটি স্থাপিত হয়েছে নিউইয়র্কের ক্রকহাভেন লেবরেটরীতে। সোভিয়েট রাশিয়ারও 7,600 কোটি ইলেকট্রন ভোল্টের একটি যন্ত্র সারপুখভে স্থাপিত হয়েছে। আমেরিকার এই নতুন যন্ত্রটি হবে একত্রে পৃথিবীর বৃহত্তম ও সবচেয়ে শক্তিশালী পরমাণু ভাঙ্গবার যন্ত্র।

নিউইয়র্কের ক্রকহাভেন লেবরেটরীর এই যন্ত্রটি পরমাণু সম্পর্কে তথ্যসম্ভানের ক্ষেত্রে নতুন অধ্যায় রচনা করেছে। কিন্তু পরমাণু কেন্দ্রের গভীরে আঘাত করে তা ভাঙ্গবার মত শক্তি ও তীব্রতা ঐ যন্ত্রটির প্রোটনজটর নেই। তন্ত্রের দিক থেকে বহু পদার্থ-বিজ্ঞানীই বলেছেন যে, পরমাণুতে প্রাথমিক যে সকল কণার সন্ধান পাওয়া গেছে, তার চেয়ে গভীরে পরমাণুর কেন্দ্রে অস্ত্রান্ত মৌলিক কণার আর একটি স্তর থাকতে পারে। 1960-এর দশকে ক্রকহাভেনের যন্ত্রের সাহায্যে পরমাণুর কেন্দ্রে পজিট্রন, মেসন, রিউন, হাইপেরন, লেপ্টন এবং অস্ত্রান্ত বহু মৌলিক কণার সন্ধান পাওয়া গেছে। পরমাণুর কেন্দ্রে 100-টিরও বেশী মৌলিক কণা বা সাব-নিউক্লিয়ার কণার অস্তিত্ব পদার্থ-বিজ্ঞানীদের ধারণা কেলেছে। তাঁদের ধারণা, মৌলিক পদার্থের একটি সহজ গঠন-প্রণালী রয়েছে।

এই অদৃশ্য, বিস্ময়কর পৃথিবীতে বস্তুর ভর এবং শক্তি পরস্পর বিনিময়যোগ্য—একটি অস্ত্রটিতে রূপান্তরিত হয় এবং এক অনাদি শক্তির বন্ধনে পদার্থের বিভিন্ন উপাদানসমূহ আবদ্ধ রয়েছে, ছিটকে বেরিয়ে আসছে না। মৌলিক পদার্থের গভীরে এই সকল বিষয়ে তথ্য-সম্ভানের সুযোগ বিজ্ঞানীরা এই প্রথম এই যন্ত্রের সাহায্যে পাবেন।

পরমাণুর কেন্দ্রে মৌলিক কণার আর একটি

ভরের অভিজ্ঞের কথা। এখন জানিয়েছিলেন ক্যালি-  
ফোর্নিয়া ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির নোবেল  
পুরস্কার বিজয়ী পদার্থ-বিজ্ঞানী ডাঃ মুর  
গেলম্যান। পদার্থের চরম মৌলিক উপাদানের  
সন্ধান ব্যাটেলিয়ার এই অ্যাটম স্যাসারটিই দিতে  
পারে। সেদিন হয়তো মৌলিক পদার্থের মূল  
উপাদান তৈরি করাও সম্ভব হবে। তবে পৃথিবীর  
বিভিন্ন দেশের গবেষণাগারেই এর সন্ধান চলছে।  
১৯৬৯ সালে অস্ট্রেলিয়ার বিজ্ঞানীরা এর অভিজ্ঞ  
সম্পর্কে আংশিক প্রমাণ পেয়েছেন বলে জানিয়ে-  
ছিলেন। কিন্তু পৃথিবীর বিজ্ঞানী-সমাজ এই বিষয়ে  
কোন উচ্চবাচ্য করেন নি।

বৈজ্ঞানিক গবেষণার ক্ষেত্রে হায়েশাই দেখা

যাচ্ছে যে, নতুন উদ্ভাবন প্রচলিত ধারণাকে সম্পূর্ণ  
বহুলে দিয়ে যায়। পদার্থের মূল উপাদান  
উদ্ভাবনের ক্ষেত্রে যে তথ্যায়নসন্ধান চলছে, এই নতুন  
পরমাণু তাকবার দৃষ্টি তাতে বিশেষভাবে আলোক-  
পাত করতে পারে। এই সম্পর্কে বতুটুকু জানা  
গেছে, তাতে তার ঘোড় ঘুরিয়ে দিতে পারে বলে  
বিজ্ঞানীদের ধারণা। মৌলিক পদার্থ যে কি কি  
উপাদানে গঠিত, তা নির্ণয় করার ও তার প্রকৃতি  
নিরূপণের চেষ্টায় বিজ্ঞানীরা সকলকাম হলে  
পদার্থের গঠন ও প্রকৃতি যে সকল নিয়মে  
নিয়ন্ত্রিত হয়, তা সম্পূর্ণ জানা গেলে বিজ্ঞানের  
ইতিহাসে আর একটি নতুন অধ্যায় রচিত হবে  
এবং এর তাৎপর্য হবে অসূরপ্রসারী।

### হর গরম করতে রঙের অভিনব ভূমিকা

রং তু ধু দেয়ালের সৌন্দর্য বৃদ্ধিই করবে না,  
এখন থেকে তা ঘরকে গরমও করতে পারবে।  
যে কোন সাধারণ রঙের মতই এই নতুন রং স্ট্রো বা  
ব্রাসের সাহায্যে লাগানো যাবে।

তবে এই রঙের একটু বৈশিষ্ট্য আছে।  
সেই বৈশিষ্ট্য হলো, এই রং বিদ্যুৎ সকালন  
করতে সক্ষম। তার কারণ, এই রঙে উদ্ভিজ্জ  
তেল বা রজন্যের বদলে রয়েছে সিলিকেট।

বৈজ্ঞানিক উদ্ভবকে যেমন, তেমনি এই রংকে  
'সুইচ অন' করা বা বিদ্যুৎযুক্ত করা যায়।  
কিন্তু বৈজ্ঞানিক উদ্ভব হাত দিলে যেমন 'অফ'  
থেকে হয়, এতে তেমন কোন আপত্তি নেই এবং  
রং-লাগানো দেয়াল কখনই বিপজ্জনকভাবে  
গরম হয়ে ওঠে না। এই রং একেবারেই  
নিরাপদ—এমন কি, শিশু ও গৃহপালিত পশুদের  
পক্ষেও। বাড়ীর যে সাধারণ বিদ্যুৎ-সরবরাহের  
ব্যবস্থা, তার সঙ্গেই দেয়ালগুলি সংযুক্ত থাকে—  
তু ধু ব্যবস্থাকে একটি ট্রান্সফরমারের সাহায্যে  
বিদ্যুৎ-প্রবাহের শক্তি ৪০ ভোল্টে নামিয়ে রাখা  
হয়। দেয়ালের মাঝার ও তলার ছুটি অ্যান্ড-

মিনিয়াম পাভ বমানো থাকে—এদের মাধ্যমে  
সারা দেয়ালে বিদ্যুৎ সকালিত হয়।

দেয়ালে সাধারণভাবে যে রং লাগানো  
হয়, তার চেয়ে এই রঙের খরচ খুব বেশী নষ্ট।  
এদিকে বিদ্যুতের খরচ অতি অল্প। এই ব্যবস্থার  
বাড়তি আয়গাও ছেড়ে দিতে হয় না। দেয়াল-  
গুলি সহজে অল্প সময়ের মধ্যে সমভাবে গরম  
হয়ে ওঠে। 'সুইচ অফ' করে দিলেও দেয়ালগুলি  
অনেক সময় পর্যন্ত গরম থাকে।

প্রি-ক্যালিব্রিকটেড দেয়ালগুলি গৃহ-নির্মাণের  
সময়েই রং করে দেওয়া সম্ভব। এভাবে গৃহ  
নির্মিত হবার সঙ্গে সঙ্গেই গর গরম করার  
ব্যবস্থাও হয়ে যায়।

হর মাস ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেছে,  
এই রঙের বিশেষ গুণ নষ্ট হয় না। আশা  
করা যায়, শীঘ্রই এই রং বাজারে দেখা যাবে।

আবিষ্কারকরা এই রঙের নাম দিয়েছেন  
'স্ট্রো-অন সেটাল হিট'। লণ্ডনের নিকটে  
টেডিংটনের ব্রিটিশ পেট রিসার্চ স্টেশনে এটি  
উদ্ভাবিত হয়েছে।

## কুষ্ঠরোগ নিরাময়ের নতুন ওষুধ

অ্যাণ্ডু ওয়াকার এই সবচেঁ লিখেছেন— পৃথিবীর দেড় কোটি থেকে দু-কোটি লোক এখনো কুষ্ঠরোগে ভোগে, যদিও আধুনিক ওষুধের দ্বারা এই রোগ নিরাময় করা সম্ভব। ব্রিটিশ লেপ্রোসি রিলিফ অ্যাসোসিয়েশনের যেতি-কাল সেক্রেটারির ভাষায়—যদি কুষ্ঠরোগসংক্রান্ত আমাদের বর্তমান জ্ঞানকে ঠিকমত কাজে লাগানো যায়, তাহলে বর্তমান সময়েই এই রোগ নিরূপণ করা সম্ভব হবে এবং অদূর ভবিষ্যতেই তা নিমূল করা অসম্ভব হবে না।

এই পরিপ্রেক্ষিতে ব্রিটিশ লেপ্রোসি অ্যাসোসিয়েশন পশ্চিম আফ্রিকার সিরেরালিওনের জন্তে গত বছর একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করেন। সিরেরালিওনে কুষ্ঠরোগীর আনুমানিক সংখ্যা 50,000।

এই রোগের আধুনিক চিকিৎসার একে প্রশাসনিক সমস্যা হিসাবেই বেশী করে দেখা হচ্ছে। রোগীদের এক কলোনীতে জড়ো করবার চেষ্টে বাড়ীতে রেখে চিকিৎসা করার অধিকতর ভাল ফল পাওয়া যায় বলে এখন মনে করা হয়।

1965 সালে পূর্ব আফ্রিকার মালাউইতে একটি পুরোধা প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছিল। তাথেকেই প্রমাণিত হয়েছে যে, এই নতুন পদ্ধতি কত কার্যোপযোগী। ল্যাণ্ড রোটার বা কখনো সাইকেলের সাহায্যে গ্রামে গ্রামে চিকিৎসার সুযোগ পৌঁছে দেওয়া হয়। কয়েকটি কেন্দ্র থেকে চিকিৎসার উদ্দেশ্যে রোগীকে প্রতি সপ্তাহে পরিদর্শন করা হয় এবং এতে চিকিৎসার ধারাবাহিকতা অক্ষুণ্ণ থাকে। এভাবে ব্রানাটিরের 2,000 বর্গ মাইল এলাকা থেকে কুষ্ঠরোগ বিভাদিত করা সম্ভব হয়েছে।

প্রাচীন কাল থেকেই কুষ্ঠরোগের কথা

জানা আছে। মধ্যযুগে ইউরোপে এই রোগের খুবই প্রাদুর্ভাব ছিল। সেই সময় রোগীদের প্রতি সাধারণের মনে কুসংস্কারজনিত ভয়ের ভাব দেখা যেত।

একটি গ্রীক শব্দ—কক বা থসুথসে থেকে এই রোগের নামের উৎপত্তি। এই রোগ মূলতঃ স্বককে ভাই করে তোলে। কিন্তু এর জন্তে রোগীকে কলোনীভুক্ত করে রাখবার প্রয়োজনীয়তা নেই। এই রোগ সামান্যভাবে সংক্রামক—সংক্রমণের জন্তে দীর্ঘস্থায়ী শারীরিক সান্নিধ্য ঘটা চাই।

এই রোগের কারণ বন্সারোগের অনুরূপ এক প্রকার জীবাণু। ড্যাপসোন (Dapsone) বা ডি. ডি. এস. (DDS) নামে এক ওষুধে এই রোগ নিরাময় হয়। পূর্ব নাইজেরিয়ার কাজ করবার সময় ডাঃ জন লোয়ে নামে এক মেডিকিট মিশনারি এই ওষুধ আবিষ্কার করেন।

বন্স মূল্যের এই ট্যাবলেটগুলি নিয়মিত ব্যবহার করলেই রোগ সেরে যায়, কিন্তু বর্তমানে পাঁচ জনে একজন মাত্র রোগীকে এইভাবে চিকিৎসা করা হয়ে থাকে। তার নানা কারণ রয়েছে। একটি হলো রোগ নির্ণয়ের অসুবিধা—সংক্রমণের পর থেকে এই রোগ প্রকাশ পেতে 5 বছর সময় লেগে যায়। আর একটি কারণ হলো—এর সঙ্গে আতঙ্ক জড়িয়ে থাকে; তাছাড়া এই রোগে সহজে লোক মরে না, শুধু পঙ্গু হয়ে পড়ে। সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনেক সময় এই রোগের চিকিৎসাকে অগ্রাবিকার দেন না।

যাহোক, এটি এমন একটি রোগ, সহজে ও বন্স ব্যয়ে বার নিরাময় করা সম্ভব, শুধু ইচ্ছা থাকে। আশা করা যায়—কালক্রমে কুষ্ঠরোগ সম্পূর্ণরূপে নিমূল করা সম্ভব হবে।

চা-ই সবচেয়ে সুলভ, নির্দোষ এবং উদ্ভীপক পানীয়। চা-পান প্রথমে চীনদেশে সুলভ হয় এবং ক্রমশঃ পৃথিবীর প্রায় সব দেশেই ছড়িয়ে পড়ে। ইংরেজী Tea কথাটি চীনদেশের আমর ভাষার Tay শব্দটি থেকে গ্রহীত, আর চা শব্দটিও চৈনিক—ক্যান্টন থেকে এসেছে। বাইবেল বা সেলসীয়সের রচনার চায়ের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। বতসূর জানা যায়, 350 খৃষ্টাব্দে চীন দেশের গ্রন্থকর্তা কুও শো তাঁর লেখা অভিধান আর ইয়াতে চায়ের প্রথম উল্লেখ করেন। খুব সম্ভব চায়ের আদিম উৎপত্তিস্থান দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া; অর্থাৎ দক্ষিণ-পশ্চিম চীন, উত্তর-পূর্ব ভারত, বর্মা, ভাম এবং ইন্দোচীনের সীমান্তবর্তী অঞ্চলই চায়ের সর্বপ্রথম উৎপাদন স্থল বলে অনুমিত হয়। চায়ের বিষয় প্রথম বই চা চিং লেখেন চৈনিক পণ্ডিত লুই খুইর অষ্টম শতাব্দীতে। তখনকার কালে ফুটন্ত লবণাক্ত জলে চা ভিজিয়ে পান করা হতো। খুইর যষ্ঠ শতাব্দীর বহু পূর্বেই চীন থেকে আপানে চা আনীত হয়। 1684 খৃষ্টাব্দে জার্মান প্রকৃতি-বিজ্ঞানী ও ডাক্তার এণ্ড্রিয়াস ক্রিয়ার ব্যবসীপে চায়ের প্রচলন করেন।

1815 সালেও কর্নেল ল্যাটার আসামীয় উপ-জাতিদের মধ্যে চা-পানের অভ্যাস দেখতে পেরেছিলেন। 1823 সালে মেজর রবার্ট ক্রস উত্তর আসামে স্বভাবজাত বস্ত্র চা-গাছ আবিষ্কার করে-ছিলেন।

বর্মীয় সেনাবাহিনীর ক্যান্টেন টার্নার 1783 সালে দৌত্যকার্য উপলক্ষ্যে বখন তিব্বতে তামি লামার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যান, তখন এই এদেশেও পান্যবর্তী অঞ্চলে ব্যাপকভাবে চা-পানের

অভ্যাস প্রচলিত ছিল। তুটানের রাজা দেবরাজ তাঁকে চা-পানে আপ্যায়িত করেন—এই চা জল, আটা, মাখন ও লবণ দিয়ে তৈরি হয়েছিল। হল্যান্ডের লোকেরাই সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দশকে সর্বপ্রথম ইউরোপে চা আমদানী করে। 1618 সালে রাশিয়ার, 1648 সালে প্যারিসে এবং 1650 সালে ইংল্যান্ড ও আমেরিকার চায়ের প্রচলন হয়।

তিনিসের স্প্রসিঙ্ক ভূ-পৃষ্ঠিক গিরাখাতিজা রামুসিও 1559 খৃষ্টাব্দে তাঁর লেখা ভ্রমণ-কাহিনীতে চীনদেশের চায়ের কথা সর্বপ্রথম লিপিবদ্ধ করেন। বিখ্যাত ডাচ নাবিক হিউগো লিন স্কুটেন 1598 সালে রচিত তাঁর ভ্রমণ-বৃত্তান্তে বিশেষ করে চায়ের কথা বলেছেন। 1658 সালে মার্কিউরাস পলিটিকাস নামে লণ্ডন থেকে প্রকাশিত এক সংবাদপত্রে প্রথম চায়ের বিজ্ঞাপন বের হয়। সান্সুয়েল পেপিস 1660 সালে তাঁর দিন-লিপিতে লিখেছেন—আমি এক পেরালা চীন দেশের পানীয় চা আনতে বলেছি, যা এর আগে কখনও পান করি নি।

1600 থেকে 1858 সাল পর্যন্ত প্রায় আড়াই-শ' বছর ধরে চায়ের আমদানী-রপ্তানী বাণিজ্যে দ্রষ্টে ইণ্ডিয়া কোম্পানী একাধিপত্য করেছিল। আমেরিকায় 1773 সালের চা আইন রাষ্ট্রবিপ্লবের অন্ততম কারণ হয়েছিল। 1778 সালে অনানুযায়ী উদ্ভিদ-বিজ্ঞানী ও ভৌগোলিক সার জোসেফ ব্যাক্স তারতবর্ষে চায়ের চাষের কথা উত্থাপন করেন। এরপর 1834 সালে ভারতের তৎকালীন বড়লাট উইলিয়াম বেঙ্কি এদেশে চা উৎপাদনের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করেন। এতে কোম্পানির উদ্ভিদতত্ত্ববিদ ওয়ালিচ ও দুজন ভারতীয়

এবং তিন জন বণিক যোগ দেন। উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রধানতঃ চীনদেশ থেকেই সারা পৃথিবীতে চা রপ্তানী হতো। 1856 সালে ভারতবর্ষ থেকে প্রথম চা চালান হয়। ভারত থেকে 1885 সালে নিয়মিতভাবে বিদেশে চা রপ্তানী হতে থাকে। ববরূপ থেকে চা আসে 1864 সালে আর সিংহল থেকে চা বার 1880 সালে।

1753 খ্রীষ্টাব্দে অনামধস্ত বৈজ্ঞানিক কার্ল লিনে চা-গাছের নামকরণ করেন *Thea sinensis*, কিন্তু বর্তমানে একে *Camellia sinensis* বলা হয়। চা-গাছ তৈরিক ও আসামীয়—এই দুই উপ-জাতিতে বিভক্ত। সিংহল দ্বীপে 1870 সালে ককির কসল ব্যাধিবিধ্বস্ত হবার পর থেকে সেখানে চা চাষের সূচনা হয়। রাশিয়া 1847 সাল থেকে চায়ের আবাদ আরম্ভ করে। আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের ডাক্তার চার্লস সোপার্ড (1890-1915) প্রায় পঁচিশ বছর ধরে চা চাষের চেষ্টা করে বিফল যত্নের ফল হন—ঐ দেশের জলবায়ু অসুস্থ হলেও প্রমিকদের পারিশ্রমিকের হার খুব বেশী হবার কারণ চা-শিল্প লাভজনক হয় নি। নিরক্ষরদের 42° উত্তর এবং 33° দক্ষিণ পর্যন্ত প্রধানতঃ চা-গাছ রোপিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর ঐশ্বর্যপ্রধান অঞ্চলে মোসুমী জলবায়ুতে সবুজসমতল প্রদেশ থেকে 6000 ফুট উঁচু পর্যন্ত জায়গা চা চাষের পক্ষে অসুস্থ।

চা-গাছ চিরহরিৎ—25 থেকে 50 ফুট অবধি দীর্ঘ হয়। চায়ের পাতা এক ইঞ্চি থেকে দুই ইঞ্চির বেশী লম্বা হয় না। সাধারণতঃ গাছ ছোটো 3 থেকে 5 ফুটের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখা হয়। চায়ের ফুলে সাধারণতঃ পাঁচটি সাদা পাপড়ি ও বহু সংখ্যক হলুদ রঙের কেন্দ্র থাকে। ফুলের ব্যাস প্রায় এক ইঞ্চি। চায়ের ফল সবুজ রঙের, বার্বেলের গুলির মত বড় হয় এবং ওজনে প্রায় দুই ওয়াবের

মত। তিতরে দুই-তিনটি গাঢ় বাদামী রঙের বীজ থাকে।

চা-গাছ প্রথমে বীজ থেকে উৎপন্ন হয়। ছয় মাসের মধ্যে গাছগুলি ছয়-সাত ইঞ্চি বড় হলেই অল্প নিরে পাঁচ ফুট অল্প লাগানো হয়ে থাকে। চার বছর পর থেকেই গাছ থেকে চায়ের পাতা সংগ্রহ করা হয়। এক-একটি চা-গাছের গড় আয়ু তিরিশ-চল্লিশ বছর হবে। এক একর জমিতে তিন-চার হাজার চা-গাছের রোপ জন্মায়। সাধারণে পটাস, অ্যামোনিয়াম সালফেট ও কসকেট ব্যবহৃত হয়। কখনও কখনও চা-গাছ কীট-পতঙ্গ ও ছত্রাকের আক্রমণে ব্যাধি-গ্রস্ত হয়ে পড়ে। এর প্রতিকারের জন্তে তাম্র-ঘটিত রাসায়নিক পদার্থ প্রয়োগ করা হয়।

চা-গাছ বসন্তে বড় হলে নির্দিষ্ট সময়ে (সাধারণতঃ শীতকালে) প্রমিকেরা প্রত্যেকটি ডাল থেকে ছুটি পাতা ও একটি ফুঁড়ি চয়ন করে ফুঁড়িতে ভর্তি করতে থাকে। চারটি চায়ের রোপ থেকে গড়ে প্রতি বছর প্রায় এক পাউণ্ড চা পাওয়া যায়। চা-গাছের প্রায় 3200টি শাখায়ে ছিঁড়ে নিলে তবেই এক পাউণ্ড আদ্যাক চা-পাতা পাওয়া যায়। সংগৃহীত চায়ের পাতা এরপর পুরা একদিন ঘরের মধ্যে বা উন্মুক্ত স্থানলোকে রেখে রসশূন্য করা হয়। তারপর ঘটা তিনেক ধরে ঐ চা-পাতা পাকানো হয়। চায়ের পাকানো পাতা দুই-তিন ঘণ্টা আর্জ হাওয়ার হাড়িয়ে দিয়ে অল্প গাঁজানো হয়। এর ফলে পাতার কষার গুণ কমে গিয়ে তাতে অগন্ধের সঞ্চার হয়ে থাকে। সর্বশেষে একটি উষ্ণ কফে আধ ঘণ্টা পাতাগুলিকে রেখে গরম বাতাস দিয়ে শুক করা হয়।

পরিপক চা সবুজ, কালো ও মাঝারী—এই তিন রকমের হয়। সবুজ চা-পাতা সংগ্রহের পরেই শুক করা হয়। কালো চা গাঁজানোর পর শুক করা হয় আর মাঝারী চা অল্প অল্প শুক

হবার পর রসশূন্য করা হয়ে থাকে। মরক্কো ও আকগানিহানে সবুজ চায়ের কিছু সমাধর আছে। সর্বশেষে আকার অল্পবায়ী চা-পাতাকে পূর্ণপত্র, তরুপত্র ও চূর্ণপত্র—এই তিন শ্রেণীতে ভাগ করে এক-শ' পাউণ্ড করে কাঠের বাস্তের জড়িত করা হয়। পৃথিবীতে প্রায় ১৫০০ রকমের চা উৎপন্ন হয় এবং তা থেকে আবার ২০০০ রকমের বিশুদ্ধ তৈরি করা হয়ে থাকে।

পৃথিবীর মোট কুড়িটি দেশে চা উৎপন্ন হয়। ১৯৫৮-৬০ সালে বিভিন্ন দেশে চা উৎপাদনের হার এই রকম ছিল—

ভারতবর্ষ	৩১৯	হাজার টন
সিংহল	১৮৫	" "
চীন	১৪৭	" "
জাপান	৭৭	" "
ইন্দোনেশিয়া	৪৩	" "
সোভিয়েট রাশিয়া	৩২	" "
পূর্ব আফ্রিকা	৩১	" "
পাকিস্তান	২৪	" "

বর্তমান বিশ্বের বাজারে শতকরা প্রায় ৪০ ভাগ চা ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে আসে। এর মধ্যে ৪৪ ভাগ চা এখন ভারত থেকেই রপ্তানী হয়ে থাকে। ১৯৫৯ সালে সারা পৃথিবীতে ১৭০ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহৃত হয়েছিল। এর মধ্যে ৫২ কোটি পাউণ্ড গ্রেট ব্রিটেন, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ১০ কোটি পাউণ্ড এবং ভারতবর্ষ ২৫ কোটি পাউণ্ড চা ব্যবহার করেছিল। যুক্তরাজ্য, ভারতবর্ষ ও সিংহল থেকে নিজ প্রয়োজনের হই-কৃত্তীরাংশ ও চীন থেকে এক-কৃত্তীরাংশ চা আমদানী করে। ১৯৫২ সালে পৃথিবীতে বার্ষিক জনপ্রতি চা-পানের হার এরূপ ছিল—

ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ ৯ পাউণ্ড, অস্ট্রেলিয়া ৬.৫ পাউণ্ড, নিউজিল্যান্ড ৫ পাউণ্ড, ইরাক ৪ পাউণ্ড, ক্যানাডা ৩.৪ পাউণ্ড, মরক্কো ৩.২ পাউণ্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা ২ পাউণ্ড, ইজিপ্ট ১.৭৮ পাউণ্ড, হল্যান্ড ১.৫৮

পাউণ্ড, আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র ৬.৬ পাউণ্ড, ভারত-বর্ষ ৯ পাউণ্ড বার। আজকাল আমেরিকার লোকেরা চায়ের চেয়ে বেশী কফি পান করে আর ইংল্যান্ডবাসীরা কফি অপেক্ষা অনেক অধিক চা ব্যবহার করে, কিন্তু অতীতে এর ঠিক বিপরীত অবস্থা ছিল।

১৯৫০-৬১ সালে বিভিন্ন দেশ থেকে চা রপ্তানীর হার এই প্রকার ছিল—

ভারতবর্ষ	২১২	হাজার টন
সিংহল	১৮৮	" "
চীন	৪৩	" "
ইন্দোনেশিয়া	৩৭	" "
পূর্ব আফ্রিকা	২৯	" "

সমগ্র ভারতবর্ষে প্রায় ১০,০০০ চা-বাগান আছে, সর্বসমেত দশ লক্ষ লোক এখানে কাজ করে। এই ব্যবসারে প্রায় ৭০ কোটি টাকা নিয়োজিত আছে। ভারতের মোট উৎপন্ন চায়ের মধ্যে শতকরা প্রায় ৭০ ভাগ আনামেই উৎপন্ন হয়, বাকী দশ ভাগ দার্জিলিং অঞ্চলে এবং অবশিষ্ট কুড়ি ভাগ দক্ষিণ ভারতের নীলগিরি, মহীশূর, ত্রিবাঙ্কুর, কোচিন ও কুর্গে উৎপন্ন হয়ে থাকে। প্রতি বছর গড়ে এদেশে ৫৫ কোটি পাউণ্ড চা উৎপন্ন হয়। এর মধ্যে ঝাড়ে ও গছে দার্জিলিঙের চা-ই সর্বোৎকৃষ্ট।

সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ইংল্যান্ডে যখন চায়ের ব্যবহার আরম্ভ হয়, তখন পাউণ্ড প্রতি চায়ের দাম ছিল প্রায় ১০ পাউণ্ড। এখন সর্বোৎকৃষ্ট চায়ের মূল্য পাউণ্ড প্রতি ৪ পাউণ্ড আনাজ হবে। চায়ের নীলাম ও বিক্রয়-কেন্দ্র প্রধানতঃ লণ্ডন, কলিকাতা, কলম্বো, চট্টগ্রাম ও কোচিন।

চা উৎপাদক পানীয়, রাসায়নিক বিশেষণে এতে ক্যাফিন, ট্যানিন ও স্নগন্ধ তৈল পাওয়া যায়। ক্যাফিন নামক উপকারী ঔষধিক, স্থপিত ও বৃককে প্রত্যক্ষভাবে উত্তেজিত করে। ট্যানিন একটু কষার স্বাদবিশিষ্ট। এক পেরালা চায়ে

প্রায় এক গ্রেন ক্যাকিন ও প্রায় দুই গ্রেন ট্যানিন থাকে। ভারতীয় কালো চায়ে 2% থেকে 3% ক্যাকিন এবং 6% থেকে 10% ট্যানিন থাকে। আর চীনদেশের চায়ে 2% থেকে 3.7% ক্যাকিন এবং 5% থেকে 10% ট্যানিন বর্তমান। সাধারণতঃ ফুটন্ত গরম জলে তিন-চার মিনিট চায়ের পাতা তিজিয়ে নেবার পর ছাঁকনিতে ছেঁকে তাতে দুধ ও চিনি মিশিয়ে পান করা হয়। দুধ চায়ের কবায় স্বাদ নষ্ট করে দেয়, আর চিনি মিষ্টতা ও সুস্বাদু আনে। চা-পানের পনেরো মিনিটের মধ্যেই ক্যাকিনের ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে যায়।

সম্মানভাবে দেহ-মনের পক্ষে উত্তেজক ও আনন্দদায়ক এবং তৃপ্তিকর অথচ সস্তা পানীয় বলেই চায়ের এত আদর। অবসর ও ক্রান্ত শরীরে চা কি রকম উপভোগ্য এবং উপকারী, তা আর কাউকে নতুন করে বলে দিতে হবে না। তবে অতিরিক্ত চা-পান করলে অজীর্ণ, অনিদ্রা এবং হৃৎপিণ্ডের গতি ক্রম ও অনিয়মিত হবার সম্ভাবনা আছে।

ঐয়কালে আমেরিকার হুথের সর ও চিনি মিশ্রিত বরফশীতল চা-পানের প্রথা প্রচলিত। রাশিয়াতে নেবুর রসের সঙ্গে চিনি কিংবা জ্যাম মিশিয়ে চা-পান করা খুব প্রীতিপদ মনে করা হয়। এক সময় মধ্যাশীর অঞ্চলে মাধন ও লবণ সহযোগে চা পান করা হতো।

চায়ের আরও প্রস্তুত-প্রণালী :

(1) সর্বোৎকৃষ্ট চা	175 ভাগ
দাকচিনি	3 "
লবঙ্গ	3 "
ভ্যানিলা	1 "
গ্যাম (60% মন্ত)	1000 "

কঠিন উপকরণগুলি চূর্ণ করে নিয়ে প্রায় তিন দিন ধরে আলকোহলে তিজিয়ে রাখতে হবে। তারপর সেই সুরাসার ছেঁকে পৃথক করতে হবে। ঠিকমত তৈরি হলে এই তরল মিশ্রণ বেশ স্বাদ, উজ্জল ও উত্তেজক পানীয় হয় এবং অনেক দিন ভাল থাকে।

(2) চা চূর্ণ	1 আউন্স
চিনি	3 "
বিগড় সুরা	10 "
জল	10 "

দুই সপ্তাহ তিজাবার পর ছেঁকে নিতে হবে।

চায়ের সুরবং :

(3) চা	8 আউন্স
চিনি	36 "
ফুটন্ত গরম জল	16 "

(4) চা	2 আউন্স
ফুটন্ত গরম জল	20 "
সাইট্রিক অ্যাসিড	$\frac{1}{2}$ "
চিনি	56 "

প্রথমে ফুটন্ত গরম জলে প্রায় 5 মিনিট কাল চা তিজিয়ে নেবার পর সেই কাথ ছেঁকে নিয়ে তাতে সাইট্রিক অ্যাসিড ও চিনি বোগ করতে হবে।

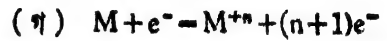
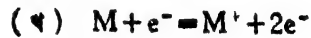
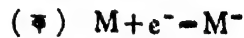
# জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীমিতি

কালীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়\*

ভর-বর্ণালীমিতি বা মাস-স্পেকট্রোমেট্রি আধুনিক যুগের রসায়ন-বিজ্ঞানীদের, বিশেষ করে তেজস-রসায়নবিদদের একটি অতি প্রয়োজনীয় ও জনপ্রিয় পদ্ধতি। এই জনপ্রিয়তার মূলে রয়েছে এই পদ্ধতির সরলতা ও দ্রুত বিশ্লেষণী ক্ষমতা। বর্তমান যুগে তেজস-রসায়ন-বিজ্ঞানীরা যে সব জৈব যৌগ নিয়ে কাজ করে থাকেন, সেগুলি প্রাকৃতিক জগতে খুব কম পরিমাণে পাওয়া যায়, যার ফলে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ের প্রচলিত রাসায়নিক পদ্ধতিগুলি তালতাবে পরিচালনা করা বেশ কষ্টসাধ্য ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু অতি অল্প (1মি: গ্রাম বা আরও কম) যৌগ নিয়ে এবং খুব সহজভাবে ভর-বর্ণালীমিতির পদ্ধতি পরিচালনা করে পরীক্ষাধীন যৌগের কাঠামো সম্পর্কে ঠিক সংবাদ সংগ্রহ করা অসম্ভব নয়। সুতরাং এই রকম একটা পদ্ধতির ব্যাপক বিস্তার যে সকল রসায়ন-বিজ্ঞানীদের কাম্য হবে, সেটা খুবই স্বাভাবিক। প্রকৃতপক্ষে ইদানীং কালে 'অধিকাংশ তেজস জৈব যৌগের কাঠামো নির্ণয় প্রধানত: ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণের ভিত্তিতেই হচ্ছে।

ভর-বর্ণালীমিতিকে এক কথায় ইলেকট্রন শক্তির সহায়তায় পরিচালিত একটা বিশেষ বাহ্যিক প্রয়োগ-কৌশল বলা যেতে পারে। এই বিশেষ প্রয়োগ-কৌশলটি মূলত: রাসায়নিক পদার্থের ভর (Mass) নির্ণয় এবং আইসোপটগুলির পৃথকীকরণের কাজেই প্রয়োগ করা হয়। এই পদ্ধতিতে একটা বিশেষ যন্ত্রের সাহায্যে কোন একটি পদার্থকে কিংবা পদার্থের মিশ্রণকে (সাধারণত: আইসোটোপের মিশ্রণ) যাবারী

শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি দিয়ে জ্বালাত করা হয়। এর ফলে নানান ধরণের আয়ন তৈরি হয়; যেমন—



(M এখানে কোন পদার্থ বা পদার্থের মিশ্রণ এবং  $e^-$  হচ্ছে ইলেকট্রন)

এরপর ঐ আয়নগুলিকে পৃথক করে তাদের ভর নির্ণয় করা হয়। এই সম্পর্কে একটা কথা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে, 'ভর-বর্ণালী-মিতির ক্ষেত্রে ইউনিপজিটিভ আয়নই সবচেয়ে বেশী গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে। কারণ অস্তিত্ব আয়নের চেয়ে এগুলিই তাড়াতাড়ি তৈরি হয়। যে বিশেষ যন্ত্রটির সাহায্যে ইলেকট্রন-রশ্মি পরিচালিত করে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা হয় এবং পরে সেগুলিকে পৃথক করা হয়, তাকে ভর-বর্ণালীমিতি যন্ত্র বলা হয়ে থাকে। এই ধরণের বিভিন্ন রকম ব্যবহারের কথা রসায়নশাস্ত্রে উল্লেখিত আছে। তাদের মধ্যে ডেম্পস্টার ও অ্যাটনের তৈরি যন্ত্র দুটিই বেশী ব্যবহৃত হয়।

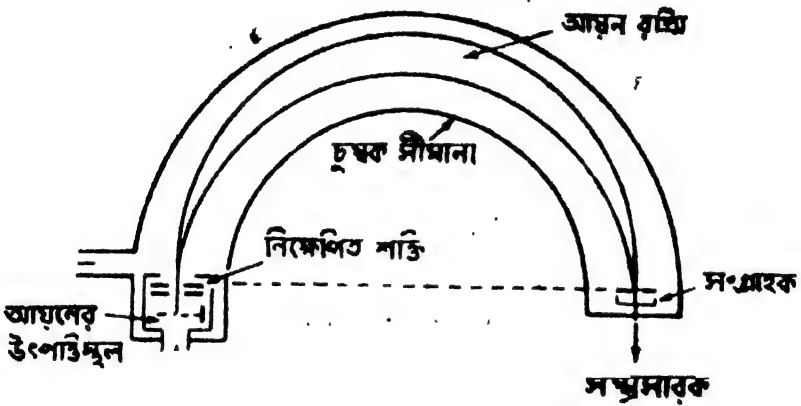
এই বাহ্যিক পদ্ধতির মূলনীতি হচ্ছে—ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির সাহায্যে পরীক্ষাধীন মিশ্রণ থেকে প্রথমে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা এবং পরে ঐ আয়নগুলিকে বৈদ্যুতিক শক্তির সহায়তায় বহুস্থিত চৌম্বক সীমানার নিকটপন্ন করা। এখন পজিটিভ আয়নগুলি তাদের ভর অনুযায়ী

রসায়ন বিভাগ, কলকাতার সরকারী কলেজ, নলীয়া।



চৌম্বক সীমানার বিভিন্ন স্থানে গিয়ে পড়বে। যদি আয়নটা খুব ভারী হয় অর্থাৎ ভার বেশী হয়, তাহলে সেটা আয়নের উৎপত্তিস্থলের কাছাকাছি যে চৌম্বক সীমানা আছে, সেখানে গিয়ে পড়বে আর আয়নটা হালকা হলে উৎপত্তিস্থলের অনেক দূরের চৌম্বক সীমানায় গিয়ে পৌঁছবে। এইভাবে এই পদ্ধতিতে বিভিন্ন পজিটিভ আয়ন পৃথক করা হয়। এর পর তার নির্ণয়ের জন্তে ঐ আয়নগুলিকে আয়ন-সংগ্রাহকের ভিতরে নেওয়া হয়। তাহলে প্রশ্ন উঠবে, এতোকটি আয়নের জন্তে কি পৃথক পৃথক আয়ন-সংগ্রাহকের দরকার? না, পৃথক পৃথক

শক্তি) যে কোন একটাকে বীরে বীরে পরিবর্তন করলে দেখা যাবে, কোন নির্দিষ্ট নিকষিত শক্তিতে কোন একটি বিশেষ আয়নই ঐ নির্দিষ্ট চৌম্বক সীমা অতিক্রম করে সংগ্রাহকে পৌঁছতে পারে। প্রকৃতপক্ষে তার-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে আয়নের উৎপত্তিস্থল ও সংগ্রাহকের মধ্যবর্তী দূরত্ব একই রাখা হয় এবং চৌম্বক শক্তি ও নিক্ষেপিত শক্তির যে কোন একটিকে অপরিবর্তিত রেখে অন্যটিকে আন্তে আন্তে বাড়ানো হয়। দেখা গেছে, নিকষিত শক্তিকে একই রেখে চৌম্বক শক্তি পরিবর্তন করলে ভালভাবে তার নির্ণয় করা সম্ভব হয় (1নং চিত্র)



1নং চিত্র

সংগ্রাহক নেবার দরকার নেই। একটি মাত্র সংগ্রাহক থাকলেই যথেষ্ট। কেন না, আমরা জানি, কোন একটি বিশেষ আয়ন চৌম্বক সীমানার কোন্‌ জায়গায় গিয়ে পড়বে, তা এক দিকে যেমন তার ভারের উপর নির্ভর করে, অন্য দিকে তেমনি নির্ভর করে, কি পরিমাণ বিদ্যুৎ-শক্তির সহায়তার তাকে নিক্ষেপ করা হচ্ছে বা কি রকম শক্তিসম্পন্ন চৌম্বক সীমানায় সেটা বিকিষ্ট হচ্ছে। সুতরাং আয়নের উৎপত্তিস্থল ও সংগ্রাহকের দূরত্ব একই রেখে চৌম্বক শক্তি এবং নিক্ষেপিত শক্তির (অ্যাম্প্লিগারেট

যখন ঐ আয়নটি সংগ্রাহকে পৌঁছয়, তখন একটা বিশেষ স্কেলের সৃষ্টি হয় এবং সেই স্কেলটিকে তখন অ্যাম্প্লিগারেটের সাহায্যে বর্ণিত করে ঠিকমত লিপিবদ্ধ করা হয়<sup>১</sup>।

1. স্কেলগুলিকে লিপিবদ্ধ করার জন্তে তার-বর্ণালীমিতি যন্ত্রে রেকর্ডার থাকে। সাধারণতঃ তিন প্রকার রেকর্ডার ব্যবহৃত হয়। যথা—অসিলোগ্রাফ, পেন ও ইলেক্ট্রিক রেকর্ডার এবং ডিজিটাইজার। এর মধ্যে অসিলোগ্রাফ এবং ডিজিটাইজার দুকভাবে ব্যবহার করলে সত্যো-জনক ফল পাওয়া যায়।

এই প্রশ্নকে যে কথাটা মনে রাখা একান্ত দরকার, তা হচ্ছে, ঐ বিশেষ সঙ্কেতটি কখনই আয়নের আনাপেক্ষিক (অ্যাবসোলিউট) ভরের নির্দেশক নয়। সব সময় ওটা ভর ( $m$ ) এবং চার্জ ( $e$ , ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি)-এর অনুপাতকে ( $m/e$ ) বুঝিয়ে থাকে। এখন ঐ  $m/e$  সঙ্কেতটিকে লেখচিত্রের মাধ্যমে প্রকাশ করা হয়। এই লেখচিত্রের এক অক্ষ আয়ন সঙ্কেত ( $m/e$ ) এবং অল্প অল্প আয়নের আপেক্ষিক তীব্রতা<sup>৩</sup> নির্দেশ করে। এর ফলে ঐ লেখচিত্রের বিভিন্ন  $m/e$  স্থানে পৃথক পৃথক আয়ন সঙ্কেতগুলি শৃঙ্খল আকারে অবস্থান করে এবং বিশেষ একটি  $m/e$  স্থানের মান নির্দিষ্ট একটি আয়নের ভরের পরিমাপক হিসাবে কাজ করে।

উপরিউক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমরা বলতে পারি, ভর-বর্ণালীমিতির আসল কথা হচ্ছে, কোন পদার্থ কিংবা পদার্থের মিশ্রণ থেকে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করে তাদের ভর নির্ণয় করা। সুতরাং যদি কোন যৌগ থেকে অল্পরপভাবে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করা সম্ভব হয়, তাহলে ভর-বর্ণালীমিতির সাহায্যে সেই সব যৌগের ভর নির্ণয় করা অসম্ভব নয়। প্রকৃতপক্ষে জৈব যৌগগুলি ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে আয়নিত হয় এবং দেখা গেছে বর্ণেট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতে বহু পারমাণবিক জৈব যৌগগুলি টুকরা টুকরা হয়ে ভেঙে গিয়ে অনেক ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি করতে পারে। এখন ঐ টুকরাগুলির ভর নির্ণয় করে ঠিকমত সরিবেশিত করতে পারলে পরীক্ষাধীন ঐ বহু-পারমাণবিক অণুটির পুরা কাঠামো সম্পর্কে একটা সুস্পষ্ট ধারণা আমাদের জন্মতে পারে এবং এই মূল-

২. সবচেয়ে বেশী তীব্র যে সঙ্কেতটি তাকে মূল সঙ্কেতে ধরা হয় এবং সেই সঙ্কেতের জন্তে যে শৃঙ্খল পাওয়া যায়, তাকে মূল শৃঙ্খল বলা হয়।

নীতিই হচ্ছে আলোচ্য বাহ্যিক প্রায়োপ-কৌশলের বৈশিষ্ট্য এবং জনপ্রিয়তার প্রধান কারণ।

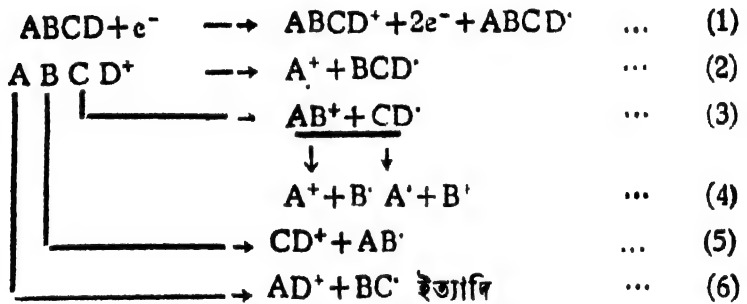
এখন প্রশ্ন হলো, কি কি পরিমাপ ইলেকট্রন শক্তি ব্যবহার করলে ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে? এর উত্তরে বলা যেতে পারে, ইলেকট্রন-রশ্মির আঘাতের ফলে কোন্ অণু থেকে তখনই একটা ইলেকট্রন বেরিয়ে যেতে পারে<sup>৩</sup>, যখন সেই আঘাতকারী ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি ইলেকট্রন-আহত ঐ অণুর আয়নীকরণ শক্তির (আয়োনাইজেশন পোটেনশিয়াল) সমান কিংবা তার চেয়ে বেশী। জৈব যৌগের আয়নীকরণ শক্তি সাধারণতঃ ৭ থেকে ১৫ ইলেকট্রন-ভোল্টের মত হয়। কাজেই জৈব অণুকে আয়নিত করতে হলে কম পক্ষে ঐ ধরনের শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করতে হবে। কিন্তু ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তি যদি অণুর আয়নীকরণ শক্তির সমান হয়, তাহলে অণুটিকে আয়নিত করতে হলে ঐ ব্যবহৃত শক্তিকে পুরাপুরিভাবে পরীক্ষাধীন অণুতে স্থানান্তরিত করতে হবে (যা অনেক ক্ষেত্রে সম্ভব নাও হতে পারে)। এই রকম ক্ষেত্রে খুব কম তীব্র আপবিক শৃঙ্খল ভর-বর্ণালীতে বিদ্যুত হয় কিন্তু ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাপ বাড়ালে পরীক্ষাধীন অণুটির আয়নিত হবার সম্ভাবনাও বেড়ে যাবে এবং তার ফলে ভর-বর্ণালীতে উল্লেখযোগ্য তীব্র আপবিক শৃঙ্খলের ইঙ্গিত পাওয়া যাবে। এই জন্তেই এই পদ্ধতিতে আপবিক-আয়নের উৎপত্তির জন্তে সাধারণতঃ ৩০ থেকে

৩। ইলেকট্রন হচ্ছে নেগেটিভ কণা, সুতরাং সে রকম একটা কণা অণু থেকে বেরিয়ে গেলে একটা ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হবে। এই ইউনিপজিটিভ আয়নকে আপবিক আয়ন বা মলিকিউলার আয়ন ( $M^+$ ) বলা হয় এবং এর ভরকে আপবিক ভর বলা হয়।

50 ইলেকট্রন-ডোন্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়।

এবার ব্যবহৃত ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির পরিমাণ যদি ধীরে ধীরে আরও বাড়ানো হয় এবং পরীক্ষাধীন অণুটি যদি বহু-পারমাণবিক হয় ( তৈজস বৌগভুলি প্রায়শঃ এরূপ হয়ে থাকে ), তাহলে দেখা যাবে, ঐ বর্ণিত অতিরিক্ত শক্তি এমন একটা স্তরে গিয়ে পৌঁছবে, যখন তা ঐ আণবিক আয়নের মধ্যস্থিত কোন একটা বিশেষ বাহকে ভাঙবার পক্ষে যথেষ্ট। এর কলে বিবেচনাধীন অণুটির খণ্ডীকরণ ঘটতে থাকবে। আণবিক আয়নের মত একেত্রেও অণুর খণ্ডীকরণের সম্ভাবনা ইলেকট্রন-রশ্মির শক্তির বৃদ্ধির সঙ্গে বাড়তে থাকে। তাই উল্লেখযোগ্য এবং

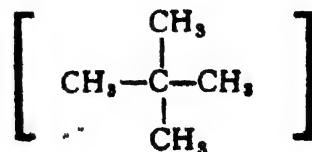
বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ভর-বর্ণালী পাবার জন্তে সাধারণতঃ 60 থেকে 90 ইলেকট্রন-ডোন্ট শক্তির ইলেকট্রন-রশ্মি ব্যবহার করা হয়। এই সব ভর-বর্ণালীগুলি কিন্তু বেশ জটিল। কারণ বহু-পারমাণবিক যৌগে বিভিন্ন ধরনের বাহ থাকতে পারে এবং তাদের ভাঙনের কলে বিভিন্ন ভরখণ্ডের সৃষ্টি হতে পারে। সুতরাং ভর-বর্ণালীতে অনেক ভর-শূন্য পাওয়া যাবে। একটা উদাহরণ দিলে এই কথাই বাখ্যার্থ্য খুব সহজেই বোধগম্য হবে। ধরা যাক, ABCD একটা কালনিক বহু-পারমাণবিক অণু এবং এটাকে যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন ইলেকট্রন-রশ্মি দিয়ে আঘাত করা হলো। এর কলে অণুটির নিম্ন পরিকল্পনা অজ্ঞাবাহী পরিবর্তন ঘটতে পারে।



উপরের পরিকল্পনা থেকে স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, আণবিক আয়নের সঙ্গে নিউক্লিওন ভরখণ্ডেরও সৃষ্টি হয় এবং পরে সেই আণবিক আয়ন ভাঙবার কলে অনেকগুলি ইউনিপজিটিভ আয়ন তৈরি হয়। যেহেতু ভর-বর্ণালীতে যে কোন পজিটিভ আয়ন বিধৃত হতে পারে, সেহেতু এই ধরনের বহু-পারমাণবিক অণুর ভর-বর্ণালীতে অনেকগুলি ভর-শূন্য দেখা যাবে।

এই প্রসঙ্গে একটা কথা উল্লেখ করা অত্যন্ত প্রয়োজন। অনেক সময় দেখা যায়, আণবিক আয়নের জ্যামিতিক গঠন এমনই যে, সেটা ভেঙ্গে

ভরখণ্ড তৈরি হবার আগে তার পুনর্বিভাগ ঘটে যায় এবং সে সব ক্ষেত্রে ঐ পুনর্বিভক্ত আয়ন থেকে এমন এক বা একাধিক ভরখণ্ড তৈরি হয়, যাদের সঙ্গে মূল অণুর কোন রকম যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। সুতরাং এই রকম পরিস্থিতিতে যৌগের কাঠামো নির্ণয়ে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ বেশ জটিল হয়ে পড়ে। ঠিক এই ধরনের জটিলতা নিমোপেনটন হাইড্রো-কার্বনের



ভর-বর্ণালীতে সৃষ্টি হয়। দেখা যায় ঐ যৌগের  $m/e$  ২৯ স্থানে একটা শৃঙ্খ আছে। হাইড্রো-কার্বনজাতীয় যৌগের ক্ষেত্রে সাধারণতঃ ইথাইল গুচ্ছ ( $-C_2H_5$ )-এর উপস্থিতির ক্ষেত্রে উক্ত স্থানে শৃঙ্খ দেখা যায়। নিম্নোপেনটেনে কিন্তু সে রকম ইথাইলগুচ্ছ নেই, অথচ ঐ শৃঙ্খটি ভর-বর্ণালীতে দেখতে পাওয়া যায়। এই ব্যতিক্রমকে ব্যাখ্যা করতে গেলে আণবিক আয়নের পুনর্বিন্যাস ঘটেছে—এই রকম কল্পনা করতেই হবে। এই ধরনের পুনর্বিন্যাস সাধারণতঃ অসম-পারমাণবিক (হেটারো-অ্যাটমিক) যৌগগুলিরই বিশেষত্ব এবং সেক্ষেত্রে এই জাতীয় পুনর্বিন্যাসের কৌশল এবং প্রয়োজনীয় কাঠামো সম্পর্কে মোটামুটি জ্ঞান থাকলে ভর-বর্ণালীর সঠিক বিশ্লেষণ করা মোটেই দুষ্কর নয়।

আরও একটা কথা এখানে বলে রাখা দরকার। আমরা জানি আয়নগুলি বেশ কম পরিমাণে তৈরি হয়। সুতরাং বেশী পরিমাণে পড়ে থাকা অপরিবর্তিত (নিউট্রাল) অণুগুলি ক্রমাগত ইলেকট্রন-রাশির আঘাতের ফলে আণবিক আয়নের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হতে পারে। এই সংঘর্ষের ফলে নিউট্রাল অণু থেকে একটা পরমাণু বা পরমাণুগুচ্ছ বিচ্ছিন্ন হয়ে আণবিক আয়নের সঙ্গে যুক্ত হয় এবং তখন অল্প একটা আয়ন তৈরি হয় (সমীকরণ নং ৭), যার ভর বিশ্লেষণাধীন অণুর চেয়ে বেশী। সুতরাং এই রকম অবস্থায় আণবিক ভর নির্ণয়ে বেশ জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে। অবশ্য যে পারিপার্শ্বিক অবস্থায় ভর-বণীয়করণ পরিচালনা করা হয়, তাতে নিউট্রাল অণু থেকে শুধুমাত্র হাইড্রোজেন বিচ্ছিন্ন হতে পারে তাই।  $(M+1)$  শৃঙ্খই সাধারণতঃ ভর-বর্ণালীতে বিদ্যুত হয়।  $(M+1)$

ভর-শৃঙ্খ প্রধানতঃ সেই সব যৌগের (অ্যামিন, ইথার, এক্টার ইত্যাদি) ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ, যাদের আণবিক আয়নটা খুবই নরম এবং তদুপর, কিন্তু  $(M+1)$  আয়নটা বেশ শক্ত ও স্থায়ী। অতএব এখানেও আমরা দেখছি, যৌগের জ্যামিতিক কাঠামোর ভূমিকা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। কেন না, আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বা নিউট্রাল অণু থেকে হাইড্রোজেনের বিচ্যুতি মোটামুটিভাবে জ্যামিতিক গঠনের উপর নির্ভরশীল।

উপরিউক্ত আলোচনার ভিত্তিতে এখন সুস্পষ্টভাবে বলা যায় যে, আণবিক আয়নের উৎপত্তি এবং পরবর্তী কালে তার বণীয়করণ সাধারণতঃ নিম্নলিখিত তথ্যের উপর নির্ভর করে :—

(ক) পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্ব।

(খ) যে বাহুটা ভাঙবে, তার দৃঢ়তা (বণ্ড-এনার্জি)।

(গ) নিউট্রাল বণ্ডের স্থায়িত্ব।

(ঘ) পরীক্ষাধীন যৌগের জ্যামিতিক কাঠামো।

এই সব তথ্যগুলির মধ্যে পজিটিভ আয়নের স্থায়িত্বই হচ্ছে সবচেয়ে বেশী তাৎপর্যপূর্ণ। কারণ এর উপরই নির্ভর করেছে ভর-শৃঙ্খ বা ভরবণ্ড-শৃঙ্খের তীব্রতা এবং একথা এখন আর আমাদের অজানা নেই যে, শৃঙ্খের তীব্রতাই হচ্ছে ভর-বর্ণালীর ব্যাখ্যানের প্রধান ভিত্তি। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর দেখা গেছে, যৌগের মধ্যে পাই-ইলেকট্রন ব্যবস্থা উপস্থিত থাকলে কিংবা যৌগের কাঠামো চক্রাকার হলে আণবিক আয়নের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায় এবং পরিবর্তপূর্ণ, বিশেষ করে অসম-পারমাণবিকগুচ্ছ আণবিক আয়নের বণ্ডিত হবার প্রবণতা বৃদ্ধি করে।

## বিজ্ঞান-সংবাদ

### তাপ পারমাণবিক সংযোজন

বিশ্বের বিভিন্ন দেশে বিজ্ঞানীরা নিয়ন্ত্রিত তাপ পারমাণবিক সংযোজন বা কনট্রোল ও থার্মো-নিউক্লিয়ার কিউশন ঘটানোর জন্তে গত 20 বছর ধরে চেষ্টা করছেন।

সমুদ্রের জলে সস্তায় ভারী হাইড্রোজেন বা ডিউটেরিয়াম পাওয়া যায়। এই সস্তা ইন্ধন ব্যবহার করে প্রচুর পরিমাণে বিদ্যুৎ-শক্তি উৎপাদন করার উপযোগী রি-অ্যাক্টর তৈরি করাই বিজ্ঞানীদের লক্ষ্য।

এক্ষেত্রে উন্নতি খুবই মধ্ গতিতে হয়েছে। তার প্রধান কারণ—প্রথমতঃ বিদ্যুতায়িত প্রচণ্ড উত্তপ্ত গ্যাসীয় বস্তুকণাকে ধরে রাখবার উপযোগী পাত্র চাই। এই সকল কণা একে অল্পকে প্রতিহত করে। এই ভীষণ উত্তপ্ত গ্যাসকে বলা হয় প্লাজ্মা। যে কোন পাত্রে ঐ গ্যাস রাখা যায় তা বাষ্প হয়ে উবে যাবে। তাই বিজ্ঞানীরা ঐ গ্যাস ধরে রাখবার পাত্র উদ্ভাবনে ব্রতী হয়েছেন।

সম্পূর্ণ কাঁকা একটি পাত্রে রাখাধানে চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে ঘিরে প্লাজ্মা রাখা যায় কিনা, সে নিয়ে বিজ্ঞানীরা পরীক্ষা করে দেখছেন। কিন্তু সমস্তা দেখা দিয়েছে—প্লাজ্মাও বিদ্যুৎবাহী। ফলে চৌম্বক ক্ষেত্রের উপর এর প্রতিক্রিয়া হয় এবং চৌম্বক ক্ষেত্র দিয়ে একে ঘিরে রাখা সম্ভব হয় না, বেরিয়ে আসে।

বিজ্ঞানীরা বর্তমানে এই ক্ষুটি দূর করার পথে খানিকটা এগিয়ে গেছেন। ক্যালিফোর্নিয়ার ভানডিয়াগোর গাল্ফ জেনারেল অ্যাটমিক সংস্থার বিজ্ঞানী ডাঃ তিহিরো ওকাগুয়া কর্তৃক একটি নতুন বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে।

যন্ত্রটি হলো সম্পূর্ণ কাঁকা উঁচু গোলাকার একটি আধার। এর ব্যাস 16 ফুট। এর মধ্যে খুব

পাতলা রড দিয়ে অনেকগুলি গোল রিং বোলাবো আছে। ঐ সকল রিংয়ের মধ্যে বিদ্যুৎ-শক্তি চালিত হলেই চৌম্বক ক্ষেত্রের সৃষ্টি হয় এবং এর তীব্রতা বাইরের দিকে বেড়ে যায়। ফলে নির্দিষ্ট স্থানে প্লাজ্মাকে ধরে রাখা যায়। তিনি 0'07 সেকেন্ড প্লাজ্মা আটক করে রাখতে সক্ষম হয়েছেন। এই সময় পূর্বকার তুলনায় 10 গুণ বেশী। ওকাগুয়া এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, হাই-ড্রোজেন পরমাণুর সংযোজন ঘটাবার জন্তে প্রথমতঃ প্লাজ্মাকে বেশ কিছু সময় বাতে ধরে রাখা যায়, তার ব্যবস্থা করতে হবেই, কারণ সংযোজন ঘটাবার রি-অ্যাক্টর তৈরির পথ সন্ধানের জন্তে বেশ কিছু বার কোন আধারে প্লাজ্মা রেখে সংযোজন ঘটাতে হবে।

### দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে জীবাত্মের সন্ধান

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে ভূগর্ভে খনন করে মার্কিন বিজ্ঞানীরা অধুনালুপ্ত এক প্রকার সরীসৃশ জাতীয় জীবের প্রত্নরীভূত কঙ্কালের অংশবিশেষ উদ্ধার করেছেন। এই সকল জীব 20 কোটি বছর পূর্বে আফ্রিকা ও এশিয়ার বিচরণ করতো।

পৃথিবীর মহাদেশসমূহ বর্তমানে যেমন একটি অল্পটি থেকে বিচ্ছিন্ন, বহু কোটি বছর পূর্বে এরকম ছিল না। পৃথিবীর মোট স্থলভূমি একটি বা দুটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। তারপর ধীরে ধীরে নানা খণ্ডে বিভক্ত হয়ে এতগুলি সরে সরে যায়। বিজ্ঞানীদের এই কথার প্রমাণ এই জীবাশ্ম আবিষ্কারে পাওয়া যায়।

একটি মত অনুসারে একদা দক্ষিণ মেরু অঞ্চল ছিল নিরক্ষবৃত্ত এলাকার খুব কাছে এবং এর সঙ্গে ছিল বর্তমান আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা,

ভারত ও অস্ট্রেলিয়া। এই বিরাট ভূখণ্ডকে বলা হতো গণ্ডারানাল্যাও।

১৯২৮ সালে দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে বার্ড অভিযান চালানো হয়, তাতে প্রধান বিজ্ঞানী হিসাবে অংশ গ্রহণ করেছিলেন অ্যারিজোনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিখ্যাত ভূ-বিজ্ঞানী ডাঃ লরেন্স এন. গুল্ড। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন—এই আবিষ্কারে অতীত যুগের গণ্ডারানাল্যাও নামে এক বিরাট মহাদেশের অস্তিত্ব সম্পর্কে আর কোন সন্দেহ রইলো না।

এই জীবাশ্মটি লিস্টোসোরাস নামে অতিকার জন্তুর মাথার একাংশ। জন্তুটি দেখতে ছিল অনেকটা হিপোগটেমাস বা জলহস্তীর মত। ঐ সকল জন্তু ভারত ও আফ্রিকার প্রচুর ছিল। জন্তুটি জলচর হলেও এর পক্ষে সম্ভবতঃ আফ্রিকা থেকে বহু সমুদ্র পেরিয়ে দক্ষিণ মেরুতে বাওয়া সম্ভব ছিল না—এই দুটি অঞ্চলের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান।

দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে আবিষ্কৃত এটিই প্রথম মেরুদণ্ডী প্রাণীর জীবাশ্ম। ডাঃ গুল্ড বলেছেন, দক্ষিণ মেরু অঞ্চলে যে সব জীবাশ্ম পাওয়া গেছে, তাদের মধ্যেই কেবল নয়, আজ পর্যন্ত অতীত যুগের যে সকল জীবাশ্ম উদ্ধার করা হয়েছে, তাদের সকলের মধ্যেই এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে রয়েছে।

দক্ষিণ মেরু থেকে ৪০০ মাইল দূরবর্তী ট্র্যান্স অ্যান্টারটিক পর্বতমালার বালিগাধরের তুণ থেকে এই প্রাগৈতিহাসিক জীবের প্রস্তরীভূত কঙ্কালটি উদ্ধার করা হয়েছে।

### দৌবস্কৃত ডি. ডি. টি. তৈরির উদ্ভোগ

কীটবিনাশক ডি. ডি. টি-র ব্যবহার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, যুক্তরাজ্য, ক্যানাডা, সোভিয়েট ইউনিয়ন, জাপান, পশ্চিম জার্মানী, নরওয়ে, ডেনমার্ক, সুইডেন, নেদারল্যান্ডস ও হাঙ্গেরীতে আংশিক

ভাবে নিষিদ্ধ হয়েছে। কীটের দ্রব্য হিসাবে এর বিশ্বজোড়া ব্যাতি থাকলেও আবহাওয়া দূষিত করবার মত এরকম দ্রব্য আর নেই। পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ম্যালেরিয়া, টাইফয়েড প্রভৃতি রোগ নিয়ন্ত্রণে এবং কীট-পতঙ্গ থেকে ফসল করবার উদ্দেশ্যে এখনও ডি. ডি. টি. ব্যবহার করা হচ্ছে, এর আংশিক বা পুরাপুরি ব্যবহার নিষিদ্ধ করা হয় নি।

তবে সর্বদোষমুক্ত একপ্রকার ডি. ডি. টি. তৈরির জন্তে চেষ্টা করা হচ্ছে এবং পরীক্ষামূলক-ভাবে ঐ ধরনের ডি. ডি. টি. তৈরি করাও হয়েছে। মাল্লব অথবা জীবজন্তুর পক্ষে ক্ষতিকর নয় বলে প্রমাণিত হলে আগামী এক বছরের মধ্যে এসকল বাজারে ছাড়া হবে এবং পরিণামে বিভিন্ন দেশে এর ব্যবহার সম্পর্কে নিবেদাজ্ঞাও জুলে নেওয়া হতে পারে।

ছড়াবার পর চার-পাঁচ দিনের মধ্যেই ডি. ডি. টি., ডি. ডি. ডি. ই নামে বৈজ্ঞানিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। জলে অথবা যেখানেই প্রয়োগ করা হোক না কেন, বহু রকমের মাছ ও পোকামাকড় ডি. ডি. ই-তে মরে যায়। মাল্লবের পক্ষে উপকারী বহু পোকামাকড়ও এর মধ্যে রয়েছে। ডি. ডি. ই. খুবই বিষাক্ত দ্রব্য।

ক্যালিকোর্নিয়ার এরোজেট জেনারেল কর্পোরেশন নামে একটি সংস্থা ডি. ডি. টি. পাউডারের সঙ্গে অল্প একটি উপকরণ মিশিয়ে এক নতুন ধরনের কীটের দ্রব্য তৈরি করেছেন। ডি. ডি. টি-কে বিষমুক্ত করবার জন্তে এতে রাসায়নিক অল্প-খটক হিসাবে কি উপকরণ যোগ করা হয়েছে, তার নাম প্রকাশ করতে ঐ সংস্থা সম্মত নন। বর্তমানে ঐ সংস্থার গবেষণাগারের মাছের উপর এই নতুন ধরনের ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করা হচ্ছে। এই দ্রব্যটি কতখানি বিষমুক্ত হয়েছে, তা বর্তমানে নিরূপণ করা হচ্ছে।

আত্মতরীণ দপ্তরের পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগের ডিরেক্টর ডাঃ অ্যালগোনস করজিয়াতি এ-সম্পর্কে বলেছেন যে, এই নতুন ধরনের ডি. ডি. টি. যে অনেকখানি দোষমুক্ত, এতে বিষ তৃষ্টি যে অনেক কম হয়ে থাকে, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। এর কার্যকারিতা প্রমাণিত হলে এই নতুন ধরনের ডি. ডি. টি-র দ্বারা পৃথিবীর শিল্পোন্নতি এবং উন্নতিশীল উত্তর অঞ্চলই বিশেষভাবে উপকৃত হবে। পুরনো ডি. ডি. টি-র তুলনায় এর মূল্য দ্বিগুণ বেড়ে গেলেও ঋণাত্মকপাদন বৃদ্ধি ও মাহুকের স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে নতুন ধরনের ডি. ডি. টি-র তাৎপর্য ও সুফল অস্বাধীন করলে এই মূল্যবৃদ্ধি যৎসামান্যই মনে হবে।

পৃথিবীর শিল্পোন্নতি রাষ্ট্রসমূহে কসল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে যে কীটন দ্রব্যাদি ব্যবহার করা হয়, তাদের অধিকারও বৈজ্ঞানিক ডি. ডি. টি. এবং সংশ্লিষ্ট উপকরণ নিয়ে তৈরি হয়ে থাকে। রাষ্ট্রসংঘের স্বাস্থ্য ও কৃষি সংস্থার ধারণা পৃথিবীর উন্নতিশীল রাষ্ট্রসমূহে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ না করলে অধিকারও বৈজ্ঞানিক

তুলনা নষ্ট হয়ে যেত। ব্রেজিলে পেরারা প্রভৃতি কল সংরক্ষণের ক্ষেত্রে ব্যাপক ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি. প্রয়োগ করা হয়।

এ সকল দোষে জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি-র প্রয়োগ অপরিহার্য। বিশ্বাস্য সংস্থার ডিরেক্টর জেনারেল এম. জি. ক্যানডো বলেছেন যে, জনস্বাস্থ্য রক্ষার ক্ষেত্রে ডি. ডি. টি-র স্থান অল্প কিছু দিগে পূরণ হতে পারে না। এর ব্যবহার সীমিত করলে পৃথিবীর বেশীর ভাগ উন্নতি-শীল রাষ্ট্রে স্বাস্থ্যরক্ষার ক্ষেত্রে গুরুতর সমস্যা দেখা দেবে।

পৃথিবীর কোন কোন গ্রীষ্মপ্রধান অঞ্চলে মোট মৃত্যুর শতকরা 20টি এবং শিশু মৃত্যুর শতকরা 10টি এখনও ম্যালেরিয়ার ক্ষেত্রেই হয়ে গেছে। জনস্বাস্থ্যের ক্ষেত্রে এখনও মাহুকের অন্ততম বড় শত্রু ম্যালেরিয়া। ম্যালেরিয়া রোগবাহক মশকগুলোর বৃদ্ধি এখনও ডি. ডি. টি. ছড়িয়েই নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

কিশোর বিজ্ঞানীর  
দপ্তর  
জ্ঞান ও বিজ্ঞান

নভেম্বর — 1970

ত্রয়োবিংশ বর্ষ — একাদশ সংখ্যা





### জীবন-জাগ বস্ত্র

দুর্ঘটনার অজ্ঞান হয়ে গেলে এই বস্ত্রের সাহায্যে জ্ঞান কিরিয়ে আনা সহজ। মুখে  
মুখোশ লাগিয়ে মার্শটিকের ব্যাগ টিপলেই প্রচুর হাওয়া ফুলফুলে ঢুকে যায় এবং ফুলফুল  
থেকে নিঃসৃত হাওয়া অল্প একটি নল দিয়ে বেরিয়ে যায়। পশ্চিম জার্মেনীর লুইসে  
এই বস্তু উদ্ভাবিত হয়েছে।

## হাম্ফ্রি ডেভির খ্রেষ্ঠ আবিষ্কার

বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হাম্ফ্রি ডেভিকে একজন প্রব কয়েছিল—আপনার সবচেয়ে বড় আবিষ্কার কোনটি? ডেভি সর্বদা উত্তর দিয়েছিলেন—মাইকেল ফারাডে। গরীব কামারের ছেলে বই বাঁধাইকারী তেরো বছরের কিশোর ফারাডের মধ্যে বিস্ময়কর সম্ভাবনার সন্ধান পাওয়া। সভাই ডেভির একটি বড় আবিষ্কার। শুধু সন্ধানই নয়, অখ্যাত সেই ছেলেটিকে বিশ্ববিখ্যাত মাইকেল ফারাডে করে গড়ে তোলবার সব কৃতিত্বই ছিল সার হাম্ফ্রি ডেভির।

লন্ডনের কাছে ছোট্ট একটি গ্রামের গরীব কামার পরিবারে 1791 খৃষ্টাব্দে ফারাডের জন্ম হয়। বিদ্যালয়ে পড়বার মত আর্থিক সামর্থ্য তাঁর পিতামাতার ছিল না। তেরো বছর বয়সেই জীবিকা অর্জনের জন্তে ফারাডেকে বই বাঁধাইয়ের কাজ করতে হয়। কিন্তু কাজের চেয়ে তাঁর মন বেশী পড়ে থাকতো বইয়ের পাতায়, বিজ্ঞানের বই পেলো বাঁধবার আগে সবটা পড়ে ফেলতেন। না পড়ে কোন বিজ্ঞানের বই তিনি কখনও ফেরৎ দিতেন না। ডেভির প্রতি তাঁর অস্থা ছিল অপরিণীত, তাঁর কাছে বিজ্ঞান শেখবার প্রবল বাসনা ছিল ফারাডের। ডেভির দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্তে তিনি তাঁর বক্তৃতাগুলি সময়ে টুকে নিতেন। টুকে নেবার সময় সংশ্লিষ্ট চিত্রাদিও এঁকে রাখতেন। পরে সেগুলি বাঁধিয়ে ডেভির কাছে পাঠিয়ে দিতেন। ডেভি তাঁর আগ্রহ দেখে খুবই সন্তুষ্ট হয়ে জানতে চান—তাঁর ইচ্ছা কি? ফারাডে লেবরেটরীতে একটি চাকুরীর প্রার্থনা জানান। ফারাডের আন্তরিক বিজ্ঞানানুরাগ বুঝতে ভুল করেন নি ডেভি। তিনি রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের একটি লেবরেটরীতে অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে ফারাডেকে নিয়োগ করেন। এই চাকুরীতে নিয়োগ সম্বন্ধে একটি সুন্দর গল্প আছে। ডেভি তখন রয়্যাল ইনস্টিটিউশনের ডিরেক্টর। ফারাডেকে চাকুরী দেবার ব্যাপারে তিনি ইনস্টিটিউশনের একজন কর্মকর্তার মতামত জিজ্ঞাসা করলে কর্মকর্তাটি জবাব দেন—বেশ তো, ওকে শিশু-বোতল পরিষ্কার করার কাজে নিয়োগ করুন। ছেলেটি রাজী হলে বোঝা যাবে, তাঁর মধ্যে পদার্থ আছে, রাজী না হলে জানবেন—কোন কাজের নয়। ডেভি সেই মত শিশু-বোতল পরিষ্কার করার কাজে যোগ দেবার জন্তে ফারাডেকে নিয়োগ পত্র পাঠান। ফারাডেও সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়ে যান। পরে ডেভি তাকে অ্যাসিস্ট্যান্টের পদে উন্নীত করেন।

ফারাডের কাছে বিজ্ঞান-সাধনার সুযোগের দ্বার খুলে গেল। ডেভির কাছে তিনি লাভ করলেন শিক্ষা আর লেবরেটরীতে হাতে-কলমে পরীক্ষা করার সুযোগ। বিজ্ঞানের তত্ত্বগুলিকে পরীক্ষার কঠিনপাথরে যাচাই করার জন্তে ছিল ফারাডের অসীম

আগ্রহ। আর সেই সঙ্গে বিজ্ঞানের ব্যবহারিক প্রয়োগের নতুন নতুন দার খুলে দেবার উদ্দেশ্যে তাঁর চেষ্টার অন্ত ছিল না।

1825 খৃষ্টাব্দে মাইকেল কারাডে তাঁর লেবরেটরীর অধ্যক্ষের পদে উন্নীত হন। রসায়নের কাজেও তিনি আত্মনিয়োগ করেন। কারাডে আবিষ্কার করেন অনেক কিছু। সেগুলির কোনটিই ছোট নয় এবং প্রতিটির ব্যবহারিক মূল্যও অপরিমেয়। তবে তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশই তাঁর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। 1820 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞানী অরস্টেড দেখিয়েছিলেন যে, কোন তারের মধ্য দিয়ে তড়িৎ প্রবাহিত হবার সময় কাছে কোন চৌম্বক শলাকা থাকলে তা বিচলিত হয়। অরস্টেডের এই পর্যবেক্ষণ সম্বন্ধে কারাডে পরীক্ষা করে দেখতে গিয়ে 1831 খৃষ্টাব্দে তাঁর বিখ্যাত তড়িৎ-চুম্বকীয় আবেশের সূত্র আবিষ্কার করেন। এই সূত্রের মধ্য দিয়েই তড়িৎ ও চুম্বকের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের বিষয় জানা যায়। এই অবিস্মরণীয় আবিষ্কার বিদ্যাকে ব্যাপকভাবে কাজে লাগাবার সন্ধান দেয়, আর সেই সঙ্গে মানুষের দৈনন্দিন জীবন ও সভ্যতার বিদ্যুতের অপরিহার্য ভূমিকার সূচনা হয়।

কারাডের তড়িৎ-বিশ্লেষণের সূত্র রসায়ন ও পদার্থবিজ্ঞানের মধ্যে সূত্র সেতু রচনা করে। এই সূত্রই আবার ধাতুশিল্প ও অস্ত্রাস্ত্র শিল্পের বিস্ময়কর অগ্রগতির সোপান গড়ে তোলে। 1825 খৃষ্টাব্দে তিনি আরোম্যাটিক হাইড্রোকার্বন বেঞ্জিন আবিষ্কার করেন। তাঁর এই আবিষ্কার জৈব রসায়নের বিপুল সম্ভাবনাময় আরোম্যাটিক শাখার সূত্রপাত করে। এই আবিষ্কারটি হয় একটু বিচিত্র ধরণে। সে সময় তিমির তেল থেকে পাতনের দ্বারা প্রাপ্ত গ্যাসকে বাড়ীর আলো জ্বালাবার কাজে ব্যবহার করা হতো। গ্যাস থাকতো উচ্চ চাপে লোহার পাত্রে। গ্যাস কোম্পানী দেখলেন—শীতকালে এই গ্যাস থেকে খুব উজ্জল আলো পাওয়া যাচ্ছে না। এই সমস্যা সমাধানের জন্যে কোম্পানী কারাডেকে বলেন। কারাডে দেখলেন, উচ্চ চাপ আর ঠাণ্ডায় এই গ্যাসের একটি অংশ তরল হয়ে যায়। গ্যাসের এই অংশই আলো-কে উজ্জল করে। শীতকালে এই গ্যাস তরল অবস্থায় থাকবার কলে ততটা উজ্জল আলো দিতে পারে না। কারাডে এই তরল অংশকে পৃথক করেন। এটিই হলো জৈব রসায়নের অতি মূল্যবান যৌগ—বেঞ্জিন।

কারাডের অস্ত্রাস্ত্র বহু আবিষ্কারের মধ্যে বিভিন্ন রকমের সঙ্কর-লৌহ প্রস্তুত, বিভিন্ন অপটিক্যাল কাচ প্রস্তুত, সমস্তগামী একমুখী আলোক-চুম্বিকে চৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা বিক্ষিপ্তকরণ প্রভৃতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। 1867 খৃষ্টাব্দে বিজ্ঞান-সাধনার অস্বতম প্রধান হোতা—সার হামফ্রি ডেভির জ্যেষ্ঠ আবিষ্কার মাইকেল কারাডে ইহলোক পরিত্যাগ করেন।

## পৃথিবীর বয়স

তোমাদের কাউকে যদি প্রশ্ন করা হয়—তোমার বয়স কত ? তাহলে নিশ্চয়ই তোমার জন্ম-তারিখ থেকে প্রশ্নের দিন পর্যন্ত হিসেব করে তোমার বয়সটা বলবে, তাই নয় কি ? কারোর বয়স জানতে গেলে তার জন্ম-তারিখটা জানা অত্যাবশ্যক। পৃথিবীরও যদি বয়স নির্ণয় করতে হয়, তাহলে তার জন্ম-তারিখটা অর্থাৎ কবে এই পৃথিবীর সৃষ্টি হয়েছিল, তা আমাদের জানতে হবে। মহাশূন্যে এই পৃথিবীটার কেমন করে সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিকেরা যেমন অন্বেষণ করেছেন, তেমনি ঠিক কত বছর আগে এই পৃথিবীটা মহাশূন্যে তার নিজের কক্ষপথে স্থাপিত হয়ে সৌরপরিবারের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল, তা নিয়েও তাঁরা দীর্ঘকাল গবেষণা করেছেন। পৃথিবী ও বিশ্বব্রহ্মাণ্ড সম্পর্কে মানুষের কৌতূহলের সীমা-পরিসীমা নেই। তাবতে কেমন লাগে বল তো—আজকের এই শস্ত-শ্রামল সুন্দর পৃথিবীটা একদিন শুধু জ্বলন্ত গ্যাসীয় পিণ্ডমাত্র ছিল, তারপর ধীরে ধীরে ঠাণ্ডা হবার পর তার বুকে পাহাড়-পর্বত, নদী-সমুদ্র, স্থলভূমি, আরো পরে জীবন অর্থাৎ উদ্ভিদ ও প্রাণীর ক্রমবিকাশ শুরু হয়েছিল।

পৃথিবীর বয়স নির্ধারণ করবার জগ্গে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন পদ্ধতি অবলম্বন করেছেন। এক এক করে পদ্ধতিগুলির কথা বলছি।

সমুদ্রের তলদেশে প্রতি বছর পলি জমা হচ্ছে এবং তার ফলে সমুদ্রের তলদেশে পলিস্তরের উচ্চতা প্রতি বছরই মোটামুটি নির্দিষ্ট হারে বৃদ্ধি পাচ্ছে। এখন যদি কোন এক বছরের জমা পলিস্তর এবং সমগ্র পলিস্তরের উচ্চতা মাপা যায়, তাহলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে একটা সংখ্যা খাড়া করা যাবে। এই হিসাবে পৃথিবীর বয়স ছ-কোটি পাঁচ লক্ষ বছরের কাছাকাছি বলে জানা গেছে। কিন্তু পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে—কারণ, প্রথম অবস্থায় পলি জমা হওয়া সম্ভব ছিল না এবং তুচ্ছও এই দীর্ঘ সময়ে বহু পরিবর্তনের সম্মুখীন হয়েছে।

আর একটা পদ্ধতি হচ্ছে—পৃথিবী প্রতি বছরই তাপ হারাচ্ছে এবং প্রায় নির্দিষ্ট হারেই। বৈজ্ঞানিকেরা কোন এক বছরে পৃথিবী কতক বর্জিত তাপ এবং সৃষ্টির প্রথম অবস্থা থেকে বর্জিত তাপের মোট হিসাব করে বলেছেন, পৃথিবীর বয়স চার কোটি বছরের কাছাকাছি। এই হিসাবটিও নিহূল নয়; কারণ যে সব কারণে পৃথিবী তাপ হারাচ্ছে, তার সবগুলি কারণ প্রথম অবস্থা থেকে এখন পর্যন্ত অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীতে জীবনের অস্তিত্ব কবে থেকে প্রথম শুরু হয়েছিল, জীব-বিজ্ঞানীরা তা গবেষণা করে পৃথিবীর বয়স দশ কোটি বছরের কাছাকাছি বলে মনে করেন।

স্পষ্টত: পৃথিবীর বয়স এর চেয়ে অনেক বেশী হবে। কারণ পৃথিবী সৃষ্টির বহু বছর পরে পৃথিবীর বৃক্কে জীবন পালিত হবার অল্পকাল পরিবেশ গড়ে উঠেছিল।

আর একটি পদ্ধতি হলো সমুদ্র কতর্ক লবণ গ্রহণের গড় হিসাব বের করা। সমুদ্রের গড় লবণাক্ততা হলো 3.5%, এথেকে সমগ্র জলভাগের মোট লবণের পরিমাণ নির্ণয় করা সম্ভব এবং এই পরিমাণকে বছরে সমুদ্র কতর্ক গ্রহীত লবণের গড় পরিমাণ দিয়ে ভাগ দিলে পৃথিবীর বয়স সম্পর্কে যে সংখ্যা পাওয়া যায়, তা বারো কোটি বছরের কাছাকাছি। এই পদ্ধতিটিও ত্রুটিযুক্ত, কারণ সমুদ্র কতর্ক লবণ-গ্রহণ চিরদিন সমহায়ে হয় নি এবং সৃষ্টির প্রথম দিন থেকে আজ পর্যন্ত পৃথিবীর জলভাগ অপরিবর্তিত নেই।

পৃথিবীর বয়স নির্ণয়ে সর্বাঙ্গীণা নির্ভরযোগ্য পদ্ধতি হলো, তেজস্ক্রিয় পদার্থ-সমৃদ্ধ শিলার পরীক্ষা করা। তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ প্রতিনিয়ত আল্ফা, বিটা ও গামারশি বিকিরণ করে নতুন পদার্থের সৃষ্টি করছে। আল্ফা কণার ভর হিলিয়াম পরমাণুর ভরের সমান। আল্ফা কণাসমূহ নির্গত হবার পর যখন পার্শ্ববর্তী অজ্ঞাত পরমাণুগুলিকে আঘাত করে, তখন আল্ফা কণা দুটি ধনাত্মক আধানবিশিষ্ট হবার দরুন পার্শ্ববর্তী অজ্ঞাত পরমাণু থেকে দুটি ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন গ্রহণ করে এবং বিপরীত-ধর্মী আয়নগুলি পরস্পরের মধ্যে বিক্রিয়ায় আধান-নিরপেক্ষ হিলিয়াম গ্যাসে পরিণত হয়। বিটারশি হচ্ছে ঋণাত্মক আধানবিশিষ্ট ইলেকট্রন কণার বিকিরণ। গামারশি কিন্তু আধানবিহীন। তেজস্ক্রিয় পদার্থের অল্পরূপ অবিরাম ভাঙনের ফলে হিলিয়াম গ্যাসের সৃষ্টি হয় এবং সেই সঙ্গে পদার্থটি অল্প মৌলিক পদার্থে রূপান্তরিত হয়। ইউরেনিয়াম, থোরিয়াম, রেডিয়াম প্রভৃতি তেজস্ক্রিয় মৌলিক পদার্থসমূহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বিকিরণের ফলে তেজস্ক্রিয় ধর্মবিহীন সীসার রূপান্তরিত হয়। হিলিয়াম গ্যাসীয় পদার্থ হওয়ায় বায়ুমণ্ডলে মিশে গিয়ে হারিয়ে যায়, কিন্তু ধাতব অবশেষ সীসা পড়ে থাকে। এক গ্রাম রেডিয়াম 1600 বছর ধরে স্বতঃস্ফূর্ত বিকিরণের পর  $\frac{1}{2}$  গ্রাম রেডিয়াম পড়ে থাকে। এই ভাঙনের হার স্থান-কালের উপর নির্ভরশীল নয়। কোন নির্দিষ্ট পরিমাণ তেজস্ক্রিয় পদার্থ যে সময়ে ভাঙনের ফলে ঐ পরিমাণের অর্ধেক দাঁড়ায়, সেই সময়কে ঐ পদার্থের অর্ধ-জীবনকাল (Half-life span) বলে। এই অর্ধ-জীবনকাল বিভিন্ন তেজস্ক্রিয় পদার্থের ক্ষেত্রে বিভিন্ন। যেমন—ইউরেনিয়ামের অর্ধ-জীবনকাল 760 কোটি বছর, রেডিয়ামের 1600 বছর, থোরিয়ামের 21,1000 লক্ষ বছর ইত্যাদি। শিলাখণ্ডের বিকিরণের পর অবশিষ্ট ভর এবং উৎপন্ন সীসার ভরের অনুপাত থেকে শিলাখণ্ডটির বয়স প্রায় নিষ্ঠুরভাবে নির্ণয় করা সম্ভব। এভাবে প্রাচীনতম শিলাখণ্ডটির যে বয়স বৈজ্ঞানিকেরা নির্ণয় করেছেন, তা 250 কোটি বছরের কাছাকাছি। এখন এই শিলাখণ্ড সৃষ্টির আগে পৃথিবী প্রথমে অল্প গ্যাসীয় পিণ্ড এবং পরে

গলিত অবস্থায় ছিল। ঠাণ্ডা হয়ে জমাট বাঁধতে, অর্থাৎ শিলার রূপ পেতে আরো 250 কোটি বছর লেগেছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করছেন। কাজেই এথেকেই পৃথিবীর বয়সের একটা মোটামুটি হিসেব পাওয়া যাবে।

ক্রীজ্যাভির্মর ছই

## টিন

এপর্যন্ত যতগুলি ধাতু আবিষ্কৃত হয়েছে, তার মধ্যে ব্যবহারের দিক দিয়ে টিনের গুরুত্ব আজ অনস্বীকার্য। ভারতবর্ষে টিনের প্রয়োজনীয়তা ক্রমশঃই বেড়ে যাচ্ছে। এই প্রয়োজন মিটাবার জগ্গেই ভারত বৈদেশিক মুদ্রা খরচ করে মালয়েশিয়া, ইন্দো-নেশিয়া, থাইল্যান্ড, বলিভিয়া, কঙ্গো, নাইজেরিয়া প্রভৃতি দেশ থেকে টিন কিনছে।

টিনের ব্যবহার চতুর্দিকেই পরিব্যাপ্ত। সঙ্কর ধাতু প্রস্তুতিতে, টিনের প্রলেপ দিতে প্রচুর টিন ব্যবহৃত হয়ে থাকে। খাদ্য সংরক্ষণের জগ্গে ইম্পাতের তৈরী পাত্রেয় গায়ে খুব পাতলা করে (01 ইঞ্চি পুরু) টিনের প্রলেপ দেওয়া হয়। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, টিন তৈরির সময় শতকরা 10 থেকে 15 ভাগ টিন অবিশুদ্ধতার (Scrap) জগ্গে বাদ যায়। এই পরিমাণ টিনকে কাজে লাগাবার জগ্গে বিজ্ঞানীরা তাই তৎপর হয়েছেন। বর্তমানে এই উদ্দেশ্যে Detinning-পদ্ধতি প্রয়োগ করা হয়। পরিত্যক্ত ইম্পাত কণার রূপান্তরও সাধিত হয় এই পদ্ধতিতে।

ভারতবর্ষে প্রতি বছর প্রায় তিন লক্ষ টন টিন ব্যবহৃত হয়। অভিজ্ঞ মহলের ধারণা, এই চাহিদা বাড়তে বাড়তে 1970-71 সাল নাগাদ 5 লক্ষ টনে পৌঁছবে। এই 5 লক্ষ টন অপরিশুদ্ধ টিন থেকে Detinning পদ্ধতিতে 500 থেকে 750 টন টিন পাওয়া যাবে। এর ফলে দেড় কোটি টাকা থেকে 2½ কোটি টাকার সাঞ্চর হবে। বৈদেশিক মুদ্রার এই সাঞ্চর নেহাৎ কম কথা নয়। টিন প্রস্তুতিতে ক্ষারীয় রাসায়নিক পদ্ধতির প্রয়োগ আগেকার পদ্ধতির চেয়ে সহজ এবং শুল্ক। তাই বর্তমানে বিভিন্ন দেশে এই পদ্ধতির প্রচলন খুব বেশী হয়েছে। আর একটি পদ্ধতির (অ্যালকালাইন ইলেকট্রোলাইটিক প্রোসেস) চল আজও পৃথিবীর কোন কোন দেশে দেখতে পাওয়া যায়। তবে এই পদ্ধতি অত্যন্ত ব্যয়বহুল। কারণ, প্রয়োজনীয় বিদ্যুৎ উৎপাদনে খরচ অত্যন্ত বেশী। ক্লোরিন-পদ্ধতি আজকাল অধুমত হয় না ঐ একই কারণে। 1936 সালের আগে পর্যন্ত উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে স্ট্যানিক ক্লোরাইডের প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে, অথচ ক্লোরিন-পদ্ধতিতে টিন সংগ্রহ করা হতো উৎপন্ন

স্ট্যানিক ক্লোরাইড থেকে। রেরন শিল্পে প্রচুর পরিমাণে টিন ক্লোরাইডের প্রয়োজন। আগেই বলেছি, ক্লোরিন-পদ্ধতিতে স্ট্যানিক ক্লোরাইড উৎপন্ন হয় 'অনাজ' ক্লোরিন ও টিনের মধ্যে বিক্রিয়ার ফলে ( $50^{\circ}\text{C}$ -এর নীচের তাপমাত্রায়)। 'অনাজ' ক্লোরিনের সঙ্গে লোহার কোন বিক্রিয়া হয় না।

আলকালি ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে কৃত্তিক সোডার জ্বপে তড়িৎ-বিশ্লেষণ করা হয়। পরিত্যক্ত টিনকে অ্যানোড ও বিশুদ্ধ ইম্পাত-দণ্ডকে ক্যাথোডে যুক্ত করা হয়। তড়িৎ-বিশ্লেষণের ফলে টিন স্পঞ্জের আকারে ইম্পাত-ক্যাথোডে জমা হয়। তারপর ঐ টিনকে ধুয়ে পরিষ্কার করে পরিশুদ্ধ টিন পাওয়া যায়। ছোট ছোট পাত্রের প্রয়োজন এই পদ্ধতিতে। এই পাত্রগুলিতে তড়িৎ-বিশ্লেষণের পর্ব সমাধা হয়। সেই ক্ষেত্রে এই পদ্ধতি খুবই বায়বহুল।

ব্যবসায়িক দিক দিয়ে লাভজনক বলে বর্তমানে এই পদ্ধতির প্রচলন প্রায় সব দেশেই হয়েছে। টিনের সঙ্গে কৃত্তিক সোডার বিক্রিয়ার ফলে সোডিয়াম স্ট্যান্ট ক্রিস্টাল তৈরি হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত টিন প্রায় শতকরা ৯৯.৯৫ ভাগ বিশুদ্ধ।

Central Electrochemical Research Institute (C. E. C. R. I.) বর্তমানে একটা নতুন পদ্ধতি (Acid chemical process) বের করেছেন। এই পদ্ধতি পূর্বোক্ত পদ্ধতিগুলির চেয়ে সহজসাধ্য এবং লাভজনক। এই পদ্ধতিতে টিন প্রথমে স্পঞ্জের আকার ধারণ করে। এই টিনকে পরিশোধন করলেই বিশুদ্ধ (২৯%) টিন পাওয়া যাবে। এই পদ্ধতিতে পরিত্যক্ত টিন কাজে লাগিয়ে খরচ কমানো সম্ভব এবং অগ্রাগত পদ্ধতির তুলনায় এই পদ্ধতিতে অনেক কম সময় লাগে। এই পদ্ধতি যেমন সহজ, তেমনি প্রয়োজনীয় প্রাপ্ত তৈরির খরচও কম। কাঁচা ও অপরিশুদ্ধ মালের তো অভাব নেই আমাদের দেশে, কাজেই এগুলির সদ্যবহার করা যেতে পারে এই পদ্ধতিতে।

বিজ্ঞানের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে টিনের ব্যবহারও বাড়ছে। তাই টিন-শিল্পে স্বয়ংস্বতা অর্জন করা ভারতবর্ষের পক্ষে আজ একান্ত দরকার।

চঞ্চলকুমার রায়

## সংখ্যা নিয়ে খেলা

তোমরা তো অনেক কিছু নিয়েই খেলা কর। কিন্তু সংখ্যা নিয়ে খেলেছ কখনও? সংখ্যা নিয়ে খেলা—মজাদার তো বটেই, সেই সঙ্গে চমকপ্রদও। বিশ্বাস না হয় তো নীচের উদাহরণগুলি দেখ।

(ক) এমন অনেক সংখ্যা আছে যাদের যোগফল যত, গুণফলও তত।

যেমন ধর : 3 এবং 1½

4 এবং 1½

5 এবং 1½

10 এবং 1½

100 এবং 1

1000 এবং 1৮৮০

এদের সবাইর যোগফল যত, গুণফলও তত। বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক করে দেখ।

(খ) এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল হলো—

11,111,111,111,111,111

সেই সংখ্যা দুটি কি কি জান? আচ্ছা আমি বলি।

2,071,723-কে 5,363,222,357 দিয়ে গুণ করে দেখ তো কি পাও।

(গ) আবার এমন দুটি সংখ্যা আছে, যাদের গুণফল বেশ মজাদার অর্থাৎ 12345678987654321। বল দেখি সংখ্যা দুটি কি কি?

সংখ্যা দুটি হচ্ছে 12345679 এবং 99999999।

(ঘ) 45 সংখ্যাটা বড়ই মজাদার, তা জান কি? কি রকম মজাদার তা নীচের অঙ্কগুলি দেখলেই বুঝতে পারবে।

যোগ

$$\begin{array}{r} 123456789 \\ + 123456789 \\ \hline 246913578 \end{array}$$

যোগ করলে 45 হয়  
” করলেও ” ”

বিয়োগ

$$\begin{array}{r} 987654321 \\ - 123456789 \\ \hline 864197532 \end{array}$$

যোগ করলে 45 হয়  
” ” ” ”  
” করলেও ” ”



গুণ

$$\begin{array}{r}
 123456789 \quad \text{যোগ করলে 45 হয়} \\
 \times 2 \\
 \hline
 246913578 \quad \text{„ করলেও „ „}
 \end{array}$$

ভাগ

$$\begin{array}{l}
 1234567890 \quad \text{যোগ করলে 45 হয়} \\
 1234567890 + 2 = 617283945 \quad \text{যোগ করলেও 45 হয়।} \\
 \text{আবার } 9876543210 \quad \text{যোগ করলে 45 হয়} \\
 9876543210 + 2 = 4938271605 \quad \text{যোগ করলেও 45 হয়} \\
 \text{তলায় দাগ দেওয়া ভাগফল দুটি যোগ করলে পাওয়া যায় :} \\
 \begin{array}{r}
 617283945 \\
 4938271605 \\
 \hline
 5555555550 \quad \text{যোগ করলেও 45 হয়।}
 \end{array}
 \end{array}$$

(ঙ) বেশ মজাদার একটি রাশিমালা আছে।

সেই রাশিমালাকে তুমি যে কোন সংখ্যা দিয়েই গুণ করতে পার। গুণফলে কিন্তু রাশিমালার অন্তর্গত সব কয়টি সংখ্যাকেই দেখতে পাবে।

বল দেখি সেই মজাদার রাশিমালাটি কি ?

— সেটি হচ্ছে 526, 315, 789, 473, 684, 210।

(চ) 999999-কে 7 দিয়ে <sup>গুণ</sup> করলে পাবে 142857। 2 থেকে 6-এর মধ্যে যে কোনও একটি সংখ্যা দিয়ে 142857-কে গুণ করে দেখ তো কি পাও ? প্রতিটি গুণফলের মধ্যেই 1 4 2 8 5 7 সংখ্যা কয়টিকেই খুঁজে পাবে।

বিশ্বাস না হয় তো অঙ্ক কষে দেখ।

শ্রীঅমরনাথ রায়

## পলিওয়াটার

জলের অপর নাম জীবন। জল যে আমাদের জীবনে কতখানি পরিব্যাপ্ত, তা কারো অজানা নয়। মানুষের শরীরের বিভিন্ন উপাদানের মধ্যে জলের পরিমাণই হচ্ছে শতকরা 90 ভাগ। তাছাড়া সমস্ত পৃথিবীর তো তিন ভাগই জল আর মাত্র একভাগ স্থল।

অতি পরিচিত জল ছাড়া আরও এক রকম জলের কথা বিজ্ঞানীরা বলছেন। এই নতুন জলের নাম দেওয়া হয়েছে পলিওয়াটার বা অ্যানোমেলাস ওয়াটার অর্থাৎ অস্বাভাবিক জল।

পলিওয়াটারের কথা প্রথম বলেন রাশিয়ার রসায়নবিদ Dr. N. N. Fedyakin এবং Dr. Boris V. Deryagin 1962 সালে। তাঁরা বলেন, পলিওয়াটার জমাট বাঁধে সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী মন্থর গতিতে এবং অনেক বেশী মন্থর গতিতে বাষ্পীভূত হয়। শুধু তাই নয়, এই জল সাধারণ জলের চেয়ে অনেক বেশী স্থায়ী।

এই নতুন জলের সংবাদ স্বভাবতই রসায়নবিদদের মধ্যে চাকল্যের সৃষ্টি করেছে। 1969 সালে নিউইয়র্কে আমেরিকান কেমিক্যাল সোসাইটির সভায় Prof. E. R. Lippicott, Dr. Gerald এবং আরও কয়েক জন মিলে সব সন্দেহের অবসান ঘটান এবং পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতির বর্ণনা প্রদান করেন। রাশিয়ার রসায়নবিদগণ যে পলিওয়াটারের কথা বলছিলেন, তা পরীক্ষার সাহায্যে প্রমাণিত হলো।

পলিওয়াটারের রাসায়নিক উপাদান কিন্তু সাধারণ জলের মতই। দুই ভাগ হাইড্রোজেন এবং একভাগ অক্সিজেনের রাসায়নিক সমন্বয়েই পলিওয়াটার উৎপন্ন হয়। তবে সাধারণ জলের চেয়ে এর কতকগুলি পৃথক ধর্ম আছে—সেগুলি ভারী মজার।

জল 0°সে. তাপমাত্রায় জমে বরফের কঠোলে পরিণত হয়, কিন্তু পলিওয়াটার -40°সে. তাপমাত্রায় কাচের মত অবস্থায় পরিণত হয়। বিজ্ঞানীদের মতে, পলিওয়াটারের নির্দিষ্ট ফ্রিজিং পয়েন্ট নেই। চাপের উপর এবং তাপমাত্রা কি হারে কমছে, তার উপর নির্ভর করে -20°সে. -40°সে. অথবা -100°সে. তাপমাত্রায় জমাট বাঁধে।

জল 100°সে. তাপমাত্রায় বাষ্পীভূত হয়; কিন্তু পলিওয়াটারের তাপমাত্রা 500°সে. পর্যন্ত বাড়ানো যায়। পলিওয়াটারের ঘনত্ব সাধারণ জলের চেয়ে 40% বেশী। সাধারণ জলের মত 4°সে.-এ পলিওয়াটারের ঘনত্ব সবচেয়ে বেশী হয় না।

পলিওয়াটার তৈরির পদ্ধতি—কোয়ার্টজের তৈরি কৈশিক নলে জলীয় বাষ্প ঘনীভূত করে নলের দু-দু'ধ বন্ধ করে পরিস্ফুট জলে ডুবিয়ে রাখা হয়। সমস্ত

ব্যবহাটীর চাপমাত্রা খুব কমিয়ে দিলে প্রায় 18 ঘণ্টা কেলে রাখলে কৈমিক নলে পলিওমরাটার তৈরি হয়। কোরাট্টজ অলুম্বটকের কাজ করে। তবে ঠিক কোন রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে পলিওমরাটার পাওয়া গেল, বিজ্ঞানীরা এখনও তা জানতে পারেন নি।

বিজ্ঞানীদের বিশ্বাস—হয়তো বনিজ পদার্থের মধ্যে পলিওমরাটারের অস্তিত্ব আছে; কারণ কিছু কিছু কাদামাটির মধ্যে সাধারণের চেয়ে কিছু বেশী হননসম্পন্ন জলের অস্তিত্বের খোঁজ পাওয়া গেছে।

মাহুঘের শারীরিক উপাদানের শতকরা 90 ভাগ জল, তাহলে মাহুঘের প্রাণধারণের পক্ষে পলিওমরাটারের প্রয়োজন আছে কি? থাকলে কতটুকু? বিজ্ঞানীরা এর উত্তর খুঁজছেন।

শ্রীশ্রীলকুমার নাথ

## প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন। আই. কিউ. বলতে কি বোঝায়?

বিজ্ঞানবিকাশ মাগ, গোপা মাগ

শ্রীরামপুর, হুগলী।

উঃ—Intelligence Quotient শব্দ দুটির প্রথম অক্ষর নিয়ে আই. কিউ. কথাটি এসেছে। মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি পরীক্ষার মানকে এই শব্দ দিয়ে বুঝিয়ে থাকেন। কোন জিনিষের ভর, ওজন, দৈর্ঘ্য ইত্যাদির যেমন পরিমাপ করা যায়, বুদ্ধিকেও তেমনি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে মাপা যায়। বুদ্ধির সংজ্ঞা কি—এর কোনও নির্দিষ্ট উত্তর বিজ্ঞানীরা এখনও দিতে পারেন নি। তাই শুধু বুদ্ধি না বলে বিজ্ঞানীরা “সাধারণ বুদ্ধি” কথাটাই বেশী প্রয়োগ করেন এবং তার একটা মোটামুটি ব্যাখ্যাও করনা করে থাকেন। তাঁদের মতে, স্বাভাবিক লোকের বুদ্ধির পরিমাণকে সাধারণ বুদ্ধি বলা হয়।

সমবয়সী বিভিন্ন ব্যক্তির মধ্যে বুদ্ধির পার্থক্য থাকে। বুদ্ধির এই তালতম্যকে করনা করেই বুদ্ধির একটা গড় মান ধরা হয়ে থাকে, থাকে বলা হয় সাধারণ বুদ্ধি। এভাবেই কম বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বোকা বলা হয় এবং বেশী বুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তিদের বুদ্ধিমান বলা হয়।

মনোবিজ্ঞানীরা বুদ্ধি মাপবার সময় পরীক্ষার্থীর মানসিক বয়স স্থির করেন। এই ব্যাপারে বিভিন্ন পরীক্ষা-নিরীক্ষা আছে। একটি পদ্ধতিতে ছাত্রকে কোন নির্দিষ্ট সময়ের

মধ্যে কতকগুলি প্রশ্নের উত্তর জিজ্ঞাসা করা হয়। ঐ সময়ের মধ্যেই সমবয়সী স্বাভাবিক ছাত্রেরা প্রশ্নগুলির বোঝার, ভাগ উত্তর যে দিতে পারে, পরীক্ষকের তা আগে থেকে জানা থাকে। পরীক্ষার্থী কত কম সময়ের মধ্যে বেশীর ভাগ প্রশ্নের উত্তর দেয়, তার উপর ভিত্তি করেই তার মানসিক বয়স স্থির করা হয়। কারণ মানসিক বয়স কুড়ি—এর মানে কুড়ি বছরের সাধারণ ছেলে যে প্রশ্নের উত্তর যে সময়ে দেয়, সেও সেই প্রশ্নের উত্তর প্রায় একই সময়ে দেয়। মানসিক বয়স ও প্রকৃত বয়সের মধ্যে একটা সম্পর্কের সাহায্যে বিজ্ঞানীরা আই. কিউ. মাপে থাকেন।

$$\text{আই. কিউ.} = 100 \times \frac{\text{মানসিক বয়স}}{\text{প্রকৃত বয়স}}$$

স্বাভাবিক ব্যক্তিদের আই. কিউ.-এর মান হয় ১০০। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাক্ষা খুবই হীনবুদ্ধিসম্পন্ন ব্যক্তির পর্যায়ে পড়েন অর্থাৎ যাদের বুদ্ধি শিশুর মত, মনো-বিজ্ঞানীদের ভাষায় তাদের ইম্বেসাইল (Imbecile) বলা হয়। তাদের আই. কিউ. খুবই কম হয়ে থাকে। বয়স হওয়া সত্ত্বেও যাদের মানসিক বয়স আট, তাদের বলা হয় ইডিয়ট (Idiot)। মানসিক বয়স যাদের বারো, তাদের বলা হয় মোরন (Moron)। এসব ব্যক্তিদের বুদ্ধি ঠিকমত বিকশিত হয় না। মনোবিজ্ঞানীদের মতে, সাধারণ ব্যক্তিদের বুদ্ধি প্রায় কুড়ি বছর বয়স পর্যন্ত বাড়ে। এই বয়সের মধ্যেই মস্তিষ্ক ঠিকমত বিকশিত হয়ে যায়। বয়স বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধি বাড়তে পারে, কিন্তু আই. কিউ. মোটামুটি অপরিবর্তিত থেকে যায়। বুদ্ধি বাড়বার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধির প্রয়োগ যথাবধ ও সূচু হবার ক্ষেত্রে যে মানসিক ও চারিত্রিক বল, অধ্যবসায় ইত্যাদির প্রয়োজন হয়, তা হয়তো পূরণ হয় না—তাই আই. কিউ. অপরিবর্তিত থেকে যায়।

শ্রীমন্তেন্দ্র দেব

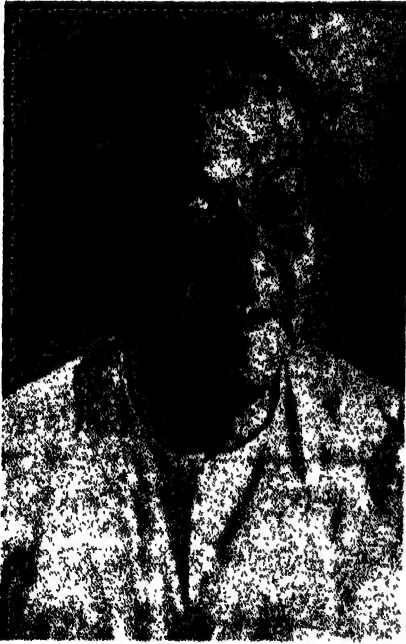
৯১নটিউট অব রেডিও ফিজিক্স অ্যান্ড টেলিকমিউনিকেশন, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৭

## শোক-সংবাদ

### ডক্টর বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

প্রখ্যাত মনোবিজ্ঞানী ও কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন প্রধান ডক্টর বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায় 13ই অক্টোবর এক পথ-দুর্ঘটনায় আহত হন এবং 14ই অক্টোবর এস. এস. কে. এম. হাসপাতালে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। মৃত্যুকালে তার বয়স হয়েছিল 67 বছর।

ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায়ের আদি বাসভূমি ছিল অধুনা পূর্ব পাকিস্থানের অঙ্গরগত করিমপুর জেলায়। তিনি হেয়ার স্কুল, প্রেসিডেন্সী কলেজ—কলিকাতা



বিজেন্দ্রলাল গঙ্গোপাধ্যায়

এবং লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষালাভ করেন। বিখ্যাত মনস্তত্ত্ববিদ বর্গীয় ডক্টর গিরীজশেখর বসু তাঁকে মনোবিজ্ঞান অধ্যয়নের জন্তে অর্থ-প্রাণিত করেছিলেন। ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় শিল্প-মনোবিজ্ঞান, অপরাধ-বিজ্ঞান, সমাজতত্ত্ব, শিশু-

মনোবিজ্ঞান সম্পর্কিত গবেষণায় ব্যাতি লাভ করেছিলেন। তিনি কাউন্সিল অব সোশাল অ্যান্ড সাইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং শীলারথ স্থাপনের প্রধান উদ্যোক্তা ছিলেন। প্রধানতঃ তাঁরই উৎসাহে অর্ডিনাল ক্যাটরীসমূহের ডিরেক্টর জেনারেল একটি সাইকোলজি-সেল স্থাপন করে-ছিলেন। গত কয়েক বছর ধরে তিনি অপরাধ-প্রবণ কিশোরদের চিকিৎসা ও চরিত্র-সংশোধনা-গার প্রভৃতিতে কয়েকটি নতুন মনস্তাত্ত্বিক স্তর চালু করেন। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় তিনি ভারত সরকারের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের মনস্তাত্ত্বিক পরামর্শদাতা ছিলেন।

1960 সালে ডক্টর গঙ্গোপাধ্যায় ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মনোবিজ্ঞান শাখার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি ইণ্ডিয়ান সাইকোলজি-ক্যাল অ্যাসোসিয়েসন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের প্রাক্তন ছাত্রদের সমিতি এবং সরকারপুল মানসিক হাসপাতালের সভাপতি এবং ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সাইকোলজ্যান-লিসিস-এর সহ-সভাপতি ছিলেন। বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সঙ্গে তিনি বিশেষভাবে যুক্ত ছিলেন। তিনি বিজ্ঞান পরিষদের সহ-সভাপতি এবং কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাছাড়া অসংখ্য অনেক প্রতিষ্ঠান, যেমন—ক্যালকাটা অ্যাসোসিয়েসন কর মেডিকাল হেল্প ইনষ্টিটিউট অব চিলড্রেনস ক্লিন, প্যাভলভ ইনষ্টিটিউট, ইণ্ডিয়ান ব্রেন রিসার্চ অ্যাসোসিয়েসন, লুইসী পার্ক মানসিক হাসপাতাল, বোম্বী পীঠ, জে. বি. এন. এস. টি. এস., কলিকাতা বুক ও বধির বিদ্যালয়, বালীগঞ্জ রতী সংঘ, শিলা সমাজ পত্রিকা প্রভৃতির সঙ্গে নানাতাবে যুক্ত ছিলেন। এক সময়ে তিনি 'ছোট গল্প' নামে একটি সাপ্তাহিক পত্রিকাও প্রকাশ করেছিলেন।

## বিবিধ

### 1970 সালে বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার

1970 সালে পদার্থ-বিজ্ঞানে দু-জনকে নোবেল পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এঁদের একজন হচ্ছেন কালের লুই নীল অপর জন সুইডেনের হান্স আল্ফভেন। দু-জনই অধ্যাপক। অধ্যাপক নীলের জন্ম 1904 সালে লিওতে। অধ্যাপক আল্ফভেনের বয়স 62।

রসায়নশাস্ত্রে 1970 সালে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন আরজেন্টিনার বুয়েনস আয়ারসের অধ্যাপক লুই এক. লেলয়র। এঁর জন্ম হয় 1906 সালে ক্রালে।

1970 সালে চিকিৎসা-বিজ্ঞানে নোবেল পুরস্কার পেয়েছেন বুটেনের সার বার্ণাড কাউজ, সুইডেনের উল্ফ. ফন ইউলার এবং আমেরিকার জুলিয়াস অ্যাক্সেলরড।

### টানদের মাটি নিয়ে লুনা-16 কিরে এসেছে

মহাকাশ প্রযুক্তিবিজ্ঞান এক নতুন ইতিহাস সৃষ্টি হয়েছে। সোভিয়েট রাশিয়ার মহাশূন্যবিহীন চাঁদবান লুনা-16 টানদের মাটি নিয়ে চক্কিশে সেপ্টেম্বর (1970) সোভিয়েট রাজ্যবস্তান সাধারণ-তত্ত্বের পূর্ব নির্দিষ্ট স্থানে স্বাভাবিকভাবে অবতরণ করেছে বলে সোভিয়েট সংবাদ সরবরাহ সংস্থা 'টাস' সংবাদ দিয়েছে। এর আগে কখনও মহাশূন্য-বিহীন বানে করে টান থেকে মাটি আনা হয় নি। লুনা-16 ভূপৃষ্ঠে অবতরণের দু-ঘণ্টা পরে এই খবর ঘোষণা করা হয়েছে।

টানদের মাটি নিয়ে চাঁদবানটি দেহকাজঘান সহরের দক্ষিণ-পূর্বে আশী কিলোমিটার দূরে নেমেছে। টানদের মাটি বা চাঁদ শিলাবাহী বডিগুলিকে প্যারাসুটের সাহায্যে নামতে

দেখা যায়। উদ্ধারকারী দলটির চোখের সামনে ক্যাপসুলটি প্যারাসুটের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠে নেমে আসে। তারপর একটি হেলিকপ্টারে ওটিকে ছলে নেওয়া হয়। ক্যাপসুলটির উদ্ধারে একটা জটিল চিকিৎসাব্যবস্থার সাহায্যে জনক পরিসমাপ্তি ঘটলো।

লুনা-16-কে গত 13ই সেপ্টেম্বর (1970) উৎক্ষেপণ করা হয়।

### টানদের শিলা খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত

মস্কো থেকে এ. পি. প্রেরিত এক খবরে জানা যায়, গত 24শে সেপ্টেম্বর লুনা-16 টান থেকে পৃথিবীতে যে শিলা এনেছে, সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্র 3রা অক্টোবর তার প্রাথমিক পরীক্ষার ফল প্রকাশ করেছে।

সরকারী সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠান টাস বলেছে যে, ঐ শিলা প্রধানত: ক্ষুদ্র শক্তদানার মত খনিজ পদার্থের কণিকা দিয়ে গঠিত এবং দেখতে ধূসর বর্ণের। বাইরে থেকে মনে হয় কণিকাগুলির সংযুক্তি খুব ঘন এবং তাদের মধ্যে আঙ্গুন শক্তিও (একত্রে এঁটে থাকবার শক্তি) আছে বেশ।

টাস আরও বলেছে, টানদের এই শিলায় যে পরিমাণ গাধারণ আছে, তা সামান্য পরিমাণ—প্রাকৃতিক তেজস্ক্রিয় পদার্থসম্বিত পৃথিবীর শিলার চেয়ে খুব বেশী নয়।

### থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233

বোম্বাই থেকে সংবাদ সংস্থা ইউ. এন. আই. জানাচ্ছে—ভারত তেজস্ক্রিয় পদার্থ থোরিয়াম থেকে ইউরেনিয়াম-233-কে আলাদা করে নেবার কৌশল আবিষ্কার করেছে।

বোম্বাইয়ের তাবা পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রের আলানী বিভাগের ভারতীয় বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা এর ফলে পরমাণু প্রযুক্তিবিদ্যার ক্ষেত্রে এক বৃহৎ কৃতিত্বের অধিকারী হলেন।

ভারতের কেরল উপকূলে যে পরিমাণ ধোরিয়াম রয়েছে, পৃথিবীর কোথাও তা নেই। এই বিপুল পরিমাণ ধোরিয়ামকে অতঃপর ভারতে পরমাণু শক্তির সাহায্যে বিদ্যুৎ উৎপাদনে অতি সহজেই ব্যবহার করা চলবে।

তাবা গবেষণা কেন্দ্রের বিজ্ঞানী ও ইঞ্জিনিয়ারেরা সংবাদ সংস্থার প্রতিনিধিকে বলেছেন, পরীক্ষা-মূলক চেষ্টার অমরা সামান্য পরিমাণ ধোরিয়াম নিয়ে সাক্ষাৎকার করেছি এবং সেটা যে কোন পরিমাণ ধোরিয়াম সম্পর্কেও প্রযোজ্য হবে।

### জোও-৪ কিরে এসেছে

রাশিয়ার বরংকির মহাকাশ স্টেশন জোও-৪ সাত দিনের মহাকাশ পরিক্রমা সেরে 27শে অক্টোবর পৃথিবীতে কিরে এসেছে বলে টাস জানিয়েছে। গত 24শে অক্টোবর জোও-৪ চাঁদকে প্রদক্ষিণ করে।

মন্ডার সময় বিকাল 4-55 মিনিটে মহাকাশ-যানটি ভারত মহাসাগরের পূর্বনির্ধারিত স্থানে নামে। একটি সোভিয়েট উদ্ধারকারী জাহাজ সাজ-সরঞ্জামসহ যানটিকে তুলে নেয়।

গত 20 অক্টোবর আরোহীবিহীন জোও-৪-কে মহাকাশে পাঠানো হয়েছিল।

### বুধ ও শুক্রগ্রহ সম্পর্কে অনুসন্ধান

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র 1974 সালে একটি 893 পাউণ্ড (405 কিলোগ্রাম) ওজনের আরোহীবিহীন মহাকাশযান উৎক্ষেপণ করবে, যা শুক্র ও বুধ গ্রহদ্বয়কে অতিক্রম করে যাবে। এই সর্বপ্রথম মানুষ বুধকে সর্বচেয়ে কাছ থেকে দেখতে পাবে।

একটিমাত্র মহাকাশযানের দুটি গ্রহকে অতিক্রম করার ঘটনা এই প্রথম প্রত্যক্ষ করা যাবে। এই দশকের শেষ দিকে বরংকির মহাকাশযান

কর্তৃক সৌরজগতের দূরবর্তী গ্রহগুলি পরিক্রমা করবে।

জাতীয় বিমান-বিজ্ঞান ও মহাকাশ সংস্থা ঘোষণা করেছেন যে, 1973 সালের শরৎকালে একটি ক্যামেরাবাহী ম্যারিনার মহাকাশযান শুক্র-গ্রহের দিকে উৎক্ষেপণ করা হবে। মহাকাশ-যানটি 1974 সালের ফেব্রুয়ারী মাসে ঐ গ্রহটির কাছে যাবে। অতঃপর মহাকাশযানটি বুধের দিকে অগ্রসর হবে। 1974 সালের মার্চ মাসে যানটি বুধের 1000 কিলোমিটার দূরত্বের মধ্যে আসবে।

টেলিস্কোপসম্বলিত ক্যামেরার সাহায্যে ম্যারিনার 42 সেকেন্ড অন্তর একবার করে বুধের আলোকচিত্র গ্রহণ করবে এবং অধিকাংশ ছবিই সরাসরি পৃথিবীতে পাঠাবে। পৃথিবী থেকে বুধের দূরত্ব 10 কোটি কিলোমিটার।

মহাকাশ সংস্থা জানিয়েছেন যে, পৃথিবী থেকে উচ্চশক্তিসম্পন্ন দূরবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে গৃহীত চাঁদের ছবি যেমন হয়েছিল, বুধের এই ছবিগুলিও অস্বল্প মানের হবে বলে আশা করা যাচ্ছে।

নয়টি গ্রহের মধ্যে বুধ সম্পর্কেই সবচেয়ে কম তথ্য জানা গেছে। বুধ সূর্যের সবচেয়ে কাছের গ্রহ। এই গ্রহটি সূর্য থেকে মাত্র 5 কোটি 80 লক্ষ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত। বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই গ্রহে উদ্ভাপ এত বেশী যে, সেখানে জীবনের কোন অস্তিত্ব নেই।

ক্যামেরাটি ছাড়া ম্যারিনার মহাকাশযানে বুধের আবহমণ্ডল, আয়নমণ্ডল, বায়োস্ফিয়ার এবং এর পৃষ্ঠদেশের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে তথ্য লিপিবদ্ধ করার জন্যে অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক যন্ত্রপাতিও সরিবিষ্ট থাকবে।

কাগজ, আখের ছবি, ডা ও ডুব প্রকৃতি থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য

সেগুলোজের অকোজো উপাদান বা সেগুলোজ ওয়েট থেকে প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য তৈরির একটি

পরীক্ষামূলক কারখানা সম্প্রতি আমেরিকার লুইজিয়ানা স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়ের ইঞ্জিনিয়ারেরা তৈরি করেছেন। ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীদের গবেষণালব্ধ কলাকলের তত্ত্বিতেই এই কারখানাটি তৈরি হয়েছে। উদ্ভিদের দেহকোষ সেলুলোজ নামে জৈব পদার্থ দিয়ে গঠিত। কাঠের মণ্ড বা গুঁড়া, কাগজের মণ্ড, তুলা, বিভিন্ন উদ্ভিদ আশ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রকার সেলুলোজ।

ঐ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞানীরা গবেষণাগারে পরীক্ষা করে দেখেছেন যে, মাইক্রো-অরগ্যানিজম বা অতি ক্ষুদ্র জীবাণু, সেলুলোজ ওয়েষ্টকে পুষ্টিকর প্রোটিনে পরিণত করে। যেসব বিভিন্ন জীবাণু বিভিন্ন সেলুলোজের মূল উপাদানগুলিকে পৃথক করে, তাদের সন্ধান করার জন্যে ব্যুরো অব সলিড ওয়েষ্ট নামে একটি সংস্থা ঐ বিশ্ববিদ্যালয়কে এই বিষয়ে গবেষণা চালানোর জন্যে অর্থ সাহায্য দিয়েছেন।

ব্যুরোর ডিরেক্টর রিচার্ড ডি. ভোগান এই প্রসঙ্গে বলেছেন যে, কৃষি ও বিভিন্ন শিল্পের পরিত্যক্ত অংশ ও সহরগুলির আবর্জনা ফেলা—একটা সমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। এই সকল আবর্জনা ও কৃষির পরিত্যক্ত অংশ, যেমন আধের ছিবড়া, তুষ প্রভৃতি ও অন্যান্য আবর্জনাকে পুষ্টিকর প্রোটিন খাদ্যে পরিণত করলে এই সমস্যার সম্যক সমাধান ভো হবোই, তাছাড়া মানুষ ও পশুর পুষ্টিকর খাদ্যের অভাব মেটানোতে বিশেষভাবে সাহায্য করা হবে।

বর্তমানে আধের ছিবড়াকে এই ব্যাপারে

কাজে লাগানো হচ্ছে। এই পদ্ধতিতে প্রথমতঃ এদের গুঁড়া করা হয়। তারপর ঐ গুঁড়া জীবাণুযুক্ত করে গাঁজানোর একটি যন্ত্রের মধ্যে রাখা হয়। সেখানে অতি ক্ষুদ্র জীবাণু ঐ গুঁড়ার মূল উপাদানগুলিকে পৃথক করে দেয় এবং এর রাসায়নিক রূপান্তর ঘটায়।

ঐ রূপান্তরিত বস্তুতে আছে 1 কোষবিশিষ্ট শতকরা 50 ভাগ প্রোটিন, যা খাদ্য হিসাবে গ্রহণযোগ্য এবং এর রং বাদামী।

বিজ্ঞানীদের ধারণা, এই পদ্ধতিতে তথ্যেতে সংবাদপত্র, কাঠমণ্ড, বড় ঘাস এবং ভুট্টাগাছ প্রভৃতি থেকেও প্রোটিনসমৃদ্ধ খাদ্য উৎপাদন করা সম্ভব হতে পারে।

### অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায় সন্মানসূচক 'ডক্টরেট' ডিগ্রীতে ভূষিত

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের এই বছরের সমাবর্তন উৎসবে প্রখ্যাত রসায়ন-বিজ্ঞানী অধ্যাপক প্রিয়দারঞ্জন রায়কে সন্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রীতে ভূষিত করা হয়েছে। রসায়নশাস্ত্রে অধ্যাপক রায়ের অবদানের জন্যে তার স্বীকৃতি বহু পূর্বেই পাওয়া উচিত ছিল। এই সম্মানে অধ্যাপক রায়ের গৌরব বৃদ্ধি হওয়া অপেক্ষা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সন্মানই বৃদ্ধি পেয়েছে। বাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় ইতিপূর্বেই তাঁকে সন্মানসূচক ডক্টরেট ডিগ্রী প্রদান করেছেন।



# বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদ

পি-23, রাজ্য রাজকৃষ্ণ ট্রাট, কলিকাতা-6

দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশন-1970

পরিষদ ভবন

29শে সেপ্টেম্বর '70

মঙ্গলবার, 5-30টা

## কার্যবিবরণী ও গৃহীত প্রস্তাবাবলী

বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনে মোট 32 জন সদস্য উপস্থিত ছিলেন। পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে সভার কাজ সম্পন্ন হয়।

### 1। কর্মসচিবের বার্ষিক বিবরণী

পরিষদের কর্মসচিব মহাশয় এই অধিবেশনে উপস্থিত সভ্যগণকে আগত জানাইয়া গত 1969-'70 সালের জন্তে পরিষদের বিবিধ কাজকর্ম ও আর্থিক অবস্থাদি সম্পর্কে তাঁহার লিখিত বার্ষিক বিবরণী পাঠ করেন। তিনি বলেন যে, গত মে '70 মাসে পরিষদের দ্বাবিংশ বার্ষিক প্রতিষ্ঠাদিবস অঙ্কষ্ঠানের সভায় পঠিত কার্যবিবরণীতে আলোচ্য বছরে পরিষদের বিভিন্ন কর্মপ্রচেষ্টা ও আর্থিক অবস্থাদি বিষয় বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইয়াছিল এবং তাহাই মোটামুটিভাবে 1969-'70 সালের বার্ষিক বিবরণী হিসাবে গণ্য করা বাইতে পারে। সেই জন্ত বর্তমান এই বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের সভায় তিনি পরিষদের কাজকর্ম ও অবস্থাদি সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণী প্রদান করেন।

এই বিবরণীতে তিনি পরিষদের আদর্শাভিযায়ী মাতৃভাষা বাংলার বিজ্ঞানের প্রচার ও প্রসার সাধনের উদ্দেশ্যে 'জ্ঞান ও বিজ্ঞান' মাসিক পত্রিকা, জনপ্রিয় বিজ্ঞান পুস্তক, বিভাগের পাঠ্যপুস্তক,

বিজ্ঞানবিষয়ক বক্তৃতা দান, পাঠাগার ও 'হাতে কলমে বিভাগ' পরিচালনা প্রভৃতি বিভিন্ন কর্ম-প্রচেষ্টার উল্লেখ করেন। পরিকল্পনা অধ্যক্ষী বিবিধ কাজের বাস্তব রূপায়ণে যেসব আর্থিক দায়দায়িত্ব পরিষদের উপর বর্তিয়াছে তাহার উল্লেখ করিয়া কর্মসচিব মহাশয় সভ্যবৃন্দের সাহায্য ও সহযোগিতার আহ্বান জানান।

### 2। হিসাববিবরণী ও ব্যয়বরাদ্দ

গত 1969-'70 সালের পরীক্ষিত হিসাব-বিবরণী ও উদ্ভূতপত্র (ব্যালান্স শিট) পরিষদের কোষাধ্যক্ষ শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ মহাশয় সভার অমুমোদনের জন্ত উপস্থাপিত করেন।

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের উক্ত পরীক্ষিত হিসাববিবরণী ও উদ্ভূত পত্র মুদ্রিতাকারে সভ্যগণের বিবেচনার জন্ত বধাসময়ে নিয়মাহুযায়ী প্রেরণ করা হইয়াছিল। কোষাধ্যক্ষ মহাশয় সাধারণভাবে বিবরণীগুলি পাঠ করেন এবং উপস্থিত সভ্যগণের দ্বারা সেইগুলি সর্বসম্মতিক্রমে অমুমোদিত ও গৃহীত হয়।

অতঃপর কোষাধ্যক্ষ মহাশয় পরিষদের বিদায়ী কার্যকরী সমিতি কর্তৃক রচিত ও অমুমোদিত বর্তমান 1970-'71 সালের জন্ত পরিষদের আভ্যুমানিক ব্যয়বরাদ্দ বা বাজেট পত্র সভ্যগণের অমুমোদনের জন্ত সভায় পেশ করেন। বখোচিত আলোচনার পরে উক্ত ব্যয়বরাদ্দ

পত্রও উপস্থিত সভাগণ কর্তৃক সর্বসম্মতিক্রমে  
অনুমোদিত ও গৃহীত হয়।

### ৩। কার্যকরী সমিতি গঠন

বর্তমান ১৯৭০-'৭১ সালের জুলাই পরিষদের  
নতুন কার্যকরী সমিতির কর্মসূচ্যমণ্ডলী ও সাধারণ  
সদস্যের মনোনয়ন পত্রের চূড়ান্ত তালিকা কর্ম-  
সচিব মহাশয় সভায় অনুমোদনের জন্য উপস্থাপিত  
করেন এবং সভাগণ কর্তৃক তাহা সর্বসম্মতিক্রমে  
অনুমোদিত হয়। বর্তমান ১৯৭০-'৭১ সালের  
জুলাই পরিষদের নতুন কার্যকরী সমিতির বিভিন্ন পদে  
ও সাধারণ সভারূপে উক্ত তালিকা অনুযায়ী সভ্য-  
গণের নিম্নলিখিত নাম সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত  
হইল বলিয়া সভায় ঘোষিত হয় :

#### কার্যকরী সমিতি

##### কর্মসূচ্যমণ্ডলী :

সভাপতি—শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ বসু

সহসভাপতি—শ্রীমুহূষণ চট্টোপাধ্যায়

শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাট্টা

শ্রীবলাইচাঁদ কুণ্ডু

শ্রীমণীন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ বৈজ্য

শ্রীকৃষ্ণেন্দ্রনাথ পাল

কোষাধ্যক্ষ—শ্রীপরিমলকান্তি ঘোষ

কর্মসচিব—শ্রীজয়ন্ত বসু

সহযোগী কর্মসচিব—শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

শ্রীজামুন্দর দে

##### সাধারণ সদস্য :

১। শ্রীঅজিতকুমার সাহা

২। শ্রীঅনাদিনাথ দা

৩। শ্রীঅমূল্যধন দেব

৪। শ্রীআত্মতোষ গুহঠাকুরতা

৫। শ্রীসোণালচন্দ্র ভট্টাচার্য

৬। শ্রীদিলীপকুমার ঘোষ

৭। শ্রীপঙ্কজনারায়ণ রায়

৮। শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত

৯। শ্রীমণীজলাল মুখোপাধ্যায়

১০। শ্রীরাধাকান্ত বসু

১১। শ্রীমহেন্দ্রকুমার মিত্র

১২। শ্রীরবীন্দ্রনাথ রায়

১৩। শ্রীশঙ্কর চক্রবর্তী

১৪। শ্রীমুর্ধন্যুদিত কল

১৫। শ্রীহেমেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

#### ৪। সারস্বত সংঘের সংঘসচিব নির্বাচন

শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত বর্তমান বছরের (১৯৭০-  
'৭১) জুলাই সর্বসম্মতিক্রমে সারস্বত সংঘের  
সংঘসচিব নির্বাচিত হন।

#### ৫। হিসাব-পরীক্ষক নির্বাচন

পরিষদের বিভিন্ন তহবিলের বর্তমান ১৯৭০-  
৭১ সালের হিসাবপত্র পরীক্ষা করিবার জন্য  
হিসাব-পরীক্ষক (অডিটর) নির্বাচন বিষয়ে  
বর্ণোচিত আলোচনার পরে এইরূপ সিদ্ধান্ত  
গৃহীত হয় যে, পরিষদের পূর্বতন হিসাব-পরীক্ষক  
প্রতিষ্ঠান যেসার্গ মুখার্জী অ্যান্ড গুহঠাকুরতা  
অ্যান্ড কোং, চার্টার্ড অ্যাকাউন্ট্যান্টস গত কয়েক  
বৎসর বাবৎ বর্ণোচিত দক্ষতার সহিত পরিষদের  
হিসাবপত্র পরীক্ষা করিয়াছেন; অতএব উক্ত  
প্রতিষ্ঠানেরই বর্তমান বর্ষের জুলাই পরিষদের  
হিসাব-পরীক্ষক পদে নির্বাচিত হওয়া বাঞ্ছনীয়  
হইবে। সভাপতি মহাশয়ের প্রস্তাবক্রমে অতঃপর  
উক্ত যেসার্গ মুখার্জী গুহঠাকুরতা অ্যান্ড কোং  
বর্তমান ১৯৭০-'৭১ সালের জুলাই পরিষদের হিসাব-  
পরীক্ষক পদে সভায় সর্বসম্মতিক্রমে নির্বাচিত  
হন।

ব্যাকব্রিঁত হইলে তাহা হৃদয়ভাবে গৃহীত বলিয়া  
 গণ্য হইবে।

## 7। সভাপতির ভাষণ

- বার্ষিক সাধারণ অধিবেশনের এই সভায়  
পরিষদের সভাপতি অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু  
মহাশয় উপস্থিত সভ্যগণকে ও অন্যান্য ব্যক্তিদের  
পরিষদের প্রতি তাঁহাদের শুভেচ্ছা ও সহ-  
যোগিতার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দেশের  
বর্তমান অবস্থার গঠনমূলক কাজের সবিশেষ  
গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি আলোচনা করেন।

পরিষদের কাজকর্মের প্রসারের জন্য সকলের সক্রিয় সহযোগিতা যে একান্ত প্রয়োজন, সেই দিকে সভাপনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া তিনি তাঁহার ভাষণ শেষ করেন।

दाः जयाङ्क वङ्क

### কর্মসচিব

ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଜ୍ଞାନ ପତ୍ରିକା

## অনুদ্যোদকমণ্ডলীর আশ্রয়

શ્રી: શ્રીમનીજીવલાલ મુરબાનાથાચાર્ય

স্বাঃ শ্রীমণীলকুমার দালগুপ্ত

স্বাঃ শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ ভাট্টাচার্য্য



## অধ্যাপক চন্ডেশ্বর চেক্ট রাইন

জন্ম—৭ই নভেম্বর, ১৯০৯

মৃত্যু—২১শে নভেম্বর, ১৯৭০

অধ্যাপক রাইনের স্বভাব প্রাতি বহীষ বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি



# জ্ঞান ও বিজ্ঞান

ত্রয়োবিংশ বর্ষ

ডিসেম্বর, 1970

দ্বাদশ সংখ্যা

## মহাজাগতিক রশ্মির আলোকে

হীরেন্দ্রকুমার পাল\*

দৈনন্দিন জীবনে কখনো কখনো আমাদের চোখের সামনে ছোটখাটো এমন সব ঘটনা ঘটে, যাদের আনন্দা কোন গুরুত্ব দিই না এবং উপেক্ষা করে থাকি। কিন্তু এদের মধ্যেও বিরাট সভাব্যতার বীজ নিহিত থাকতে পারে এবং যথোচিত আকৃতি ও নিষ্ঠানুসারে অঙ্কন করলে এদের মধ্যেও নতুন আলোকের সন্ধান মিলতে পারে—বিজ্ঞানের ইতিহাসে এরকম তুহি তুহি ঘুঁটা আছে। মহাজাগতিক রশ্মির আবিষ্কারও এই পর্বাণে পড়ে।

স্বর্ণপত্র তড়িৎ-জাপক যন্ত্র (Gold leaf electroscope) নামক একটি যন্ত্র আছে, যা পদার্থ-বিজ্ঞানের গবেষণাগারে বহুল ব্যবহৃত হয়। এতে প্রধানতঃ একখানি হালকা স্বর্ণপত্র বাঁকা

খাতব শলাকার গায়ে মুক্ত থেকে ঝুলে থাকে। শলাকার মাথায় তড়িৎ-আধান আরোপ করলে তা শলাকার মাথামে প্রবাহিত হয়ে পত্রকে আহিত করে এবং উদ্ভূত বিকর্ষণের ফলে তার মুক্ত প্রান্ত শলাকা থেকে আলাদা হয়ে দূরে সরে যায়। প্রদত্ত আধান অথবা তড়িৎ বিতরণ উপর বিচ্যুতির পরিমাণ নির্ভরশীল। ক্ষুদ্রতম বিচ্যুতিও অণুবীক্ষণ যন্ত্রের সাহায্যে পরিমাপ করা যায়। বায়ু অথবা অন্য কোন গ্যাস পরিবেষ্টিত হয়ে শলাকা ও পত্র একটি কু-সংলগ্ন আধানের ত্বিতরে অন্তর্ভুক্ত হয় এবং স্তরকিত অবস্থায় থাকে। তাই স্বতাবতঃ এই যন্ত্র থেকে তড়িৎ-করণের

\*পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ ; বেলুড় রাস্তায় বিশদ বিভাগস্থিত, বেলুড়।

কোন সম্ভাবনা নেই। অবশ্য এক-রে সম্প্রতি অথবা অন্ত কোন প্রত্যাধীন যন্ত্রের মধ্যস্থিত গ্যাস আয়নিত হলে বিপরীত চিহ্নাত্মক আয়ন আকর্ষণ করে আহিত পত্র ও শলাকা উত্তরেই নিস্তড়িং হয়ে পড়তে পারে। পত্রখানি তখন পুনরায় এসে মিলিত হবে শলাকার গায়ে, যেমন ছিল অনাহিত অবস্থায়।

আসলে কিন্তু দেখা যায়—প্রত্যক্ষ কোন কারণ ব্যতিরেকেই সে যন্ত্র তার আধান হারাতে থাকে। ঘটনাটি ঘটে এক ধীর গতিতে যে, স্বভাবতঃই তা দৃষ্টি এড়িয়ে যায় অথবা অকিঞ্চিৎকর বলে মনে হয়। কিন্তু এই তুচ্ছ ঘটনাই এককালে অল্পসঙ্খিৎসু বিজ্ঞানীর দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এর ফলেই এমন এক গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার সম্ভব হয়েছিল, যার প্রেক্ষেই সন্দেহ আজ কোন দ্বিমত নেই।

প্রথমে মনে করা হতো, ঐ অত্যাশিত তড়িৎ-ক্ষরণের মূলে রয়েছে জল-স্থল-অন্তরীক্ষে ছড়িয়ে থাকা তেজস্ক্রিয় পদার্থের ছিটাকোটা। অথবা এ-ও হতে পারে যে, আবহমণ্ডলে অজানা এবং স্বয়ং কোন আয়নীভবন-প্রক্রিয়া নিত্যই চলেছে। ঐতিহাসিক দিক থেকে বলতে গেলে 1910 সালে বৈজ্ঞানিক হেন্স-ই সর্বপ্রথম বেলুনের সাহায্যে তড়িৎজাপক যন্ত্র উৎক্ষেপাঠিরে লক্ষ্য করেন যে, বেলুন যত উপরে ওঠে, তড়িৎক্ষরণের হারও হয় তত বেশী। কিছুকাল পরে কোল্‌হর্স্টার এই বিষয়টি সমর্থন করেন। তিনি দেখেন যে, ভূপৃষ্ঠ থেকে হয় মাইল উৎক্ষেপ তড়িৎক্ষরণের হার ভূপৃষ্ঠের চেয়ে প্রায় ত্রিশ গুণ অধিক। অতএব একথা পরিষ্কার যে, এই ঘটনার উৎস পাখিব-কিছু নয়। হেন্স-এর অনুমান, বায়ুমণ্ডলের বাইরে থেকে আসা কোন অজাত বিকিরণই এর জন্তে দায়ী। বায়ুস্তরের তর একই প্রস্থচ্ছেদবিশিষ্ট 10 মিটার উঁচু জল কিংবা 1 মিটার পুরু সীসার সমান। কাজেই যে বিকিরণ এই বায়ুস্তর ভেদ

করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছতে পারে, তার ভেদ-শক্তি যে কি বিপুল, তা সহজেই বোধগম্য।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের অবসানে 1921 সালে পুনরায় বিজ্ঞানীদের মনোযোগ এই সমস্যা প্রতি আকৃষ্ট হয়। আমেরিকার অধ্যাপক মিলিকান ও তাঁর সহকর্মীরা এর গুরুত্ব সম্যক উপলব্ধি করেন এবং প্রথমে জাঁদে পর্বতগুহার যন্ত্রপাতি রেখে তাঁরা পরীক্ষা আরম্ভ করেন। বলা বাহুল্য, এই কাজের জন্তে পর্বতগুহা নির্বাচনের উদ্দেশ্যে ছিল, সেখানে যন্ত্র সব দিক থেকেই সুরক্ষিত থাকবে এবং কেবল গুহানুগ্নের ভিতর দিগেই উৎসর্গিত সম্ভাব্য বিকিরণ এসে যন্ত্রে প্রবেশ করবে। এই পরীক্ষা থেকে জানা গেল, যন্ত্রের অভ্যন্তরে আয়নীভবনের মাত্রা বিকিরণের দিক-নির্ভর নয়। দুপুর বেলায় সূর্য যখন মাথার ঠিক উপরে থাকে অথবা মধ্য রাতে এই মাত্রা সমান। নক্ষত্রমণ্ডলের 'তল' (Galactic plane) দৃশ্যমান অথবা অদৃশ্য বা-ই হোক না কেন, এই মাত্রার কোন তারতম্য পরিলক্ষিত হয় না। সুতরাং আলোচ্য বিকিরণ যে সূর্য অথবা সংশ্লিষ্ট নক্ষত্রপুঞ্জ থেকে আগত নয়, তাও অবধারিত। অন্তরীক্ষের সব দিক থেকেই পৃথিবীর উপর—তার উত্তর ও দক্ষিণ গোলাধারে সমভাবে অবিস্রান্ত বর্ষিত হচ্ছে এই অজানা বিকিরণ। তাই এর নাম দেওয়া হয়েছে মহাজাগতিক রশ্মি (Cosmic rays)।

ভূপৃষ্ঠ থেকে বিভিন্ন উচ্চতার এবং ক্যালি-কর্ণিয়া ও বলিভিয়ার ভূবার-গলা জলে পূর্ণ যে-তরঙ্গ আছে, তার নীচে নানা স্তরে স্বয়ংলব্ধ তড়িৎ-জাপক যন্ত্র পাঠিয়ে মিলিকান ও তাঁর সহকর্মীরা দেখতে পেলেন যে, বায়ুমণ্ডলের উৎসর্গিত স্তর থেকে স্রব করে নীচের দিকে আয়নীভবনের মাত্রা ক্রমশঃ কমতে থাকে। এর ফলে আরো বিশদভাবে প্রমাণিত হলো যে, উৎসর্গাংশ থেকেই এই রশ্মির আগমন হচ্ছে।

তীব্রতম গামারশ্মির জ্বলনায় এই রশ্মির ভেদ-

শক্তি প্রায় দশ গুণ অধিক। কাজেই তাকে অতিদ্রুত তরঙ্গের দামারশ্মি বলে কল্পনা করাই স্বাভাবিক। এই রশ্মিও সুষম (Homogeneous) নয়। এর পরিশোধন বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে, এতে তেদশক্তির তারতম্যাত্মকারী চার রকম উপাদান আছে। তবে গাণিতিক বিশ্লেষণ-পদ্ধতির কল একেত্রে স্থানান্তরিত হতে পারে না বলে কার্যক্ষেত্রে এই রশ্মিকে দু-ভাগে বিভক্ত মনে করাই সমীচীন। এক অংশকে বলা হবে শক্ত বা তীক্ষ্ণ এবং অন্য অংশকে বলা হবে নরম। তীক্ষ্ণ বলতে এই বোঝার যে, তিন মিটার পুরু সীসা ভেদ করলে তার প্রাথমিক কমে মাত্র অর্ধেক, আর নরম বলতে বোঝার মাত্র দশ সে: মি: সীসাতেই সে নিঃশেষে পরিশোধিত হয়ে যায়। মহাজাগতিক রশ্মির তীক্ষ্ণতম অংশের তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য  $8 \times 10^{-10}$  সে: মি:। এই তরঙ্গ উৎপাদন করতে যে পরিমাণ শক্তি লাগে, তা  $150 \times 10^6$  ভোল্টের মত। এত প্রচণ্ড শক্তি উৎপাদন কোন জাত প্রক্রিয়ার মাধ্যমেই সম্ভব নয়। এমন কি, সূর্য্যপেক্ষা জোয়ারালো তেজস্ক্রিয় বিভাজন থেকে যে শক্তি পাওয়া যায়, তার চেয়েও বহু গুণ বেশী এই শক্তি।

1927 সালে হল্যাণ্ড থেকে সমুদ্রপথে জাভা বাজার কালে ক্রে লক্ষ্য করেন যে, চৌম্বক বিদ্যুৎবাহকের বিকিরণের তীব্রতা উত্তর অথবা দক্ষিণের উচ্চ অক্ষাংশ থেকে 10 কি 12 শতাংশ কম। মহাজাগতিক রশ্মির গবেষণার অগ্রসর হয়ে অধ্যাপক কম্পটন যে বিশ্ব-পর্ব্ববেক্ষণ অভিযান সংগঠিত করেছিলেন, তাতেও এই বর্ণনার বাধার্থ্য প্রতিপন্ন হয়েছিল। তাঁরা আরো দেখেছিলেন যে, একই দ্রাঘিমা ব্যবহার উত্তর থেকে থেকে আরম্ভ করে প্রায় 45° পর্ব্বত বিকিরণ-প্রাথমিক ঘোটারূটি অপরিবর্তিত থাকে, অতঃপর বিদ্যুৎ-রেখা অবধি ক্রমশ: কমে যায়। প্রাথমিকের হ্রাস সমুদ্রপৃষ্ঠে প্রায় 11 শতাংশ এবং 4360 মিটার উচ্চের প্রায় 33 শতাংশ। সমপ্রাথমিকের রেখাগুলি

ভূচৌম্বক অক্ষরেখার সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলে যায়। এর কারণ এই হতে পারে যে, নভো-মণ্ডলে মহাজাগতিক রশ্মির ব্যাপক ভূচৌম্বক ক্ষেত্রের দ্বারা প্রভাবিত এবং বিকিরণটি ধনাত্মক কণিকা দিয়ে তৈরি।

প্রাথমিক-বিভক্তাসের একটা স্থল ব্যাখ্যার জন্তে প্রায় উত্তর-দক্ষিণে প্রলম্বিত কাল্পনিক ভূ-চুম্বকের ভ্রামক-মান (Moment)  $8.1 \times 10^{28}$ । ভূচৌম্বক চৌম্বক একক ধরে নিয়ে হিসাব করলে দেখা যায় যে, পৃথিবীর চৌম্বক অক্ষাংশ  $\lambda$ -তে পৌঁছতে হলে কোন আহিত কণিকার ন্যূনতম শক্তি হওয়া চাই  $1.9 \times 10^{10} \cos^4 \lambda$  ইলেক্ট্রন ভোল্ট। অতএব আপাতদৃষ্টিতে চৌম্বক ক্ষেত্রে পৌঁছতে হলে ঐ কণিকার কোন শক্তি না থাকলেও চলে আর থাকলে তো কথাই নেই। কিন্তু ভূচৌম্বক বিদ্যুৎবাহকের পৌঁছবার জন্তে সে শক্তি কম পক্ষে  $1.9 \times 10^{10}$  ই: ভো: (e.v.) হওয়া দরকার। কাজেই আপতিত কণিকাগুলির শক্তির মাত্রা যদি একটা বিশেষ পরিসরের মধ্যে নিবদ্ধ থাকে, তাহলে বিদ্যুৎবাহকের চেয়ে উর্ধ্বতর অক্ষরেখার উপরই অধিকতর কণিকা বর্ণনের সম্ভাবনা। কিন্তু এটাই সব কথা নয়। এই ব্যাপারে আর একটি প্রশ্নও বিবেচ্য। সেটা হলো বায়ুমণ্ডলের দ্বারা ঐ কণিকাগুলির পরিশোধন। তাই কণিকার শক্তির কণিকাগুলি যদিও তাত্ত্বিকভাবে যেকোনো পৌঁছবার ক্ষমতা রাখে, তথাপি প্রায় 10 মিটার পুরু জলের সমতুল্য বায়ুমণ্ডলে পরিশোধিত হয়ে সেগুলি পূর্বেই বন্দী হয়ে যেতে পারে। তবু গোটা বায়ুমণ্ডল অতিক্রম করতে না পারলেও তার ক্ষিতরে অন্তত: কিছুটা অগ্রসর হতে বাধ্য নেই। এতে বেশ বোঝা যায়, কেন বিকিরণ-প্রাথমিক বায়ুমণ্ডলের উর্ধ্বতরেই অপেক্ষাকৃত বেশী। যে সব কণিকা ভূচৌম্বক বিদ্যুৎবাহকের উপর বায়ুমণ্ডল পর্ব্বত এসে পৌঁছয়, সেগুলির শক্তির পরিমাণ গড়ে  $3 \times 10^{10}$  ই: ভো: বলে জানা



গেছে এবং সেগুলির সংখ্যা প্রতি বর্গসেকেন্ডিটারে প্রতি মিনিটে প্রায় দুটি করে।

বিকিরণ-প্রাথমিক পরিমাপের জন্তে আয়নী-ত্বনের-প্রকোষ্ঠকে সাধারণতঃ অধিক চাপের আর্গন গ্যাস দিয়ে ভর্তি করা হয়। কিন্তু এতে কণিকাগুলি কোন্ দিক থেকে আসছে, কত সেগুলির সংখ্যা, কি-ই বা সেগুলির সঠিক পরিচিতি ইত্যাদি বিষয় জানবার সুবিধা নেই। এসব তথ্য জানতে হলে আর একটি পৃথক যন্ত্রের প্রয়োজন। তার নাম গাইগার কাউন্টার (Geiger counter)। এই রকম দুটি বস্তু একই সাইনে এবং অল্প ব্যবধানে স্থাপন করে একটি তালু-পরিবাহক বর্তনীর সঙ্গে জুড়ে দিতে হয়।

এরূপ যান্ত্রিক কৌশলের সাহায্যে দেখা যায় যে, কোন দিগ্‌মণ্ডলীয় ভূজকোণের (Azimuth) জন্তে পশ্চিম দিক থেকে আগত কণিকার সংখ্যাই সমধিক। আবার বিষুবরেখার উপর এই আবিষ্কার মাত্রা  $45^\circ$  থেকে  $60^\circ$  দিগ্‌মণ্ডলীয় ভূজকোণের জন্তে সর্বোচ্চ, বা 14 শতাংশ পর্যন্ত হতে পারে। এই ব্যাপারটিও সহজেই হৃদয়ঙ্গম করা যায়, যদি অন্ততঃ সরলতার খাতিরেও আমরা ধরে নিই যে, আগন্তুক কণিকাগুলি ধনাত্মক এবং ঋণাত্মকভাবে বিষুবরেখার উপর এসে পতিত হচ্ছে। এই জন্তে সেগুলিকে অধোমুখী তড়িৎ-প্রবাহরূপে গণ্য করা যেতে পারে। আবার ভূচুম্বকের উত্তর ও দক্ষিণ মেরু বখাটের ভৌগোলিক দক্ষিণ ও উত্তর দিকে অবস্থিত থাকার অঙ্গভূমিক চৌম্বক বলরেখা দক্ষিণ দিক থেকে উত্তরাভিমুখে প্রসারিত। এমনভাবেই উল্লিখিত তড়িৎ-প্রবাহ অঙ্গভূমিক চৌম্বক বলরেখাকে লম্বভাবে ছেদ করেছে। তাতে তড়িৎ-বল-বিজ্ঞানের বিধান অর্থাৎ Fleming's left hand rule অনুযায়ী প্রবাহের গতিপথ পূর্বদিকে বেকে বাবে এবং এজন্তে কণিকাগুলি পশ্চিম দিক থেকেই আসছে বলে প্রতীতি জন্মাবে।

বেহেছু ধনাত্মক, সেহেছু কণিকাগুলিকে সাধারণতঃ প্রোটন বলেই অহুমান করা হয়, যদিও বর্তমানে আলফা-কণা অর্থাৎ হিলিয়াম কেন্দ্রীদের সম্ভাবনাকেও উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

এই কথাটা এখানেই বলে রাখা ভাল যে, এই সব কণিকা, যেগুলি প্রতিনিয়ত পৃথিবীর বুকে এসে হানা দিচ্ছে, সেগুলি আদি অর্থাৎ প্রাথমিক পর্যায়ের নয়। সেগুলি হচ্ছে বায়ু-কেন্দ্রীদের সঙ্গে আদি কণিকার সংঘর্ষজনিত দ্বিতীয় পর্যায়ের কণিকা। তাহলেও এগুলির উপরই পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালিয়ে প্রাথমিক কণিকা সংক্রান্ত বহু ধরনের মিলতে পারে। কেন না, গতি-বিজ্ঞানের নিয়মালসারে এগুলি প্রাথমিক কণিকার দিক ধরেই ধাবিত হবে। অধিকন্তু সেগুলির উচ্চ শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে বায়ুমণ্ডলের ভিতর দিয়ে সেগুলির ব্যাপ্তির দৈর্ঘ্য নগণ্য বলে তাতে ভূচৌম্বক-বিচ্যুতি হবে খুব সামান্যই। এমনভাবেই এগুলির মধ্যেও আদি কণিকার পূর্ব-পশ্চিম বৈসাদৃশ্য (East-west assymetry) অব্যাহত থাকবে।

উইলসনের মেঘ-প্রকোষ্ঠের সাহায্যে ভূপৃষ্ঠের নিকটস্থ কণিকাগুলির অল্পস্বত পথ দৃষ্টিগোচর করে তোলা যায়। এর শিখনে যে নীতিটি সক্রিয়, সেটি হচ্ছে—এই পথের উপরে উৎপন্ন আয়নের গায়ে জলীয় বাষ্প তরলীভূত হয়ে যে বারিবিকূর সৃষ্টি করে, সেগুলিরই পর পর সঞ্চিত চিহ্নগুলি কটোপ্লোটে অঙ্কিত হয়ে অল্পস্বত পথের নিশানা দেয়। অধ্যাপক র‍্যাঙ্কেট গাইগার কাউন্টার ও মেঘ-প্রকোষ্ঠের সমন্বয়ে এমন এক অভিনব বস্তু উদ্ভাবন করেন, যাতে অনায়াসে অভ্যাস কালের মধ্যেই নিখুঁতভাবে কণিকাগুলির ক্রান্তিপথ কটোপ্লোটে বন্দী করা যেতে পারে। কিন্তু এভাবে তোলা ছবি থেকে সংশ্লিষ্ট কণিকার পরিচয় উদ্ধার করা অন্তটা

সহজ নয়। কেন নয় এবং কি তার প্রতিকার, নিম্নোক্ত বর্ণনা থেকে তা উপলব্ধি করা সম্ভব হবে।

বহিঃ তেজস্ক্রিয় পদার্থ-নিঃসৃত বিকিরণের ক্ষেত্রে এই ছবি থেকে আলফা কণা, প্রোটন ও ইলেকট্রনের পথের পার্থক্য বুঝতে কষ্ট হয় না—যেহেতু, তৎসংশ্লিষ্ট আয়নীভবনের ঘনত্ব (অর্থাৎ প্রাচুর্য) হবহ এক নয়, তথাপি মহাজাগতিক রশ্মি-নিহিত কণিকা সম্পর্কে এই বিচার-পদ্ধতি খাটে না। কারণ, এই কণিকাস্তলি এমন প্রচণ্ড শক্তিশালী যে, আয়নীভবনের ঘনত্ব দ্ব্যুতঃ সেগুলির গতিবেগ এবং আধান-মাত্রার উপরই নির্ভর করে। অতএব বিপুল, সমান বেগে ধাবিত প্রোটন ও ইলেকট্রন-সত্ত্বেও এই ঘনত্বের মধ্যে উল্লেখযোগ্য তারতম্য হবার কথা নয়। এমনভাবেই অতি ক্ষিপ্রগতির কণিকাকে সূক্ষ্মচিত্তভাবে সনাক্ত করতে হলে অধিকতর তথ্যের প্রয়োজন।

সে তথ্য মিলবে জ্ঞাত মানের চৌম্বক ক্ষেত্র প্রয়োগে আলোচ্য কণিকার ক্রান্তিপথে যে বক্রতা উৎপন্ন হয়, তার পরিমাপ থেকে। চৌম্বক ক্ষেত্র বৃত্ত জোঁরদার হবে, বক্রতাও হবে তত বেশী। হরেক রকম পরিচিত কণিকার জন্তে বিভিন্ন শক্তির চৌম্বক ক্ষেত্রজনিত বক্রতা এবং সংশ্লিষ্ট আয়ন-ঘনত্ব পূর্বাঙ্কে নির্ধারণ করে লেখচিত্রের সাহায্যে অজ্ঞাত কণিকাকে সনাক্ত করতে হয়; এছাড়া উপারান্তর নেই।

এভাবে পর্যবেক্ষণ চালিয়ে দেখা গেছে, অধিকাংশ ফলেই এই সব কণিকা  $10^{11}$  ই: ভোল্ট-প্রমাণ শক্তির ইলেকট্রন ছাড়া অল্প কিছু নয়, বহিঃ মাঝেমাঝে ছবিতে দু-একটা প্রোটন-পথও ধরা পড়েছে। তবে পেরোজটি বুঝে ছন্দ, ঘটনা প্রতি দু-হাজার ইলেকট্রনে একটি বাজ প্রোটন—এই অল্পপাতে। এই প্রোটন হয়তো মহাজাগতিক রশ্মির দ্বারা যে-প্রকোষ্ঠের সন্নিকটে কেন্দ্রীভবন বিভাজনের কলেই উদ্ভূত।

১৯৩৩ সালে অধ্যাপক অ্যাণ্ডারসন সর্বপ্রথম যে-প্রকোষ্ঠের কটোপ্রাক্ষেপে দুখ পথাক লক্ষ্য করেন। প্রতিটি দুখ রেখা যেন প্রকোষ্ঠের তিতরে অথবা তার নিকটে একই উৎস-বিন্দু থেকে নির্গত। রেখাঘরে আয়ন-প্রাচুর্য সমান। চৌম্বক-বক্রতাও তাই, কিন্তু বিপরীতমুখী। এই ধরণের সমান বক্রতা থেকে সংশ্লিষ্ট পথচারীঘরের আধানমাত্রাও যে সমান, সেই ইঙ্গিতই বহন করে। কিন্তু বিপরীত বক্রতা থেকে দুটি বিকল্প সিদ্ধান্ত হতে পারে; যথা—(১) যদি উত্তর পথচারী একই উৎস-বিন্দু থেকে রওনা হয়, তাহলে তাদের আধান হবে বিপরীত চিহ্নাঙ্ক, আর (২) যদি কোন বিশেষ এবং ছুঁর্বোধ্য যোগাযোগের কলে তারা পরস্পরের বিপরীত দিকে ধাবিত হয়, তাহলে তাদের আধান হবে সমচিহ্নাঙ্ক। সিদ্ধান্ত দুটির কোনটি এখানে গ্রহণীয়, তা নির্ণয়ের ওরফে অপরিণীম। বলা বাহুল্য, অ্যাণ্ডারসন নিজেই অগ্রণী হয়ে এই সমস্তার সমাধান করেছিলেন। এর জন্তে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করেছিলেন, তা হচ্ছে—প্রকোষ্ঠের তিতর কণিকা দুটির পথিমধ্যে ৬ মিলিমিটার পুরু একখণ্ড সীসার কলক স্থাপন করে পূর্ব ব্যবস্থাপনাতেই তিনি পুনরায় ছবি তোলেন। এবারে দেখা গেল, কলকের পশ্চাদিকে উত্তর রেখারই বক্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। এর ব্যাখ্যার প্রথম সিদ্ধান্তকেই গ্রহণ করতে হয়। কেন না, তাহলে কলকের তিতরে পরিশোধনের কলে উত্তর পথচারীরই গতিবেগ পশ্চাদিকে হ্রাস পাবে, আর এটাই হবে বক্রতা বৃদ্ধির হেতু।

অতএব নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হলো যে, কণিকাস্তল একই উৎস-সম্মুখ এবং ভিন্নমধ্যে একটি ধনাত্মক, অল্পটি ঋণাত্মক। অধিকন্তু, ধনাত্মকটি যে প্রোটন নয়, তাও বোঝা গেল ছবিতে তার গতিবেগের বহর দেখে। পক্ষান্তরে এই উত্তাল গতিবেগ ইলেকট্রন-ভরের স্বপক্ষেই সাক্ষ্য দেয়।

উপর্যুক্ত স্বভাব থেকে এই সিদ্ধান্তও অপ্রতিরোধ্য হয়ে পড়ে যে, এখন আমরা একটি নতুন কণিকার সন্ধান পেয়েছি, বা ধনাত্মক এবং ঋণাত্মক ইলেকট্রনের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে করা যেতে পারে। এই ধনাত্মক ইলেকট্রনের নাম হলো পজিট্রন। ইলেকট্রন ও পজিট্রনের আধান/ভর ( $e/m$ ) অনুপাত এবং ভরও অভিন্ন।

যদি এখন স্বভাবতঃই প্রশ্ন জাগবে, এই বস্তু কণিকার জন্ম হলো কোথায় এবং কিতাবে? আইনস্টাইনের সুবিখ্যাত ভর-শক্তি সমতুল্যতা নীতির (Equivalence of mass and energy) পরিপ্রেক্ষিতে এই প্রশ্নে একটা সুন্দর জবাব মিলে। এই নীতি অনুসারে ইলেকট্রন বা পজিট্রনের ভর  $9.1 \times 10^{-31}$  ই: ভো: শক্তির সমতুল্য। অতএব শক্তির বিনিময়ে এগুলির সৃষ্টি সম্ভব। যেহেতু নিস্তড়িৎ কোন কিছু থেকে রূপান্তর নিশ্চয়িত করতে হলে সময়পরিমাণ ধনাত্মকতার আবির্ভাব অপরিহার্য, সেহেতু শক্তির জন্ম থেকেও ইলেকট্রন ও পজিট্রন যুগপৎ জন্মলাভ করতে পারে। আর যে পরিমাণ শক্তির বিনিময়ে এই রূপান্তর সংঘটিত হবে, তার ন্যূনতম পরিমাণ হলো  $2 \times 9.1 \times 10^{-31} \times c^2$  ই: ভো:।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখযোগ্য, এক নির্গূঢ় তত্ত্বের পরিকল্পনার ডিরাক এই জাতীয় মুখকণিকার অস্তিত্ব সনাক্তে পূর্বদৃষ্টি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন। অ্যাণ্ডারসনের গবেষণা এখন সেই ভবিষ্যদ্বাণীকে বিমূর্ত করে তুললো।

অতএব দেখা যাচ্ছে, উপযুক্ত ব্যবহার  $10^6$  ই: ভো: অথবা ততোধিক শক্তিসম্পন্ন কটোন পরিশোধনের কালে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগল জন্মতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রচণ্ড শক্তিশালী কটোন মহাজাগতিক রশ্মি তির্যক্স কিছু থেকে সন্ধানের লক্ষ্য নয়। একমাত্র ব্যতিক্রম হিসাবে

খোরিয়াম-C'- থেকে উৎকৃত গামারশ্মির নাম করা যেতে পারে। বস্তুতঃ ডাউটাইক, র্যাকট এবং ওকচিয়ালিনি এই কণিকায়ুগল সৃষ্টির চেষ্টায় খোরিয়াম-C' ব্যবহার করে আকাজিক সাফল্য অর্জন করেছিলেন। অধুনা কতিপয় কৃত্রিম তেজস্ক্রিয় পদার্থ থেকেও পজিট্রন পাওয়া যাচ্ছে বলে সংবাদ আছে।

ইলেকট্রন ও পজিট্রনের তড়িৎআধান বিপরীত বলে একে অন্যকে স্বভাবতঃই আকর্ষণ করবে এবং এর ফলে তাদের মধ্যে যে মিলন বা সংঘর্ষ ঘটবে, তাতে উভয়েরই বিনাশ অবশ্যজ্ঞাবী। কিন্তু তখন তাদের ভরের দশা কি হবে? বিজ্ঞানী বলেন, সে ভরের বিনিময়ে দেখা দিবে কটোন অর্থাৎ বিকিরণরূপী শক্তি। এই কারণে সাধারণ ঘনত্ব-বিশিষ্ট পদার্থেও পজিট্রনের জীবনকাল নিরতিশয় সংক্ষিপ্ত হতে বাধ্য। বস্তুতঃ ইলেকট্রন-পজিট্রনের আবির্ভাব ও বিলয়—উভয়েই কল্পনার স্তর উত্তীর্ণ হয়ে অধুনা পরীক্ষাগারে নিরীক্ষণসাধ্য বাস্তবে পরিণত হয়েছে।

তড়িৎ-চৌম্বক তত্ত্বের শিক্ষা এই যে, পদার্থের দ্বারা প্রতিহত হলে চলন্ত ইলেকট্রন (অথবা পজিট্রন) তার শক্তি কিছুটা হারিয়ে কেলে এবং দ্রুতশক্তির কিরণে আত্মপ্রকাশ করে এক-দুই-রূপী বিকিরণের মধ্য দিয়ে। দেখা গেছে, ইলেকট্রনের শক্তি  $1.5 \times 10^6$  ই: ভো:-এর বেশী হলে তার অপচিৎ শক্তির অবিকাংশই এভাবে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। সুতরাং একথা স্বতঃ-সিদ্ধ নয় যে, শক্তি বুদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইলেকট্রনের ভর-শক্তিও বাড়ে। যদি রাখা দরকার, এই ভর-শক্তির একটা সর্বোচ্চ সীমা আছে এবং সে সীমা  $10$  সে: মি: সীমা দিয়ে সূচিতব্য। যেহেতু গোটা বায়ুমণ্ডল প্রায়  $100$  সে: মি: সীমার জুলা, সেহেতু সহজেই বোঝা যায় যে, মেঘ-প্রকোষ্ঠের কটোয়াকে আমরা যে সকল ইলেকট্রনের সাফল্য পাই, সেগুলি বায়ুমণ্ডলের

ভিতরে ভূপৃষ্ঠের অনতিদূরে অর্থাৎ সমীপে করে  
বাইলের মধ্যেই উৎপন্ন হয়েছে।

এবার আমরা মহাজাগতিক রশ্মির ধারাবাহিক  
সম্বন্ধে আলোচনা করবো। ধরা যাক, প্রচুর  
শক্তি নিয়ে কোন ইলেকট্রন আবহমণ্ডলের  
ভিতরে দিয়ে ছুটে আসছে। এমতাবস্থায় বায়ু-  
কণার সঙ্গে সংঘর্ষে সেটির শক্তি ক্ষয় করিত হয়ে  
তার বদলে কতিপয় শক্তিশালী কণার সৃষ্টি  
করবে। এগুলি আবার পদার্থের কেন্দ্রীণে উপস্থিত  
হলে ইলেকট্রন-পজিট্রন যুগলের অভ্যাস ঘটতে  
পারে। এই যুগলের শক্তির মাত্রাও বিপুল হওয়া  
কিছুমাত্র বিচিত্র নয়। ফলে বায়ুকণা থেকে  
প্রতিহত হয়ে সেগুলি উভয়েই পৃথকভাবে আরও  
কণার সৃষ্টি করবে। প্রক্রিয়াটি পুনঃ পুনঃ চক্রা-  
কারে চলবে এবং তাতে ইলেকট্রন, পজিট্রন ও  
কণার কণিকাক্ষয়ের ক্ষয় বংশবিস্তার ঘটতে  
থাকবে। পরিশেষে যখন এই লক্ষ লক্ষ কণিকা  
ঝাঁকে ঝাঁকে পৃথিবীতে নেমে আসবে, তখন এক-  
মাত্র প্রবল বৃষ্টিধারার সঙ্গেই সেগুলির তুলনা করা  
চলবে। এরই নাম ধারাবাহিক। নিঃসন্দেহে, এই  
ঘটনা এক বিরাট শক্তির প্রকাশ। এই ধারাবাহিক  
আবিষ্কারের কৃতিত্ব অধ্যাপক ব্র্যাকস্টের।  
কেউ কেউ একে বিস্ফোটন (Burst) আখ্যাও  
দিয়ে থাকেন। মহাজাগতিক রশ্মির অপেক্ষাকৃত  
নরম অংশটি সম্ভবতঃ উল্লিখিত তিন রকমের  
কণিকার সাহায্যেই গঠিত এবং মেঘ-প্রকোপের  
ছবিতে এদেরই পথচিহ্ন বিদ্যুত হয়। ধারা-  
বাহকের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো এই যে,  
বায়ুমণ্ডলের উচ্চতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বর্ধিত  
কণিকার সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়তে থাকে এবং  
উচ্চতম সীমার আরোহণ করবার পর পুনরায়  
কমতে শুরু করে।

আউগের এবং আরও কয়েকজন বিজ্ঞানী  
প্রায় ২৫ একর জায়গা জুড়ে বহু গাইগার কাউন্টার  
সমিবেশিত করে সেগুলির সাহায্যে যুগপৎ ধারা-

বাহকের প্রকৃতি অধ্যয়ন করেছেন। তাঁরা লক্ষ্য  
করেছেন, প্রতি বর্গগজের উপর এই ধারাবাহিক  
সংখ্যা হয় প্রায় ২৫। তার মানে, প্রায় ১০ লক্ষ  
কণিকা এসে পৃথিবীর বৃক্ষে একই সঙ্গে হানা  
দিচ্ছে। হাইসেনবার্গ মনে করেন, এই সব  
শক্তিশালী বিস্ফোটনের মূল রয়েছে পারমাণবিক  
বিস্ফোরণ এবং সেই বিস্ফোরণ ঘটছে ছদ্ম  
শক্তির বাহক কোন কণিকা।

পূর্বেই বলা হয়েছে, মহাজাগতিক রশ্মির একটি  
শক্তি অংশও আছে, যা জলের ২৪০ মিটার  
অবধি তেজ করতে সক্ষম। তাই সে অংশ  
ইলেকট্রন কিংবা কণার দিয়ে গঠিত হতে  
পারে না—এমন কি, প্রোটন দিয়েও নয়।  
এহেন তেজশক্তির জন্তে সেগুলির শক্তির মাত্রা  
এতই বিরাট (গিগাট) হওয়া প্রয়োজন যে, তাতে  
করনাও হার মানবে। হিসাবে দেখা যায়, এর  
সুই ব্যাখ্যার জন্তে চাই এমন এক কণিকা,  
যার ভর হবে ইলেকট্রন ও প্রোটনের মাত্রাতিরিক্ত।  
এই কণিকার নাম মেসন। কিন্তু গবেষণাগারে  
সে ছিল তখনো অজ্ঞাত।

প্রসঙ্গতঃ আর একটি বিষয়ের অবতারণা  
এখানে এসে পড়ে। সর্বাধুনিক তত্ত্বানুযায়ী পরমাণু  
কেন্দ্রীণের অভ্যন্তরে রয়েছে কিছু ধনাত্মক  
প্রোটন ও কিছু নিউট্রন। এগুলিকে  
একত্রে ধরে রাখবার জন্তে এমন একটি আকর্ষণ  
বলের দরকার, যা প্রোটন-প্রোটন বিকর্ষণকেও  
পরাসৃত করবে। কিন্তু কিসে তা উৎপন্ন হয়  
সে বলা? ঝাঁঝ ঝাঁঝ তাত্ত্বিকেরা এই নিয়ে  
অনেক মাথা ঘামিয়েছেন। সূক্ষ্মগণনা অধ্যয়ন  
হচ্ছে, উল্লিখিত মেসনও কেন্দ্রীণেরই বাসিন্দা  
এবং সেগুলি ঘন ঘন প্রোটনের অভ্যন্তর  
থেকে নিউট্রনের অভ্যন্তরে অথবা এর বিপরীত  
দিকে বাওয়া-আসা করে। এতে প্রোটন  
নিউট্রনে এবং নিউট্রন প্রোটনে রূপান্তরিত হয়।  
আবার প্রোটন থেকে প্রোটনে অথবা নিউট্রন

থেকে নিউট্রনেও ( নিউট্রিয় ) যেসনের আনা-গোনা চলে রূপান্তর হাড়াই। আন্তঃকেন্দ্রীয় কণাগুলির মধ্যে এই জাতীয় যেসন-বিনিময়ের কলেই উদ্ভূত হয় সেই ঈশিত আকর্ষণ, বা বিনিময় বল নামে খ্যাত।

বহু চেষ্টার পর আজ গবেষণাগারে যেসনের সাক্ষাৎ বিলোকে। অধ্যাপক অ্যাওয়ারসন এবং আরো কয়েক জন বিজ্ঞানী মহাজাগতিক রশ্মির মেঘ-প্রকোষ্ঠ কটোপ্রাক্ষেপে যেসনেরও পথচিহ্ন আবিষ্কারে কৃতকার্য হয়েছেন। অধিকন্তু মাপজোখের দ্বারা এটাও তাঁরা জানতে পেরেছেন যে, যেসন-কণিকা ইলেকট্রনের চেয়ে প্রায় দুই শত গুণ ভারী। অবশ্য এই যানের অল্প-বিস্তার হেরফেরও হয়ে থাকে। কারো কারো মতে, এই ভারতম্য দেখে সন্দেহ বা বিস্মিত হবার কিছু নেই—কেন না, সেই তর নির্ভর করে কেন্দ্রীয়ের রূপান্তরের নমুনা বা ধরণের উপর। তরের ভারতম্য সত্ত্বেও এটা লক্ষণীয় যে, যেসনের আধান-মাত্রা সর্বদাই অতিরিক্ত। সে যাত্রা হয় ইলেকট্রন-আধানের সমান, নয়তো 0। আধান থাকলে তা অণুাত্মক অথবা ধনাত্মক দুই-ই হতে পারে। যেসনের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে, মুক্তাকালেও সে অস্থায়ী ও তদুন্নত; তাই অভ্যন্তর কালের মধ্যেই বিলিষ্ট হয়ে ইলেকট্রন অথবা পজিট্রনে পরিণত হয়। কিন্তু ভরবেগ এবং শক্তি-সংরক্ষণ নীতির সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষার জন্তে দ্বিতীয় একটি নিউট্রিয় কণিকাও ইলেকট্রনের সহজাত হওয়া দরকার—এটাই তত্ত্বের দাবী। এই আগন্তকের নাম নিউট্রিনো। বীকণাগারে আজ পর্যন্ত সেটি ধরা দেয় নি। তবিশ্রুতেও হয়তো দেখে না।

ভেজফ্রি পদার্থ থেকে বীটারশ্মি নির্গমনের ব্যাপারে ইতিপূর্বে যে কিছু অসঙ্গতি পরিলক্ষিত হচ্ছিল, তা যেসন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে দূরীভূত হয়ে গেছে। এখন এই কথাটা বেশ বোঝা

যাচ্ছে যে, বীটারশ্মির আবিষ্কার হলে এই যেসন। কেন্দ্রীয়-বিভাজনের সময় যেসনই সমস্ত শক্তি কুক্ষিগত করে নির্গত হয় এবং পরে সে বীটারশ্মিকা ( ইলেকট্রন ) ও নিউট্রিনোতে বিভক্ত হয়ে যায়। তখন ঐ দুটি কণিকা নিজেদের মধ্যে সে শক্তি ভাগাভাগি করে নেয়। আরো জানা গেছে, অস্থায়ী যেসনের গড় পরমায় এক সেকেন্ডের পাঁচ লক্ষ ভাগের এক ভাগ মাত্র।

আবহনগুলের উৎস' তরে যদি  $10^{10}$  ই: ভো: শক্তি নিয়ে কোন যেসন বিমুক্ত হয়, তাহলে তার পক্ষে নীচের বাস্তব বিলীর্ণ করে পৃথিবীতে এসে পৌঁছবার সম্ভাবনা আছে। কিন্তু স্পষ্টতই সে প্রাথমিক পর্যায়ে কণা হতে পারে না। তাহলে এখন প্রশ্ন উঠতে পারে, যেসন শূন্যে কি ব্যবস্থা সক্রিয়? বতদূর বোঝা যায়, ব্যবস্থাটা হচ্ছে এই যে, উৎস' তরে বায়ু-কেন্দ্রীয়ের সঙ্গে বহিরাগত প্রাথমিক বিকিরণের সর্বাংশে শক্তিশালী প্রোটন এবং ভারী কেন্দ্রীয়গুলির সংঘর্ষের কলেই কেন্দ্রীয় ভেঙ্গে গিয়ে প্রথমে মুক্তি লাভ করে যেসন এবং পরে তাৎক্ষণিক ইলেকট্রন উপজাত হয়। কিছু প্রোটনও ঐ যেসনের সঙ্গী হতে পারে। তখন যেসন স্বয়ং অথবা প্রোটনসহ মহাজাগতিক রশ্মির তীক্ষ্ণ অংশ উৎপাদন করবে আর কোয়ল অংশটি গট্টিত হবে—পূর্বেই বলা হয়েছে—যেসন-সম্মুত ইলেকট্রন যে ধারাবর্ষণ উৎসারিত করে, তার মাধ্যমে।

আপাতদৃষ্টিতে তুচ্ছ, অকিঞ্চিৎকর একটা ঘটনাকে বৈধ, অধ্যবসায় এবং নিষ্ঠাসহকারে অন্বেষণ করে বিজ্ঞানীরা আজ বিশ্বরহস্যের এক পরম বিশ্বাসের সুধোমুখী এসে দাঁড়িয়েছেন। ব্রহ্মাও জুড়ে অবিরত চলেছে যে উজ্জ্বল শক্তির উল্লীরণ, কি তার হেঁচু, কোথায় তার উৎস? এই ভেবে বিজ্ঞানীরা আকুল। সত্য কথা বলতে গেলে, এই সবচেয়ে স্থির সিদ্ধান্ত অধ্যাবসায় কিছু হতে পারে নি। তবে অল্পনা-

কল্পনারও অভ নেই। অধ্যাপক মিলিকান বলেন, মহাপ্রকৃতি প্রোটন ও নিউট্রন কণিকার মিলনে হিলিয়াম, নাইট্রোজেন প্রভৃতি পরমাণু নিত্য নূতন গঠিত হচ্ছে এবং তাতে যে ভর-হ্রাসের উদ্ভব হয়, তা-ই আইনস্টাইনের সুবিখ্যাত সূত্রানুযায়ী ( $E=mc^2$ ) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে অধ্যাপক এডিংটন ও অধ্যাপক জীল মনে করতেন যে, প্রোটন ও ইলেকট্রনের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ বা সংস্পর্শের কালে প্রোটনের বিনাশ ঘটছে এবং তার সমুদয় ভরই শক্তিরূপে পুনঃ-প্রকাশিত হচ্ছে মহাজাগতিক রশ্মির ভিতর দিয়ে।

মতান্তরে, বিশ্ব-স্থিতির গোড়ার দিকে পদার্থ-জগতের নিয়ম ও সূত্রাদি অভ রূপ ছিল এবং তখনই এই রশ্মির জন্ম সম্ভব হয়েছিল। তারপর থেকে এভাবে সে আবদ্ধ বিশ্বের অভ্যন্তরে তদুপরিভ্রমণ করেই চলেছে। রাশিয়ান পদার্থবিদ ভাইল-বার্গের ধারণা হলো—প্রাথমিক মহাজাগতিক কণিকা সঞ্চারিত হচ্ছে, তারকামণ্ডলীর অভ্যন্তরে কেন্দ্রীয়-বিস্ফোরণের কালে। অতএব এগুলি নাকল্পনুলি ছাড়া কিছুই নয়; আর এই প্রক্রিয়াতেই মঙ্গল-সমূহের বিরোজন, বিভাজন ও বিধ্বংসলীলাও সংঘটিত হচ্ছে মহাবিশ্বে।

## কৃষি-সমস্যার সমাধানে সংশ্লিষ্ট উদ্ভিদ-হর্মোনের ভূমিকা

মনোজকুমার সাহু\*

বিশ্বের উন্নতিকামী দেশগুলির চরম লক্ষ্য হলো খাদ্য স্বয়ংসম্পূর্ণতা লাভ করা। উন্নত ধরনের বীজ, পর্যাপ্ত সার ও জল সরবরাহ, কীট-পতঙ্গ ও রোগের আক্রমণ প্রতিরোধকরো যথাযোগ্য ব্যবস্থা গ্রহণ ইত্যাদি শ্রম কলনের হার উন্নয়নযোগ্যভাবে বৃদ্ধি করলেও কতকগুলি সমস্যা এখনও কৃষকদের বিশেষভাবে বিব্রত করে থাকে। তবে ইতিমধ্যে কয়েকটি আশ্চর্যজনক রাসায়নিক পদার্থের আবিষ্কারের কালে কৃষির ঐ সব জটিল সমস্যা সমাধানের পথে দৃঢ় পদক্ষেপ সম্ভব হয়েছে। আজ থেকে প্রায় ৪০ বছর পূর্বে অক্সিন নামে যে উদ্ভিদ-হর্মোন আবিষ্কৃত হয়, তা আজ কতকগুলি কসদের ক্ষেত্রে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে। প্রাকৃতিক অক্সিনের মধ্যে ইণ্ডোল অ্যাসেটিক অ্যাসিড (IAA) প্রধান এবং প্রতিটি উদ্ভিদের মধ্যে এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। তথাপি কৃষি-সমস্যার সমাধানে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত অক্সিনের ব্যবহারই

সর্বাধিক; কারণ উদ্ভিদের উপর এর প্রভাব বিচিত্র ও অভূতনীয়। অক্সিনের বহুধর্মী কর্মক্ষমতা নিয়ে সমগ্র বিশ্বে বিশদ গবেষণা শুরু হয়েছে এবং ইতিমধ্যেই আমরা এর ব্যবহারিক ও ব্যবসায়িক উপযোগিতা সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠেছি। অক্সিন ব্যবহারের প্রধান সুবিধা হলো এই যে, খুব অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করলেই ঐঙ্গিত কল পাওয়া যায়, সময় ও অর্থের সাশ্রয় হয়। নীচে কৃষি-সমস্যা ও তার সমাধানে অক্সিনের ভূমিকা বর্ণনা করা হলো।

আনারস, সেলারি ও বাঁধাকপির গাছে ফুল নিয়ন্ত্রণ—আনারস সুবাহ ও পুটিকর ফলগুলির মধ্যে অন্ততম। আনারস চাষের প্রধান সমস্যা হলো এই যে, সব গাছে একই সঙ্গে ফুল ধরে না, বার জন্মে আনারসের ক্ষেত থেকে বার বার ফল তোলাবার ঝামেলার সম্মুখীন হতে হয়। কিন্তু বর্তমানে পশ্চিম হুনিয়ার প্রগতিশীল দেশগুলিতে

\*কৃষি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

ভাপ্পলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) নামে কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত একটি উদ্ভিদ-হরমোনের ব্যবহারের ফলে বহুরের যে কোন সময়ে সব গাছে একই সঙ্গে ফল ধরানো সম্ভব হচ্ছে। একর প্রতি মাত্র 25 গ্রাম NAA প্রয়োগ করলেই এই আশ্চর্যজনক ফল পাওয়া যায়।

আবার কতকগুলি ফসল, যেমন—সেলারি ও ধানাকপির গাছে তড়াঁতড়াঁ ফুল আসা কাব্য নয়। আল্ফা ক্লোরোকেনোমি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড নামে আর একটি অম্লের 100 ppm জলীয় দ্রবণ গাছে স্প্রে করলে অসময়ে ফুল আসা বন্ধ হয়। গাছে ফুল ধরা নিয়ন্ত্রণে অম্লের ভূমিকা নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে যথেষ্ট মতভেদ রয়েছে এবং এর সঠিক বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা দেওয়া আজও সম্ভব হয় নি।

অল্পপুষ্প প্রাকৃতিক পরিবেশে টোম্যাটো চাষ—শীতপ্রধান দেশে শীতকালে টোম্যাটো চাষ করা বেশ কঠিন। টোম্যাটো গাছের বুদ্ধি ও ফলন পারিপার্শ্বিক আবহাওয়ার উপর নির্ভরশীল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকলে বা দিনের দৈর্ঘ্য কম হলে ফুলের আত্যন্তরীণ গঠনের পরিবর্তন হয়, পরাগ উৎপাদন হ্রাস পায় ও পরিণামে পরাগ-সংযোগ ব্যাহত হয়। আবার পরাগ-সংযোগ হলেও অতিরিক্ত শৈত্যের প্রভাবে অনেক সময় পরাগ-নালীকার বুদ্ধি ব্যাহত হওয়ার গর্ভকোষের মধ্যস্থিত ডিম্বাণু নিষিক্ত হয় না। গর্ভকোষের অম্লিন ফলের প্রাথমিক বুদ্ধির জন্মে যথেষ্ট হলেও পরবর্তী বুদ্ধির পক্ষে অপ্রচুর। নিষিক্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে ডিম্বাণুর মধ্যে অম্লিন প্রস্তুত হতে থাকে এবং নিষিক্ত ডিম্বাণুটি ফলের বুদ্ধির জন্মে প্রয়োজনীয় অম্লিন সরবরাহ করে এবং ফলটি স্বাভাবিকভাবেই বড় হতে থাকে। কিন্তু অনিষিক্ত ডিম্বাণুর অম্লিন প্রস্তুতির স্বাভাবিক কমতা না থাকায় গর্ভকোষের বুদ্ধি বন্ধ হয়ে যায় এবং কালক্রমে

ফলটি ছোট অবস্থায় শুকিয়ে করে পড়ে। এই সমস্যাটি আজ আধুনিক কৃষকদের আর বিস্তৃত করতে পারে না। বিটা-ভাপ্পলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (B-Napthoxy acetic acid—50 ppm), অথবা প্যারাতাপ্পলিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (15 ppm) অথবা 4-o-chlorophenoxy propionic acid (40 ppm)-এর জলীয় দ্রবণ সময়মত স্প্রে করলে অল্পপুষ্প পরিবেশেও গাছে ফুল ও ফল ধরে।

আবার এই সব দেশে বিরাটকার কাঁচের ঘরে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে টোম্যাটো চাষ করে উপরিউক্ত সমস্যাটি সমাধানের চেষ্টাও চলছে। অবশ্য এই সঙ্গে অল্প আর একটি সমস্যা আবির্ভূত হয়েছে, তা হলো কাঁচের ঘরের মধ্যে স্বাভাবিক বায়ু চলাচল না থাকায় এক ফুলের পরাগরেণু অল্প ফুলের গর্ভস্থে পতিত হবার (Cross pollination) সম্ভাবনা খুবই কমে যায়। পরাগ-সংযোগ ব্যতিরেকে সাধারণতঃ গাছে ফল ধরে না বা ফল ধরলেও বীজের অত্যন্তাচ্ছন্ন ফলের আকার অত্যন্ত ছোট হয়। এই ক্ষেত্রেও অম্লিন ব্যবহার করে বিনা পরাগ-সংযোগে নিয়ন্ত্রিত পরিবেশে বীজহীন ফল পাওয়া সম্ভব হচ্ছে।

গাছ থেকে অকালে ফলের পতন রোধ—আপেল, ভাসপাতি, অ্যাপ্রিকট ও লেবু বাগানের অল্পতম মুখ্য সমস্যা হলো এই যে, সম্পূর্ণরূপে পরিপক হবার পূর্বেই বেশ কিছু ফল গাছ থেকে ঝরে যায়। অনেক সময় 30-50 ভাগ ফল অসময়ে ঝরে বাওয়ার ফলন উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পায়। গাছ থেকে ফল ঝরে বাবার সময় দেখা যায় যে, গাছের শাখার সঙ্গে ফলের যৌটো যেখানে সংযুক্ত থাকে, সেখানে আবলিসন স্তর (Abscission layer) নামে একটি কোষস্তরের সৃষ্টি হয়। ঐ স্তরটি অসংখ্য ক্ষুদ্রকার কোষের সমষ্টি এবং কোষগুলি পরস্পরের সঙ্গে অত্যন্ত আলগাভাবে সন্নিবিষ্ট থাকে, যার ফলে বায়ু-



এবং বের বেগ এতল হলে অথবা অনেক সময় আগনার ভায়ে কলগুলি সহজেই স্থানচ্যুত হয়। এই অবস্থাসন ভয়ের সৃষ্টি, কল ও পাখার অগ্নির পরিমাণের তারসাম্যের উপর নির্ভর করে। কোন কারণে (যেমন, ডিবাণু নিবিড় না হলে বা নিবিড় ডিবাণু নষ্ট হয়ে গেলে বা ঐটি পূর্ণাঙ্গ বীজে পরিণত হলে) কলের মধ্যে অগ্নির পরিমাণ কমে গেলে অবস্থাসন ভয়ের সৃষ্টি ঘরাবিত হয় এবং অবশেষে কলটি বন্ধ হয়ে পড়ে। সিঙ্ক্রটিক অর্থাৎ সংশ্লিষ্ট অগ্নি 2, 4, 5—টাইক্লোরোকেনোজি অ্যাসেটিক অ্যাসিড (245—T) বা 2, 4, 5—টাইক্লোরোকেনোজি প্রোপিয়োনিক অ্যাসিড (2, 4, 5-TP) একর প্রতি 48 গ্রাম হিসাবে প্রয়োগ করলে অকালে কলের পতন রোধ হওয়া ছাড়াও কলের বৃদ্ধি ঘরাবিত হয়, আকার বৃদ্ধি পায় এবং কলের রং ও উৎকর্ষ সাধিত হয়।

কলের সংখ্যা হ্রাস—অকালে কল বন্ধ হওয়া যেমন কাম্য নয়, তেমনি কোন কোন গাছে অতিরিক্ত কল ধরাও বাঞ্ছনীয় নয়। কারণ—(1) অতিরিক্ত কল ধরলে কলের আকার হ্রাস পায় ও উৎকর্ষের অবনতি ঘটে, (2) আপেল, অলিভ ইত্যাদি গাছে কোন এক বছর অতিরিক্ত কল ধরলে পরবর্তী বছরে ঘোটেই কল ধরে না বা অত্যন্ত কম কল ধরে। কিছু দিন আগে পর্যন্ত ছোট থাকাকালীন কিছু কিছু কল হাত দিয়ে তুলে কেলে উপরিউক্ত সমস্যাটির মোকবিলা করা হতো। এই ব্যয়বহল ও সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির বিকল্প হিসাবে বর্তমানে আপেল ও ভাসপাতি গাছে ভাপ্‌থ্যালিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড (NAA) ও ভাপ্‌থ্যালিন অ্যাসিটামাইড প্রে করে বিশেষ সুকল পাওয়া গেছে।

শতকেন্দ্রে আগাছা দমন—শতের অল্পতম প্রধান শত্রু হচ্ছে আগাছা। এর প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো—1। এটি শতের প্রয়োজনীয় খাদ্য-

পাখান ও জল শোষণ করে, 2। শতকেন্দ্রে হারা সৃষ্টি করে, 3। নানান ধরনের রোগ ও পোকামাকড়কে আশ্রয় দেয়, 4। অনেক সময় মূল থেকে ক্ষতিকারক পদার্থ নিঃসৃত করে। ঠিক সময় আগাছা দমন করলে কলন বিশেষভাবে বৃদ্ধি পায়। প্রধানতঃ হাত দিয়ে বা যন্ত্রপাতির সাহায্যে আগাছা দমন করা হলেও অগ্নির দ্বারা আগাছা নিরস্ত্র কমেই বিশেষ অদ-প্রিয়তা অর্জন করেছে। এই বিষয়ে 2, 4-ডাইক্লোরো-কেনোজি অ্যাসেটিক অ্যাসিডের (2, 4-D) তুলিকা সর্বাগ্রগণ্য। আগাছা নিরস্ত্রণে 2, 4-D-এর একটি বিশেষ নির্বাচনী ক্ষমতা রয়েছে, যার জন্মে এর প্রয়োগে সুরু পাতার গাছ, যেমন—ধান, গম, বব প্রভৃতি শতের কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু চওড়া পাতার গাছ সহজেই আক্রান্ত হয়। 2, 4-D-র আগাছা নিরস্ত্রণ-প্রক্রিয়া সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিকেরা বিভিন্ন মত পোষণ করেন। বহুল প্রচলিত অভিমত হলো—1। এটি উদ্ভিদের খাস-কিয়ার গতি অব্যাবহিকভাবে বাড়িয়ে দেয়, কলে উদ্ভিদ-কোষে শর্করাজাতীয় খাদ্য সঞ্চারে বাইতি হয়ে পড়ে 2। এই পদার্থটি ঘিবীজপত্রী গাছের ক্যামিয়ার টিস্যুর অনির্দিষ্ট বৃদ্ধিতে সাহায্য করার ক্ষোদেহ টিস্যু নষ্ট হয়ে যায়, 3। এটি কোষের প্রোটিন বস্তুর অহেতুক বিশ্লেষণে সহায়তা করে, কলে সাইটোপ্লাজমের ঘনত্বের হ্রাসের হয় এবং প্রয়োজনীয় এন্জাইম ধ্বংস হয়ে যায় বা এর কর্মক্ষমতা হ্রাস পায় এবং 4। এটি উদ্ভিদের দেহে পটাসিয়াম ও কস্‌করাসের স্বাভাবিক বিপাককিয়ার বাধা দেয় এবং বিশৃঙ্খল বিপাককিয়ার জন্মে বিবাক্ত পদার্থের সৃষ্টি হয়। এবাবং সংগৃহীত তথ্য থেকে একথা স্থানান্তিত-ভাবে বলা যায় যে, উপরিউক্ত কারণগুলি একক বা সম্মিলিতভাবে 2, 4-D-এর আগাছা দমন ক্ষমতাকে নিরস্ত্রিত করে, বা আবার উদ্ভিদের প্রকার তেদ, এর বরস, অগ্নি প্রয়োগের



যাড়া, পারিপার্শ্বিক অবস্থা ইত্যাদির উপর নির্ভরশীল।

শাখা কলমের দ্বারা গাছের সংখ্যা-বৃদ্ধি—গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধি প্রধানতঃ বীজের দ্বারা হয়। তবে এর একটা অসুবিধা হলো এই যে, বীজ থেকে উদ্ভূত গাছটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জন্মদাতা গাছের বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না। বীজ ছাড়া গাছের বংশ বা সংখ্যা-বৃদ্ধির সহজতম উপায় হলো কলমের সাহায্য নেওয়া। তবে কিছু কিছু গাছের কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। উদ্ভান-বিশারদগণই ইণ্ডোল বিউটেরিক অ্যাসিড (Indole butyric acid) ও জ্জাপ্‌থ্যানিন অ্যাসেটিক অ্যাসিড এবং এই দুটি অম্লিনের মিশ্রণ বিভিন্ন গাছের শাখা কলমে ব্যবহার করে বিশেষ সফল পেয়েছেন। অম্লিন ব্যবহারের প্রধান প্রধান সুবিধাগুলি হলো এই যে, 1। এতে শিকড়ের বৃদ্ধি ত্বরান্বিত করার সময় ও অর্ধের সাঞ্জয় হয়, 2। প্রায় সব কলমেই শিকড় বের হয়, 3। প্রতিটি কলমে অসংখ্য ছোট ছোট শিকড় বের হয়, যেগুলি গাছের পরবর্তী বৃদ্ধির জন্তে বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। অম্লিন কভাবে শাখা কলমে শিকড় বের হতে সাহায্য করে, সে সম্পর্কে বিশেষ কিছু এখনও জানা যায় নি। বিভিন্ন গবেষণার ফল থেকে শুধু এটুকুই বলা যায় যে, অম্লিন শাখা কলমের শর্করা ও নাই-হ্রোজেনযুক্ত ষাণ্ডবস্তুর সঙ্গে জটিল যৌগিক বিক্রিয়ার সূচনা করে, যার ফলে প্রথমে ক্যালাস টিসু ও পরে ঐ ক্যালাস টিসু থেকে শিকড় নির্গত হয়।

পশ্চিম আফ্রিকা ও পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জে কোকো গাছের শাখা কলমে IBA ও NAA-মিশ্রণ ব্যাপক হারে ব্যবহৃত হচ্ছে। রবার, কফি 364 ইত্যাদির শাখা কলমেও অম্লিনের ব্যবহার ক্রমেই জনপ্রিয়তা অর্জন করছে।

উপরে বর্ণিত বিষয়গুলি ছাড়াও আরও অনেক ক্ষেত্রে অম্লিন ব্যবহৃত হচ্ছে, যেমন—সংরক্ষণ-কালে আলু, পেঁয়াজ ইত্যাদির অক্সিডেশন বন্ধ করা এবং অক্সরের স্থপ্তিকাল প্রলম্বিত করা, কীট-নাশ গাছের পাতার পতন রোধ, নেবু, বীজ-হীন আঙ্গুর, ট্রুবারি ইত্যাদির কলের আকার বৃদ্ধি ইত্যাদি।

উপসংহার—কৃষি-সমস্তার সমাধানে অম্লিনের ভূমিকা নিয়ে এই পর্বত যে আলোচনা করা গেল, তা মূলতঃ শীতপ্রধান দেশের কসলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। গ্রীষ্মপ্রধান দেশের কসলের উপর এর প্রভাব নিয়ে বিশেষ গবেষণা হয় নি। তাই এর প্রয়োগও এই সব দেশে সীমিত। আম ও লিচু আমাদের পরিচিত ফলগুলির মধ্যে অন্যতম, বিশেষ করে আম খাদ্যে ও গাছে অভুলনীয়। তবে আপেলের মত এরও সমস্তা হলো এক বছর প্রচুর আম ফলে এবং পরবর্তী বছরে মোটেই আম ফলে না বা অত্যন্ত কম ফলে। তাছাড়া অকালে আম ঝরে যাবার সমস্তাও রয়েছে। আম, লিচু ও পেয়ারা গাছের আর একটা সমস্তা হলো—বীজ থেকে জন্মানো গাছ সাধারণতঃ জন্মদাতা গাছের সব বৈশিষ্ট্য ধারণ করে না ও নিকট ধরনের ফল দেয়। আবার ঐ সব গাছের শাখা থেকে কলম করাও যায় না, কারণ ঐ কলমে সহজে শিকড় বের হয় না। এই সম্পর্কে বিশদ গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে।

অম্লিন ছাড়া আরও দুটি উদ্ভিদ-হর্মোন—জিব্বারেলিন ও কাইনেটিন নিয়েও ব্যাপক গবেষণা শুরু হয়েছে এবং উদ্ভিদের জীবনকালে বিভিন্ন প্রক্রিয়ার এই দুটির বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা গেছে। ভবিষ্যতে হয়তো এমন দিন আসবে, যখন এর সাহায্যে ষাণ্ড-সমস্তার বর্ষার্য সমাধান করা সম্ভব হবে।

# ট্রেসার পদ্ধতি

মিহিরকুমার কুণ্ডু\*

ট্রেসার বা আইসোটোপীয় পদ্ধতি অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ। বিজ্ঞানের অল্প সমস্তার সহজ অথচ সুনিশ্চিত সমাধানে এর অবদান অনন্ত-সাধারণ। জীব-বিজ্ঞান, শারীর-বিজ্ঞান, রসায়ন-বিজ্ঞান, পদার্থ-বিজ্ঞান প্রভৃতি বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার উন্নতিতে এর ভূমিকা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বিশেষতঃ জীব-বিজ্ঞান ও রসায়ন-বিজ্ঞানের অনেক সমস্যাই অত্যন্ত জটিল, দুর্লভ, অথচ সেগুলির গুরুত্ব এবং তাৎপর্য অপরি-সীম। এই সব সমস্যাবলীর সুষ্ঠু সমাধান করতে হলে এসম্পর্কে বিশদ জ্ঞান অত্যাৱশ্যক। ট্রেসার পদ্ধতির প্রয়োগ করে এই ধরনের অল্প সমস্যাবলীর উপর আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। কোন কোন ক্ষেত্রে কষ্টসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ পদ্ধতির মাধ্যমে লব্ধ অনেক সিদ্ধান্তের বাণার্থ্য বা অবাণার্থ্য ট্রেসার পদ্ধতির সাহায্যে অনেক সহজে, অনেক দ্রুত এবং সুনিশ্চিতভাবে প্রমাণিত হয়েছে।

ট্রেসার পদ্ধতিতে বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের আইসোটোপসমূহ ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনের পর্যায়বলী সনাক্তকরণে ব্যবহার করা হয়। এটা সম্ভব হয় এগুলির ধর্মের কয়েকটি বৈশিষ্ট্যের দরুন। আমরা জানি, মৌলিক পদার্থের ক্ষুদ্রতম অংশ বা পরমাণু দুটি অংশে বিভক্ত—একটি নিউক্লিয়াস, বার প্রধান কণিকা ধনাত্মক (+) আধানসম্পন্ন প্রোটন এবং নিউট্রন। পরমাণুর ভর কার্যতঃ এগুলির সম্মিলিত ভরের উপর নির্ভরশীল। নিউক্লিয়াসকে ঘিরে রয়েছে ঋণাত্মক (−) আধানসম্পন্ন ইলেকট্রনের স্তর। ইলেকট্রনের ভর অত্যন্ত নগণ্য,

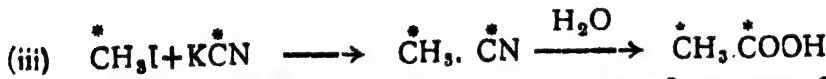
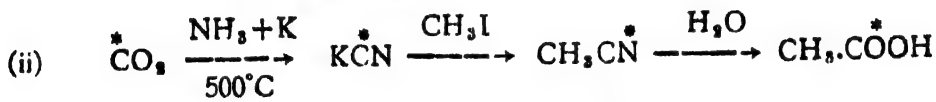
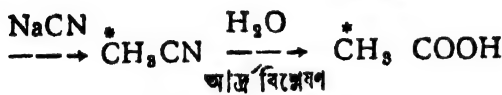
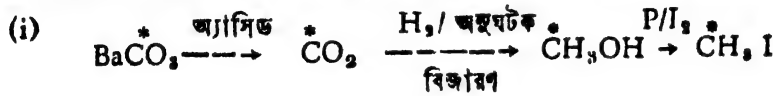
একটি প্রোটনের ভরের ১৮৪০ ভাগ বাকি। ইলেকট্রন ও প্রোটন, উভয়ের আধানের মান সমান, আবার পরমাণু সামগ্রিকভাবে নিরুপ-স্পষ্টতঃই, পরমাণুতে ইলেকট্রন ও প্রোটনের সংখ্যা সমান। পরমাণুর রাসায়নিক ধর্ম মূলতঃ ইলেক-ট্রনের সংখ্যা ও বিভাসের উপর নির্ভরশীল। আইসোটোপগুলির প্রোটন ও ইলেকট্রনের সংখ্যা সমান, কিন্তু নিউট্রনের সংখ্যা বিভিন্ন, অর্থাৎ এগুলির রাসায়নিক ধর্মাবলী অভিন্ন। ভৌত, রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক পরিবর্তনে এগুলি অবিকল একইভাবে ব্যবহার করে, পার্থক্য কেবল পরমাণুর ভরে। কোন কোন আইসোটোপ আবার অস্থায়ী, এগুলির সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য এগুলি তেজস্ক্রিয় রশ্মি, যথা—আল্ফা, বিটা এবং গামারশ্মি বিকিরণ করে। স্পষ্টতঃই, স্থায়ী আইসোটোপগুলির পরমাণুর ভরের বিভিন্নতা পরিমাপ করে এবং তেজস্ক্রিয়তার সাহায্যে অস্থায়ী বা তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। কলে বিশেষ মৌল বা যৌগের সঙ্গে চিহ্নিত আইসোটোপটি মিশিয়ে ভৌত বা রাসায়নিক পরিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে মৌল বা যৌগটির পরিবর্তন অহুসরণ বা অহুসরণ করা সহজেই সম্ভব। বস্তুতঃ এই ভাবে বিজ্ঞানীরা বহু জটিল রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায় সম্পর্কে সুনিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে সক্ষম হয়েছেন। চিহ্নিত মৌলটি অত্যন্ত পরিমাণে উপস্থিত থেকে ভৌত বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়বলী অহুসরণ ও নির্দেশ করে বলে একে ট্রেসার

---

\*কলিত রসায়ন বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

মৌল (Tracer element) এবং এই পদ্ধতিকে ট্রেসার পদ্ধতি নামে অভিহিত করা হয়। এটি একটি আলট্রাভাইয়ো পদ্ধতি অর্থাৎ এই পদ্ধতির সাহায্যে অবিখ্যাত রকম স্বল্পপরিমাণ পদার্থের সনাক্তকরণ সম্ভব। কোন কোন ক্ষেত্রে এই পদার্থের পরিমাণ  $10^{-10}$  গ্রাম পর্যন্ত হতে পারে।

সাধারণতঃ কিতাবে কোন নির্দিষ্টভাবে চিহ্নিত আইসোটোপ অম্লসমূহের পদার্থের কোন বিশেষ স্থানে স্থাপিত করা হয়—একটি উদাহরণের সাহায্যে তা দেখানো যায়। একটি কার্বন যৌগের বিবরণ



পূর্বেই বলা হয়েছে, এই পরিবর্তনের কলে যৌগের রাসায়নিক বা জীব-রাসায়নিক ধর্মের কোন ব্যাঘাত বা পরিবর্তন হয় না। কলে বিক্রিয়াকালে যৌগটির বিভিন্ন অংশের ব্যবহার অপরিবর্তিত থাকবে এবং তেজস্ক্রিয়তার পরিমাপ করে বিক্রিয়ার পর্যায়বলী সহজে অনুসরণ করা যেতে পারে। ধরা যাক, অ্যাসেটিক অ্যাসিড, যার মিথাইল কার্বন চিহ্নিত ( $\text{CH}_3\text{COOH}$ ) কোন প্রাণীদেহে প্রবেশ করানো হলো। প্রাণীদেহ থেকে নির্গত দ্রব্যের সঙ্গে কার্বন ডাই-অক্সাইড বেরিয়ে আসে। প্রশ্ন হলো, এই কার্বন ডাই-অক্সাইড মিথাইল কার্বন, না কার্বক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত? নির্গত কার্বন ডাই-অক্সাইডের কার্বন পরমাণুর তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপ করে প্রমাণিত হয়েছে, নিঃসৃত  $\text{CO}_2$  কার্বক্সিল কার্বন থেকে উদ্ভূত।

কমন। করা যাক, যার মধ্যে একাধিক কার্বন পরমাণু রয়েছে, যেমন—অ্যাসেটিক অ্যাসিড,  $\text{CH}_3\text{COOH}$ । এর মিথাইল ( $\text{CH}_3$ ) গুচ্ছে রয়েছে একটি কার্বন পরমাণু আর দ্বিতীয়টি রয়েছে কার্বক্সিল ( $-\text{COOH}$ )—গুচ্ছে। মিথাইল বা কার্বক্সিল বা উভয় গুচ্ছের C নির্দেশিত বিক্রিয়ার সাহায্যে চিহ্নিত আইসোটোপ  $\text{C}^*$ -এর (এখানে  $\text{C}$  বলতে C-14 অর্থাৎ 14 পরমাণুর বিশিষ্ট তেজস্ক্রিয় কার্বন পরমাণু বোঝানো হচ্ছে) দ্বারা প্রতিস্থাপিত করা যায় :

পূর্বে বিজ্ঞানীদের ধারণা ছিল, প্রাণীদেহের ক্ষয় অতি দ্রুত গতিতে হয়। জীর্ণ খাদ্য থেকে উদ্ভূত শক্তি প্রাণীকে চলাকোরা প্রভৃতির দ্রুত নিত্য-প্রয়োজনীয় শক্তি সরবরাহে সীমিত থাকে, একটি নগণ্য ভগ্নাংশ মাত্র করিত দেহকোষের প্রতিস্থাপনে ব্যয়িত হয়; অর্থাৎ জীব-রাসায়নিক বিক্রিয়াটি মূলতঃ স্থিতিশীল সাম্যাবস্থার থাকে। সোয়েনহাইমার ও রিভেনবার্গ এবং তাঁর সহকর্মীরা 1938 সালে এবং পরবর্তী কালে ডয়টেরিয়ায় (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ, D বা H-2) এবং N-15 ট্রেসার মৌলরূপে ব্যবহার করে প্রমাণ করেন যে, এই ধারণা সম্পূর্ণ ভ্রান্ত। দেহস্থিত ক্যাটি, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেট এবং খাদ্যের সঙ্গে আগত ক্যাটি, প্রোটিন ও কার্বোহাইড্রেটের মধ্যে সত্যতঃ বিনিময় হয়, অর্থাৎ এগুলি গতিশীল সাম্যাবস্থার থাকে। ভিনির ডেল

সংক্রান্ত এই বিজ্ঞানীদের পরীক্ষা বিশেষ উল্লেখ-  
যোগ্য। তাদের তেলের ক্যাটি অ্যানিডের  
অণুগুলি দ্বি বা ত্রি-অসম্পৃক্ত (Di or tri-unsaturated)  
বহুবীজবৃত্ত। তাঁরা প্রথমতঃ ডয়-  
টেরিয়ামের সাহায্যে এই ক্যাটি অ্যানিডের অণু-  
গুলি আংশিক সম্পৃক্ত করেন। চিহ্নিত ডয়টেরো-  
ক্যাটি প্রাণীদের খাওয়ার পর তাঁরা বিশ্লিষ্ট  
হয়ে লক্ষ্য করলেন, প্রাণীদের দেহ থেকে নিঃসৃত  
ডয়টেরিয়ামের পরিমাণ, খাদ্য (ডয়টেরোক্যাটি)  
রূপে প্রবর্তিত ডয়টেরিয়ামের ভুলনার অনেক  
কম—ডয়টেরিয়ামের বৃহত্তর অংশই দেহস্থিত  
ক্যাটের মধ্যে সঞ্চিত হয়। একটি পৃথক পরীক্ষার  
বিজ্ঞানীরা খাদ্যের মধ্যে ক্যাটের পরিমাণ  
কমিয়ে দিলেন। উদ্বেগ হলো—প্রয়োজনীয়  
শক্তির জন্তে প্রাণী যেন দেহস্থিত ক্যাট ব্যবহার  
করতে বাধ্য হয়। এক্ষেত্রে তাঁরা লক্ষ্য করলেন,  
ডয়টেরোক্যাটি প্রধানতঃ দেহস্থিত ক্যাটের  
অন্তর্ভুক্ত হয়, সজে সজে ব্যয়িত হয় না। কিন্তু  
স্বাভাবিক (চিহ্নিত নয়) ক্যাটি খাওয়ানো আরম্ভ  
করবার পর দেখা গেল, দেহস্থিত চিহ্নিত  
ক্যাটের পরিমাণ ধীরে ধীরে কমতে আরম্ভ করে।  
ডয়টেরিয়াম প্রধানতঃ  $D_2O$  (ভারী জল) বা  
 $DHO$  (ভারী ও সাধারণ জলের সংমিশ্রণ)  
রূপে নিঃসৃত হয়। স্বাভাবিক খাদ্যের সঙ্গে  
প্রয়োজনীয় জলের পরিবর্তে যদি ভারী জল  
সাধারণ জলের ( $H_2O$ ) সঙ্গে এমন অল্পপাতে  
মেশানো হয় যে, দেহস্থিত ডয়টেরিয়াম এবং  
খাদ্যের সঙ্গে আগত ডয়টেরিয়ামের মধ্যে সমতা  
রক্ষিত হয়, তাহলে কিন্তু দেহস্থিত ক্যাটে যে  
পরিমাণে ডয়টেরিয়াম বৃদ্ধি পায়, ঠিক সেই  
পরিমাণে দেহে সঞ্চিত ডয়টেরোক্যাটি থেকে  
ডয়টেরিয়াম হ্রাস পায়। এই সব পরীক্ষা থেকে  
স্পষ্টভাবে বোঝা যায়, প্রাণীদেহে জল ও  
ক্যাটের মধ্যে গতিশীল সাম্যাবস্থা বর্তমান।  
হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম ত্যাগ করে সম্পৃক্ত

ক্যাটি অসম্পৃক্ত হয়, পক্ষান্তরে জল থেকে  
হাইড্রোজেন বা ডয়টেরিয়াম গ্রহণ করে  
অসম্পৃক্ত ক্যাটি সম্পৃক্ত হয়।

পরবর্তীকালে প্রমাণিত হয়েছে যে, এই ধরনের  
গতিশীল সাম্যাবস্থার কেবলমাত্র এক-অসম্পৃক্ত  
বহুবীজবৃত্ত ক্যাটি অ্যানিড অংশগ্রহণ করে।  
অধিকতর অসম্পৃক্ত ক্যাটি অ্যানিড, যথা—  
লিনোলিক বা লিনোলেনিক অ্যানিড এইভাবে  
সম্পৃক্ত হয় না বা সম্পৃক্ত ক্যাটি থেকে উৎপন্ন হয়  
না অর্থাৎ দেহ এগুলির সংশ্লেষণে অক্ষম। খাদ্যের  
সঙ্গে এগুলিকে অবশ্যই সরবরাহ করতে হবে।  
এই জন্তে এই ধরনের অ্যানিডগুলিকে অপরিহার্য  
ক্যাটি অ্যানিড বলা হয়।

সোয়েনহাইমার এবং রিভেনবার্গের অ্যামিনো  
অ্যানিড সংক্রান্ত পরীক্ষার ফলও অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।  
এঁরা অ্যামিনো ( $-NH_2$ ) পুঞ্জের নাইট্রোজেন  
N-15 আইসোটোপ দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে  
কতকগুলি অ্যামিনো অ্যানিড তৈরি করেন।  
অতঃপর খাদ্যের সঙ্গে এই সব চিহ্নিত অ্যামিনো  
অ্যানিড প্রাণীদের খাওয়ানো হয়। তাঁরা লক্ষ্য  
করলেন, খাদ্যের অ্যামিনো অ্যানিড সরাসরি  
এবং দ্রুত দেহস্থিত প্রোটিনের (প্রোটিন একাধিক  
অ্যামিনো অ্যানিডের রাসায়নিক সমন্বয়ে তৈরি  
একটি জটিল জৈব যৌগ) অন্তর্ভুক্ত হয়, তাছাড়া  
জীব-রাসায়নিক প্রক্রিয়ার প্রোটিনের এক  
অ্যামিনো অ্যানিড থেকে অল্প অ্যামিনো  
অ্যানিডে অ্যামিনো নাইট্রোজেনের ( $-NH_2$ ) স্থান  
বিনিময় হয়। এর একমাত্র ব্যতিক্রম অপরিহার্য  
অ্যামিনো অ্যানিড লাইসিন।

প্রাণীদেহের অণু-পরমাণু স্তর পর্যন্ত পরিবর্তনশীল।  
খাদ্যরূপে আগত মৌলিক কণার সঙ্গে দেহস্থিত  
সদৃশ মৌলিক কণার অবিচল বিনিময় চলছে।  
এই বিনিময় কস্করাস এমন কি, অহি-র  
ক্যালসিয়ামের সঙ্গেও হয়ে থাকে। এইভাবে  
কালক্রমে প্রাণীর দেহকোষ নতুন নতুন মৌলিক

কণার সম্বন্ধে কার্ধতঃ সম্পূর্ণ নতুনভাবে তৈরি হয়। দেহস্থিত লৌহকণিকা কিন্তু সাধারণভাবে বিনিময় বিষুথ। তেজস্ক্রিয় লৌহ (Fe-59) প্রয়োগ করে দেখা গেছে, এর একটি নগণ্য অংশমাত্র রক্তের লৌহ-কণিকার অন্তর্ভুক্ত হয়। কেবলমাত্র রক্তে লৌহের পরিমাণ হ্রাস পেলে দেহ বহিরাগত লৌহকণিকা গ্রহণ করে। ট্রেসার পরীক্ষার জানা গেছে, শরীরের মধ্যে লৌহ কেরিটিন নামে লৌহ প্রোটিনের জটিল যৌগরূপে সঞ্চিত থাকে এবং এই যৌগটি নির্দিষ্ট পরিমাণে থাকে। শরীরের মধ্যে লৌহ বতই প্রবেশ করানো হোক না কেন, কেরিটিন এই সীমা ছাড়িয়ে যায় না। কখনো যদি কোন কারণে কেরিটিনের পরিমাণ নির্দিষ্ট সীমার নীচে নেমে যায়, যেমন—গর্ভাবস্থার বা ক্ষত বৃদ্ধিকালে, যখন শরীর হিমোগ্লোবিনের পরিমাণ হ্রাস পায়, তখনই কেবল দেহ লৌহ গ্রহণ করে। এই অবস্থার শরীরে লৌহের যোগান দেওয়া বিশেষ আবশ্যক।

অনেক জটিল রোগ নির্ণয়ে ট্রেসার পদ্ধতি অপরিহার্য। এর একটি প্রকৃষ্ট উদাহরণ—রক্তের ব্যাহত সঞ্চালন ও দায়ী অংশটির অবস্থান নির্ণয়ে তেজস্ক্রিয় সোডিয়াম পরমাণুর (Na-24) প্রয়োগ। Na-24 চিহ্নিত খুব সামান্য পরিমাণ লবণজল রোগীর হাতের শিরায় প্রবেশ করানো হয়। এরপর একটি তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্র (একেক্রে গামারশি পরিমাপক যন্ত্র) পারের পাতা সংলগ্ন করে স্থাপিত করা হয়। রক্ত-সঞ্চালন স্বাভাবিক হলে সমস্ত পারের পাতায় তেজস্ক্রিয়তা ধরা পড়বে এবং এর পরিমাণ ক্ষত বৃদ্ধি পেয়ে সর্বোচ্চ মানে পৌঁছাবে। কিন্তু যদি রক্ত-সঞ্চালন ব্যাহত হয়, তাহলে এই প্রক্রিয়াটি মধুর গতিতে অগ্রসর হবে। তেজস্ক্রিয়তা ধীরে ধীরে বৃদ্ধি পাবে। পরিমাপক যন্ত্রটি শরীরের বিভিন্ন অংশের সারিষ্যে স্থাপন করে ব্যাহত সঞ্চালনের প্রকৃত অবস্থানটি নির্ণয় করে চিহ্নিত করা সম্ভব। এই একই প্রক্রিয়ায়

হৃৎপিণ্ডের রক্ত-সঞ্চালন বা রক্ত-সঞ্চালনে কোন অস্বাভাবিকতা থাকলে, তা নির্ধারণ করা যায়। একেক্রে তেজস্ক্রিয়তা পরিমাপক যন্ত্রটি হৃৎকের উপর বা সারিষ্যে স্থাপন করা হয় আর সঙ্গে সংযুক্ত থাকে একটি স্বয়ংক্রিয় লেখনীবন্দ। বলে সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ সঞ্চালন-প্রক্রিয়াটির একটি স্বয়ংক্রিয় লেখ (Graph) তৈরি হয়ে যায়।

কোন কোন মৌলের কয়েকটি বিশেষ স্বাভাবিক এবং অস্বাভাবিক বা আকর্ষক তিস্রুতে সঞ্চিত হওয়ার প্রবণতা দেখা যায়। এই বিশেষ প্রবণতার সুযোগ নিয়ে এই সব মৌলের তেজস্ক্রিয় আইসোটোপের সাহায্যে শরীরে অনেক জটিল, দুর্নির্দেশ্য রোগের, যথা—ক্যান্সার, টিউমার প্রভৃতির অস্তিত্ব এবং অবস্থান নির্ণয় করা যায়। উদাহরণস্বরূপ বলা যেতে পারে—যদিও টিউমার হলে তার অস্তিত্ব বা নিভুল অবস্থান নির্ণয়ে সাধারণ প্রচলিত পদ্ধতি প্রায় অসহায়। এই সব ক্ষেত্রে মার্ক্যারি-203 চিহ্নিত নিওহাইড্রিন বা গ্যালি-রায়-68 চিহ্নিত ইথিলীন তাইঅ্যামিন টেট্রা অ্যাসেটিক অ্যাসিডের জটিল যৌগ প্রয়োগ করে আশ্চর্য ফল পাওয়া গেছে। উপর্যুক্ত তেজস্ক্রিয়তা নির্ধারক যন্ত্রের সাহায্যে স্বয়ং তেজস্ক্রিয়তা লেখ (Radioautography বা autoradiography) বা তেজস্ক্রিয়তার আলোকচিত্র ভুলে টিউমারের অস্তিত্ব ও নিভুল অবস্থানের সংশয়হীন, প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া সম্ভব।

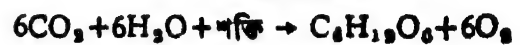
কোষ-জীববিজ্ঞান ক্ষেত্রেও ট্রেসার পদ্ধতির অবদান কম গুরুত্বপূর্ণ নয়। দেহের কোষ দুটি অবিকল সদৃশ কোষে বিভক্ত হতে পারে বলেই প্রাণীদেহের বৃদ্ধি ও করিত তিস্রু প্রতিস্থাপন সম্ভব। কোষের এই বিভাজন জীব-বিজ্ঞানে মাইটোসিস নামে পরিচিত। প্রক্রিয়াটি সম্পূর্ণ হতে একটি নির্দিষ্ট সময় লাগে; সময়কাল প্রাণী ও কোষের প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল। প্রত্যেকটি কোষে ডিঅক্সিরিবোনিউট্রিক অ্যাসিড বা

সংক্ষেপে ডি. এন. এ. থাকে। ডি. এন. এ. কোবের নিউক্লিয়াসে থাকে। প্রাণীর বংশধারা অর্থাৎ বংশপরম্পরায় যে সাধুত্ব দেখা যায়, তার সূত্র এই ডি. এন. এ. নিয়ন্ত্রণ করে। কোবের অ্যাথিনো অ্যাসিড থেকে বিভিন্ন প্রোটিন সংশ্লেষণের সুজাবলীও এদের নিয়ন্ত্রণে। ডি. এন. এ. অণুগুলির একটি একক বৈশিষ্ট্য—এগুলির মধ্যে থাইমিন নামে একটি নাইট্রোজেনযুক্ত বৈকল্পিক অবস্থাই থাকবে। থাইমিনের একটি হাইড্রোজেন পরমাণু তেজস্ক্রিয় হাইসিরাম (হাইড্রোজেনের আইসোটোপ T বা H-3) দিয়ে প্রতিস্থাপিত করে ডি. এন. এ. চিহ্নিত করা যায়। থাইটোসিসের প্রাচুর্যে কোবের ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা বিগুণ হয়। এই ক্ষেত্রেই নবজাত কোব ও বাতুকোবে (স্বজনের অব্যবহিত পরে) ডি. এন. এ.-এর সংখ্যা সমান থাকে। প্রত্যেক কোবই থাইটোসিসে সক্ষম নয়। কোন্ কোব থাইটোসিসে সক্ষম, আর কোন্ কোব নয়—চিহ্নিত ডি. এন. এ. ব্যবহার করে তা জানা গেছে। এই ট্রেনার পরীক্ষার আরো জানা গেছে যে, স্তন্য টিস্যুর ক্ষেত্রে প্রতি ১০০টি স্তন্য কোবের মধ্যে প্রায় ৫০টির বিভাজন হয়। এর ফলে প্রাণীদেহে কোবের সংখ্যা অপরিবর্তিত থাকে। কিন্তু ক্যালার-আক্রান্ত কোব অস্বাভাবিক দ্রুতগতিতে বৃদ্ধি পায়। এর কারণ, এই সব ক্ষেত্রে অনেক বেশী সংখ্যক কোবের থাইটোসিস হয় এবং থাইটোসিস প্রক্রিয়ার সময়কালের কিছু কোন হেরকের হয় না। স্তন্য পূর্ববর্তক ব্যক্তির ক্ষেত্রে করিত টিস্যু প্রতিস্থাপিত করতে শক্ত করা প্রায় তিনটি কোবের থাইটোসিস হয়।

ট্রেনার পদ্ধতি প্রয়োগ করে উদ্ভিদের আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার পর্যায়ক্রমের উপর উল্লেখযোগ্যভাবে আলোকপাত করা সম্ভব হয়েছে। পূর্বলোকে সূর্য উদ্ভিদ কার্বন ডাই-অক্সাইড এবং জল থেকে জটিল পদার্থ, যথা—সুগার, স্টার্চ, সেলুলোজ

প্রভৃতির (সমষ্টিগতভাবে বেগুনির নাম কার্বো-হাইড্রেট) সংশ্লেষণ করতে পারে। উদ্ভিদের এই ক্ষমতাকে আলোকসংশ্লেষণ বলা হয়। কার্বো-হাইড্রেট তৈরির কালে সর্বদাই অক্সিজেন গ্যাস ( $O_2$ ) নির্গত হয়। কার্বোহাইড্রেটগুলির মধ্যে সরলতম কার্বোহাইড্রেট—গ্লুকোজ ও ফ্রুকটোজ। দুটাই উদ্ভিদে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। উভয়েরই সাধারণ সংকেত  $C_6H_{12}O_6$ । আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার এগুলির উৎপাদনের সামগ্রিক বিক্রিয়াটি নিম্নোক্তভাবে দেখানো যেতে পারে:

ক্লোরোফিল



আলোকসংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার ক্লোরোফিল অপরিহার্য। এর অল্পপরিমাণে আলোকসংশ্লেষণ হয় না। এর হচ্ছে, নির্গত  $O_2$ ,  $CO_2$  বা  $H_2O$  থেকে উদ্ভূত? ১৯৪১ সালে মার্কিন বিজ্ঞানী এস. রুবেন ও তাঁর সহকর্মীগণ তেজস্ক্রিয় অক্সিজেন-১৮ চিহ্নিত কার্বন ডাই-অক্সাইড বা জল ব্যবহার করে দেখান যে, নির্গত অক্সিজেন জল থেকে উৎপন্ন। তাঁরা তেজস্ক্রিয় কার্বন-১৪ ব্যবহার করে কার্বন ডাই-অক্সাইড থেকে কার্বো-হাইড্রেট সংশ্লেষণের বিভিন্ন রাসায়নিক পর্যায়ের উপরও আলোকপাত করেন। তাঁদের গবেষণা থেকে আরো প্রমাণিত হয়েছে যে, আলোক-সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ার কেবলমাত্র কার্বোহাইড্রেটই উৎপন্ন হয় না, কার্বোহাইড্রেট নিঃসঙ্গেই দ্রব্য পদার্থ, কিন্তু এই প্রক্রিয়ার অ্যাথিনো অ্যাসিড এবং ক্যাটক কিরণ পরিমাণে তৈরি হয়।

বিভিন্ন রসায়নে কোন বিশেষ বিক্রিয়ার গতিপথ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট সিদ্ধান্তে উপনীত হতে ট্রেনার পদ্ধতির প্রয়োগ বহুল প্রচলিত। উদাহরণ স্বরূপ অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের মধ্যে বিক্রিয়ার কালে একটার তৈরির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। ক্রবিকেরেও ট্রেনার পদ্ধতির উপযোগিতা

উদ্দেশ্যযোগ্য। গাছপালায় বৃদ্ধি দ্বারাচিত করতে এবং তাদের সতেজ ও পুষ্ট করতে প্রায়ই মাটিতে কস্করাস সার ব্যবহার করা হয়। বিভিন্ন প্রকারের কস্করাস সার পাওয়া যায়। কোন বিশেষ জমিতে কোন্ ধরনের কস্করাস সার সবচেয়ে উপযোগী, তা সব সময় স্পষ্ট নয়। গাছ কতটা কস্করাস গ্রহণ করেছে, রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তা নির্ণয় করা যায়, কিন্তু এই কস্করাসের কতটা মাটি থেকে আর কতটা সার থেকে এসেছে, তা বলা অসম্ভব। তেজ-ক্রিয় কস্করাস চিহ্নিত সার ব্যবহার করে এই পার্থক্য বা কোন বিশেষ সারের কার্যকারিতা নির্ধারণ করা যায়।

গাছের ক্লোরোকিলে কোন লৌহ নেই, কিন্তু এর উৎপাদনে লৌহের উপস্থিতি একান্ত প্রয়োজন। মাটিতে এর পরিমাণ কম হলে গাছ ক্লোরোকিল রোগে আক্রান্ত হয়। ক্লোরোকিলের উৎপাদন ব্যাহত হওয়ার পাতার রং সবুজ না হয়ে হলুদে হয়, আলোকসংশ্লেষণ-ক্রিয়াও হ্রাস পায়। আবার কখনো কখনো জমিতে লৌহ উপযুক্ত পরিমাণে থাকা সত্ত্বেও গাছের ক্লোরোকিল হতে দেখা যায়। ট্রেনার পরীক্ষায় এই সব ক্ষেত্রে জমিতে এক বা একাধিক এমন সব মৌলের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়েছে, যেগুলি গাছের লৌহ গ্রহণে ব্যাঘাত ঘটায়।

শিলেও তেজ-ক্রিয় আইসোটোপের প্রচুত প্রয়োগ লক্ষ্যীয়। কয়লার মধ্যে গন্ধক থাকে। গন্ধক লৈব বোঁগ আর অলৈব বোঁগ সাধারণতঃ পাইরাইট ( $FeS_2$ ) রূপে থাকে। কয়লা থেকে কোক তৈরির কালে এই গন্ধকের কিছু অংশ সালফার ডাই-অক্সাইডরূপে বেরিয়ে যায়, অবশিষ্টাংশ কোকের অন্তর্ভুক্ত হয়। গন্ধকের কোন্ অংশ বেরিয়ে বাবে বা কোন্ অংশ কোকের মধ্যে থাকবে, তার কি কোন নিশ্চয়তা আছে, অর্থাৎ এর সঙ্গে গন্ধকযুক্ত বোঁগের প্রকৃতির কোন

সম্পর্ক আছে কি? কয়লার মধ্যে তেজ-ক্রিয় গন্ধক চিহ্নিত পাইরাইট ব্যবহার করে দেখা গেছে, কয়লা এবং কোক উভয়ের মধ্যেই লৈব এবং অলৈব বোঁগের গন্ধকের অল্পাংশ সমান অর্থাৎ বোঁগের প্রকৃতির সঙ্গে উক্ত প্রক্রিয়ার কোন সম্পর্ক নেই।

কোন বস্তুর প্রাচীনত্ব, যেমন—পৃথিবীর বয়স কত, কোন্ কসিল কত বছরের পুরনো, কোন্ শিলা কত বছর আগে সৃষ্ট হয়েছিল—তা নির্ণয় করতে তেজ-ক্রিয় আইসোটোপের জুড়ি নেই। একেবারে রহস্য সমাধানের পূর্ব রয়েছে অল্পসংখ্যক বস্তুতে, কোন বিশেষ তেজ-ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবনকালের মধ্যে। তেজ-ক্রিয় মৌলের অর্ধ-জীবন (Half life) বলতে বোঝায়, যে সময়ের মধ্যে তেজ-ক্রিয়তার তীব্রতা অর্ধেক হ্রাস পায়। কার্বন-14-এর অর্ধ-জীবন 5730 বছর অর্থাৎ কার্বন-14-এর তেজ-ক্রিয়তার পরিমাণ কোন এক সময়ে ক হলে 5730 বছর পরে এর পরিমাণ হবে  $k/2$ , আরো 5730 বছর পরে তেজ-ক্রিয়তা ঐ বিশেষ সময়ের তুলনায় হবে  $(k/2)/2$  বা  $k/4$ ,—এইভাবে তেজ-ক্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। জীবজন্তুর মৃত্যুর পর কার্বন-14 গ্রহণ করবার ক্ষমতা বন্ধ হয়ে যায়। এই সময় প্রতি লক্ষ কোটি কার্বন-12 পরমাণুর সঙ্গে কার্বন-14 থাকে 1টি। মৃত্যুর কোন প্রাচীন কার্বন যৌগযুক্ত বস্তুর কার্বন-14-এর বর্তমান তেজ-ক্রিয়তা পরিমাপ করে 50,000 বছরের মধ্যে সৃষ্ট বস্তুর বয়স নির্ণয় করা সম্ভব। বস্তুতঃ কার্বন যৌগযুক্ত বহু বস্তু, যেমন—বহু কসিলের প্রাচীনত্ব বিজ্ঞানীরা নির্ধারণ করতে সক্ষম হয়েছেন।

অপরাধ ও অপরাধীর সনাক্তকরণেও তেজ-ক্রিয় আইসোটোপ এক উদ্দেশ্যযোগ্য তুলিকা গ্রহণ করেছে। এই সব ক্ষেত্রে 1936 সালে দ্রি. হেভেজি এবং এইচ. লেভি প্রবর্তিত তেজ-ক্রিয়তা বিশ্লেষণ পদ্ধতির ব্যবহার বিশেষ প্রচলিত।



পদ্ধতির মূল কথা হলো, অহস্রের বস্তুর কোন বিশেষ ঘৌল উপযুক্ত পরমাণু-কেন্দ্রীয় বিকিরণ সাহায্যে বা ঘৌলকণাগুলিকে তেজস্ক্রিয় আইসোটোপে রূপান্তরিত করা। অতঃপর এই সব তেজস্ক্রিয় আইসোটোপগুলির স্বরূপ ও পরিমাণ বিকিরিত রশ্মি, যথা—বিটা বা গামারশ্মি এবং আইসোটোপগুলির অর্ধ-জীবনকালের সাহায্যে নির্ণয় করা হয়। এর পর নির্দিষ্ট ঘৌল বা ঘৌলগুলির পরিমাণ জানা আছে, এমন কোন সদৃশ স্থপরিজাত বস্তুর সঙ্গে অবিকল একই অবস্থায় তুলনা করে বিদ্রোহ অজ্ঞাত পদার্থ সম্পর্কে জ্ঞাতব্য তথ্যাবলী স্থানান্তরিতভাবে জানা সম্ভব। এই পদ্ধতির সাহায্যে জানা গেছে যে, মাহুঘের চুল ও তার আঙুলের ছাপের মতই বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। চুলের মধ্যে অত্যন্ত পরিমাণে কয়েকটি ঘৌল থাকে। এগুলির পরিমাণ ও

অল্পপাত ব্যক্তিবিশেষের উপর নির্ভরশীল। সেট হেলেনা বীশপুকে নেপোলিয়নের মৃত্যুর পর এই পদ্ধতি প্রয়োগ করে তাঁর মাথার চুলে অকৃত্রিমিক পরিমাণ আর্গেনিকের অতিশয় থাকা পড়ে। এ থেকে অনেকের সন্দেহ হয় যে, আর্গেনিক-চুই হয়ে নেপোলিয়ন মারা যান।

মানব কল্যাণে ট্রেসার পদ্ধতি এক বিপুল সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত করেছে। বিজ্ঞানের বিবিধ শাখার প্রযুক্ত ট্রেসার পদ্ধতি ব্যবহারের অতি সামান্য অংশ এখানে উল্লেখ করা হয়েছে। সব মর সমস্তার সমাধান, অপ্রত্যাশিত জটিলতার গ্রহি ঘোচনে এর উপযোগিতা বলবার অপেক্ষা রাখে না এবং স্মৃতিভাঙেও বিজ্ঞানের অগ্রগতিতে, মানবের কল্যাণসাধন ও সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বিধানে এই পদ্ধতি অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করবে।

## অবলোহিত রশ্মি

শ্রীপ্রদীপকুমার দত্ত\*

হুচনা—তেপির কাচে সূর্যের আলো পড়লে সাতটি রঙের সৃষ্টি হয়। এর কারণ সূর্যালোক সাতটি রঙের সমষ্টি। এই সাতটি রং ছাড়া সূর্যালোকের একটা বিরাট অংশ আমাদের চোখের রেটিনার অগোচরে থেকে যায়। কিন্তু অদৃশ্য হলো এই বিরাট অংশের প্রভাব আমাদের উপর কম নয়। গ্রীষ্মের প্রচণ্ড দাবদাহের জন্তে দায়ী সূর্য থেকে আগত অবলোহিত রশ্মির প্রচণ্ড প্রভাব আমাদের রেটিনার না থাকলেও স্বকের উপর বণ্ণেই আছে। অবলোহিত রশ্মিও দৃশ্য আলোকের মতই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় তরঙ্গ। তবে তার তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এই দৈর্ঘ্য লাল আলোর তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য এবং বাইকো-তরঙ্গের

তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের মধ্যবর্তী সীমার মধ্যে অবস্থিত। তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য অল্পদায়ী অবলোহিত রশ্মিকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা যায়—(১) একটি অংশ, যেটি লালের ঠিক পরেই থাকে, (২) আর একটি অংশ, যেটি বাইকো-তরঙ্গের নিকটবর্তী এবং (৩) এই দুই-এর মধ্যকার অংশ।

১৮০০ সালে সার উইলিয়াম হার্শেল একটি সৌর বর্ণালীতে লাল অংশের পাশে একটি কালো অংশ দেখেন। এই অংশটিতে অবস্থিত একটি ধার্মোমিটার সর্বোচ্চ তাপমাত্রা সূচিত করে। এ থেকে তিনটি সিদ্ধান্তে পৌঁছানো যায়—(১) দৃশ্য আলোকের

\*পদার্থ-বিজ্ঞান বিভাগ, বঙ্গবান বিশ্ববিদ্যালয়, বরদহান।



বর্ণালীর পরে রয়েছে একটি অদৃশ্য বর্ণালী, (2) এই অদৃশ্য বর্ণালীও আলোকের বহু কোনও শক্তির প্রকাশ এবং (3) এই বিকিরণ তাপীয় ঘটনার সৃষ্টি করে এবং এর উৎস কোন তাপীয় বস্তু। 75 বছর পরে এই বিকিরণটির ব্যবহার করা হয় অবলোহিত বিকিরণ। অবলোহিত রশ্মি আবিষ্কারের পর বহু বছর পর্যন্ত এটি নির্দেশনের কোনও উপযুক্ত উপার জানা ছিল না। 1917 সালে টি. ডার্লিউ. কেস আবিষ্কার করেন যে, গ্যালাস সালফাইড কোবের উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব খুব বেশী। প্রথম বিশ্ব-যুদ্ধের সময় জার্মানী ও অপর কয়েকটি দেশ সামরিক প্রয়োজনে অবলোহিত রশ্মি ব্যবহারের জন্তে কয়েকটি বহু তৈরি করে। প্রকৃত পক্ষে দ্বিতীয় বিশ্ব-যুদ্ধের পর থেকে অবলোহিত রশ্মির গবেষণা শুরু তালে এগিয়ে চলেছে।

উৎস ও প্রকৃতি—অবলোহিত রশ্মির উৎস হলো তাপীয় বস্তু। প্রত্যেক বস্তুই অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে এবং বিকিরণের পরিমাণ বস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। আবার একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রার একটি বিশেষ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের বিকিরণের শক্তি সর্বোচ্চ হয়। তাপমাত্রা বহু কম হয়, এই সর্বোচ্চ শক্তি তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যে পাওয়া যায়। 1নং তালিকা থেকে এটি প্রতীয়মান হবে। তালিকাটি একটি সূত্রের সাহায্যেও প্রকাশ করা যায়। সূত্রটি হলো— $\lambda_m = \frac{2897}{T}$ , এখানে তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য  $\lambda$  হলো বাইকোনে (1 বাইকোন =  $10^{-4}$  সেন্টিমিটার) এবং তাপমাত্রা  $T$  হলো তাপমাত্রার চরম স্কেলে,  $\lambda_m$  হলো  $T^\circ K$  তাপমাত্রার বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য। অবলোহিত রশ্মির আর একটি ধর্ম হলো বস্তুর তাপমাত্রা বহু কম হয়, বস্তু থেকে অবলোহিত রশ্মির বিকিরণ তত বেশী তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য থেকে আরম্ভ হয়। উদাহরণস্বরূপ  $300^\circ K$  তাপমাত্রার বিকিরিত অবলোহিত

রশ্মির সর্বনিম্ন তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য হলো 4 বাইকোন আর  $1000^\circ K$  তাপমাত্রার বিকিরিত অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে তা হলো 1 বাইকোনেরও কম।

#### 1নং তালিকা

তাপমাত্রা (চরম স্কেলে)	নির্গত সর্বোচ্চ তরঙ্গ-দৈর্ঘ্য (বাইকোনে)
$11000^\circ$	0.45
$1000^\circ$	3.0
$500^\circ$	5.0
$300^\circ$	9.8
$373^\circ$	7.8
$273^\circ$	10.5
$77^\circ$	38.0

তালিকা (1নং) থেকে আরও দেখা যায় যে, বস্তুর তাপমাত্রা বহু কমই হোক না কেন, তা থেকে অবলোহিত রশ্মি বিকিরিত হচ্ছে; অর্থাৎ পৃথিবীর, শুধু পৃথিবীরই বা কেন, সমগ্র বস্তুজগতের প্রতিটি বস্তু প্রতিনিয়ত অবলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে চলেছে।

নির্দেশন—অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন প্রধানতঃ দু-ভাবে করা হয়—(1) তাপীয় উপারে ও (2) কটোনের দ্বারা। তাপীয় উপারে অবলোহিত রশ্মি যে তাপ সৃষ্টি করে, তার সাহায্য নেওয়া হয় এবং এদের সাঁড়া দেবার ক্ষমতা তাদের শক্তি শোষণের ক্ষমতার উপর নির্ভর করে। থার্মোকাপ্‌ল, বোলোমিটার প্রভৃতি এই কাজে বহুল ব্যবহৃত হয়। থার্মোকাপ্‌লের একটি জোড়ায় বিকিরণের সাহায্যে উত্তপ্ত হলে যে থার্মোবিভকের সৃষ্টি হয়, তার দ্বারা বিকিরণের পরিমাপ করা যায়। বায়ুহীন পায়ে অবস্থিত বিস্ফাটন-অ্যাক্টিভিটি থার্মোকাপ্‌লই সবচেয়ে বেশী ব্যবহৃত হয়।

বোলোমিটারের সূচ তত্ত্ব তাপমাত্রার সঙ্গে পদার্থের ঘোষণের পরিবর্তনের মধ্যে নিহিত।

বায়ু এবং অধ-পরিবাহী এই কাজে ব্যবহার করা হয়। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে বস্তুর ইলেকট্রিক বোলোমিটার বলা হয়।

তাপীয় নির্দেশকের সীমাবদ্ধতা হলো—তার সাড়া দেবার ক্ষমতা খুব বেশী নয়। এদের সময়-ক্রমক হলো কয়েক মিলিসেকেন্ড।

কটোনের নির্দেশক বস্তুর সাড়া দিবার ক্ষমতা অপেক্ষাকৃত বেশী এবং এদের সময়-ক্রমক কয়েক মাইক্রো সেকেন্ড হলেও যাত্র কয়েকটি ক্ষেত্রে বর্ণালীর সীমাবদ্ধ অংশে এদের ব্যবহার সীমিত। এই সমস্ত বস্তু অধ-পরিবাহীর উপর অবলোহিত রশ্মির প্রভাব কাজে লাগানো হয়; যথা—কটো-পরিবাহক, কটো-ডোপাটাইক ও কটো-ডব্লিউ-চুম্বকীয় ঘটনা।

নিকট অবলোহিত রশ্মির ক্ষেত্রে কম তল-শক্তি (Work function) সম্পন্ন বস্তুর উপর রশ্মি আপাতত হলে বস্তু থেকে ইলেকট্রনের নির্গমন হয় এবং সেই ইলেকট্রনগুলি একটি জিক সালকাইডের প্রতিভব পর্দার আঘাত করে পর্দার উপর সবুজাভ আলোকের সৃষ্টি করে। এই ধরনের বস্তুগুলিকে ইমেজ কনভার্টার বলে। এদের ১.২ মাইক্রোন পর্যন্ত ব্যবহার করা যায়। আরও একটি উপারে কটো-বৈদ্যুতিক ঘটনার সাহায্যে অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন সম্ভব। তা হলো—যে ইলেকট্রন-গুলি বস্তু থেকে নির্গত হচ্ছে, সেগুলিকে একত্রিত করে কটো-ডব্লিউয়ের পরিমাপ করা। ১.৩ মাইক্রোন পর্যন্ত তরঙ্গ-দৈর্ঘ্যের অবলোহিত রশ্মির নির্দেশন কটোগ্রাফির সাহায্যে করা যায়। অবশ্য এর ক্ষেত্রে সারানিন রঞ্জকের দ্বারা কটো-গ্রাফিক প্লেটকে বেশী সূত্রাহী করা প্রয়োজন।

অবলোহিত রশ্মির বিভিন্ন অংশে যে সব নির্দেশক বস্তু ব্যবহার করা হয়, তার একটা তালিকা নিয়ে প্রবন্ধ হলো।

০.৭২ মাইক্রোন— ১.৫ মাইক্রোন— কটো-

বৈদ্যুতিক কোব, ডাই-ইলেকট্রিক কোব, কটো-গ্রাফিক প্লেট, ইমেজ কনভার্টার টিউব, প্রতিপ্রত বস্তু এবং লেড সালকাইড কোব।

১.৫ মাইক্রোন—৬.০ মাইক্রোন—লেড সালকাইড, লেড সেলেনাইড, ইন্ডিয়াম অ্যান্টিমোনাইড, লেড টেলুরাইড, কটো-পরিবাহক, কটো-ডোপাটাইক ও কটো-বিদ্যুৎ চৌম্বক নির্দেশক এবং ডপ্‌লার জার্মেনিয়াম নির্দেশক।

৬.০—১০০০ মাইক্রোন—থার্মোকাপ, বোলোমিটার, ডপ্‌লার জার্মেনিয়াম এবং সিলিকন নির্দেশক।

ব্যবহার—অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার মূলতঃ সাময়িক প্রয়োজনেই হয়। এর গবেষণা এবং উন্নতিও সাময়িক প্রয়োজন যেটাবার তাগিদেই হয়েছে। তবে বায়ুয়ের নানাবিধ প্রয়োজনে এর বহুল ব্যবহারও প্রচলিত আছে। সাময়িক কার্যে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহারের কারণ প্রধানতঃ দুটি—(১) এটি অদৃশ্য রশ্মি; সুতরাং লক্ষ্যবস্তুর উপর অবলোহিত রশ্মিপাত করে শত্রুর অগোচরে কোনও বিশেষ ব্যবহার বস্তুটিকে দেখা যেতে পারে। এই ধরনের ব্যবস্থা করা হয় সক্রিয় বস্ত্রে; (২) সমস্ত জিনিষই অবলোহিত রশ্মির উৎস-স্থল একথা আগেই বলা হয়েছে। তাই উপযুক্ত অবলোহিত নির্দেশকের সাহায্যে সাময়িক লক্ষ্যবস্তু (যথা—যাহ্ন, চিম্বি, জেট ইঞ্জিন প্রভৃতি) থেকে নির্গত অবলোহিত রশ্মির দ্বারা তাদের সনাক্ত করা যায়। এই ধরনের বস্তুগুলিকে নিষ্ক্রিয় বলা হয়।

শত্রুর অবস্থান নির্ণয়ে আজ রেডারের সঙ্গে সঙ্গে অবলোহিত রশ্মির ব্যবহার খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছে এবং অনেক ক্ষেত্রে অবলোহিত রশ্মি রেডার অপেক্ষা বেশী কৃতিত্বের অধিকারী। রেডারের মত এই সব অবলোহিত রশ্মির বস্তুর কোনও সর্বনিম্ন দূরত্বের সীমাবদ্ধতা নেই। এদের ব্যবহারও রেডার অপেক্ষা অনেক সহজ ও সরল। এর বিস্তারিত কথ্যতা

রেডার অপেক্ষা বেশী, অথচ বরচ কম। 1 ফুট ব্যাসের অ্যান্টেনাসহ একটি তিন সেন্টিমিটার রেডারের পক্ষে 5 মাইল দূরবর্তী ছুটি এরোপ্লেনকে আলাদাভাবে ধরা তখনই সম্ভব, যদি প্লেন দুটির মধ্যে দূরত্ব অন্ততঃ 1 মাইল হয়। কিন্তু একটি অবলোহিত রশ্মি নির্দেশক একটি প্লেনের ছুটি ইঞ্জিনের মধ্যেও পার্থক্য ধরতে পারে।

এই সব কাজে যে সব যন্ত্র প্রায়ই প্রায়ই ব্যবহৃত হয়, সেগুলির দু-একটির কার্য-প্রণালী সম্বন্ধে সামান্য কিছু আলোচনা হয়তো অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

(1) প্রতিবিম্ব গঠনকারী সক্রিয় যন্ত্র—এই যন্ত্রে ট্যাংটেন কিলারস্কে বাতি কিংবা জেনন আর্ক বাতিকে অবলোহিত রশ্মির উৎস হিসাবে ব্যবহার করা হয়। বাতির দৃষ্ট আলোক উপযুক্ত ফিল্টারের সাহায্যে ছেদন করা হয়। লক্ষ্যবস্তু থেকে প্রতিফলিত হইয়া অবলোহিত রশ্মি দূরবীক্ষণ যন্ত্রে বস্তুর প্রতিবিম্ব সৃষ্টি করে। অবলোহিত রশ্মির দূরবীক্ষণ যন্ত্র যখন বস্তুকের সামনে লাগানো থাকে, তখন অঙ্ককারেও লক্ষ্যবস্তুকে শুদ্ধি করা সম্ভব হয়।

(2) প্রতিবিম্ব গঠনকারী নিষ্ক্রিয় যন্ত্র—পূর্বেই বলা হইয়াছে, এই ধরনের যন্ত্রে অবলোহিত রশ্মির কোনও উৎস ব্যবহার করা হয় না এবং

লক্ষ্যবস্তু থেকে নির্গত রশ্মিই কাজে লাগানো হয়। থার্মোগ্রাফ এবং এভাপোরোগ্রাফ হলো এই ধরনের দুটি যন্ত্র। এভাপোরোগ্রাফে যে প্রতিবিম্বের সৃষ্টি হয়, তার প্রতিটি অংশের বর্ণ লক্ষ্যবস্তুর তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল। বিভিন্ন তাপমাত্রার লক্ষ্যবস্তুর ক্ষেত্রে প্রতিবিম্বে বিভিন্ন বর্ণের প্রকাশ হয়। এই বর্ণ অবশ্য লক্ষ্যবস্তুর নিজস্ব বর্ণ নয়। তবুও এথেকে তাপমাত্রার প্রকৃত অবস্থা জানা সম্ভব। তাপমাত্রা এবং বর্ণের চার্ট থেকে সহজেই লক্ষ্যবস্তুর প্রকৃতি নির্ণয় করা যায়। যন্ত্রটি 1' সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার পার্থক্য নিরূপণ করতে পারে। রসায়নশিল্পে এবং চিকিৎসাশাস্ত্রে এই যন্ত্রটি আজকাল বহুল ব্যবহৃত হইয়া থাকে। থার্মোগ্রাফের সাহায্যে দাবিনলের কেন্দ্রস্থল এবং তার মধ্যে মালুয়ের অবস্থান নির্ণয় করা যায় খুব সহজেই।

অবলোহিত রশ্মির আর একটি প্রয়োজনীয় ব্যবহার হলো—অবলোহিত স্পেক্ট্রোস্কোপি। পদার্থের আণবিক কম্পন, ঘূর্ণন এবং গঠন জানবার কাজে এর গুরুত্ব অপরিণীত। তাছাড়া ভারী জল প্রস্তুতে, এনজাইম নির্ধারণে, ভিটামিন, ঔষধ ও খাদ্য বিশ্লেষণে, চিকিৎসাবিজ্ঞানে, কৃষি-গবেষণায়, তত্ত্ব, কয়লা, দ্রুত, রবার, প্রাণিক প্রভৃতি শিল্পে এর উল্লেখযোগ্য ব্যবহার আছে।

# হিমবাহ

সন্তোষকুমার দে

জুয়ার বুগে (বা আট হাজার বছর আগে শেষ হয়ে গেছে) পৃথিবীর প্রায় 30% অংশ ছিল বরফে ঢাকা। তার পর পৃথিবীর উত্তাপ বাড়বার কালে বরফ গলে গিয়ে এখন হুই মেরুর কাছে সমভূমিতে প্রায় সারা বছর ধরে জুয়ারপাত হয় ও বরফ জমে থাকে। পৃথিবীর এই অংশে বরফের খুণ বহন বিরাট আকার ধারণ করে, তখন তার পাণের কতক অংশ দেখলে মনে হয় বেন বরফের একটা বড় বড় ভিত্তি বেরিয়ে আছে। এই বরফ বড় বড় বরফের অংশ বহন ভূমির ঢালের জন্তে নীচের দিকে চলতে থাকে, তখন তাকে বলা হয় (গ্ল্যাসিয়ার) বা বরফের নদী। তারতের উত্তর দিকে কারাকোরাম পর্বতের গ্রেট বালটরো (36 মাইল) পৃথিবীর দীর্ঘতম হিমবাহ। এছাড়াও এতাদেরেই শৃঙ্গের কাছে আছে বংবুক, কাংতক প্রভৃতি অনেক হিমবাহ। গঙ্গা থেকে নীলনদ এবং সেখান থেকে যোন নদী পর্বত বত বড় বড় নদী আছে, সবাইই উৎপত্তির উৎস হলো এই হিমবাহ। পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ অংশের জল (2 কোটি 90 লক ঘন কিলোমিটার) এই হিমবাহের বরফের মধ্যে সঞ্চিত আছে এবং সেখান থেকেই তা আঁছত হয়।

হিমবাহের জন্ম—অল্প কথায় বলতে হলে বলা চলে, প্রায় বে পরিমাণ বরফ গলে, শীতে সেই পরিমাণ গলনের চেয়ে বেশী জুয়ারপাত হলে হিমবাহের সৃষ্টি হয়। গলনের পরে এই অতিরিক্ত জুয়ারপাত বছরের পর বছর জমতে জমতে কঠিন বরফে পরিণত হয়। পরিবর্তনটা হয় এইভাবে—হাল্কা জুয়ার প্রথমে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জুয়ার কণিকার পরিণত হয়। তার পর সমুদ্রের জলের লবণাংশ

কমতে থাকলে এই জুয়ারকণা জুয়ার-ঝটিকায় তাক্তিত হয়ে একত্রিত হয় এবং ক্রমশঃ জমাট বেঁধে একটি বিরাট খুণে পরিণত হয়। বছরের পর বছর এভাবে জুয়ারের কাজ চলতে থাকার জুয়ারের খুণ কঠিন থেকে কঠিনতর হতে থাকে।

হিমবাহের গতিবেগ সবচেয়ে কিছু বলা দরকার। বিভিন্ন ঋতুতে বিভিন্ন স্থানে হিমবাহের গতিবেগ স্বাভাবিক কারণেই বিভিন্ন রকমের হয়ে থাকে। আদম্ একলে হিমবাহ প্রতিদিন এক ফুটও এগোতে পারে না, অথচ প্রীমল্যাও তার গতিবেগ বেশ দ্রুত। হিমবাহ প্রতিদিন সেখানে প্রায় 6 ফুট গতিতে এগিয়ে চলে। আবার লক্ষ্য করা গেছে হিমবাহের পাণের দিকের চেয়ে মাঝখানের গতিবেগ বেশী। সেখানেও আবার নীচের দিকের ভুলনার উপরের দিকের গতিবেগ দ্রুততর। সম্ভ্রতি একটি অতি বেগবান হিমবাহের ধর পাওয়া গেছে। 1966 সালে একজন বিমানচালক ক্যানাডার ইল পর্বতের উপর দিয়ে উড়ে যাবার সময় 35 কিঃ মিঃ চওড়া একটি হিমবাহকে, সামনের সবকিছু তেজেচুড়ে ভাসিয়ে নিয়ে ঘণ্টার আধ মিটারের বেশী অর্ধাৎ সারা দিনে প্রায় 15 মিটার বেগে চলতে দেখতে পান।

আগেই বলা হয়েছে, মেরু অঞ্চলের কাছাকাছি বিস্তীর্ণ অংশে জুয়ারখুণ সবচেয়ে বেশী পরিমাণে জমে থাকে। পৃথিবীর শেষ জুয়ার বুগের সময় উত্তর আমেরিকা এবং ইউরোপের উত্তর-পশ্চিম অংশে বর্তমান সময়ের ভুলনার অনেক বেশী পরিমাণে জুয়ার জমে ছিল। দক্ষিণ মেরুর নিকটবর্তী অঞ্চলেও অ্যান্টার্কটিক জুয়ারখুণ

বর্তমানের ভুলনার পূর্বে অনেক বেশী বিস্তৃত ছিল। এই সময়কে কোয়ার্টারনারী বরফযুগ বলা হয়। বর্তমানে উত্তর গোলাধে ঐক্যল্যাও এবং দক্ষিণ গোলাধে অ্যাটলান্টিক অঞ্চলে বিস্তীর্ণ ভূবারভূপ দেখতে পাওয়া যায়। সারা পৃথিবীর 97% শতাংশ হিমবাহ এই দুই জায়গায় অবস্থিত।

অ্যাটলান্টিক ভূবারভূপের আয়তন 14.25 কোটি বর্গ কিঃ মিঃ; অর্থাৎ যুক্তরাষ্ট্র আমেরিকা-সম্মত সমগ্র ইউরোপের সমান। এই সমগ্র মহাদেশ 3,350 মিটার পুরু বরফের ভূপে আবৃত। শুধু বরফ আর বরফ—মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে আন্টিসের মত উঁচু উঁচু পর্বত মাথা ভুলে জেগে আছে।

দ্বিতীয় বৃহৎ বরফভূপ হলো উত্তর গোলাধের ঐক্যল্যাও। এখানকার ভূবারভূপের আয়তন 1.7 মিলিয়ন বর্গ কিঃ মিঃ। এখানকার মালভূমি থেকে বড় বড় ভূবারশৈল সমুদ্রে নেমে গিয়ে ভেসে বেড়ায়। স্মোক ও কুমেস অঞ্চলের বিরাট ভূবারভূপের কতক অংশে মাঝে মাঝে তাসতে তাসতে সমুদ্রে এখানে-ওখানে এসে পড়ে। জলের চেয়ে বরফ হালকা, তাই হিমবাহের 1/9 অংশ জলের উপর ভেসে থাকে। এই রকম তাসমান ভূবারভূপকে বলে হিমশৈল। এই রকম একটি বৃহৎ হিমশৈলে থাকে যেহে 1912 সালে 14ই এপ্রিল তখনকার দিনের বৃহত্তম প্রযোদ তরী টাইটানিক, বা কখনও ডুববে না বলে কতৃপক দত্ত করে বলেছিলেন—আটলান্টিক মহাসাগরে ডুবে যায়।

আরও অনেক হিমবাহ আছে, কিন্তু সেগুলি ঐক্যল্যাও ও অ্যাটলান্টিক হিমবাহের ভুলনার ছোট। এশিয়া, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং নিউজিল্যান্ডও সেগুলির দেখা মেলে।

একজন বিজ্ঞানী বলেছেন—যদি অ্যাটলান্টিক ভূবারভূপ সবটাই গলে যায়, তাহলে সমুদ্রের

উচ্চতা 50 থেকে 60 মিটার বেড়ে যাবে। কলে লণ্ডন, নিউইয়র্কসম্মত পৃথিবীর সমস্ত নিরক্ষি ভূবে যাবে। তবে এই ভূবারভূপের গলবার তর আপাতত নেই—যদিও ভূবারভূপের গলনের ভয়ে বাইব বানিকটা দারী। সারা পৃথিবীর কল-কারখানা থেকে যে সব আবর্জনা ও দূষিত পদার্থ নদীপথে সমুদ্রে এসে পড়ছে, তাতে সমুদ্রের উচ্চতা বানিকটা বেড়ে যাচ্ছে, আবহাওয়ারও পরিবর্তন হচ্ছে। পৃথিবীর উচ্চতা বাড়লে এবং তার ফলে হিমবাহগুলি কিছু পরিমাণে গলে গেলেও সমুদ্রের জল এমন কিছু বাড়বে না, বরং ভয়ে এখন থেকেই আতঙ্কিত হতে হবে। কেন না, দেখা যাচ্ছে যে, গত বারো হাজার বছরে (16,000-4,000 খঃ পূঃ) সমুদ্রপৃষ্ঠ বাড়ি 100 মিটার উচ্চতায় বেড়েছে। প্রতি 100 বছরে সমুদ্রের জল প্রায় এক মিলিমিটার বাড়ছে।

পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে সঞ্চিত বরফরাশিকে প্রধানতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় :—(1) মহা-দেশীয় ভূবারভূপ, (2) উপত্যকার হিমবাহ আর (3) পাদদেশের হিমবাহ (শিঙাট গ্যাসিয়ার)।

প্রথমটির কথা আগেই বলা হয়েছে। উপত্যকার হিমবাহ সম্বন্ধে সংক্ষেপে বলা যায় যে, বহু পূর্বে ভূবার যুগে উচ্চভূমিতে ভূবার সঞ্চিত হয়ে যে বরফের অঞ্চল সৃষ্টি হয়েছিল, তা থেকে বিভিন্ন উপত্যকার ভিতর দিয়ে হিমবাহ নীচের দিকে নামতে শুরু করেছে। একেই বলে উপত্যকা হিমবাহ। পরবর্তী যুগেও পৃথিবীর বিভিন্ন অংশে বড় বড় পাহাড়-পর্বতে যে বরফের ভূপ জমে থাকে, তা থেকে আগের বিভিন্ন উপত্যকার মধ্য দিয়ে হিম-বাহ প্রবাহিত হয়। এই রকম হিমবাহকে কেউ কেউ পার্বত্য হিমবাহ বলেন। পার্বত্য অঞ্চলে ভূবার-ভূপ যদি কোন কারণে কম জমে বা সেখানকার উত্থাপ বেড়ে যায়, তাহলে হিমবাহের প্রবাহের পরিমাণও কমে যায়। এই রকম অবস্থাকে হিমবাহের পতনপন্থা বলে। গত 100

বহুতর মধ্যে আভিন অকলের হিমবাহগুলির বর্ষে পচাশনসহ নক্য করা গেছে।

পর্বত-পারদেশের হিমবাহ—পার্বত্য অঞ্চল থেকে বহন কোন হিমবাহ উপত্যকার দ্বা দ্বিহে নীচে বেবে আসে এবং পর্বতের পারদেশে বিকৃত হয়, তখন তাকে বলা হয় পারদেশের হিমবাহ। আইসল্যান্ড ও অ্যাটলিকার এই রকম হিমবাহ দেখা যায়। উত্তর আমেরিকার আলাস্কাতে প্রায় দেড় হাজার বর্গমাইল জায়গায় এই রকম একটা হিমবাহ কেবতে পাওয়া গেছে।

আলাস্কা, গ্রীনল্যান্ড প্রভৃতি দু-একটা জায়গা ছাড়া এই সব বরফের দেশে বাহুরের বসবাস নেই। সাধারণ জাহাজ এই সব দেশের ভূমার-নদীতে বাতায়াত করতে পারে না। সেবানকার বান হলো বহাহরিণের টান। সেকগাড়ী। অথচ এই সব দেশ প্রাকৃতিক সম্পদে সমৃদ্ধ। আলাস্কার কথাই বরা বাক—বিশেষজ্ঞদের মতে, এখানে 2 হাজার থেকে 4 হাজার কোটি ব্যারেল তেল সঞ্চিত আছে। এত বেশী তেল পৃথিবীর আর কোথাও নেই। এই তেল আনা বাবে কি করে, সেটাই হলো সমস্যা। আলাস্কা থেকে আমেরিকার পূর্বাংশে চৌটির সহরের শোষণ-পারে এই তেল আনতে হলে কঠিন বরফ ভেঙে প্রায় দশ হাজার মাইল পথ অতিক্রম করতে হবে। এই দীর্ঘ পথে পাইপ-লাইন বসিয়ে তেল আনা যায় বটে, কিন্তু সেটা অত্যন্ত ব্যয়বহুল ব্যাপার এবং এটো দৈত্যে সেই পাইপ-লাইন কত দিন স্থায়ী হবে এবং পাইপের ভিত্তর তেল জমে গিয়ে পাইপ কঠিনে দেখে কিনা—সে সব কথাও ভাববার বিষয়।

এই সমস্যা সমাধান করার জন্যে গত বছর আমেরিকার এক তেল কোম্পানী (হাবল অরেল অ্যান্ড রিকাইবিং কোং) একটি অভিনব ব্যবস্থা প্রস্তাব করে সকল-স্ব। 1005 ফুট লম্বা ম্যানহাটন নামে একটি বড় লক ট্রেনের তেলবাহী জাহাজ 24 অগস্ট, 1969 সালে পেনসিলভেনিয়ার চৌটির নগর থেকে 95 জন সাবিক, বৈজ্ঞানিক ও

সাংবাদিক নিয়ে বাত্মা শুরু করে। বরফের ভূপ ভাঙতে হবে জেনে সবে নিয়েছিল দুটি বরফ-ভাঙবার জাহাজ (আইস ব্রেকার) এবং কয়েকটি হেলিকপ্টার—আশেপাশে চারদিকে নজর রাখবার জন্যে। গ্রীনল্যান্ডের উটকুবি পার হবার পরেই আরম্ভ হলো পথের দুর্গমতা। কয়েক দিন নরম বরফ চলে জাহাজ অগ্রসর হলো। তারপর আর এতনো গেল না, বরফ জাহাজের মাথাটা বরফ-ভাঙবার উপযোগী করে বিশেষ বরফের ইস্পাতে তৈরি ছিল। এবার বরফভাঙবার জাহাজ দুটি জমাট বরফ ভাঙতে আরম্ভ করলো। বিরাট বিরাট বরফের চাপ ভেঙে কেনে ক্রমাগত জাহাজের পথ করে দিতে থাকে। এমনভাবে যাক ক্রিওর এগালীতে এসে জাহাজ 12 ঘণ্টা আটকে পড়ে থাকলো। এবারকার বরফের ভূপ বহু বছরের পুরনো হওয়ায় তার কাঠিন্য ছিল অত্যন্ত বেশী। বতদিন বার ততই সাংস্কৃতিক বরফের লবণের ভাগ করতে থাকে, কলে বরফ অত্যন্ত কঠিন হয়ে পড়ে। কাজেই এই আতকার জাহাজটি আর অগ্রসর হতে না পেয়ে দিক পরিবর্তন করে প্রিন্স-অব-ওয়েলস্ এগালীতে করে যায়। আবার বরফ-ভাঙবার জাহাজ গেল এগিয়ে, বরফের ভূপ ভেঙে ভেঙিয়ে দিয়ে এখো উপসাগর পর্বত পথ পরিষ্কার করে দিয়ে উত্তর আলাস্কার পরেট-বারোহিত তেলভূপ পর্বত ম্যানহাটনের পথ করে দিল। তার পর সেবান থেকে তেল নিয়ে সন্তোষে করে এলো ম্যানহাটন আমেরিকায়। বাত্মা-আসার বরফ পড়লো চার কোটি ডলার। এত বরফ করে কোম্পানীর লাভ থাকলো কিনা, জানা যায় নি। তবে পাইপ দিয়ে তেল আনতে হলে ব্যায়সপ্রতি বরফ হতো এর চেয়ে 60 শতাংশের বেশী। এই অভিযান সমস্ত সফল হয়েছে, কিন্তু ব্যবসায়ের দিক দিয়ে লাভজনক করতে হলে তেল সংগ্রহের ব্যাপারে আরও ব্যয়-সংকল্প করা যায় কিনা তাই এখন জেনে দেখা হচ্ছে।

# হিমাক্ষের নীচে জীবন

দেবব্রত সাগ এবং জগৎজীবন ঘোষ

পৃথিবীর প্রায় তিন ভাগ জল এবং এক ভাগ হল। সেখানে কত যে বিভিন্ন আকৃতি ও প্রকৃতির জীবন ছড়িয়ে আছে, তা শুধে শেষ করা যায় না। একটু বিশেষভাবে লক্ষ্য করলেই দেখা যাবে, ওরা সবাই কোন না কোন রকমে একে অজ্ঞের উপর নির্ভরশীল। জীব-জগতের এক-একটি প্রাণী বিভিন্ন রকম কলাকৌশল আয়ত্ত করে নানাপ্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যেও বেঁচে আছে। বারা প্রতিকূল অবস্থা সামলে উঠতে পারে নি, তারা ক্রমশঃ তাদের অস্তিত্ব হারিয়েছে। তাবলে আশ্চর্য হতে হয় যে, এখনও পৃথিবীর কোন কোন স্থানে এমন অনেক জীব বাস করছে, বারা হিম-শীতলের নীচের তাপমাত্রার থাকতেই অত্যন্ত। এমন একটি প্রতিকূল অবস্থার বেঁচে থাকবার উদ্দেশ্য কি থাকতে পারে—তা সঠিক বলা শক্ত। তবে মানব-কলাপে এর বিশিষ্ট ভূমিকার আভাস পাওয়া যাচ্ছে।

এই প্রবন্ধে আমরা হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতা উপেক্ষা করে কিভাবে বিভিন্ন প্রাণী বেঁচে থাকে, সে বিষয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

হিমশীতল অঞ্চল—পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের উষ্ণতা হান ও কালের উপর নির্ভরশীল। উষ্ণতা কোথাও হিমশীতলের নীচে  $-70^{\circ}\text{C}$  আবার কোথাও হিমশীতলের অনেক উপরে প্রায়  $+40^{\circ}\text{C}$ । বহিঃ জাতি অঞ্চলের উঁচু জারলা-গুলি বার দিলে সেখানকার উষ্ণতা শীত-প্রীয়ে কখনই হিমাক্ষের নীচে পড়বে না। উত্তর এবং দক্ষিণ ঘের অঞ্চলের উষ্ণতা কিন্তু শীত-প্রীয়ে সব সময়ই হিমশীতল কিংবা তারও নীচে থাকে।

হিমাক্ষের নীচে বেঁচে থাকবার প্রকারভেদ—প্রাণীদের দেহে জলের আধিক্য সম্বন্ধে বেশী। হিমাক্ষের নীচে ঐ জল বরফে পরিণত হয়, কিন্তু উঁচু এমন একটি প্রতিকূল অবস্থার বেঁচে থাকবার ভাগিদে কিছু কিছু প্রাণীর দেহকোষে প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াগুলি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের এমন সব বিবর্তন হয়েছে, যা ওদের বাঁচিয়ে রাখছে। আধুনিক বিজ্ঞানের ক্ষমতার সত্ত্বে সত্ত্বে প্রাণীদের হিমাক্ষের নীচের তাপমাত্রার বেঁচে থাকবার কারণগুলি পরিষ্কার হয়ে ফুটে উঠছে।

হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতার যে সব প্রাণী বেঁচে থাকে, তারা মূলতঃ দু-রকমের। একদল হিমশীতলের প্রভাব নানাতাবে এড়িয়ে চলে। অল্প দল জীবন-চক্রের কোন এক সময়ে হিমশীতলের প্রভাব থেকে বেঁচে থাকবার জন্তে প্রচণ্ড সহন-কমতা আয়ত্ত করে।

হিমশীতল অবস্থা ভালবাসে বারা—হিমশীতল কিংবা তারও নীচের উষ্ণতার থাকতে বারা অত্যন্ত তারা অনেক রকমের হয়ে থাকে। উদাহরণস্বরূপ ল্যাক্সডোর অঞ্চলের রাইঙলির কথা বলা যায়। ঐ সব অঞ্চলে পাহাড়ের মধ্যে বহু জলাশয় দেখতে পাওয়া যায়। গ্রীষ্মকালে জলাশয়গুলির উপরি-তলের উষ্ণতা  $+5^{\circ}\text{C}$ -এর বেশী ভর্তে না, কিন্তু শীতকালে জলের উষ্ণতা প্রায়  $-1.7^{\circ}\text{C}$  নেমে যায়। যে সব বাছ জলাশয়গুলিতে দেখতে পাওয়া যায়, গ্রীষ্মকালে তাদের স্তরের বিচার  $-0.6^{\circ}\text{C}$ । হুতলাং শীতকালে যখন জলাশয়গুলির উষ্ণতা  $-1.17^{\circ}\text{C}$ -এ থাকে, তখন তাদের রক্ত-প্রাণ-রাসায়নিক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।



অবশ্য বাতাস খুবই বাতাবিক। কিন্তু দেখা গেছে, নীতকালে ওদের রক্তের হিমাক  $-0.8^{\circ}\text{C}$  এরও নীচে নেমে যায়। নীতকালে এই অকলে কড় বাহ এবং ডালপিন বাহের রক্তের হিমাক বখাফে  $-1.47^{\circ}\text{C}$  এবং  $-1.50^{\circ}\text{C}$  থাকে। কি কি বিশেষ কারণে কড় এবং ডালপিন বাহের রক্তের হিমাক নীতকালে কম থাকে, তা জানতে গিয়ে দেখা গেল যে, নীতকালে বহন এই সব বাহ হিমশীতলতার নীচে ঘুরে বেড়ায়, তখন তাদের রক্তে বিশেষ এক রকম রাসায়নিক পদার্থ নির্গত হয়। অনেক পরীক্ষা করেও বৈজ্ঞানিকেরা এই বাহগুলির রক্ত থেকে সঠিক পদার্থটি উদ্ধার করতে পারেন নি।

হিমশীতলতা এড়িয়ে চলে যারা—কিছু সংখ্যক প্রাণী দেখা যায়, যারা হিমশীতলতা কিংবা তার নীচের উষ্ণতার থাকতে পারে না। এরা প্রধানতঃ পাখী এবং ভক্তপায়ী জীব। বিভিন্ন উষ্ণতার তারতম্য সহ্য করার ক্ষমতা এদের কাকুর দেখে প্রচুর চর্চা থাকে আবার কাকুর দেখে প্রচুর লোম থাকে, আর পানীদের থাকে প্রচুর পালক। এদের মধ্যে যারা নীতকালটা জড়বৎ কাটিয়ে দেয়, তারা সাধারণতঃ প্রায়কালে অনেক কাজকর্ম সেরে রাখে। নীতকাল শুরু হবার সঙ্গে সঙ্গে তাদের দেহের উষ্ণতা স্থানীয় বায়ুগুলির উষ্ণতার সঙ্গে সমতা রক্ষা করে থাকে, যদিও এরা বেশী নীত সহ্য করতে পারে না এবং হিমশীতলতার নীচেও বাঁচতে পারে না। যদি স্থানীয় উষ্ণতা হিমশীতলতার কাছাকাছি নেমে যায়, তবে এরা বিভিন্ন জড় অবস্থা থেকে আবার জেগে ওঠে এবং অধিক পালন প্রক্রিয়া থেকে প্রয়োজনীয় তাপ উৎপন্ন করে।

হিমশীতলতার বেঁচে থাকে কেমন করে—  
ল্যাম্বাজোর অকলের কড় ও ডালপিন বাহের কথা আগেই বলেছি। এই অকলে কিছু সংখ্যক

জলাশয় আছে, যেখানে আরও একদল বাহ এক জড়ত উপায় অবলম্বন করে বেঁচে আছে। এদের বেঁচে থাকবার উপায়টি বুঝতে গেলে হিমশীতলতার নীচের উষ্ণতা সম্পর্কে বানিকটা প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। সাধারণতঃ লক্ষ্য করা যায় যে, একটি পাত্রে বানিকটা জল নিয়ে তাকে না দেখে উষ্ণতা যদি খুব ধীরে ধীরে হ্রাস করা যায়, তবে দেখা যাবে হিমশীতলতার নীচে প্রায়  $-20^{\circ}\text{C}$  উষ্ণতারও এই জল বরকে পরিণত হয় না। এটি জলের অতিশীতল অবস্থা। এই অবস্থার পাত্রটিকে একটু নেড়ে দিলে কিংবা পাত্রে একটি ছোট বরককণা কেলে দিলে সঙ্গে সঙ্গে জল জমে কঠিন বরকে পরিণত হয়। অতিশীতল অবস্থার জল জমে বরক না হবার ঘটনাকে কিছু কিছু বাহ কাছে লাগিয়ে নিজেদের বেঁচে থাকবার পথ খুলে করে নিয়েছে। সাধারণতঃ ল্যাম্বাজোর অকলের জলাশয়গুলিতে যে সব বাহ দেখতে পাওয়া যায়, তাদের রক্তের হিমাক  $-0.9^{\circ}\text{C}$  থেকে  $-1.0^{\circ}\text{C}$ । কিন্তু জলাশয়ে নীচে যে সব অকলে বাহগুলি ঘুরে বেড়ায়, সেখানকার উষ্ণতা বছরের সব সময়ই প্রায়  $-1.7^{\circ}\text{C}$ -এ থাকে। উল্লেখযোগ্য বাহগুলি হলো—*Boregadus saida*, *Lycodes turneri*, *Liparis koefoedi*, *Gymnacanthus tricuspidis* এবং *Icelus spatula*। এদের অতিশীতল অবস্থা থেকে ছুলে নিয়ে যদি একটি জলাশয়ে বরক দিয়ে রাখা যায়, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাদের মৃত্যু ঘটে। কিন্তু সাধারণ অবস্থায় বহন এরা জলাশয়ের নীচে অতিশীতল অকলে ঘুরে বেড়ায়, তখন ওরা বেশ ভালভাবেই বেঁচে থাকে। কিতাবে বাহগুলি বেঁচে থাকে, তা পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, বছরের সব সময় ওরা ওদের রক্তের উষ্ণতা অতিশীতল অবস্থায় রাখতে পারে। যদিও অতিশীতল অবস্থায় সাধারণ আলোড়নের কালে রক্ত জমে কঠিন হয়ে বাওয়াই বাতাবিক,

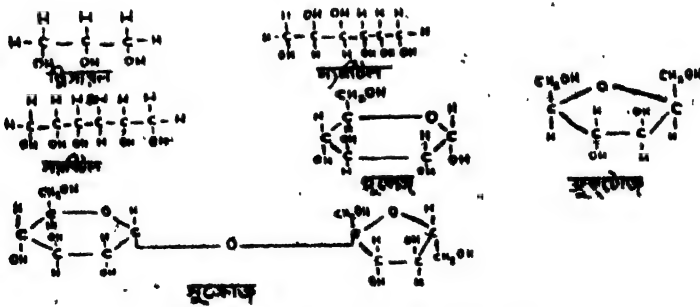


তথাপি পরীক্ষা করে বাহ্যিকের রক্তে এমন কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থ পাওয়া গেছে, যা অতিশীতল অবস্থার বাহ্যিকের রক্ত জমতে বাধা দেয়।

হিম-রোধক পদার্থ—কোন কোন রাসায়নিক পদার্থ রক্তকে অতিশীতল অবস্থার তরল রাখতে সাহায্য করে, তা জানবার জন্যে বিশেষ রকম পরীক্ষা করা হয়। পরীক্ষার উপাদান হিসাবে কিলি কিলি নামক মাছকে কাজে লাগানো হয়। অনেকগুলি মাছকে কয়েকটি সমান ভাগে ভাগ করা হয় এবং এক-একটি ভাগের মাছকে বিভিন্ন উষ্ণতার থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়। যে সব মাছ  $20^{\circ}\text{C}$  এবং  $10^{\circ}\text{C}$ -এ থাকতে অভ্যস্ত, তাদের রক্তে বিশেষ কোন রাসায়নিক পরিবর্তন দেখা যায় নি। যদিও উষ্ণতা আরও কমতে থাকলে রক্তে কতকগুলি পদার্থের আবিষ্কার লক্ষিত হয়। আবার কতকগুলি পদার্থের পরিমাণের কোন রকম পরিবর্তন দেখা যায় নি। যে সব পদার্থের পরিমাণ বাড়ে, সেগুলি হলো সোডিয়াম, ক্লোরাইড, ম্যাগনেসিয়াম, ক্যালসিয়াম

বহন বাহ্যিকের প্রায়  $-1^{\circ}\text{C}$ -এ থাকতে অভ্যস্ত করানো হয়, তখন তাদের রক্তে গ্লুকোজের পরিমাণ বাড়ে দেখা যায়। যদিও অত্যন্ত পদার্থগুলির বিভিন্ন উষ্ণতা পরিবর্তনের কালে বিশেষ কোন তারতম্য হয় না বললেই চলে। কেবল গ্লুকোজই নয়, গ্লুকোজের লবণাক্তীয় আরও কতকগুলি পদার্থ, যেমন—সর্বিটল, ফ্রুক্টোজ, স্নাক্রোজ, ম্যানিটল ইত্যাদি পদার্থগুলি অতিশীতল অবস্থার রক্তকে তরল রাখতে সাহায্য করে। পদার্থগুলিকে হিমরোধক (Cryoprotective agents) বলা হয়। কতকগুলি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি নিয়ে দেখা গেল।

যদি এই সব লবণ পদার্থের গঠন-প্রকৃতি ভাল-ভাবে লক্ষ্য করা যায়, তবে দেখা যাবে এদের সবার মধ্যেই বহু সংখ্যক হাইড্রজেন বা  $-\text{OH}$  মূলক আছে। এথেকে ধারণা হয় যে, যে সব পদার্থে  $-\text{OH}$  মূলক অধিক সংখ্যায় থাকে, সেগুলি অতিশীতল অবস্থার রক্তকে অপরিবর্তিত রাখতে সাহায্য করে। যদিও কোন বিশেষ প্রক্রিয়ার উল্লিখিত রাসায়নিক পদার্থগুলি অতিশীতল



কয়েকটি হিমরোধক পদার্থের গঠনাকৃতি।

ইত্যাদির আরও এবং প্রোটিন নয় এমন নাইট্রো-জেনযুক্ত বৈজ্ঞানিক পদার্থ—কোলোস্টেরোল, গ্লুকোজ ইত্যাদি। আর যে সব পদার্থ প্রায় একই পরিমাণে থাকে, সেগুলি হলো পটাসিয়াম, বাইকার্বনেট, কস্টিক আরও এবং প্রোটিন।

অবস্থার রক্তকে জমতে দেয় না, তার সঠিক কারণ জানা যায় নি।

তবে অল্পমান হিসাবে বলা যায় যে, উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে জলের অণুগুলি হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হয়ে কঠিন বস্তুতে পরিণত

কিন্তু উল্লিখিত প্রাথমিক পদার্থগুলিতে একাধিক  $-OH$  মূলক থাকার তত্ত্বটি অনেক অণুগুলিকে হাইড্রোজেন বন্ধনীর দ্বারা পরস্পর যুক্ত হতে বাধ্য করে।

হিম্মতের নীচে প্রাণীর সহনশক্তি—হিম্মতের কিংবা তারও নীচের উষ্ণতায় যে সব প্রাণী বাস করে, তাই প্রাণীর জীবন করে বেঁচে থাকে, এখানে তাৎপর্য কথায় বলা হয়েছে! এখানকার কথা বলাও, তারা প্রতিদিন অবস্থার বেঁচে থাকবার সন্তোষজনক আনন্দ করেছে। এরা জীবন-চক্রের কোন এক সময়  $-273^{\circ}C$ -এর কাছাকাছি উষ্ণতা পর্যন্ত সহ করতে পারে। উদাহরণ-স্বরূপ বলা যায় যে, গাছের অঙ্গুর কিংবা বীজের অভিশীতল অবস্থা সহ করতে পারবার কারণ হলো—এরা পুর সহজে এবং তাড়াতাড়ি অন্যত্র হতে পারে। কলে কোবের তিতর বরফকণা জমে কোবের কোন কতি করতে পারে না। আর একটি কারণ হলো—বতই এরা অন্যত্র হতে থাকে, ততই কোবের তিতরকার পদার্থগুলি বনীবৃত্ত হতে থাকে, কলে বহিও বা অল্প পরিমাণ জল থেকে যায়, তার হিমাক  $0^{\circ}C$ -এর অনেক নীচে নেমে যেতে বাধ্য হয়।

কোব কতিগ্রস্ত হয় কেন?—সাধারণতঃ দেখা গেছে যে, কোবের তিতরকার জল বরফে পরিণত হলেই কোবের বেশী কতি হয়, কিন্তু কোবের বাইরের জল বরফ হলে তা কোবকে সজ্জিত করে বটে, কিন্তু কোবের পুর একটি কতি হয় না। কোবের তিতর জল বরফে পরিণত হলে তা কোবের বিভিন্ন সক্রিয় রাসায়নিক পদার্থের গঠন-প্রকৃতি পাঠে দেয়; কলে কোবের প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াক্রান্তি নানাবিধে বাধ্যপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু এই বরণের মুক্তি সব সময় পাঠে না। কখনও কখনও দেখা গেছে যে, কোবের বাইরে জল বরফ হওয়ার কোব কতিগ্রস্ত হয়েছে। একেই সঠিক কারণ বুঝে পাওয়া যায় নি। বলা হয়েছে যে, উষ্ণতা

কখনও কখনও কোব কখনও অন্যত্র হতে থাকলে কোবের বাইরে অনেক পরিমাণ বাতাস থাকে। কোবের তিতরে অনেক পরিমাণ কখনও কলে প্রাথমিক সোডিয়াম ক্লোরাইডের বদল বাতাসে থাকে এবং কোন এক সময় প্রচুর সোডিয়াম ক্লোরাইড থাকবার ভয়ে কোবের প্রোটিন অণুগুলি গঠন-প্রকৃতি পাঠে যায়; কলে প্রোটিনগুলি অনেকো হয়ে পড়ে। প্রোটিন অনেকো হলে কোবের বিভিন্ন প্রাণ-রাসায়নিক বিক্রিয়াক্রান্তি বিঘ্নিত হয়। এসব কেনে রিসারল কিংবা অন্যত্র শরীর জাতীয় পদার্থগুলি কোবের তিতরকার জলবায়ু হিমাক কবিরে দেয় বলে জল জমে বরফ হতে পারে না। এমন কি, যে বনয়ে সোডিয়াম ক্লোরাইড কোবের কতিসাধন করে, তাও হতে বাধ্য দেয়।

হিম্মতের কিংবা অভিশীতল অবস্থার জীব-কোব যে বিভিন্ন ভাবে কতিগ্রস্ত হয়, তার আরও একটি কারণ জানা গেছে। পরীক্ষা করে দেখা গেছে যে, প্রোটিন অণুতে বহু সংখ্যক  $-SH$  মূলক থাকে। এগুলিকে থায়োল (Thiol) মূলক বলা হয়। উষ্ণতা হ্রাসের সঙ্গে সঙ্গে কোব বদল অন্যত্র হতে থাকে, তখন কোন এক বিশেষ উষ্ণতায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর যুক্ত হয়। একটি প্রোটিন অণুর বহু সংখ্যক  $-SH$  মূলক অপর একটি প্রোটিন অণুর  $-SH$  মূলকের পুর কাছাকাছি এলে এই  $-SH$  মূলকগুলির মধ্যে বিস্ময় কিংবা  $-SH$  মূলকগুলি অগ্রসর হয়ে  $-S-S-$  বন্ধনী তৈরি হয়। এভাবে দুটি প্রোটিন অণু যুক্ত একটি নতুন প্রোটিন অণু তৈরি হতে পারে। এখান উষ্ণতা কিংবা কোবের আর্দ্রতা বাড়িয়ে দিলে নতুন প্রোটিন অণুগুলি গঠনে বিঘ্নিত ঘটে। এখনি করে এখন উষ্ণতা হ্রাস এবং পরে উষ্ণতা বৃদ্ধির কলে প্রোটিন অণুগুলি প্রাণ-রাসায়নিক ভাবাবলী হারিয়ে কলে। রিসারল কিংবা এই বরণের অণুগুলি যে সব

জীব-কোষ পাওয়া গেছে, সেগুলি প্রোটিন অণু —SH মূলকের সঙ্গে হাইড্রোজেন বন্ধনী তৈরি করে। কলে অতিশীতল অবস্থায় প্রোটিন অণুগুলি পরস্পর সংলগ্ন হতে পারে না এবং প্রোটিনের প্রাণ-রাসায়নিক গুণাবলীও বজায় থাকে।

হিব-জীববিজ্ঞান তথ্য—হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থায় প্রাণীদের বেঁচে থাকবার মূলে যে সব কারণগুলির কথা বলা হয়েছে, যানব সমাজে তা কি কি কাজে লাগতে পারে, সে সম্পর্কে অমেরুই চিন্তা করতে শুরু করেছেন। হিমশীতল অক্সার জীবকোষের কয় প্রয়োজনীয় ধর্মগুলি অনেক দিন বাঁচিয়ে রাখা যায়। যাহ্নের জীবনকাল সুদীর্ঘ করতে কিংবা যাহ্নের জরা রোধ করতে এই ধরণের পরীকার বখেট মূল্য আছে বলে মনে হয়। হিমশীতল কিংবা অতি-শীতল অবস্থায় প্রয়োজনীয়তা শল্যচিকিৎসায় ইতিমধ্যেই বখেট প্রসার লাভ করেছে।

যদিও হিমশীতল কিংবা অতিশীতল অবস্থা সহ করে কিছু সংখ্যক প্রাণী বেঁচে থাকে, তথাপি যাহ্নের পক্ষে সাধারণভাবে এত কম উষ্ণতা সহ করা সম্ভব নয়। হিমশীতল অকলে যে সব যাহ্ন বাস করে কিংবা যে সব অত্যন্ত গ্রহণী দিনের পর দিন প্রবল শীত সহ করে ঠাড়িয়ে থাকে, প্রায়ই তাদের ছাঁতের আঙ্গুল বলে পড়তে দেখা যায়। এর কারণ হলো আঙ্গুলের surface area বেশী থাকবার দরুন খুব সহজেই ঐ অঙ্গগুলি শৈত্যের প্রভাবে ঠাণ্ডা হয়ে যায়। কলে সাধারণভাবে রক্ত চলাচল হতে পারে না—এমন

কি, পাচন প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন উপযুক্ত তাপের সরবরাহ হতে পারে না। কলে ঐ অঙ্গগুলির কোষের সক্রিয়তা কমশা লোপ পেতে থাকে এবং কোন এক সময় আঙ্গুলগুলি বলে পড়ে।

তবে প্রাণীদের শীত সহ করার কষতা বাড়ানো যায় কিনা, সে সম্পর্কে একদল বৈজ্ঞানিক ইতিমধ্যে ইহ্লের উপর পরীকা করে দেখিয়েছেন যে, ইহ্লের শীত সহ করার কষতা অনেকটা বাড়িয়ে দেওয়া যায়। ঐ ইহ্লগুলিকে যদি বাণ্যাবহার ঠাণ্ডা জারগায় থাকতে অভ্যস্ত করা যায়, তবে তাদের বাচ্চাগুলি শীত সহ করার কষতা লাভ করে। শীতপ্রধান জারগায় যে সব যাহ্ন বাস করে, তাদের দেহে অধিক তাপ প্রদানতঃ পাচন প্রক্রিয়া থেকেই উৎপন্ন হয়। কিন্তু যাহ্নের ক্ষেত্রে জীলোকদের শীতপ্রধান স্থানে বেশ কিছুদিন রাখলে তাদের সন্তানেরা কতটা শীত সহ করার কষতা অর্জন করবে, তা ভাল ভাবে জানা নেই। ঐ সম্পর্কে ভালভাবে পরীকা হলে তা হিমশীতল অবস্থা সহ করার কষতা অর্জন করতে যাহ্নকে সাহায্য করবে। কেবল তাই নয়, হিমরোধক পদার্থগুলি কিভাবে শীতপ্রধান স্থানে যাহ্নের দৈনন্দিন জীবনে প্রয়োগ করা যায়, সে সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক গবেষণা এখন থেকেই শুরু হওয়া উচিত।

বিভিন্ন পরীকার বল থেকে এখনও কিছু কিছু ইঙ্গিত পাওয়া আছে, যা অল্প এবে প্রতিফল অতিশীতল অবস্থায় বেঁচে আছে, এমন একটি জীবসমাজের অস্তিত্ব খুঁজে বের করতে সাহায্য করবে।

## বিজ্ঞান-সংবাদ

লিউকেমিয়া রোগের ওষুধ আবিষ্কার

বোম্বাই থেকে পি. টি. আই. কর্তৃক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়, ক্যালার রিসার্চ ইনস্টিটিউটের একজন গবেষক ডাঃ এম. এস. সহস্রবৃষের পরিচালনার লিউকেমিয়া চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটা বড় রকমের সাফল্য লাভ করেছেন। লিউকেমিয়া রোগ হলো রক্তের খেত কণিকার ক্যালার।

ডাঃ সহস্রবৃষ গত ২৪শে অক্টোবর সাংবাদিক-দের জানান যে, তাঁরা অ্যান্টি-লিউকেমিয়া সিরাম উৎপাদনের একটি সহজ পদ্ধতি আবিষ্কার করেছেন। এর প্রয়োগে শরীরের বাতাবিক কণিকাগুলিতে বা অত্যন্ত ব্যাপারে কোন বিঘ্ন প্রতিক্রিয়া দেখা দেবে না। তিনি বলেছেন, লুসেমেহের 'ও' গ্রুপের রক্তের খেত কণিকার সঙ্গে উপযুক্তভাবে একটি রাসায়নিক হুরো-ডি-নাইট্রো-বেঞ্জিন মিশিয়ে সেটি তাঁরা অ্যান্টিজেন হিসাবে ইছর, ঘোড়া ও লিউকেমিয়া রোগগ্রস্ত মানুষের দেহেও ব্যবহার করেছেন।

### মুসপীনের কুকল

বেশী সিগারেট খসে খাস-এখাসের ব্যয়ে যে ক্যালার হয়, তার প্রত্যেক প্রমাণ দিয়েছেন পঃ জার্মেনীর হানবুর্গ গবেষণা কেন্দ্রের ডিরেক্টর ডাক্তার ওগার্টার ডোটেমহিল। দেড়-শ' ইঁদুরকে একটানা আশিটি সিগারেটের ধোঁয়া ভুকিয়ে ভুকিয়ে তিনি দেখিয়েছেন যে, তাদের বেশীর ভাগের কুকলে ক্যালারের আক্রমণ ঘটে। পঃ জার্মেনীর সিগারেট শিল্পের তরফ থেকে এই গবেষণা চালানো হয়েছিল। সিগারেট কোম্পানীগুলি এখন বৃহৎ সিগারেট তৈরির কথা চিন্তা করছে। ডাক্তার ডোটেমহিলের গবেষণার দেখা গেছে

যে, তাবাককে ইথাইল অ্যালকোহল দিয়ে পোরন করলে ক্যালার হবার সম্ভাবনা অনেক কমে যায়। একত্রে তবিলতে নাকি তাবাকের রাংতা (করেন) দিয়ে সিগারেট তৈরি হবে।

### পারমাণবিক বড়ি

লক্ষ বহুরে এক সেকেণ্ডের ছেরকের হলেন্ড হতে পারে—এরকম একটি পারমাণবিক বড়ি তৈরি হয়েছে পশ্চিম জার্মেনীতে। বিজ্ঞানীরা বলেছেন, জ্যোতির্বিজ্ঞান অহাবারী সেকেণ্ডের ব্যাখ্যা নির্ভুল নয়, ৯, ১৭২, ৬৭১, ৭৭০ সিজিয়ার অ্যাটমের স্পন্দনে যে সময় লাগে, তাকেই প্রকৃত এক সেকেণ্ড বলা চলে। এই বড়িতে সেই ব্যবস্থা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও চুম্বক থেকে যাতে কোন বিঘ্ন না ঘটে, দে জতে এই বড়িতে বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।

### ভূকম্পের রহস্য

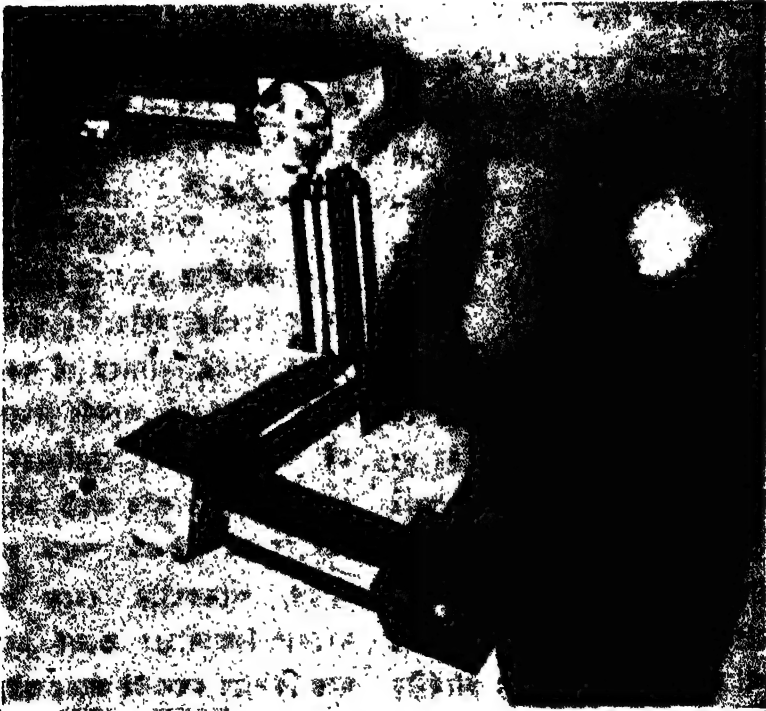
সৌরমণ্ডলীতে ভূকম্পটি হলো পৃথিবীর নিকট-তম প্রতিবেশী। মহাকাশ-যুগে মহাকাশ সম্পর্কে তথ্যাহুসন্ধানের ব্যাপারে যে সকল গ্রহ বাহুরে দৃষ্টিকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে, তাদের মধ্যে এই গ্রহটি অগ্রতম। সোভিয়েট ইউনিয়ন এই গ্রহাতিবুধে নতুন আর একটি তথ্যসন্ধানী রকেট প্রেরণের পর এই গ্রহ সম্পর্কে জানবার আগ্রহ আরও অনেকখানি বেড়ে গেছে। নাকিন মহাকাশ-বিজ্ঞানীরাও ভূকম্পের রহস্য উদ্ঘাটনের জন্তে কিভাবে কখন এই গ্রহের নষ্ট হয়েছে, কি কি উপাধানে এই গ্রহ গঠিত—ইত্যাদি বিষয় জানবার জন্তে বুধই উৎসুক। পৃথিবীসহ সৌরমণ্ডলীর প্রায় সকল গ্রহই বড়ির কাটা যে দিকে ঘোরে, তার বিপরীতদুই হয়ে দূর্বক প্রদক্ষিণ করছে।

নিজের অকস্মেৎ উপরেও এই সকল গ্রহ এই ভাবেই আবর্তিত হচ্ছে। শুক্রগ্রহও এই সকল গ্রহের মতই সূর্যকে প্রদক্ষিণ করছে। কিন্তু এই গ্রহটি নিজের অকস্মেৎ উপর অভ্যন্তর গ্রহের মত আবর্তিত হয় না—যড়ির কাঁটা যে দিকে ঘোরে, এটি সেই দিকেই ঘুরছে; অর্থাৎ শুক্রগ্রহে যদি কেউ থেকে থাকে, তবে সে দেখবে শুক্রের আকাশে সূর্য পশ্চিম দিকে উদিত হচ্ছে আর অস্ত যাচ্ছে পূর্ব দিকে। বিজ্ঞানীরা আজও এই রহস্যের সন্ধান করতে পারেন নি।

### ‘বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা’

সম্প্রতি বহরমপুর থেকে ‘বিজ্ঞান জিজ্ঞাসা’

নামক একটি মাসিক পত্রিকা (55, একজিন্সন বাগান রোড, গোরাবজার, ডাকঘর বহরমপুর, বেঙ্গালুরুনিদ্রাবাদ, মূল্য প্রতি সংখ্যা 25 পয়সা) প্রকাশিত হচ্ছে। ডিসেম্বর মাসে (1970) পত্রিকাটির এক বছর পূর্ণ হবে। বর্তমানে প্রকাশিত এই জাতীয় বিজ্ঞান মাসিকের শুরু বখেট। পত্রিকাটিতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিষয়ে সহজবোধ্য প্রবন্ধাদি এবং বিজ্ঞান সংক্রান্ত আরও নানা তথ্যাদি প্রকাশিত হয়। তবে প্রবন্ধ, সংবাদ ইত্যাদির সঙ্গে প্রাসঙ্গিক ছবি দু-একখানা দিতে পারলে পত্রিকাটি সাধারণের কাছে আরও আকর্ষণীয় হতো। আমরা পত্রিকাটির উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি কামনা করি।



শল্যচিকিৎসকদের ব্যবহারযোগ্য সেন্সার স্থাপন এক রকম আলোর ছবি। এই ছবিটিকে যে কোন দিকে সড়াবো যায়। সেন্সার স্থাপন বাহর উপরে স্থাপিত প্রিজমের দ্বারা দিয়ে ইচ্ছানুসারে যে কোন ভাবে পরিবর্তন করা যায়।

## শোক-সংবাদ

প্রোফেসর সি. ভি. রায়ন

প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ও নোবেল পুরস্কারবিজয়ী প্রোফেসর চন্দ্রশেখর ভেঙ্কট রায়ন গত 21শে নভেম্বর ব্যাঙ্গালোরে 82 বছর বয়সে পরলোক গমন করেছেন।

প্রোফেসর রায়ন 1888 সালের 7ই নভেম্বর দক্ষিণ ভারতের ত্রিচিনোপল্লীতে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি মাদ্রাজের প্রেসিডেন্সী কলেজ থেকে বি. এ. ও এম. এ. ডিগ্রী লাভ করেন। বি. এ. ডিগ্রী অর্জন করবার পূর্বেই তিনি বিজ্ঞানের মৌলিক গবেষণার কৃতিত্বের পরিচয় দেন। 1906 সালে আলোক-বিজ্ঞানে তাঁর মৌলিক গবেষণার বিষয় লণ্ডনের ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয়। সে সময়ে বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে ভারতীয় যুব সম্প্রদায়ের উচ্চাকাঙ্ক্ষা পূরণের কোন সুবিধা ছিল না। কাজেই তিনি ভারত গভর্নমেন্ট কর্তৃক অর্জিত এক প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় যোগদান করেন এবং পরীক্ষার সর্বোচ্চ স্থান অধিকার করে মাত্র 19 বছর বয়সে গেজেটেড অফিসাররূপে ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্টের কাজে নিযুক্ত হন। 1907 সালের জুন থেকে 1917 সালের জুলাই পর্যন্ত তিনি কলকাতা, নাগপুর এবং রেজুনে দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। এই কাজে নিযুক্ত থাকা সত্ত্বেও তিনি বৈজ্ঞানিক গবেষণার বিরত থাকেন নি। এই সময়ের মধ্যেই নেচার, ফিলোসফিক্যাল ম্যাগাজিন, ফিজিক্যাল রিভিউ পত্রিকায় তাঁর মৌলিক গবেষণা সংক্রান্ত প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়।

গবেষণার কৃতিত্বের জন্তে তাঁর প্রতি বিশ্বজন সমাজের দৃষ্টি আকর্ষিত হয় এবং 1915 সালে সার আন্তোনির সুধোপাধ্যায় তাঁকে পদার্থ-

বিজ্ঞানের পানিত চেয়ার গ্রহণের আয়তন জানান। বিজ্ঞানের সেবার পূর্যপূরি আন্তঃমিশ্রণ করতে পারবেন বলে ভবিষ্যৎ আর্থিক কতি স্বীকার করেও তিনি সার আন্তোনির এই আয়তন গ্রহণ করেন এবং সরকারী চাকুরী পরিত্যাগ করে 1917 সালে বিজ্ঞান কলেজে যোগদান করেন। যোগ বছর তিনি এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। 1921 সালে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের বিশ্ববিদ্যালয় সম্মেলনে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতি-নিবন্ধপে ইংল্যান্ডে যান। তিনি কলকাতার ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন কর দি কালটিভেশন অব সায়েন্সের অষ্টমতনিক সেক্রেটারী পদেও নিযুক্ত ছিলেন। ডাঃ মহেন্দ্রলাল সরকার কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত বোম্বাইয়ের এই ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশনের লেবরেটরীতে তাঁর অধিকাংশ গবেষণার কাজ পরিচালিত হয়েছিল।

1924 সালে প্রোফেসর রায়ন লণ্ডনের রয়েল সোসাইটির ফেলো (এফ. আর. এস.) নির্বাচিত হন। ঐ বছরেই তিনি যুক্তরাজ্যে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন কর দি অ্যাডভান্সমেন্ট অব সায়েন্সের অধিবেশনে যোগদানের জন্তে আমন্ত্রিত হন। তিনি টরোন্টোতে ব্রিটিশ অ্যাসোসিয়েশন এবং ইন্টারন্যাশনাল কংগ্রেস অব ম্যাথমেটিক্সের অধিবেশনে আলোর বিচ্ছুরণ বা স্ফাটারিং সম্বন্ধে আলোচনার পূর্যপাত করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ফিলোডেলফিয়ার ক্রাকলিন ইনস্টিটিউটের শতবার্ষিকী উৎসবে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেন। যুক্তরাষ্ট্রে থাকবার সময় প্রোফেসর রায়ন প্রোফেসর আর. কে. মিলিকানের আয়তনে ক্যানিকোপারি ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজীতে ভিজিটিং প্রোফেসর হিসাবে চার মাস আতবাহিত করেন। 1925 সালে তিনি

ভারতে প্রত্যাভর্তন করেন এবং ঐ বছরেই যকো ও নেনিনগ্রাড অ্যাকাডেমী অব সায়েন্সের আমন্ত্রণে ঐ প্রতিষ্ঠানের দ্বি-বছরব্যাপী উৎসবে যোগদানের ক্ষেত্রে তিনি পুনরায় ইউরোপ বাত্মা করেন।

1929 সালে ব্রিটিশ গভর্ণমেন্ট প্রোফেসর রায়নকে নাইট উপাধিধানে সম্মানিত করেন। 1928 সালে ইটালিয়ান সোসাইটি অব সায়েন্সেস ম্যাটেউচি মেডাল এবং 1930 সালে রয়েল সোসাইটি হিউজেস মেডাল দিয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করেন। 1930 সালে তিনি রায়ন একেই নামক যুগান্তকারী আবিষ্কারের ক্ষেত্রে পদার্থবিজ্ঞান নোবেল পুরস্কার লাভ করেন। তিনি নোবেল পুরস্কারের অর্থের সহায়তায় তাঁর লেবরেটরীর কাজের ক্ষেত্রে (ফটোলোগ্রাফী) হীরক ক্রেতে ব্যয় করেন। তাঁর যত্নের আগে পর্যন্তও তিনি হীরক সংগ্রহ করে গেছেন এবং মোট 700-এর বেশী হীরকখণ্ড সংগ্রহ করেন। 1941 সালে তিনি যুক্তরাষ্ট্রের ক্রাফলিন পদক লাভ করেন। ফটোলোগ্রাফী সম্বন্ধে গবেষণায় তিনি খুব আগ্রহী ছিলেন এবং 1948 সালে হার্ভার্ডে অঙ্কিত প্রথম আন্তর্জাতিক ফটোলোগ্রাফী কংগ্রেসে যোগদান করেন।

‘মলিকিউলার স্পেকট্রাম’ সম্বন্ধে আলোচনার উদ্বোধনের ক্ষেত্রে 1929 সালে তিনি ক্যারাডে সোসাইটি কর্তৃক আমন্ত্রিত হন এবং ঐ উপলক্ষে ইউরোপের বহু গবেষণা কেন্দ্র পরিদর্শন ও বক্তৃতা প্রদান করেন। নোবেল পুরস্কার গ্রহণ উপলক্ষে 1930 সালে, প্যারিসে ডট্টরেট ডিগ্রি গ্রহণ উপলক্ষে 1932 সালে, প্যারিস এবং বলোয়ার আন্তর্জাতিক কিজিক্স কংগ্রেস উপলক্ষে 1937 সালে তিনি ইউরোপ পরিভ্রমণ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান জার্নাল অব কিজিক্স-এর সম্পাদনাও করেছেন।

1933 সালে তিনি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছেড়ে ক্যাম্ব্রিজের ইণ্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অব

সায়ন্সের ডিরেক্টর হিসাবে যোগদান করেন এবং চার বছর পরে পদত্যাগ করেন। তিনি ইণ্ডিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্স প্রতিষ্ঠানের অন্ততন প্রতিষ্ঠাতা। 1943 সালে তিনি রায়ন হিসার্চ ইনস্টিটিউট স্থাপন করেন। পরবর্তী কালে এখানেই তাঁর বৈজ্ঞানিক গবেষণা পরিচালিত হয়।

দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান থেকে তিনি অনেক সম্মান ও উপাধি লাভ করেছেন। প্যারিস ইউনিভার্সিটি অনারেরী ডি. এস-সি, গ্রাসগো ইউনিভার্সিটি এল. এল. ডি., ক্রেইবার্গ ইউনিভার্সিটি অনারেরী পি-এইচ. ডি ডিগ্রি দিয়ে তাঁকে সম্মানিত করেছেন। কলকাতা, বম্বে, মাদ্রাজ, বারানসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ও তাঁকে অনারেরী ডি. এস-সি ডিগ্রি দিয়ে সম্মানিত করেন। গ্রাসগোর রয়েল কিজিক্যাল সোসাইটি, জুরিক কিজিক্যাল সোসাইটি, মিউনিকের ডয়েট অ্যাকাডেমি, হাঙ্গারিয়ান সায়েন্স অ্যাকাডেমি, ইণ্ডিয়ান কেমিক্যাল ও ম্যাথমেটিক্যাল সোসাইটি এবং অন্যান্য বহু প্রতিষ্ঠানের তিনি কেলা নির্বাচিত হন। 1929 সালে তিনি ভারতীয় বিজ্ঞান কংগ্রেসের মূল সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি আমেরিকার অস্ট্রিক্যাল সোসাইটির অনারেরি কেলা এবং কলকাতা অ্যাকাডেমির করেন অ্যাসোসিয়েট এবং রাশিয়ান অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সের কoresponding মেম্বর নির্বাচিত হন। 1949 সালে প্রোফেসর রায়ন ভারতের জাতীয় অধ্যাপক নির্বাচিত হন। 1954 তাঁকে ‘ভারতরত্ন’ উপাধি দিয়ে সম্মানিত করা হয়। 1961 সালে তিনি পলি-কিমিক্যাল অ্যাকাডেমি অব সায়েন্সে নির্বাচনের ক্ষেত্রে ত্যাটিকান কর্তৃক বনোদিত হন। 1957 সালে তিনি আন্তর্জাতিক নেনিন পুরস্কার লাভ করেন।

প্রোফেসর রায়ন অন্তরের কাষনার বৈজ্ঞানিক গবেষণায় উদ্বুদ্ধ হয়েছিলেন এবং জীবনমায়াকেও সেই গবেষণা চালিয়ে গেছেন—এটাই হলো



হোমো তাঁর জীবনের প্রধান বৈশিষ্ট্য। বিবেকের গবেষণাগারসমূহে শিকানাত না করেও নিজের চেষ্টায় তিনি বিজ্ঞানীমহলে শীর্ষস্থানে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

নীলম পঞ্চাধিকার গবেষণার ব্যাপ্ত থাকলেও প্রোফে: রায়নের সৌন্দর্যস্পৃহা এবং রসবোধও কম ছিল না। সজীত বসু, আলোক-তরঙ্গের বিভিন্ন অতিব্যক্তি, সমুদ্রের রং, পাখীর পালকের বর্ণ-বৈচিত্র্য, শাদুক-কিছকের খোঁলার রামধনুর রং, ফটকের কম্পন, বিশেষ করে ক্রোরোসেল, কল-কোরোসেল প্রভৃতি বিষয় সংক্রান্ত হীরকের গঠন, আণবিক সংস্থান ও সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিবিধ গবেষণার মধ্যেও তাঁর হৃদয় সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এক্স-রশ্মির ডিফ্রাকশন এবং ফুলের রং সম্বন্ধেও তিনি উল্লেখযোগ্য গবেষণা করেছেন। প্রোফে: রায়ন এবং তাঁর অগ্রগামীরা বিভিন্ন বিষয়ে গবেষণা করলেও মূলত: সেগুলি আলোক-বিজ্ঞানেরই বিভিন্ন দিক মাত্র। কৃত্রিয়াল-কিজিঙ্গ, বিশেষত: ডার্মাটো-কিজিঙ্গের উপরই তাঁর অগ্রগতি ছিল বেশী। বিজ্ঞানীমহলে ডার্মাটো-কিজিঙ্গ সম্বন্ধে প্রোফে: রায়ন ছিলেন একজন অবিসম্বাদী বিশেষজ্ঞ।

### ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

রাজ্যীয় বিজ্ঞান পরিষদের অন্ততম সহ-সভাপতি, অবিতক্ত বাংলার কৃষি বিভাগের শারীরবৃত্তির রসায়নবিদ এবং ভারত সরকারের সহ-কৃষি কমিশনার ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায় গত ২৭শে অক্টোবর ১৯৭০, ভোরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে শেখনিংখাস ত্যাগ করেন। বৃদ্ধকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৪৫ বৎসর। সম্প্রতি তাঁর আঘাতা কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের নিউরোলজি ও সাইকিয়াট্রি বিভাগের প্রধান ডাঃ জে. বি. মুখার্জীর অকাল মৃত্যুতে তিনি এতও মানসিক আঘাত পান।

তিনি বারানসীর সেন্ট্রাল হিন্দু কলেজ ও

নাগপুরের কৃষি কলেজে শিকানাত করবার পর শিকানবীণ হিসাবে নাগপুর এবং পরে পুনায় ইন্সটিটিউট অফিকালচার্যাল রিসার্চ ইনস্টিটিউট থেকে Dr. J. W. Heathe-এর তত্ত্বাবধানে কৃষি-রসায়ন এবং জীবাণু তত্ত্ব সম্বন্ধে দাতকোত্তর শিকা গ্রহণ করেন। Sabour Agricultural College-এ কৃষিবিষয়ক শিকক হিসাবে তিনি কর্ম-জীবন শুরু করেন (১৯১২—১৯১৫)। অবশ্য



ইন্দুভূষণ চট্টোপাধ্যায়

বাংলার ঢাকার অবস্থিত প্রাদেশিক Agricultural Chemist-এর বিভাগে তিনি যোগদান করেন। তাঁকে ১৯৩২ সালের জাহ্নগারী মাসে অবিতক্ত বাংলার Physiological Chemist হিসাবে নিযুক্ত করা হয়। তিনি Agricultural Chemist হিসাবেও কিছুকাল কাজ করেন। ইতিমধ্যে তিনি Indian Institute of Dairing and Animal Husbandry-তে (ব্যাঙ্গালোরে) প্রখ্যাত গবেষক Dr. F. J. Warth-এর তত্ত্বাবধানে প্রাণীর গৃহী বিষয়ক গবেষণা করেন। ১৯৪৩ সালে



এই কাজ থেকে অবসর নেন। অবসর গ্রহণের পর তিনি ভারত সরকারের সহকারী কৃষি অধ্যক্ষ-রূপে এবং 18-মাস এগ্রিকালচার্যাল কমিশনারের অস্থগস্থিতিতে কমিশনারের গুরু দায়িত্ব দক্ষতার সঙ্গে পালন করেন। তিনিই প্রথম বাঙালী, যিনি সর্বপ্রথম এই পদের অধিকারী হন। এর পর তাঁর বাধ্যক্য সবেও ডক্টর পি. সি. মহলানবীশ তাঁর ট্যাঙ্কিটিক্যাল ইনস্টিটিউটে গবেষণামূলক কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেন এবং তিনিও 75-80 বছর বয়স পর্যন্ত একান্ত নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণার কাজে আত্মনিয়োগ করেন।

Physiological Chemist থাকবার সময় তিনি তাঁর সমস্ত উৎসাহ ও উদ্বীর্ণনা প্রাণীদের পুষ্টি বিষয়ক গবেষণার নিয়োগ করেন এবং প্রাণীদের খাদ্য ও পুষ্টি সম্বন্ধে প্রচুর গবেষণা করে এই বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করে গেছেন। বিশেষ করে তাঁর উদ্ভাবিত পরিণাক পরিমাণ নিরূপণের পদ্ধতি (Special method of estimating digestibility) ভারতের বাইরেও স্বীকৃতি লাভ করে। এছাড়া তিনি চূনের প্রয়োজনীয়তা এবং জীবদেহে কস্কেটের রাসায়নিক রূপান্তর বা বিপাক সম্বন্ধীয় পদ্ধতির উদ্ভাবন করেন। পুষ্টি ও কৃষি এবং অস্থরূপ অস্তান্ত বিষয়ে তিনি প্রচুর গবেষণা করে এই সব বিষয়ে পুস্তিকা রচনা করেন। এই সঙ্গে দৈনিক পত্রিকা, ভারতবর্ষ, বসুমতী, বসুমতী ইত্যাদিতে খাদ্য ও পুষ্টি প্রভৃতি বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধাদি প্রকাশ করেছেন। তাছাড়া তাঁর "Is our country

really deficeit in food" নামক পুস্তিকা বিশেষ সমাদর লাভ করেছে। তিনি কর্মজীবনে কৃষি ও পুষ্টি সম্বন্ধে যথাক্রমে পনেরো ও একশটি, ইতি-রান প্যাটেন্টিক্যাল ইনস্টিটিউটে উনিশটি, একটি হিন্দীসহ আকলিক ভাষায় উনত্রিশটি এবং প্রখ্যাত কৃষি বৈজ্ঞানিকদের জীবনী বিষয়ে চারটি—ষোট অষ্টআশীটি বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনা করেন।

তিনি নিজের গবেষণা ও অস্থরূপ কাজে ব্যস্ত থাকার সত্ত্বেও অস্তান্ত প্রতিষ্ঠান, যেমন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, Dept. of Agr. West Bengal, Indian Science Congress ইত্যাদির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রেখেছিলেন। তিনি ভারত সরকারের Imperial Council of Agricultural Research এর সদস্য এবং পরে Indian Council of Agricultural Research-এর সদস্য ছাড়াও Nutrition paper-এর Specialist Refree ছিলেন। তিনি West Bengal Board of Agriculture, Animal Husbandry and Veterinary, State Agricultural Research Committee, Faculty of Agriculture, Indian Dairy Science Association, Indian Science Congress, Socio-Economic Research Institute, Calcutta Science Club, Bharatiya Sanskrit Parishad এবং অস্থরূপ অস্তান্ত প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন।

# কিশোর বিজ্ঞানীর দপ্তর

## রেডিও-ফটো

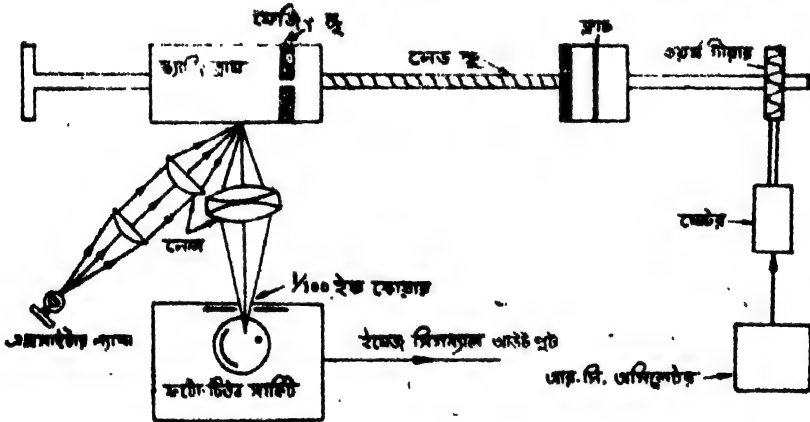
খবরের কাগজ বা কোন সাময়িক পত্রিকা খুলে যখন চোখ বুলিয়ে দেখ, তখন চোখে পড়বে হঠাৎ একটা ছবি, যার তলায় ছোট করে লেখা আছে—রেডিও ফটো। এই সম্পর্কে তোমাদের জানবার কৌতুহল হওয়া খুবই স্বাভাবিক। কেন না, যে ক্যামেরা সাধারণতঃ তোমরা দেখে থাক তাতে ছবি তোলা খুবই সহজ—তবে সঙ্গে সঙ্গে সেটাকে হাজার হাজার মাইল দূরে পাঠানো খুবই শক্ত ব্যাপার। এই সব ক্ষেত্রে যে আলোকচিত্র গ্রহণের পদ্ধতি প্রচলিত আছে, তাকে বলে বেতারচিত্র বা Radio-photographic পদ্ধতি। এখানে মনে রাখতে হবে, এই পদ্ধতির সঙ্গে টেলিভিশনের তফাৎ আছে। বেতারচিত্র প্রেরণ পদ্ধতিতে প্রেরিত চিত্রটির সঙ্কেত কোন দূরবর্তী স্থানে পাঠাবার পর তার একটি নিখুঁত স্থির চিত্র পাওয়া যাবে। কিন্তু টেলিভিশনের ক্ষেত্রে হবে ঠিক তার বিপরীত; অর্থাৎ চলমান চিত্রটি বেতारे প্রেরণ করার পর দর্শক তার সামনে ঠিক সেই দৃশ্যটির চলমান অবস্থার তাৎক্ষণিক প্রতিচ্ছবি দেখতে পাবে। সাহোঁক, রেডিও ফটোগ্রাফিতে তোলা ছবি বেতার-তরঙ্গ মাৱকং এসে ধরা দেয় একটা বিশেষ ধরনের গ্রাহক-যন্ত্রে এবং তৎক্ষণাৎ বিশেষ প্রকার কাগজে তার ছাপার কাজ সন্নাসরি সংঘটিত হয়। এই ধরনের প্রত্যেক ক্যামেরার সঙ্গে একটি করে ফটো-ইলেকট্রিক সার্কিট থাকে, যা এর তোলা ছবি দূরবর্তী স্থানে পাঠাতে সক্ষম হয়। যতটা সহজে বলা হলো এর গঠন-কৌশল কিন্তু ততটা সরল নয়। সেটা বুঝতে গেলে প্রথমতঃ ফটো-সেল সঙ্কেত ভালভাবে জানতে হবে। এই ফটো-সেল বা আলোক-কোষের ব্যবহার আজকের যুগে অত্যন্ত ব্যাপক। রেডিও-ফটো ছাড়াও, বিভিন্ন প্রকার টেলিভিসন এবং দূরপাল্লার ক্ষেত্রে বাবতীর দৃশ্যমান বস্তু সন্নাসরি সঙ্কেত প্রেরণে এর জুড়ি নেই। ফটো-সেল এমন একটি যান্ত্রিক ব্যবস্থা, যার মধ্যে এক প্রকার বিদ্যুৎ উৎপন্ন হয় আলোর বিকিরণ ক্রিয়ার ফলে। এই বিদ্যুৎকে বলা হয় আলোক-বিদ্যুৎ বা ফটো-ইলেকট্রিসিটি।

সাধারণতঃ তিন রকমের ফটো-সেল আমরা দেখতে পাই—(১) ফটো-এমিসন জাতীয়, যার মধ্যে যে কোন একটি ইলেকট্রোডের উপর বিকিরিত আলো এসে পড়লে ইলেকট্রন

কণিকা নির্গত হয়; (2) কটো-কণ্ঠাঙ্কিত জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো এসে পড়লে সেলের Ohmic বাধার সৃষ্টি করে। (3) কটো ডন্টাইক জাতীয়, যার মধ্যে বিকিরিত আলো একটি ইলেকট্রোমোটিক কোর্স উৎপন্ন করে। এর মধ্যে কটো-ডন্টাইক জাতীয় সেলের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। তার কারণ প্রধানত: তিনটি: (1) প্রচুর বিদ্যুৎ-শক্তির উৎপত্তি, (2) যথেষ্ট শক্তিসম্পন্ন এবং (3) বাইরের কোন ব্যাটারীর সাহায্য ব্যতিরেকেই কর্মক্ষম। এছাড়া সকল প্রকার দৃশ্যমানে আলোর ক্ষেত্রেই এই সেলটিকে ব্যবহার করা চলে।

বেতার আলোকচিত্রের ক্ষেত্রে এই কোষকে ব্যবহার করা হয়। এই জাতীয় কোষগুলির অবশ্য উন্নত সংস্করণের ইলেকট্রোডগুলি নানা প্রকার ধাতু এবং ধাতব যৌগিক দিয়ে তৈরি হয়। এগুলি পরস্পরের সংস্পর্শে পাশাপাশি অবস্থিত থাকে। প্রধানত: নিম্নলিখিত পদ্ধতিতে সাব্বানো থাকে: তামা এবং তারার অক্সাইড ( $\text{Cu}_2\text{O}$ ) ঘটিত, রৌপ্য-লৌহের সেলেনাইড জনিত, লৌহ-সেলেনিয়াম জাতীয়।

এই কটো-সেলের সঙ্গে বেতার আলোকচিত্র বা অল্প কথায় নিখুঁৎ-চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতির সম্পর্ক অত্যন্ত নিবিড়। রেডিও-কটো যন্ত্রের দুটি প্রধান অংশ আছে—একটির কাজ প্রেরণ করা আর অপরটির কাজ প্রেরিত চিত্র গ্রহণ করা।



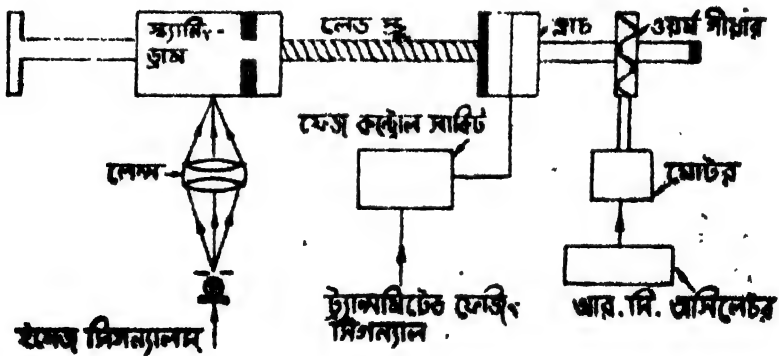
1নং চিত্র

প্রেরক-যন্ত্র

1নং চিত্র থেকে বোঝা যায় যে, প্রেরক-যন্ত্রের মুখ্য অংশগুলির মধ্যে আছে—(1) একটি নিয়ন্ত্রিত ঘূর্ণায়মান কম্পক (R. C. Oscillator), (2) একটি ছোট মোটর, যেটা গিয়ারের সাহায্যে স্কাফ্ট-এর সঙ্গে যুক্ত, (3) একটি সেন্সিটিভ প্যাক, (4) একটি ক্যানিং বা বিল্ডিংক ড্রাম, (5) একটি উত্তেজক আলো এবং (6) একটি কটো-টিউবের ব্যবস্থা।

এই যে কটো-টিউব সার্কিট, এতে আছে একটি কটো-সেল, যার একমাত্র কাজ

হলো, কোন বস্তু থেকে আগা আলো-কে বিদ্যুৎ-তরঙ্গে পরিণত করে দূরে পাঠিয়ে দেওয়া। নিশ্চয়ই এবার জানতে ইচ্ছা হয়, কেমন করে এই ছবি পাঠানো যায়। প্রথমে মোটরের সাহায্যে আবর্তিত স্ক্রাক্ট-এর সঙ্গে লাগানো বিশ্লেষক ড্রামটিকে স্ক্রাক্ট-এর চারদিকে ঘোরাতে হবে। এই ড্রামটির ঘূর্ণনকাল হবে প্রতি সেকেন্ডে ১ পাক। এটা হবে নিজের চারদিকে। অপর দিকে দৈর্ঘ্য বরাবর হবে প্রতি পাকে ১ ইঞ্চির ১০০ ভাগের এক ভাগ। এই ভাবে দৃশ্যটির বা ছবির প্রতিটি অংশ সন্নত থাকবে এবং তার সামগ্রিক ক্ষেত্রের প্রতিটি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থেকে আগা আলো কটো-টিউবকে ক্রমাগত উত্তেজিত করবে। এইভাবে টিউবটি একটি নির্দিষ্ট হারে সমগ্র চিত্রটিকে বিতরণ করবে। এই হারটি হচ্ছে প্রতি সেকেন্ডে ১০০০টি মৌলিক ক্ষেত্রাংশ। সুতরাং যদি চিত্রটিতে ৫০০,০০০ মৌলিক ক্ষেত্রাংশ থাকে, তবে কটো-টিউবটি তাকে যাত্র ৪ মিঃ সামগ্রিকভাবে ভাগ করতে পারবে। কোন কোন ক্ষেত্রে তার চেয়েও কম সময়ে এই কাজটি সম্পন্ন হয়ে থাকবে। সুতরাং ছবির নির্দেশ প্রেরণের কাজও খুব দ্রুতগতিতে হবে। এখন ছবি থেকে যে সংকেত গেল, গ্রাহক-যন্ত্র তাকে ধরলো এবং প্রথমেই তাকে বর্ধিত করে নিল। ফলে একটি নির্দেশক নিওন আলো জ্বলে উঠলো। সেই আলোক রশ্মিকে একটি ছোট ছিঁড়ের ভিতর দিয়ে পাঠানো হলো সেটা গিয়ে কেন্দ্রীভূত হবে একটি আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের উপর। এই কাগজটি জড়ানো থাকে একটি ড্রামের উপর। সমগ্র গ্রাহক-যন্ত্রটি প্রেরক-যন্ত্রের অনুরূপ। তবে এই যন্ত্রটি সাধারণতঃ একটি অঙ্ককার যন্ত্র



২য় চিত্র  
গ্রাহক-যন্ত্র

অথবা চতুর্দিক ঢাকা এমন একটি প্রকোষ্ঠে রাখা হয়, যেখানে ঐ নিওন ল্যাম্পের আলো ছাড়া আর কোন বাইরের আলো প্রবেশ না করে। এখন গ্রাহক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামটি প্রেরক-যন্ত্রের বিশ্লেষক ড্রামের সঙ্গে ঠিক সমহারে আবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং আলোক-স্পর্শকাতর কাগজের একটি বিশেষ মৌলিক ক্ষেত্রাংশে পড়া আলোর তীব্রতা নির্ভর করে

সেই বৃহত্তর রেকর্ডার ল্যাম্পের উপর আসা আলোক-সংকেতের তীব্রতার উপর। তোমরা পূর্বেই জেনেছ যে, এই সংকেতের তীব্রতা নির্ভর করে ঐ বৃহত্তর প্রেরিত ছবিটির বিশ্লেষিত মৌলিক ক্ষেত্রাংশের ঐচ্ছিকতার উপর। অতএব চিত্র গ্রহণের কাগজটি স্থায়ীমান অবস্থায় বিভিন্ন তীব্রতার আলোক রশ্মির দ্বারা আলোকিত হয়। যখন বিশ্লেষণ-ক্রিয়া শেষ হয়, তখন কাগজটি ডেভেলপ করা হলে একটি সুন্দর প্রতিকৃতির সৃষ্টি হয়। অবশ্য বর্তমানে সরাসরি প্রতিকৃতি গ্রহণের অনেকগুলি পদ্ধতি প্রচলিত হয়েছে। যার ফলে ফটোগ্রাফীর প্রয়োজনীয় সাজসরঞ্জাম, অঙ্ককার প্রকৌষ্ঠ প্রভৃতির আর প্রয়োজন হয় না। পদ্ধতিগুলির মধ্যে একটিতে প্রতিকৃতি গ্রহণ করা হয় একটি বিশেষ ধরনের কাগজের উপর দহন-ক্রিয়ার সাহায্যে। গ্রাহক ল্যাম্পের পরিবর্তে সেখানে একটা টাইলস অথবা অম্লরূপ সূচালো কোন বস্তু ব্যবহার করা হয়। একটি জোরালো আলোক-সংকেত গ্রহণ করবার পর প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন বিদ্যুৎ-স্তরের সৃষ্টি হয় ড্রাম এবং টাইলস প্রান্তের মধ্যে এবং লব্ধ বিদ্যুৎ-প্রবাহ কাগজটির সাদা অংশকে দহন করে আর সঙ্গে সঙ্গে কালো আস্তরণের সৃষ্টি হয়। এই আস্তরণের ঘনত্ব নানা কারণে নানা রকম হবার ফলে সম্পূর্ণ বিশ্লেষণের পর একটি নিখুঁৎ প্রতিকৃতি পাওয়া যায়। গ্রাহক-বস্তুর দ্বারা উৎপন্ন সংকেতগুলির উপযুক্ত পরিবর্ধন এবং তাদের আণেপিক প্রসারতা নির্দিষ্ট করলে তার ফলে পছন্দমত সাদা-কালোর মেশানো একটি তুলনামূলক ছবি পাওয়া যায়। তবে ঐ সংকেতগুলিকে ঠিকমত নিয়ন্ত্রণ করতে হয়। কোন কোন সময় ছবি অস্পষ্ট হয়। কেন না, সে ক্ষেত্রে সংকেতগুলির আসবার পথ খুব দীর্ঘ হওয়ার ভিন্ন ভিন্ন দিকে ছড়িয়ে পড়ে। তাই নানা প্রকার গোলমালজনিত বাধা ছবির মধ্যে আসায় এবং দাগের সৃষ্টি করে। সেই কারণে একটি কম্পন-নিয়ন্ত্রক ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে বেতার আলোকচিত্র প্রেরণে কম্পন-নিয়ন্ত্রকটিকে 88 মেগা সাঃ থেকে 108 মেগা সাঃ ব্যাণ্ডে কাজ করানো হয়। আধুনিক কালে এই পদ্ধতির আরও উন্নতি হয়েছে। এখন এক জোড়া নিয়ন্ত্রকের দ্বারা কম্পন-নিয়ন্ত্রণ করা হয় এবং গ্রাহক-বস্ত্রে কোন রকম অস্পষ্টতা বা এলোমেলো ভাব অনেকাংশে দূর করা হয় একটি Limiter-এর সাহায্যে। সংকেতগুলির ক্রমাগত নিয়ন্ত্রণের ফলে একটি পরিষ্কার নিখুঁৎ আলোকচিত্র পাওয়া যায়।

এই ধরনের চিত্র প্রেরণ-পদ্ধতি মিলিটারীতে এবং খবরের কাগজের অফিসে ব্যবহার করা হয়। আলোকচিত্র, লেখা বা ছাপানো কোন বিষয়, চার্ট বা মানচিত্র, ছবি প্রভৃতি তাড়াতাড়ি পাঠাবার কাজ এর দ্বারা সহজে সম্ভব হয়। বড় হলে বিষয়টি আরও বেশী কমে জানতে পারবে, তখন তোমাদের ধারণা আরও পরিষ্কার হবে।

## ভারতের জাতীয় পাখী—ময়ূর

অপরূপ রূপলাবণ্য এবং বহু ঐতিহ্যের অধিকারী ময়ূর যে ভারতের জাতীয় পাখী, সে কথা নিশ্চয়ই তোমাদের জানা আছে। ময়ূরকে ভারতের নিজস্ব পাখী বললে ভুল হয় না। এদেশের কয়েকটি জায়গা বাদ দিলে প্রায় সব অঞ্চলেই ময়ূর পাওয়া যায়। রাজস্থান, উত্তর প্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলে এদের প্রায় সর্বত্রই দর্শন মেলে। পশ্চিম বঙ্গের দাঙ্গিলিং, জলপাইগুড়ি, বাঁকুড়া প্রভৃতি অঞ্চলেও ময়ূর হ্রলভ নয়। ভারত ছাড়া সিংহল, ব্রহ্মদেশ, পাকিস্তান, মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশেও এদের দেখা মেলে। ভারতে যে ময়ূর দেখা যায়, তার বৈজ্ঞানিক নাম পাভো ক্রিস্টেটাস। আর মালয়, ইন্দোচীন প্রভৃতি দেশে যে ময়ূর দেখা যায়, তাদের বলা হয়—পাভো মিউটিকাস।

ভারতীয় ময়ূর এদেশ থেকে নানা দেশে ছড়িয়ে পড়েছে। শোনা যায়—আলেকজান্ডারের সময় এদেশ থেকে ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়েছিল গ্রীসে। সেখান থেকে যায় ইউরোপের বিভিন্ন দেশে। প্রায় ছ-হাজার বছর আগে ইরানেও ময়ূর নিয়ে যাওয়া হয়।

ময়ূর সমতল ভূমি থেকে প্রায় চার-পাঁচ হাজার ফুট উঁচু পার্বত্য অঞ্চলে থাকতে পারে, তবে তারা খুব উঁচু পাহাড়ে বাস করে না। পাহাড়, জঙ্গল, ঝোপ-ঝাড়ের কাছে যদি জলের উৎস থাকে, তবে সেই সব জায়গা এদের পছন্দ। এরা খুব জল খায়, তাই বোধ হয় জলাশয়ের কাছাকাছি বাস করার দিকেই ঝোঁক। ঝোপ-ঝাড়, বন-জঙ্গলের কাছে নদী-নালা আছে—এমন সব অঞ্চলেই তারা বাসা তৈরি করে।

ময়ূর সামাজিক পাখী। বন-জঙ্গলে এরা ঘুরে বেড়ায় দলবেঁধে। একটি ময়ূর তিন-চার বা কিছু বেশী স্ত্রী-ময়ূর নিয়ে এক পরিবারভুক্ত হয়ে বাস করে। দিনের বেলায় এরা মাটির উপর চরে বেড়ায়, তবে গাছের উপর বে থাকে না, তা নয়। হুপুরে কড়া ঘোদ উঠলে ঝোপ-ঝাড় বা বন-জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। সাধারণতঃ ভোরের আলো ফুটে উঠলে বা বিকেলের দিকে এরা বেরিয়ে পড়ে খাওয়ার সন্ধানে। এরা প্রায় সর্বভুক—নানা রকম শস্ত, ফলমূল, ফুলের কুঁড়ি, কচি পাতা, ঘাস-পাতা, ছোট ছোট সরীসৃপ জাতীয় প্রাণী প্রভৃতি এদের খাদ্য। গৃহপালিত ময়ূর ধান, চাল, গম, বব, কপির পাতা, কল ইত্যাদি খেয়ে থাকে। রাজ্যবেলায় এরা গাছের ডালে গিয়ে আশ্রয় নেয় এবং দলবল নিয়ে সারারাত সেখানেই কাটায়। ভোরের আলো ফুটে উঠলে আর নূর্য ভবে গেলে এরা এক রকম শব্দ করে, যাকে বলা হয় কেকাধ্বনি। তবে ভয় পেলে এরা যে শব্দ করে, তা কিন্তু কেকাধ্বনি নয়।

মহুরের দৃষ্টিশক্তি অতি প্রখর। শোনবার ক্ষমতাও বেশ আছে। সর্বদাই এরা খুব সতর্কভাবে চলাকেরা করে। বনের মধ্যে কোন শত্রুর আগমন হলে এরা সহজেই তা বুঝতে পারে এবং চকল হয়ে ওঠে, আর বিপদ-সম্বন্ধে জানাতে স্ত্রী-পুরুষ মিলে এক রকম শব্দ করে। এরা বেশ লাজুক পাখী। অনেক সময় মহুরের আওরাজ পেলেও তাদের দেখা মেলা ভার। লোকালয়ের কাছাকাছি যে সব মহুর থাকে, তারা মানুষকে এড়িয়ে চলে। তবে অনেক সময় তাদের গ্রামের মধ্যে বা লোকালয়ে ঘোরাকেরা করতেও দেখা যায়। এরা পোষও মানেন। পোষ মানলে মহুর মালিকের হাত থেকে খাবার নিয়ে খায় আর তার পিছনে পিছনে ঘোরে। তবে এরা অন্য কোন পোষা পাখীদের উপর বড় একটা সদর ব্যবহার করে না।

প্রয়োজনমত মহুর হাঁটা-চলা বা ওড়া ছুই-ই করতে পারে। নদী-নালা, জলাশয় প্রভৃতি তারা উড়ে পার হয়। আবার বিপদের সময় ছুটে পালাতেও পারে। মজবুত পা-দুটি তাদের একাজে সহায়তা করে। পুরুষদের পা-দুটি শত্রুকে আক্রমণের হাতিয়ার হিসাবেও ব্যবহৃত হয়। তাছাড়া পা দিয়ে মাটি খোঁড়া, আঁচড়ানো প্রভৃতি কাজও হয়। অনেক সময় অসতর্ক মুহূর্তে মানুষকেও এরা আক্রমণ করে থাকে।

স্ত্রী-মহুর বছরে একবার করে ডিম পাড়ে। সাধারণতঃ এরা তিনটি থেকে আটটি পর্যন্ত ডিম দিতে পারে। গাছের কোটরে বা শুকনো লতা-পাতা, ঘাস বা খড়কুটা দিয়ে তৈরী বাসায় এরা ডিম পাড়ে। পোষা মহুরী বাগানে বা তার আশেপাশে লতা-পাতা, ঘাস ইত্যাদি জমা করে তার মধ্যে ডিম পাড়ে বলে জানা যায়। প্রায় তিন ইঞ্চি লম্বা ডিমগুলির রং সালা, পীতাম্ব বা হালকা বাদামী। বাচ্চা অবস্থার অন্ততঃ বেশ কিছুটা বড় না হওয়া পর্যন্ত স্ত্রী-পুরুষ ভেদ করা শক্ত। পুরুষদের পুচ্ছ সম্পূর্ণ সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে ছ-তিন বছর সময় লেগে যেতে পারে। তবে বাচ্চাদের ঝুঁটি বা শিখা থাকে। মহুর দীর্ঘজীবী পাখী।

সামান্যতঃ মত বর্ণবিকাসী অপক্লপ পুচ্ছ আর নৃত্যের জন্তে মহুরের সবচেয়ে বেশী খ্যাতি। কিন্তু এই পুচ্ছ বা পেখমের বাহার শুধু পুরুষ মহুরদেরই আছে, মহুরীদের পেখম নেই। বর্ষা-সমাগমে যখন তারা পেখম তুলে নাচে, তখন তা অপক্লপ দেখায়। পুচ্ছটি বেশ লম্বা। পুরুষ মহুর লম্বায় প্রায় ছ-ফুট পর্যন্ত হয়ে থাকে আর তার পুচ্ছটি হয় প্রায় চার ফুটের মত। ঝোপ-ঝাড়ে চলাকেরা করবার সময় এই পুচ্ছ কোন বাধার সৃষ্টি করে না। এদের পুচ্ছ বেশ হালকা ও নমনীয়, তবে বেশ মজবুত ও শক্ত। মহুরপুচ্ছ কিন্তু আসলে লেজ নয়, লেজের আচ্ছাদন বলা যেতে পারে। আসল লেজ থাকে এর তলার। মহুর ইচ্ছামত পুচ্ছ খুলতে বা বন্ধ করতে পারে। পেখমতোলা পুচ্ছে বিভিন্ন রঙের বিকিমিকি দেখা যায়। পুচ্ছের সব পালক কিন্তু সমান নয়। এই পালকে থাকে চক্ৰ আঁকা। মহুরকে সংস্কৃতে সহস্রলোচন পাখী বলা হয়। এদের পেখমের পালকের চক্ৰগুলির জন্তেই এই নাম। শিখা আছে বলে এদের শিখীও বলা হয়।

খাদ্য হিসাবেও ময়ূর একদিন জনপ্রিয় ছিল। প্রাচীন রোম, ইউরোপের ভোজ সভার, বড়দিনের সময় ইংল্যাণ্ডে ও আরও নানা স্থানে ময়ূরের মাংসের কদর ছিল। সম্রাট অশোকও একদিন ময়ূরের মাংসের ভক্ত ছিলেন। অবশ্য তাঁর সময়েই পরে ময়ূর-হত্যা নিষিদ্ধ হয়। মহাভারত ইত্যাদিতে দেখা যায় যে—অতিবেক, ভোজনভার ময়ূরের মাংসের এক বিশেষ স্থান ছিল। কবিতা আছে—ঋতুভেদে ময়ূরের মাংস খেলে নাকি দেহের উপকার হয়। বর্তমানে ভারতবর্ষে ময়ূরের মাংস খাওয়ার চলন নেই। তবে এই সেদিন পর্যন্তও হায়দরাবাদের নিজাম তাঁর সম্মানিত অতিথীদের ময়ূরের মাংস দিয়ে আপ্যায়িত করতেন। ভারতে ময়ূর পবিত্র পাখীরূপে সম্মানিত, কারণ এর সঙ্গে ধর্মবিশ্বাস জড়িয়ে আছে। তাছাড়া ভোমরা নিশ্চয় শুনেছেন সাহাজানের ময়ূর সিংহাসনের কথা, ময়ূরপাখী নাওয়ের কথা। ঐক্যের চূড়ায় ময়ূরের পাখা শোভা পায় বা দেব সেনাপতির বাহন যে ময়ূর, তাও ভোমাদের অজানা নয়। জৈন সম্রাটগণও ময়ূরের পালক ধারণ করতেন। দেব-দেবীর অঙ্গসজ্জায়, রাজমুকুটে ও বীর বোত্সাদের উকীর্ষেও শোভা পেত একদিন ময়ূরের পালক। দেবালয়ে, রাজপ্রাসাদে, উড়ানে, ধনীগ্রহে, ঋষির আশ্রম ও তপোবনে ময়ূর-ময়ূরী একদিন মহাউল্লাসে বিরাজ করতো। আজও তার কিছু কিছু নিদর্শন পাওয়া যায়। তাছাড়া গানে, কবিতায় ও সাহিত্যে ময়ূর বহু উল্লেখিত এবং সমাদৃত হয়েছে নানা শিল্পকলায়। এদেরপর কাব্য, সাহিত্য, ধর্ম, ইতিহাস, পুরাণ, রূপকথা, শিল্পকলা প্রভৃতিতে আমাদের জাতীয় পাখী ময়ূর এমনভাবে জড়িয়ে আছে যে, যার তুলনা বিরল।

জীবনমাধব মিত্র\*

\*প্রাণিবিজ্ঞা বিভাগ, বিশ্বভারতী, শান্তিনিকেতন

## ট্যাকিওন্স

ভোমরা জান আলোই সবচেয়ে দ্রুতগামী। আর এও জান যে, এর গতিবেগ সেকেন্ডে প্রায় ১ লক্ষ ৪৬ হাজার মাইল বা ২ লক্ষ ৯৭ হাজার ৬ ম' কিলোমিটার। একবার চিন্তা করে দেখ ভো—কি প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে আলো ছুটে চলছে।

আলোর চেয়েও দ্রুতগামী কণিকা আছে—এই কথা শুনে চমকে উঠলেন বৈজ্ঞানিকেরা। এতদিন ধরে আমরা যা জেনে এসেছি, সে কথা তাহলে ভুল? বিজ্ঞান-জগতের সকলে অবাক হয়ে তাবতে থাকেন—কি সে জিনিষ?

কলাম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কিন পদার্থ-বিজ্ঞানী ডক্টর জেরার্ড ফেনবার্গ (J. Feyn-



berg) আলোর চেয়ে দ্রুততর কণিকার কথা বলেছেন। নাম তার ট্যাকিওন্স (Tachyons)। শব্দটি গ্রীক ভাষা থেকে নেওয়া। গ্রীক ভাষার শব্দটির অর্থ হলো দ্রুতগতি।

ট্যাকিওন্সের গুণাগুণ বা ধর্ম সম্বন্ধে ডক্টর কেনবার্গ বা বলেছেন, সেকথা এমার বলছি। এই বিরাট বিশ্বের সব জায়গাতেই এই কণিকার অবাধ গতি। প্রচণ্ড গতিবেগ নিয়ে কণিকাগুলি ঘুরে বেড়ায়। কোন কোন সময় এদের গতিবেগ এমন প্রচণ্ড হয় যে, তা অসীমে (Infinity) গিয়ে পৌঁছায়। সাধারণ বস্তুর গতি বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সে অনুপাতে বেড়ে যায়, কিন্তু এই কণিকাগুলির ধর্ম তার ঠিক উল্টো রকমের; অর্থাৎ গতিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে শক্তির পরিমাণও সেই অনুপাতে কমে যেতে থাকে।

আমরা জানি, সাধারণ বস্তু আলোর গতি পেলে নিজেদের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলবে, তখন তাদের ভর (mass) শক্তিতে রূপান্তরিত হয়ে যাবে।

আইনস্টাইনের তত্ত্বানুযায়ী শক্তিকে  $E$ , ভরকে  $m$  এবং শূন্যে আলোর গতিবেগকে  $c$  ধরলে—

$E=mc^2$  অর্থাৎ শক্তি তখন বস্তুর ভর ও আলোর গতিবেগের বর্গের গুণফলের সমান হয়; অর্থাৎ আলোর গতিতে বস্তুর ভর শক্তিতে রূপান্তরিত হয়। সাধারণ বস্তুর গতির যেখানে শূন্য, ট্যাকিওন্সের গতির সেখানে থেকেই শুরু। তাই এই কণিকাগুলিকে বের করতে হলে আলোর চেয়ে বেশী গতির মধ্যে তাদের খুঁজে নিতে হবে।

গবেষণাগারে ট্যাকিওন্সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার প্রধান বাধা হলো, তার এই প্রচণ্ড গতি, যা আলোর চেয়েও বেশী। আর এক বাধা কণিকাগুলি তড়িৎ-আধানিত নাও হতে পারে বলে ডক্টর কেনবার্গের ধারণা।

সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বিজ্ঞানী আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের ভিত্তিতেই ডক্টর কেনবার্গ এই কাল্পনিক কণিকার অস্তিত্বের কথা বলেছেন। তত্ত্বগতভাবে অকণাক্ষের জটিল হিসাব দেখিয়ে তাঁর সূত্রটিকে তিনি প্রমাণ করেছেন।

সংবাদে প্রকাশ, ট্যাকিওন্সের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার জন্তে ইতিমধ্যে গবেষণাগারে বেশ কয়েক বার চেষ্টা করা হয়েছে। এর অস্তিত্ব প্রমাণিত হলে বিজ্ঞানের পরিধি যে আরও বিস্তৃত হবে, সে সম্বন্ধে কোন দ্বিমত নেই।

বিজ্ঞানীরা বলেছেন, ট্যাকিওন্সের গুণাগুণ বা ধর্ম আমাদের পরিচিত বস্তুকণিকা থেকে বেশ কিছুটা আলাদা। অনেক পদার্থ-বিজ্ঞানী আশা করেন যে, গবেষণাগারে কেনবার্গের নতুন এই তত্ত্বটি প্রমাণ করা হয়তো সম্ভব হবে।

ডক্টর কেনবার্গের নাম দেওয়া এই নতুন কণিকা 'ট্যাকিওন্সের বিশ্ব জ্ঞানবার জন্তে বিজ্ঞানীদের সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র বিশ্ববাসী আজ গভীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন।

কারণ এই তত্ত্বটি প্রমাণিত হলে কেমন করে অতীতের সৃষ্টি হলো, তা হয়তো আমরা নতুন করে ভেবে দেখতে হবে।

অনুর ভবিষ্যতে উত্তর কেনবার্গের পূত্র ধরে আলোর চেয়ে দ্রুতগতিতে এক স্থান থেকে অন্ড স্থানে বিদ্যুৎ-শক্তির আদান-প্রদান করা যাবে, যা এখন অসম্ভব। এক গ্রহ থেকে অন্ড গ্রহের দূরত্ব আলোক-বর্ষ (আলো এক বছরে যেটা দূরত্ব যায়) দিয়ে না মেপে এই নতুন ট্যাকিওন্স দিয়ে মাপা হবে। গ্রহগুলির পারস্পরিক বোণাবোণগু করা যাবে অনেক কম সময়ে।

আগামী দিনে বিজ্ঞান-জগতে নতুন যার খুলে যাবে ট্যাকিওন্স আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে।

অজয় ভট্ট

## গতিশীল মহাদেশ

আশ্চর্য মনে হলোও কথাটা সত্য যে, মহাদেশও গতিশীল; এই বিষয়ে পবেষণারত বিজ্ঞানীদের মতে, এখন আমরা দেশ, মহাদেশ ও মহাসাগরগুলিকে পৃথিবীপৃষ্ঠে বোঝানো দেখানো দেখতে পাই। প্রথমে কিন্তু সে রকম স্কেটেই ছিল না; করেক কোটি বছরের ব্যবধানে আদি অবস্থান থেকে বর্তমানে এরা অনেকখানি সরে গেছে। গতিশীল মহাদেশের এই তত্ত্বটির প্রথম আভাস দেন ফ্রান্সিস বেকন, প্রায় সাড়ে তিন-শ' বছর আগে। এরপর ১৯০৭ সালে আমেরিকার অধ্যাপক ডবলিউ. এইচ. পিকারিং এবং ১৯১০ সালে এক. বি. টেলর এই তত্ত্বটি নিয়ে বিশদ আলোচনা করেন। ১৯২৮ সালে প্রকাশিত তাঁর পুস্তকে টেলর একটি চমকপ্রদ সংবাদ দেন। তাঁর মতে, ফ্রিটেনাগ যুগে তাঁর ধরা পড়েছিল পৃথিবীর আকর্ষণে। কলে পৃথিবীপৃষ্ঠে অবস্থিত সমুদ্র ইত্যাদিতে প্রচণ্ড জলক্ষোভ দেখা দেয়। এই আলোড়নের থাকার মূল ভূখণ্ড করেকটি ক্ষুদ্রতর অংশে ভেঙে যায়। কলে বর্তমান গ্রীনল্যান্ড থেকে উত্তর আমেরিকা এবং মধ্য আটলান্টিক অঞ্চল থেকে আফ্রিকা ও দক্ষিণ আমেরিকা বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়।

মহাদেশগুলির আদি অবস্থান সম্বন্ধে বিজ্ঞানীরা বলেন, বহু কোটি বছর আগে বর্তমান বিশ্বেরখার উত্তর ও দক্ষিণ দিকে দুটি বিরাট ভূখণ্ড বা মহাদেশ ছিল। এর প্রথমটির নাম দেওরা হয়েছে লোরেসিয়া এবং অপরটির নাম গণ্ডোয়ানালাণ্ড। বর্তমান সময়ে ইউরোপ ও এশিয়া, গ্রীনল্যান্ড এবং উত্তর আমেরিকা ছিল লোরেসিয়ার অঙ্গাঙ্গ, আর গণ্ডোয়ানালাণ্ডের মধ্যে ছিল এখনকার আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা, অস্ট্রেলিয়া এবং

মের অঞ্চল। ভারতবর্ষ ছিল অবশ্য শেখোক্ত মহাদেশের অন্তর্গত। এই দুই ভূখণ্ডের মধ্য দিয়ে বয়ে যেত বিরাট টেথিস সাগর। স্বাভাবিক কারণে এই সাগর পৃথিবীপৃষ্ঠ থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে বটে, তবে বর্তমান ভূমধ্যসাগর সেই প্রাচীন টেথিসেরই একটা অংশ বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা।

গভির্দীপ মহাদেশের তথ্যটি প্রথম বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করেন আমেরীয় বিখ্যাত ভূতত্ত্ববিদ আলফ্রেড ওয়েগনার। 1915 সালে তাঁর 'দি অরিজিন অফ কন্টিনেন্টস এ্যাণ্ড ওশাল' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে ওয়েগনার এসবকিছু বহু তথ্য ও প্রমাণ উপস্থাপিত করেন। তাঁর মতে, আগিতে বিদ্যে ছিল কেবলমাত্র একটি বিরাট ভূভাগ বা Pangea। মেসোজোয়িক যুগে সেটি ভাঙতে শুরু করে; উত্তর প্রাথমিক শিলার উপর দিয়ে এই সব ইকরা ভূখণ্ড ভেঙ্গে যাবার সময় সামনে জমে-ঠা আবর্জনাগুলিকেও ঠেলে নিয়ে যেতে থাকে। পরবর্তী যুগে এইসব আবর্জনাই সঞ্চিত হয়ে সৃষ্টি করেছে হিমালয়, আরস্ ইত্যাদি পৃথিবীর বৃহৎ বৃহৎ পর্বতশ্রেণী। ওয়েগনার বলেন, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার পশ্চিম উপকূল অঞ্চলে অবস্থিত পর্বতশ্রেণীর উৎপত্তি হয়েছে মহাদেশগুলির পশ্চিম অভিমুখী গতির ফলে।

সাম্প্রতিক কালে এ নিয়ে কিছু কিছু পরীক্ষা হয়েছে। কয়েক মাস আগে আমেরিকার প্রসিদ্ধ ভূতত্ত্ববিদ ডক্টর লরেন্স গোল্ড তাঁর দলবল নিয়ে দক্ষিণ মের অঞ্চলে গিয়েছিলেন এই বিষয়ে তথ্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যে; সেখানে প্রাপ্ত বিভিন্ন জিনিষের মধ্যে আছে লিট্টোনিউরা নামক প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপের প্রাপ্তগীভূত কঙ্কাল, দক্ষিণ মের থেকে 400 মাইল দূরে পাহাড়ের নীচে এটি পাওয়া গেছে। কঙ্কালটি লম্বার প্রায় আড়াই হাত, প্রাণীটির আকৃতি বড় বিচিত্র, এর চোখ দুটি কিছু উত্তোলিত এবং নাক দুটি চোখজোড়ার মাঝখানে মাঝায় খুলির উপর অবস্থিত অর্থাৎ এর শ্বাসকার্য চলতো মস্তিষ্কের মধ্য দিয়ে। জন্তুটি যে জলচর ছিল, তাতে সন্দেহ নেই। এছাড়া অভিযাত্রীদল প্রাগৈতিহাসিক প্রাণী ডার্মোসেরের পূর্বপুরুষ বলে বর্ণিত থিয়োকোডোন্ট-এর ফসিলও এখানে পেয়েছেন। ইতিপূর্বে এই জন্তুটির ফসিল দক্ষিণ আফ্রিকা, দক্ষিণ আমেরিকা এবং উরুগুয়েতেও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সব মূল্যবান আবিষ্কার থেকে বিজ্ঞানীরা সিদ্ধান্ত করেছেন—এক সময়ে পৃথিবীর দক্ষিণ প্রান্তে ছিল একটি বিরাট ভূভাগ। বিজ্ঞানীরা সেটির নাম দিয়েছেন গণ্ডোরানাল্যাণ্ড। বর্তমানে প্রচণ্ড ঠাণ্ডা এবং বৃষ্টিবিহীন হলেও দক্ষিণ মের এক সময় উষ্ণ অঞ্চলের অন্তর্গত ছিল এবং ঘন অরণ্যও দেখা যেত এর বিভিন্ন স্থানে। তাছাড়া বর্তমান অবস্থানে আসবার আগে দক্ষিণ মের যে এককালে দক্ষিণ আফ্রিকা এবং দক্ষিণ আমেরিকার সঙ্গে একই ভূখণ্ডের অন্তর্গত ছিল, এটি ভারই অকাটা প্রমাণ।

হিমবাহ নিয়ে গবেষণার সময় বিজ্ঞানীরা কয়েকটি বিচিত্র ব্যাপার লক্ষ্য করেছেন। প্রাচীন গণ্ডোরানাল্যাণ্ড জুড়ে ছিল বরফ ও হিমবাহের বিস্তীর্ণ রাজত্ব। বর্তমান গ্রীষ্মকালের

যে সব অংশ গণ্ডারানাল্যাণ্ডের অন্তর্গত ছিল বলে বিজ্ঞানীরা মনে করেন, প্রচণ্ড গরম হলেও সে সব অঞ্চলের কোথায়ও কোথায়ও কিন্তু এখনো হিমবাহের অভিযের চিহ্ন দেখা যায়। এই প্রাচীন মহাদেশের হিমবাহিক পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে যে, এগুলি নিরক্ষরেখা থেকে দূরে সরে এসেছে অথচ আমরা জানি, বরফের স্বাভাবিক গতি সব সময় উচ্চতর অঞ্চলের দিকে। এথেকে এমন সিদ্ধান্ত করলে বোধ হয় ভুল হবে না যে, অতীতে কোন এক সময়ে এই অঞ্চলটি হিমমণ্ডলের অন্তর্গত ছিল, তারপর সরে গিয়ে বর্তমান স্থানে উপস্থিত হয়েছে।

সমুদ্রের তলদেশ পরীক্ষা করতে গিয়ে বিশেষজ্ঞেরা একটানা লক্ষা উচ্চভূমির সন্ধান পেয়েছেন। এর প্রথমটি আছে মধ্য আটলান্টিক অঞ্চলে, দ্বিতীয়টি ভারতবর্ষ ও আফ্রিকার মাঝামাঝি ভারত মহাসাগরের তলদেশে, তৃতীয়টি অস্ট্রেলিয়া ও দক্ষিণ মেক্সিকো মাঝামাঝি স্থানে। বিশেষজ্ঞদের মতে, এগুলিই হচ্ছে প্রাচীন গণ্ডারানাল্যাণ্ডের সীমা। মহাদেশটির উত্তর প্রান্ত মধ্য হিমালয়ের পর্বতশ্রেণী পর্বত বিস্তৃত ছিল। এক সময় বিরাট টেথিস সাগর হয়ে যেত হিমালয়ের উপর দিয়ে, সেখানকার বিভিন্ন চূড়ার পাওয়া বিভিন্ন সামুদ্রিক জীবের দেহাবশেষ থেকে একথা বুঝতে অনুবিধা হয় না। এক সময় বিরাট হিমালয় পর্বত মগ্ন ছিল সমুদ্রগর্ভে।

ভারতবর্ষের ভূপ্রকৃতি পরীক্ষা করতে গিয়ে বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে—এখানকার অসংখ্য অঞ্চল অপেক্ষা বিদ্যুৎ পর্বতের দক্ষিণ প্রান্তের ভূমি তুলনামূলকভাবে সাম্প্রতিক কালে গঠিত। তাঁদের মতে, এর গঠনকাল কার্বনিকেরাস এবং মেসোজোয়িক যুগের মাঝামাঝি সময়। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার প্রমাণিত হয়েছে যে, ভারতবর্ষের এই অঞ্চলের ভূপ্রকৃতির সঙ্গে অস্ট্রেলিয়া, আফ্রিকা, ম্যাডাগাস্কার এবং দক্ষিণ আমেরিকার কোন কোন অঞ্চলের মাটির বৈশিষ্ট্য মিল আছে। তাছাড়া ভারতবর্ষের মধ্য প্রদেশে ভারনোসরের যে কসিল পাওয়া গেছে, তার সঙ্গে হুদুর ম্যাডাগাস্কার, ব্রাজিল, উরুগুয়ে এবং প্যাটাগোনিয়ার আবিষ্কৃত একই কসিলের মধ্যে অদ্বুত সাদৃশ্য বিজ্ঞানীরা লক্ষ্য করেছেন।

মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আসার জিন্মা এখনো পৃথিবীর কোন কোন অঞ্চলে চলছে। আফ্রিকার দ্রিষ্ট উপত্যকা অঞ্চলে ব্যাপারটা পরিষ্কার বুঝতে পারা যায়। বিশেষজ্ঞদের অনুমান, আরব ও ম্যাডাগাস্কার যেমন একদিন মূল মহাদেশ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল, তেমনি হুদুর ভবিষ্যতে পূর্ব আফ্রিকাও একদিন মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। তাছাড়া গ্রীনল্যান্ডের জাতিয়ার দৈর্ঘ্য মাপতে গিয়েও একটা বিচিত্র জিনিস বিজ্ঞানীদের চোখে পড়েছে। তাঁরা দেখেছেন, দেশটি প্রতি বছর ইউরোপের মূল ভূখণ্ড থেকে ২৫ থেকে ৩০ গজ করে সরে যাচ্ছে, সুতরাং করেক লক্ষ বছর পরে এটি বেশ কয়েক হাইল দূরে সরে আসবে—এমন অনুমান করা অস্বাভাবিক নয়।

## সূর্যশিশির

সূর্যশিশির—আসলে একটি গুল্মজাতীয় ছোট উদ্ভিদ ছাড়া আর কিছুই নয়। ইংরেজীতে একে বলে Sun dew আর জীব-বিজ্ঞানীর ভাষায় এর নাম Drosera। এদের বাস সাধারণতঃ আসামের পাহাড়ী অঞ্চলে—খাসিয়া ও জয়ন্তীয়া পাহাড়ে, আর দক্ষিণ ভারতের পশ্চিম-ঘাট পাহাড়ে; তাছাড়া বাংলা দেশের কোন কোন স্থানে ঝালুকাকীর্ণ এলাকার এদের সাক্ষাৎ মেলে। এদের দূর থেকে দেখলে পানের পিক বা লাল লাল ধোঁকা বলে মনে হয়।

দেখতে ছোট হলেও এরা কাজে মোটেই ছোট নয়। এরা এক-একটি ক্ষুদ্র রাক্ষস, ছোট ছোট পোকা-মাকড় ধরে সহজেই হজম করে কলে। নেহাৎ জীবন-রক্ষার তাগিদেই এদের পোকা-মাকড় ধরে খেতে হয়। কারণ প্রত্যেক জীবদেহই প্রোটিন নামক জটিল রাসায়নিক পদার্থ ছাড়া জীবনধারণ করতে পারে না এবং এই জটিল পদার্থ গঠনকারী উপাদানগুলির মধ্যে নাইট্রোজেন অত্যন্তম। কিন্তু সূর্য-শিশির যে মাটিতে জন্মায়, সে মাটিতে নাইট্রোজেন থাকে না; কাজেই এরা প্রোটিন তৈরি করতে পারে না। এই কারণেই এরা জীবদেহ থেকে প্রোটিন সংগ্রহের এক বিশেষ কৌশল আয়ত্ত করে নিয়েছে।

টুকি চারেক লম্বা ছোট ছোট গাছ ভোরের আলোয় ঝলমল করে, মনে হয় পাতার উপর বেন শিশির জমে রয়েছে। পাতাগুলি মাটির উপর গোলাকারে সাজানো থাকে আর তাদের মাঝখান থেকে ফুলসমত ডাঁটা বেরিয়ে আসে। এই পাতাগুলিই হচ্ছে এক-একটি কীদ। এদের উপরের গা থেকে ঝড়াতাবে কতকগুলি শুঁড় সাজানো থাকে। এই শুঁড় থেকে অনবরত কৌটা কৌটা মধুর মত মিষ্টি রস বেরিয়ে এসে মাখায় জমা হয়। এই কৌটাগুলিই সূর্যের আলোর ঝলমল করে ওঠে, আর পোকা-মাকড়েরা মধুর লোভে ভুল করে পাতার উপর এসে বসে। তখন তো ওরা জানে না যে, ওগুলি মধুমাখা আঠালো পদার্থ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাই শুঁড়গুলি পোকাটাকে ধীরে ধীরে পাতার গায়ে আটকে কলে জারক-রস দিয়ে সম্পূর্ণ হজম করে কলে। যুডদেহটার রস শুবে নেবার পর আবার কীদ পেতে বসে নতুন শিকারের আশায়। এমন কি, এও দেখা গেছে যে, এক টুকরা মাংস পাতার উপর কলে দিলেও একই রকম ব্যাপার ঘটে থাকে।

বৃহত্তা মৌলিক

## প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন 1। সাইক্লোষ্ট্রোন কি ?

মল্লয় ভট্ট, বারাসভ

প্রশ্ন 2। ডাবের জলের উপকারিতা কি ?

অমিতা বন্দ্যোপাধ্যায়

শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়

হালিশহর

উঃ 1। বস্তুকণিকাকে ঘরাঘিত করলে তার শক্তি বৃদ্ধি পায়। গবেষণাগারে বস্তুকণিকাকে ঘরাঘিত করার কাজে যে সমস্ত বিভিন্ন ধরনের যন্ত্র ব্যবহৃত হয়, সাইক্লোট্রোন সেগুলির মধ্যে অন্যতম। এই যন্ত্রে পরিবর্তী তড়িৎ-প্রবাহের সাহায্যে বস্তুকণিকাকে ঘরাঘিত করা হয় ও চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রয়োগে এর গতিপথ নিয়ন্ত্রিত হয়। সাধারণতঃ ভারী বস্তুকণিকাকেই এই বিদ্যুৎ-চুম্বকীয় ক্ষেত্রের মধ্যে ক্রমশঃ বৃত্তাকার পথে আবর্তনের সাহায্যে ঘরাঘিত করা হয়। পরীক্ষামূলক পদার্থবিজ্ঞানের গবেষণায় পরমাণুর রাসায়নিক রহস্য উদ্ঘাটনে এই সমস্ত শক্তিশালী কণিকা কাজে লাগে।

উঃ 2। আমাদের শরীর গঠনের কাজে বিভিন্ন প্রকার খাদ্য লবণের প্রয়োজন অপরিহার্য। এই সমস্ত খাদ্য লবণ বিভিন্ন মৌলিক পদার্থের সংমিশ্রণে গঠিত। ডাবের জলকে রাসায়নিক উপায়ে বিশ্লেষণ করে দেখা গেছে যে, এর মধ্যে সাধারণতঃ সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, পটাসিয়াম, লোহা, তামা, কপাক্রম, ক্লোরিন ইত্যাদি আছে। এগুলি ছাড়াও ডাবের জলে প্রোটিন, শর্করা, স্নেহজাতীয় পদার্থ এবং বিভিন্ন ভিটামিনের উপস্থিতিও প্রমাণিত হয়েছে। ডাবের জলে যে সমস্ত ভিটামিন পাওয়া যায়, সেগুলি হচ্ছে ভিটামিন বি-2, ভিটামিন বি-6, ভিটামিন-3, ভিটামিন-সি ইত্যাদি।

ডাবের জলে উপস্থিত বিভিন্ন মৌলিক উপাদানগুলির মধ্যে সোডিয়াম পাকস্থলীতে পাচক রসে হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড উৎপাদনে ও দেহকোষগুলির স্বাভাবিক কাজ নিয়ন্ত্রণে সাহায্য করে। ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়াম দাঁত, অস্থি ইত্যাদির গঠন ও জৈব-অনুঘটকের বিক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। স্নায়ুকেন্দ্রের কাজ সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার ক্ষেত্রে

পটাশিয়ামের ভূমিকা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। লোহা ও তারার মতো লোহিত কণিকা ও হিমোগ্লোবিন সৃষ্টির কাজে সাহায্য করে। এইভাবে ডাবের জলের বিভিন্ন মৌলিক উপাদান আমাদের শরীর গঠনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করে থাকে।

ডাবের জলে উপস্থিত খাতব পদার্থগুলি ছাড়া অম্লান্ত পদার্থগুলি, অর্থাৎ শর্করা, প্রোটিন, বিভিন্ন প্রকার ভিটামিনও আমাদের শূন্য শরীর গঠনের ক্ষেত্রে অপরিহার্য। দেহকোষগুলির সজীবতার জন্যে জল খুবই প্রয়োজনীয়। কাজেই উপরিউক্ত প্রয়োজনীয় উপাদানগুলি ছাড়াও ডাবের জলের জলীয় অংশটুকুও ফেলা যায় না।

স্বাস্থ্যসুন্দর দে\*

\* ইনস্টিটিউট অব রেডিওকিমিক্যাল অ্যান্ড ইলেক্ট্রনিক্স, বিজ্ঞান কলেজ, কলিকাতা-৭

## বিবিধ

### চাঁদের বৃকে সচল সোভিয়েট

#### মহাকাশযান লুনোখোদ-১

ইতিপূর্বে চাঁদের বৃকে দু-বার মাত্র তাদের পদচিহ্ন রেখে এসেছে। মার্কিন মহাকাশযান অ্যাপোলো-১১ এবং অ্যাপোলো-১২-র দু-জন করে মহাকাশচারী সাফল্যের সঙ্গে চাঁদের বৃকে পদার্পণ করেন এবং সেখানে নানা বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ চালিয়ে নিরাপদে পৃথিবীতে ফিরে এসেছেন। মাত্রের মহাকাশ অভিযানের ইতিহাসে এটি এক ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এতদিন পর্যন্ত চন্দ্রপৃষ্ঠে মাত্র বেসব মহাকাশযান পাঠিয়েছিল, সেগুলি চাঁদের বৃকে বেয়ে এক স্থানে অবস্থান করে বথানির্দিষ্ট বৈজ্ঞানিক অন্বেষণ সম্পন্ন করেছে। গত ১৭ই নভেম্বর মহাকাশ-অভিযানের ক্ষেত্রে আর একটি ঐতিহাসিক ঘটনা

ঘটলো। সেদিন তারতীয় সময় সকাল ৭টা ১৭ মিনিটে সোভিয়েট মহাকাশযান লুনো-১৭ থেকে একটি স্বয়ংক্রিয় আট চাকার বান লুনোখোদ-১ চাঁদের বর্ষ সাগর অঞ্চলে বেয়ে পৃথিবী থেকে প্রেরিত নির্দেশ অনুযায়ী চলারেরা শুরু করে।

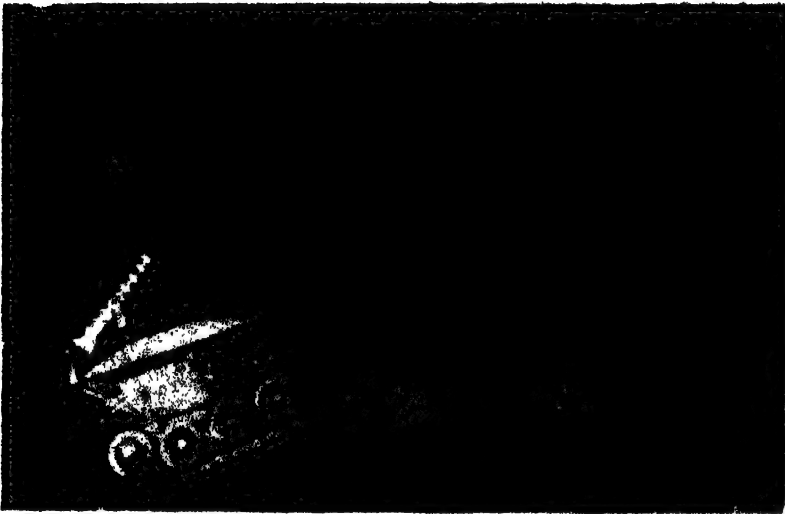
চাঁদের বৃকে লুনোখোদ-১-এর এই সচল কার্য-কলাপ মহাকাশ প্রযুক্তিবিদ্যার দিক থেকে নিঃসন্দেহে একটি বিস্ময়কর ঘটনা। সোভিয়েট ইউনিয়নের তুপ্ত মহাকাশক্ষেত্র থেকে যে সব নির্দেশ পাঠানো হয়েছে, লুনোখোদ তা যথাযথ ভাবে পালন করেছে এবং নানা ধরনের বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিতুনভাবে সম্পাদন করেছে। লুনোখোদকে একটি ট্যাক্সিওবলা বেতে পারে। এই ট্যাক্সিওতে রয়েছে সোভিয়েট বৃত্তান্তের প্রতীক, দেশের প্রতিকৃতি, বেতার বোগাখোশের ব্যবস্থা,

টেলিভিশন বরং অন্য নাম। বরষের বৈজ্ঞানিক  
বহুপাতি। এই সব বহুপাতির মধ্যে একটি হচ্ছে,  
কালে নির্দিষ্ট একটি পেসার প্রতিকলক।  
মহাকাশ-বিজ্ঞানে কাল ও সোডিয়েট ইউনিটের  
মধ্যে সহযোগিতার চুক্তি অল্পদূরে কাল এই বস্তুটি  
দিয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

পৃথিবীর বুকে চলমান যানের চাকার সঙ্গে  
চক্রপৃষ্ঠে চলমান লুনোবোদে চাকার বিশেষ

লুনোবোদ চক্রপৃষ্ঠের টেলিভিশন ছবি  
পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। ছবিগুলি চক্রকার-পৃষ্ঠ  
দূতের সে সব ছবিতে টাঁদের দূকে লুনোবোদে  
চলাচলের দাপড়নিও শট বোঝা গেছে। ছবিতে  
লুনোবোদ তার বহুপাতিগুলিকেও পৃথিবীর  
দেখিয়েছে

লুনোবোদ পাঁচ দিন ধরে মধ্যনির্দিষ্ট কার্য  
সম্পাদনের পর টাঁদের দেশে দীর্ঘ শীতরাজি



চক্রপৃষ্ঠে অবতরণের পর লুনোবোদ-১ লুনা-১৭ মহাকাশযান থেকে  
নেমে আসছে।  
( শিল্পীর পরিকল্পিত )

কোন সাহস নেই, যদিও সেগুলির কার্যপ্রণালী  
এমন একই রকম। চক্রপৃষ্ঠে চলমান যানকে এমন-  
ভাবে তৈরি করা হয়েছে, যাতে বায়ুপ্রভা ও  
আপেক্ষিকতার বিরূপ ভাবভেদে মধ্যে সে সঠিক-  
ভাবে কাজ চালাতে পারে। চক্রপৃষ্ঠের সংযুক্তি  
ও পূর্ণন ক্রম থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের; কাজেই  
এই সব বিষয় বিবেচনা করেই লুনোবোদকে  
নির্মাণ করা হয়েছে।

( পৃথিবীর সময়ের হিসাবে ১৪ দিন ) নেমে  
আসায় নিজের ও চলচ্ছবিহীন হয়ে যায়।  
কারণ সূর্যরশ্মিই এতদিন লুনোবোদের সকল শক্তি  
জুগিয়ে এসেছিল। ৪ই ডিসেম্বর টাঁদের বর্ণ  
সাগরের আকাশে আবার সূর্য উঠলে সোডিয়েট  
বিজ্ঞানীর লুনোবোদকে সক্রিয় করার চেষ্টা  
করবেন।

লুনোবোদ-১ পৃথিবীর বুকে কিসে আসবে



না। কারণ কিয়ে আসবার উপযোগী রকেট নিয়ে সে চাঁদে যায় নি। সুনোবোদের এই সাফল্য ভবিষ্যতে হুয়াত্তরের গ্রহে বংশজির যান প্রেরণের পথ প্রশস্ত করবে। ভাবীকালে সুনোবোদের অঙ্গগামীরা বঙ্গ, তুঙ্গ বা আরও দূরবর্তী গ্রহে গিয়ে সেবানকার তথ্য পৃথিবীর বাহ্যকে জানাতে পারবে বলে বিজ্ঞানীরা আশা করেন।

**করোনারী অক্সুশন সম্বন্ধে জনপ্রিয় বক্তৃতা।**

5ই আগস্ট '70 বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের উদ্যোগে বিজ্ঞান পরিষদ ভবনে 'করোনারী অক্সুশন' সম্বন্ধে একটি লোকসম্মেলন বক্তৃতার ব্যবস্থা করা হয়। বক্তৃতাটি প্রদান করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের অধ্যক্ষ সহ-সভাপতি ডাঃ বোসেন্দ্রনাথ মৈত্র। এই বক্তৃতা-সভার সভাপতিত্ব করেন বঙ্গীয় বিজ্ঞান পরিষদের সভাপতি জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু। করোনারী অক্সুশনের কারণ, লক্ষণ এবং প্রতিকারের পন্থা প্রভৃতি বিষয়ে ডাঃ মৈত্র প্রোডাদের সুবিধে বলেন। বক্তৃতার শেষে কলিকাতার যুক্তরাষ্ট্রের তথ্য কেন্দ্রের সৌজন্যে এই বিষয়সংশ্লিষ্ট ছুটি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়।

### কৃত্রিম জীবন সৃষ্টি

লণ্ডন থেকে এ. পি. ও. এ. এক. পি. কতর্ক প্রচারিত এক সংবাদে জানা যায়—ব্রিটিশ জীব-বিজ্ঞানী জেন্স ড্যানিয়েলি ঘোষণা করেছেন যে, তিনি কৃত্রিম উপায়ে বরাগারে 'জীবন সৃষ্টি করতে পেরেছেন।' ব্রিটিশ বেতারে এক টেলিকোম সাফল্যকারে তিনি জানিয়েছেন,

নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির জীব-বিজ্ঞান গবেষণাগারে তিনি অল্প জীব-কোষের অংশ জুড়ে দিয়ে আর একটি নতুন জীব-কোষ সৃষ্টি করেছেন। ঘোষণা এই জীব-কোষ শুধু বেঁচেই থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে। ডক্টর ড্যানিয়েলি উক্ত গবেষণাগারের অধ্যাপক।

ডক্টর ড্যানিয়েলি বলেছেন, বরজির ঘোঁকারে ইচ্ছামত যাপ ও আকৃতির পোষাক তৈরির মত মন থেকে বিশ বছরের মধ্যে মানুষ নির্দিষ্ট নকশা অনুযায়ী তত্তপারী জীব সৃষ্টি করতে পারবে। তিনি আরও বলেছেন—অবশ্য কৃত্রিম মানব প্রজাতি সৃষ্টির দিকে না গিয়ে বাহ্যের বংশগত ব্যাধিগুলি দূর করবার দিকেই আপাততঃ মন দিতে হবে।

নিউইয়র্ক থেকে এ. পি. আরও জানিয়েছেন যে, নিউইয়র্ক স্টেট ইউনিভার্সিটির গবেষক হল কৃত্রিম উপায়ে এই প্রথম জীব-কোষের সংশ্লেষণ ঘটাতে পেরেছেন। তাঁরা এককোষী অ্যামিবার দেহ ছিন্নবিছিন্ন করে কেলেছেন এবং অত্যন্ত অল্প অ্যামিবার দেহাংশ জুড়ে নিয়ে নতুন অ্যামিবার সৃষ্টি করেছেন। নবজাত অ্যামিবা শুধু প্রাণেই বেঁচে থাকে নি, বংশবৃদ্ধিও করেছে।

এই গবেষণার উদ্যোক্তা হচ্ছেন বার্কিন মহাকাশ-পরিচর্যা সংস্থা। তাঁদের বিশেষজ্ঞ হল এই আবিষ্কারকে জীব-বিজ্ঞানের ক্ষেত্রে নতুন ও বিস্ময়কর পদক্ষেপ বলে অভিনন্দিত করেছেন। অবশ্য নিউইয়র্ক টাইমস বিশেষজ্ঞদের উক্তি উল্লেখ করে বলেছেন, এর মধ্যে চাকল্যকর কিছু

বাকসেও আরও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভাঙে প্রতীক্ষা করা উচিত হবে।

### চিকিৎসা-বিজ্ঞানের নতুন অব্যায়— এণ্ডোফোপি

হামবুর্গ থেকে ইউ. এন. আই. এবং ডি. পি.

এ. কতৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—  
দেহাত্মকরবীকণ পদ্ধতি, ইংরেজী নাম  
এণ্ডোফোপি—চিকিৎসা-বিজ্ঞানে এক নতুন ও  
রোগাকরকর অব্যায়। অতঃপর চিকিৎসা-  
বিজ্ঞানকে দেহাত্মকর রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে  
আদৌ অহমানের উপর নির্ভর করতে হবে না।

নানা দেশে, বিশেষ করে জাপানে এই  
পদ্ধতিটির অঙ্গসরণ করা শুরু হয়েছে। পদ্ধতিটি  
হচ্ছে এরূপ—মানবদেহের যে সকল আত্মবিক  
হারণ রয়েছে—চোখ, কান, নাক ইত্যাদি,  
সেগুলির মধ্য দিয়ে বিনি-ক্যামেরা দেহাত্মকর  
প্রবেশ করিয়ে রঙীন ছবি তুলে নিয়ে আসা হচ্ছে।  
ক্যামেরাটির চেহারা হাতের কড়ে আঙুলের মত,  
যত্নে গলার মধ্য দিয়ে ঢুকিয়ে দেওয়া যায়।  
বিনি-বাইকোফোপও রয়েছে, পরীক্ষা সাধারণ  
একই আঁচড় কেটে এটিকে দেহাত্মকর প্রবেশ  
করিয়ে দিলে সেটি নিখুঁতভাবে রোগ-ব্রণার  
উৎসটি দেখে নিতে পারে।

পেটের তিতরে টিউমারটির অবস্থান আসলে  
কোথায় এবং তার অবস্থানটিই বা কিরূপ,  
ক্যামেরা তার নিখুঁত ছবি তুলে এনে ডাক্তারকে  
দেবে।

পৃথিবীর সেবা এণ্ডোফোপিষ্ট আপানের  
জা: হিমোলি ওমিনো রোগীর পাকস্থলীর

প্রাচীরের ট্রিক কোন্ স্থানটিতে কতটা কত বসি  
হয়েছে, তা দেখিয়ে দিতে পেরেছেন।

অঙ্গসরণভাবে কৃত্রিম দ্বি-বিনিউক্লিয়ার  
প্রবেশ করিয়ে রোগীর পলকোন্দের অবস্থান  
দেখে নিয়ে অস্ত্রোপচার করা হয়েছে।

### কৃত্রিম রক্ত

চারলটভিল (ভার্জিনিয়া) থেকে রয়টার  
কতৃক প্রচারিত এক সংবাদে প্রকাশ—কৃত্রিম  
রক্ত নিয়ে পরীক্ষা-নিরীক্ষার ব্যাপারে  
বিজ্ঞানীরা কৃত্রিম রক্ত ব্যবহার করেছেন।  
ক্যাটর অফেল, জিলাটিন ও বোনা জলের  
মিশ্রণে এই রক্ত তৈরি করা হয়েছে।

ভার্জিনিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের কেমিক্যাল ইঞ্জি-  
নিয়ারিং-এর অধ্যাপক ডক্টর গিলেট সাংবাদিকদের  
জানান—আসল রক্ত এই পরীক্ষার অঙ্গসরণযোগী।  
সেটা ব্যয়সাধ্য তো বটেই, তাছাড়া খোঁজা  
জারগার রাবলে জমাট বেঁধে যায়।

### পান্না অধুবিভক্ত অকল

মহাদিল্লী থেকে পি. টি. আই. কতৃক প্রচারিত  
এক সংবাদে জানা যায়—মাজহানের উমরপুর  
ও আজমীরের মধ্যে একটি দেড়-শ' মাইল  
বিত্তীর্ণ এলাকার পান্না পাওয়া যাবে বলে  
রূপ বিশেষজ্ঞেরা জানিয়েছেন। এখন কি,  
হাশিরার বিখ্যাত পান্না এলাকা থেকে যে  
পরিমাণ পান্না পাওয়া যায়, এখান থেকেও  
সেই পরিমাণ পান্না পাওয়া যাবে বলে রূপ  
বিশেষজ্ঞের অভিপ্রায়। "একদল রূপ-ভূতত্ত্ববিদ  
সম্মতি এই অঞ্চলটি খুঁজে গিয়েছেন। এঁরা

এখানে আসেন জাতীয় বনি উন্নয়ন কর্মসূচী-  
কর্মসূচীর উদ্দেশ্যে।

এসময়টা উল্লেখ করা যেতে পারে, রাজস্বের  
পারমাণবিক আর্থনৈতিক ব্যাতি আছে এবং এবেকে  
হীরকের চেয়েও বেশী অর্থ পাওয়া যায়।

বিশিষ্ট কৃষি-বিজ্ঞানীর ১৯৭০ সালের প্রতিবেদন

অন্তে নোবেল পুরস্কার লাভ

সম্পূর্ণ এক নতুন ধরনের সব ও ফুট।  
আবিষ্কারের অন্তে ১৯৭০ সালে আমেরিকার  
কৃষি-বিজ্ঞানী ডাঃ মরহান আলেক্সি বরলগকে  
নোবেল পুরস্কার দিয়ে সম্মানিত করা হয়েছে।  
পৃথিবীর বাত-সমস্ত সমাধানে এই সব সব ও  
ফুট। খুবই সহায়ক হতে পারে, কারণ এই সব  
সবের ফলন খুব বেশী হয়ে থাকে। দুইপ্রাচ্যে  
এক প্রকার বহাঙ্গাঙ্গীর অকালে যে অতিরিক্ত  
ফলফল দান উদ্ভাবিত হয়েছে, তাও পরোক্ষভাবে  
এই আবিষ্কারের ফল।

এই নতুন ধরনের সবের চাব ইতিমধ্যেই ভারত,  
পাকিস্তান, নেপাল, ছরক, ইকুয়াডর, জর্ডন,  
উগান্ডা, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান প্রভৃতি

দেশে বহুতর করে চাষ করা হচ্ছে।  
পাকিস্তান ও বেরিয়াকোতে এই চাষের ফল  
ফুট। চাষ করে যে পরিমাণে ফল পাওয়া  
গেছে, সেই পরিমাণে ফল অন্য কোথাও ফুট।  
ও সব চাষ করে এই 'নোবেল' আর পাওয়া  
যায় নি।

পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত কৃষিকর্ম

১৩ই নভেম্বর পূর্ব পাকিস্তানে প্রচলিত কৃষিকর্ম  
লক্ষ লক্ষ লোক নিরুত, আহত ও নির্যাতন  
হয়েছিল। 'কর্মক্ষেত্র' কতিপয় হয়েছে হাতিরা,  
রাখগতি, ভোলা ও চরজবর—এই চারটি বীণ।  
পূর্ব পাকিস্তানের এই প্রচলিত কৃষিকর্ম সাম্প্রতিক  
কালের প্রচলিত বিপর্যয়। 'কর্মক্ষেত্র' বিপর্যয়  
বিবরণ এখন পর্যন্তও সঠিক নির্ণয় হয় নি।

অনুসন্ধান :—নভেম্বর '৭০ সংস্করণ 'জাতি

বিজ্ঞানের ৬৪৬ পৃষ্ঠার (৮) চিত্রিত পদ্ধতিতে  
'৭ দিয়ে গুণ করলে' এই ফলে 'গণের' পরিবর্তে  
'ভাগ' হবে।





